কঠোপনিষদ্

স্বামী ভূতেশানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

কঠোপনিষদ্

স্বামী ভূতেশানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় কঠোপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনাগুলি ক্যাসেটে ধরে রাখা হয়। ক্যাসেট থেকে অনুলিখিত হয়ে পরে মুদ্রণের উপযোগী করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক ধর্মসভায় আলোচিত বলে স্থানে স্থানে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। তবে সে পুনরাবৃত্তিসমূহ পরিহার করার চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ তা মার্জনা করবেন। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি সাধ্যানুসারে সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস করা হয়েছে। আমাদের এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে তা পাঠকবর্গই নিরূপণ করবেন। গ্রন্থখানি সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সহজবোধ্য হলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য তাঁদের প্রয়াস ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশন সম্ভব হতো না। পরমেশ্বর তাঁদের কল্যাণ করুন।

সূচীপত্র

ভূমিকা	১-১০
কঠোপনিষদ্ (শান্তিপাঠ)	১১

কঠোপনিষদ্

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
প্রথম বল্লী	১
দ্বিতীয় বল্লী	৩৫
তৃতীয় বল্লী	১৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রথম বল্লী	১৬৭
দ্বিতীয় বল্লী	১৯৪
তৃতীয় বল্লী	২৩৫
পরিশিষ্ট	
মন্ত্রনির্দেশিকা	২৭৭
আকরগ্রন্থাবলী	২৭৯
নির্ঘণ্ট	২৮২

॥ ভূমিকা ॥

শাস্ত্রে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের কথা আছে। যে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হলে তার চারটি অনুবন্ধ অর্থাৎ চারটি বিশেষ সম্বন্ধ প্রথমেই জানতে হয়, তবেই সে গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি হতে পারে। অনুবন্ধকে সংক্ষেপে গ্রন্থারম্ভের হেতু বলা যায়। অনুবন্ধ চারটি হলো— বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকারী ও প্রয়োজন। প্রথম অনুবন্ধ গ্রন্থটির মূল বিষয়। বিষয়টি জানা থাকলে বোঝা যাবে আমাদের মনকে কোথায় কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। মূল বিষয় না জানলে অনেক অবান্তর বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে গুরুত্ব দিতে হবে বা কোন্ প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে তা বুঝতে পারব না। দ্বিতীয় অনুবন্ধ হলো সম্বন্ধ। বিষয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ কী। গ্রন্থের সঙ্গে বিষয়ের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান এবং গ্রন্থ এই জ্ঞানের প্রতিপাদক। তৃতীয় অনুবন্ধ, গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী নির্ণয়। অনধিকারী যদি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় চর্চা করে তাহলে ফললাভ তো হয়ই না বরং ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত ফলও হয়। গ্রন্থ-পাঠের শেষ অনুবন্ধ হলো প্রয়োজন। কেন গ্রন্থোক্ত বিষয় আমরা আলোচনা করব, এতে আমাদের লাভ কী হবে? নিতান্ত মূর্খও সব সময়েই লাভ-লোকসান খতিয়ে কাজ করে— 'প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে'[১]। যাতে লাভ নেই এমন বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। অনেক সময় মনে হবে আমরা যে বিজ্ঞানচর্চা করি তাতে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখি না, তত্ত্বকে জানবার জন্য বিজ্ঞানের অনুসরণ করি। শাস্ত্র বলেন, কেবল জানবার জন্যই জানা— এতে সহজে মানুষের প্রবৃত্তি হয় না। কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এটি মনে রেখে জানতে প্রবৃত্তি হয়। 'কাকদন্ত-পরীক্ষা'[২]— কাকের দাঁত আছে কিনা পরীক্ষা করার কোন সার্থকতা নেই। যদি কেউ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তা করে, সে চেষ্টার সঙ্গে তার জীবনমরণ সমস্যার সম্বন্ধ থাকে না, কৌতূহল চরিতার্থতার দিকেই লক্ষ্য থাকে। শাস্ত্র বলেন কেবলমাত্র এইরকম কৌতূহলনিবৃত্তি শাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্য নয়। জীবনের সঙ্গে জড়িত কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের চর্চা। অতএব গ্রন্থ-পাঠের আগে আবশ্যকতা বিচার করে গ্রন্থারম্ভ করতে হবে।

---

১. শ্লোকবার্তিক (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার)—৫৫

২. মীমাংসাদর্শন— ৬/২/১, শাবরভাষ্যের উপর টুপ্‌টীকা দ্রষ্টব্য

এখানে প্রথমেই বিচার্য, কঠোপনিষদের বিষয়টি কী? বিষয়— আত্মজ্ঞান যা নচিকেতার প্রশ্ন থেকে আমরা জানছি। নচিকেতার জিজ্ঞাস্য— মৃত্যুর পরে কী হয়? কেউ বলে আত্মা থাকেন, কেউ বলে থাকেন না। আত্মা সম্বন্ধে মানুষের এই যে সংশয় তার দূরীকরণ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আলোচ্য উপনিষদের বিষয়। কঠোপনিষদ্ গ্রন্থটি আত্মজ্ঞানরূপ বিষয়ের প্রতিপাদক এবং আত্মজ্ঞান চায়। কেন চায়? নিছক কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য? না, আত্মার স্বরূপকে জানলে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে এই উদ্দেশ্যে। যা কিছু মায়িক তাকে বলে সংসার। দেহটিও তার মধ্যে পড়ে। সংসারের বন্ধন আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মাকে অনিত্য, বহুবিধ দোষযুক্ত, সুখী বা দুঃখী বলে বোধ করায়। সেই বন্ধন থেকে যে মুক্তিকামী সেই ব্যক্তিই উপনিষদ্ পাঠের যথার্থ অধিকারী। এই অধিকারী-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের কথাও বলা হলো। প্রয়োজন হলো অজ্ঞান এবং তৎপ্রযুক্ত সকল দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তি।

এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় কেবল বেদান্ত সম্বন্ধে নয়, সমস্ত শাস্ত্রের, সর্ব বিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা সেই বেদান্তের আলোচনা করছি যাকে উত্তর-মীমাংসা বলে। তেমনি পূর্ব-মীমাংসা শাস্ত্রেও ঠিক এইরকম অনুবন্ধ-চতুষ্টয় আছে। মীমাংসকগণ বলেন, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি। অলৌকিক সুখ, যা স্বর্গে গিয়ে মানুষ লাভ করতে পারে, তার সাধন হলো ধর্ম। মীমাংসকদের মতে বেদের তাৎপর্য এখানেই। কেন? না, তাতে শাস্ত্রের লক্ষণ পুরোপুরি মেলে। শাস্ত্রের লক্ষণ কী? 'অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং শাস্ত্রম্'— শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা যে বস্তুকে জানা যায় না সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিয়ে দেওয়া। ধর্মের সাধ্য স্বর্গাদি, তা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। স্বর্গাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, মনের দ্বারা নির্ণেয় নয়, অনুমানের দ্বারাও তাকে জানা যায় না। এক্ষেত্রে বেদ ছাড়া অন্য সব প্রমাণ অচল। সুতরাং ধর্মই মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টি কেন আমরা আলোচনা করব? না, ধর্ম দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিসুখ পাবার জন্য। সুতরাং প্রয়োজন— স্বর্গাদি সুখ। অধিকারী কে? স্বর্গকামী ব্যক্তি। 'সুবর্গকামো যজেত'[১] —স্বর্গকামী যাগ করবেন। অধিকারী সম্বন্ধে অবশ্য আরও কথা আছে যে তিনি বেদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবেন, বেদরূপ প্রমাণকে নিত্যসিদ্ধ বলে মানবেন এবং বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অনুসরণকারী হবেন। শাস্ত্রে যাকে অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাই হবেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্র-গ্রন্থের যেমন প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ তেমনি শাস্ত্রের সঙ্গে অধিকারীর যে সম্বন্ধ রয়েছে তাকে

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫

বলা যায় প্রযোজ্য বা নিযোজ্য-নিযোজক সম্বন্ধ। শাস্ত্র নিযোজক, স্বর্গকামী নিযোজ্য। কারণ, শাস্ত্র অধিকারীকে ধর্মাদিতে নিযুক্ত করে। এই বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও এই উভয় মীমাংসার মধ্যে একটি স্পষ্ট বৈসাদৃশ্যও আছে। বেদান্ত শুধু তত্ত্বকে প্রতিপাদন করে, জানিয়ে দেয়, আর কিছু করে না। পূর্ব-মীমাংসা তত্ত্বকে জানিয়ে দিয়েই শেষ হয়ে যায় না কিন্তু, অনুষ্ঠান করতে বলে। মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্মবিষয়ক বিধির কথা যেমন আছে তেমনি নিষেধের কথাও আছে। 'যাগ কর' বলে যেমন যাগাদিতে নিয়োগ করা হচ্ছে তেমনি অমুক কাজ করো না, পাপ হবে, দুঃখভোগ হবে—এও বলা হচ্ছে। ধর্মাধর্ম, বিধিনিষেধ—এই দু-রকমই মীমাংসাশাস্ত্রে রয়েছে। কিন্তু বেদান্ত 'কুরু' অর্থাৎ কর—এ কথা বলেন না। শুধু জানলেই হয়ে গেল। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তশাস্ত্র বিষয়টিকে প্রতিপাদন করে দেয় মাত্র। অনুষ্ঠান না করলে, যাগযজ্ঞ কিরকম করে করতে হয়—কেবল তা জেনে কোন লাভ হবে না। সেইজন্য পূর্ব মীমাংসাশাস্ত্র বিধি এবং নিষেধের দ্বারা বদ্ধ করে। সুতরাং ধর্মাধর্ম জানার পরও অনুষ্ঠানের অপেক্ষা থাকে। কিন্তু বেদান্ত কিছু করতেও বলছে না, কিছু থেকে নিবৃত্ত হতেও বলছে না। বলছে আত্মাকে জান। জানা হয়ে গেলেই শাস্ত্রের কাজের পরিসমাপ্তি। শুধু জানলে কী লাভ হবে? না, যদি নিজেকে জানি যে—এই আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, তাহলে আর দেহাদি বন্ধন থাকবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন—

'আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ।'[১]

—যদি কেউ পরমাত্মাকে 'আমি ইনি' বলে স্বরূপত জানেন, তবে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় এবং কার প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখভোগ করবেন? অর্থাৎ তাঁর ঐরূপ ভোগ হয় না। 'এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্'[২]—ব্রহ্মজ্ঞের শাশ্বত মহিমা। এই শাশ্বত মহিমা কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। আত্মা সর্ব-কর্ম-সম্পর্কশূন্য। যিনি আত্মাকে এইভাবে জানেন তিনি কোন কর্মে নিযোজ্য হতে পারেন না একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং বেদান্তের তাৎপর্য মীমাংসার তাৎপর্য থেকে অত্যন্ত ভিন্ন।

প্রশ্ন হতে পারে, বেদান্তের তাৎপর্য যদি জ্ঞানে হয় তাহলে কী লাভ হলো? 'আমি এইরকম'—জেনে কী ফল হবে? আত্মা আছেন, আমি আত্মারূপে আছি, তাতে কী লাভ? কিছু লাভ হচ্ছে না। যদি কেউ বলে—আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তাতে আমার কী? আমি যেমন বন্ধনের মধ্যে

---

১. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—৪/৪/১২

২. তদেব—৪/৪/২৩

ছিলাম তেমনই রইলাম। তাই মীমাংসকেরা বলেন, বেদান্তের তাৎপর্য বৃথা, নিষ্ফল, সুতরাং হেয়। আর শাস্ত্র যদি তা প্রতিপাদন করে তাহলে শাস্ত্রও হেয় হয়ে যাবে, তার কোন সার্থকতা থাকবে না। কারণ 'ফলবদ্ অর্থজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্'— সফল অর্থকে যা জানায় তাকেই শাস্ত্র বলা হয়। সহস্রবার আত্মাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত বললেও মানুষ তার দ্বারা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে যায় না। আমার কাছে লক্ষ টাকা আছে—এমন কল্পনা লক্ষ বার করলেও কল্পিত সেই টাকা দিয়ে সামান্য বাস ভাড়াও দিতে পারি না।

বেদান্তবাদীদের বিরুদ্ধে মীমাংসকদের এই হলো যুক্তি। বেদান্তবাদী বলেন, বেদান্ত কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না করলে তোমাদের কথা মেনে নেব যে তা নিষ্ফল, সুতরাং অপ্রমাণ। কিন্তু এর দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় যে আত্মাকে জানলে আর সুখ-দুঃখের বা শুভাশুভ কর্মের ফলভাগী হতে হয় না। 'এই যে দেখছি ফলভোগী হচ্ছি?'—তার কারণ আত্মাকে জানি না। 'কেন জানব না? আত্মা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলে দিলেই তো জানা হয়ে গেল।' ওকে জানা বলে না। একজন একটা কথা বলল আর আমি শুনলাম সেও জ্ঞান বটে; কিন্তু এরকম জ্ঞানে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। 'কেমন জ্ঞান হওয়া চাই?' সংশয়-বিপর্যয় রহিত জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না বা বিপরীত ধারণা মনে আসবে না। 'বেদান্তের জ্ঞানে সংশয় থাকে না কি?' থাকে। 'বিপরীত ভাবনা আসে না কি?' আসে। সেইজন্য এই জ্ঞানকে আসল জ্ঞান বলা চলবে না। 'জ্ঞানের আবার আসল নকল আছে নাকি?' আছে। আসল জ্ঞানকে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, নকল জ্ঞান হলো পরোক্ষ জ্ঞান। দুটি দুরকম। দুঃখ যদি প্রত্যক্ষ হয় তার নিবারক হবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যদি ভ্রমজনিত দুঃখ হয় তাহলে বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুঃখ এবং তার সঙ্গে সুখও প্রমা-জ্ঞান নয়, ভ্রম-জ্ঞান। প্রতিপক্ষের প্রশ্ন— যা অনুভব হচ্ছে তাকে ভ্রম-জ্ঞান বলি কী করে? তার উত্তর, ছোট ছেলে মায়ের কোলে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সে একলা জঙ্গলের মধ্যে বাঘের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে আর কাঁদছে। মা দেখলেন ছেলেটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছে, তাকে জাগিয়ে দিলেন। তখন স্বপ্ন ভেঙে গেল, ছেলে দেখল সে একা নয় বা তাকে বাঘ তাড়াও করেনি। স্বপ্ন ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপরীত জ্ঞান দূর হয়ে গেল।

বেদান্ত মতে ঐ স্বপ্নে দেখা বস্তুর মতো যতরকমের দুঃখের অনুভব হচ্ছে, এমনকি সুখেরও যে ছিটেফোঁটা বোধ হচ্ছে তা ভ্রম-জ্ঞান থেকেই হচ্ছে। সে বিষয়ে প্রমাণ কী? প্রমাণ হচ্ছে তদ্বিপরীত অনুভব। শাস্ত্র বলছেন, যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বলেছেন, আমরা মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে

অজ্ঞানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। এটি তাঁদের অনুভব এবং সেই অনুভব বহু লোকেরই হয়েছে। প্রশ্ন উঠবে, অনুভব তো পাগলেরও হয়। প্রমাণ কী যে সেই অনুভব প্রমা-জ্ঞান? উত্তরে বলছেন, একজন দু-জনের নয়, ধারাবাহিক ভাবে গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে সেই অনুভব চলে আসছে এবং শাস্ত্রের দ্বারা তা সমর্থিত। পাগলের জ্ঞানেরও যদি পরম্পরা থাকত, বহুলোকের সমর্থন এবং শাস্ত্রেরও সমর্থন থাকত তাহলে অনুভবকে পাগলামি বলা যেত না।

তবু প্রশ্ন ওঠে, লক্ষে দু-একজনকে বাদ দিয়ে আর সকলে জগৎকে জড়বস্তু রূপে দেখছে। এতজনের অনুভব ঐ দু-চারজনের অনুভবেই কি নাকচ হয়ে যাবে? তার উত্তর, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে অনুভবের মূল্যায়ন হয় না। যুক্তি এবং শাস্ত্রের সমর্থন আছে কি না দেখতে হয়। অনুভব যদি যুক্তিবিরোধী হয় সে অনুভব প্রামাণিক নয় এবং শাস্ত্রও সেরকম কথা বলবেন না। বললেও প্রমাণ হবে না। বেদান্তবাদী বলছেন—জগৎ মিথ্যা। জগতের মূল তত্ত্ব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। কেউ বলবেন, এ কথা যুক্তি-বিরোধী। উত্তরে বেদান্তবাদী বলেন, যুক্তিবিরোধী বলে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত বদলে যাবে। এই নিয়ে দীর্ঘ বিচার আছে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বিরোধকে পূর্বপক্ষরূপে তুলে তার সমাধান করা হয়েছে। বেদান্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণের কোন বিরোধ নেই। পূর্বপক্ষ বলেন, তোমরা বল জগৎরূপ যে ব্রহ্ম তিনি নিত্য, এই সব প্রত্যক্ষবিরোধী কথা। উত্তরপক্ষ বলেন, তোমরা দেখছ অন্য ভূমি থেকে। যেমন জাগ্রতের ভূমি থেকে দেখলে স্বপ্নের অনুভবগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, স্বপ্নের ভিতর থেকে হয় না। স্বপ্নের ভিতরে থাকলে স্বপ্ন সত্য, যেমন জাগ্রতের ভিতরে থেকে জাগ্রৎ সত্য। জাগ্রৎ থেকে জাগ্রতের সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না তবুও তা মিথ্যা হতে পারে। অন্তত একেবারে অসন্দিগ্ধরূপে বলা চলবে না যে, যা আমরা দেখছি তাই ঠিক, আর শাস্ত্র যা বলছেন তা ভুল। তারপর বলছেন, জাগ্রতের অতীত একটি অবস্থা আছে সেখানে এই জাগ্রৎ বস্তু নেই। বলছেন, সুষুপ্তিতে সত্তার অনুভব না থাকলেও তার নিত্য হতে দোষ কি আছে? যেমন স্বপ্নের সময়ে বাইরের পরিবেশের অনুভব হচ্ছে না তবু তো তা সত্য। বলছেন, সুষুপ্তি-কালেও যে জগৎ থাকে তার প্রমাণ কী? প্রমাণ তো অনুভব ছাড়া হয় না। যেখানে অনুভব নেই সেখানে জগতের অস্তিত্বের অনুভব কী দিয়ে করব? আমরা বলব অনুভব না থাকলেও আরও দশজনের অনুভব রয়েছে, তার দ্বারা অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে। তার উত্তরে বলবে, আর দশজনের থাকাটাই প্রমাণিত না হয়, সন্দিগ্ধ হয় তাহলে সেই সন্দিগ্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করে সত্য নির্ধারণ হবে না। সুতরাং ও

যুক্তি খাটবে না যে আমি না জানি, আরও দশজনে জানে। আমি দেখছি না বলে কি সমস্ত জগৎটা নেই? অপরে দেখছে যে বলা হয় একথা এখানে যুক্তিসহ নয়। তবু দৃঢ় বিপরীত সংস্কার ভিতরে রয়েছে বলে আমাদের সংশয় যায় না। এমন দৃঢ় যে হাজার বললেও কিছুতেই মন মানতে চায় না। বিপরীতধর্মী পূর্ব সংস্কার তার প্রতিবন্ধক হয়। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত বললেও আমার সংশয়রহিত জ্ঞান হলো না। সংশয়রহিত জ্ঞান, যাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান বলি তা যদি না হয় তাহলে প্রত্যক্ষ অজ্ঞান দূর হবে না। আমার স্বরূপকে জেনেও যে অবিদ্যা, অজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে পারছি না তার কারণ আমাদের শুনে যে জ্ঞান হচ্ছে তা সংশয়রহিত নয়। সংশয়রহিত জ্ঞান হওয়া চাই। উপায় কী? উপায় চিত্তকে সংস্কারমুক্ত করা। যে বিপরীত সংস্কার আমাকে ক্রমাগত বদ্ধ, বদ্ধ বলছে তাকে মন থেকে সরাতে হবে তার বিপরীত সংস্কার দিয়ে। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি সুন্দর গল্প বলেছেন— মদালসার গল্প।[১] মদালসা রানী হয়েছেন। রাজাকে বলেছেন, আমার সংসার করতে আপত্তি নেই কিন্তু একটি শর্ত যে, সন্তান মানুষ করবার ব্যাপারে তুমি কিন্তু কোন বাধা দিতে পারবে না। রাজা মেনে নিয়েছেন। জন্মের পর থেকে মদালসা শিশুকে দোলনায় দোল দেন আর বলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'—তুমি শুদ্ধ, নিরঞ্জন আত্মা। সব মা যদি এরকম করতেন তাহলে কত ভাল হতো। আবাল্য শিশুর সংস্কার গড়ে উঠল যে সে নিরঞ্জন। তার ভিতরে আর বিরুদ্ধ সংস্কার উৎপন্ন হতে পারল না। ভাব হচ্ছে, মনের প্রতিকূল সংস্কারকে দূর করতে হলে তার বিপরীত সংস্কার মনে বসাতে হবে। সর্বদা মনকে বলতে হবে—তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। তুমি যে নিজেকে অন্যরকম মনে করছ সেটা ভুল। 'মনে করলেই হবে?' হ্যাঁ, হবে। তার চেয়ে বেশি কিছু করবার দরকার নেই, খালি মনে করলেই হবে। কারণ এটা সত্য।

এক জায়গায় রাস্তার ধারে একটা গাছ আছে। তার তলা দিয়ে যেতে লোকের গা ছমছম করে। শোনা গিয়েছে সে গাছে ভূত আছে। যাদের গা ছমছম করে তাদের কেউ সে ভূতকে দেখেনি, শুনেছে মাত্র। কিন্তু শোনা ভূত তাদের পেয়ে বসেছে। প্রতিকার কী? সাহস করে নিজের মনকে বোঝাতে হবে সেখানে কোন ভূত নেই, এ অলীক কল্পনা মাত্র। কিছুদিন শোনাতে শোনাতে মন মেনে নেবে এবং আর ঐ গাছের তলায় যেতে গা ছমছম করবে না। এই হলো বিপরীত সংস্কারের ফল। শাস্ত্র বলেন, আসল তত্ত্বটি

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ৫ম সংস্করণ (১৩৮৭), পৃঃ ১৩৪-৩৫ [এখন থেকে বইটির নাম কেবল 'বাণী ও রচনা' নামে উল্লেখিত হবে।]

শোন এবং সেই সংস্কারকে মনে দৃঢ় কর। করতে করতে যখন মনে সংশয় বিপর্যয় থাকবে না তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে এবং তার দ্বারাই মুক্তি হবে। প্রশ্ন উঠবে—প্রত্যক্ষ জ্ঞান এরকম করে কিভাবে হয়? বেদান্তী বলেন—প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাকে বলি যা আমাদের অনুভূত। পূর্বপক্ষের বক্তব্য—আত্মতত্ত্ব তো অনুভূত নয়। সিদ্ধান্তীর উত্তর—এমন জড়বুদ্ধি কেউ নেই যে নিজের সম্বন্ধে জানে না। নিজেকে না জানলে কোন কিছুই জানতে পারত না। তার সত্য জ্ঞান যেমন হয় না তেমন মিথ্যা জ্ঞানও হয় না। আমাকে অবলম্বন করেই সব কিছু। সেই আমাকেই যদি না জানি তাহলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং আমি আমার সম্বন্ধে যে অজ্ঞ একথা ঠিক নয়। তবে আমি আমাকে সঠিকভাবে, নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানি না। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান সব মানুষেরই আছে। সে জ্ঞান অসন্দিগ্ধ নয়, সন্দিগ্ধ। তা নাহলে আত্মার পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। আত্মা নিত্য অপরোক্ষ। কথা উঠবে—তাহলে মুক্তি হয় না কেন? তার উত্তরে পঞ্চদশীকার বলেছেন—'পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাৎ অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ'[১] —সেখানে জ্ঞানের যে প্রকাশ হচ্ছে সেটা পরোক্ষ জ্ঞানের মতো নয়, সাক্ষাৎভাবে অনুভূত। কিন্তু ফলে হচ্ছে পরোক্ষ, কারণ এই জ্ঞান অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্যস্ত নয়, তাই তার মুক্তিও হয় না। শাস্ত্র এই করেন। আত্মার স্বরূপকে জানিয়ে দিয়ে বলেন—সংশয় না যায় অনুশীলন কর, নিদিধ্যাসন কর। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[২]—শুনতে হবে, মনন অর্থাৎ বিচার করতে হবে এবং বিচারের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করে তার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করতে হবে। পুনঃ পুনঃ মনে আবৃত্তি করলেই জ্ঞান হবে। শাস্ত্রের কথা শুনে এখন যে জ্ঞান হচ্ছে সেটা পরোক্ষ জ্ঞানের মতো, তাই তাতে মুক্তি হচ্ছে না। এই হলো মীমাংসকদের বিরুদ্ধযুক্তির উত্তরে বেদান্তীদের মত।

এখানে বেদান্তের তাৎপর্য হলো আত্মজ্ঞান, যার দ্বারা আত্মার সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান দূর হয়ে যায়। সেইরকম জ্ঞানকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলা হয়েছে। মীমাংসকদের মতে যা নিয়োগ, তার এখানে প্রতিপাদন মাত্রেই অবসান। আর কিছু করতে হবে না কেবল জানিয়ে দেওয়া। আত্মাকে এইরকম জেনে এইরকম করতে হবে তা নয়। প্রশ্ন উঠবে—এই যে বলা হচ্ছে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতে হবে? উত্তর হলো—ওগুলো বিধি নয়, নিজেকে জানবার, পরিস্ফুট করবার প্রণালী। নিজেকে জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের আছে। সেখানে অপর কাকেও প্রেরণ বা নিয়োগ করতে হয় না। সুতরাং এখানে ঐরকমের কোন বিধি নেই। এই হলো বিষয়ের

১. পঞ্চদশী—৭/৫৪

২. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—২/৪/৫, ৪/৫/৬

সঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ। অধিকারী কে? যে মুক্তিকামী। আমরা আগেই বলেছি প্রয়োজন এখানে ধর্ম নয়, মুক্তি। সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই কাম্য নয়, কাম্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি। এইভাবে বেদান্তের দৃষ্টিতে বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকারী এবং প্রয়োজন—এই অনুবন্ধচতুষ্টয়কে দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের আশঙ্কা হতে পারে—অনধিকারী হয়ে শাস্ত্রচর্চা করলে বিপরীত ফল হবে না তো? শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে খুব ভাল করে বলা আছে। দেবতাদের প্রতিনিধি ইন্দ্র এবং অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন—দুজনেই আত্মতত্ত্ব জানতে গেলেন বৃহস্পতির কাছে। একই উপদেশ উভয়ে শুনলেন। কিন্তু একজন অধিকারী বলে আত্মাকে জানলেন, আর একজন অনধিকারী বলে দেহকেই আত্মা বলে বুঝলেন। এই ভুল বোঝা তাঁর অনর্থের কারণ হলো। আমাদের এরকম হবে না তো? তার উত্তরে বলছেন যে—অধিকারী নই—বলে কী লাভ? অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করতে দোষ কী? অধিকারী নই অতএব ও পথে যাব না—বললে কোনদিন অধিকারী হতে পারব না। বিষয়টিকে খোলা মন, যাকে বলে open mind, তাই নিয়ে জানতে হবে, জেনে তার গ্রহিষ্ণুতার পথে যে অন্তরায়গুলি আছে তাদের দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। মাত্র আংশিকভাবে জানলে তা ভয়ঙ্কর হবে।

তথাকথিত বেদান্তের পণ্ডিতেরা বেদান্ত পড়ে হয় জাগতিক বিষয়ে তার অপপ্রয়োগ করেন, না হলে তর্কবিতর্কে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পঞ্চবটীর সেই বেদান্তী সাধুর কথা আমরা জানি যিনি ঠাকুরের কথার উত্তরে বলেছিলেন জগৎটাই মিথ্যা আর আমার সম্বন্ধে অপবাদটা কী করে সত্য হবে? ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন, 'তুমি কিরকম বেদান্তী!' পাঞ্জাবে বেদান্তের খুব প্রচলন আছে। প্রায়শ লোকে সেখানে বেদান্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তাদের দেশীয় ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। নিশ্চলদাসের 'বিচারসাগর' গ্রন্থ বিখ্যাত। ভাল বই, কিন্তু তার অপব্যবহার হয় প্রচুর। সেই 'বিচারসাগর' পড়ে অনেক বিষয় জানা যায়, তর্ক করা যায়। কিন্তু তর্ক করা এক, আর জীবনে তাকে কাজে লাগানো ভিন্ন ব্যাপার। শাস্ত্র পড়ে যারা কেবল তর্কই করে, ঠাকুর তাদের কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা একটি প্রসঙ্গে বোঝা যায়। ঠাকুরের শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রথম ঠাকুরের কাছে এলে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'পঞ্চদশী-টশী পড়েছ?' তিনি পঞ্চদশীর নামই শোনেননি, বললেন, সে কার নাম মহাশয়, আমি জানি না। ঠাকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐ সব পড়ে আসে; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।'[১] কারণ কতকগুলি শব্দের কচকচি শিখে তিনি নিজের বুদ্ধিকে আরও গুলিয়ে ফেলেননি।

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সং ১৩৯৩, পৃঃ ৪২।

অধিকারীর আসল যোগ্যতা হলো শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থাকলে অনধিকারের ভয় থাকে না। শ্রদ্ধাবান হয়ে শাস্ত্র অনুসরণ করলে ফল ভাল হবে। অনধিকারীর যে দুর্গতি হয় শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও তাই হয়। গীতায় আছে,

'ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।
ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি'।।[১]

—এই জ্ঞান, প্রশ্ন না করলে, জানতে না চাইলে দিও না এবং শ্রদ্ধাযুক্ত না হলেও দিও না। যে তপশ্চর্যা করেনি অর্থাৎ যার মনের শুদ্ধি হয়নি, যে অভক্ত, তাকেও দিও না। অনধিকারীকে দিলে শাস্ত্রের অপব্যবহার হবে। আগে অনেক সময় ধর্মগ্রন্থকে লুকিয়ে রাখা হতো। যাতে অনধিকারীর হাতে না পড়ে, তাই এই সতর্কতা। ফলে অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে তত্ত্ব আলোচনা করছেন তাঁরা ঐ অনধিকারীর পর্যায়ে পড়বেন না। দু-চারজন শ্রদ্ধাহীনের জন্য কি শ্রদ্ধাবানদেরও বঞ্চিত করে রাখতে হবে? সুতরাং অত চিন্তা করে শাস্ত্রজ্ঞান দিতে হবে না। অন্যত্র আছে—'ত্রিসুপর্ণম্ অযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ'[২]—যে ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, সে না চাইলেও তাকে দেবে। অর্থাৎ এ নিয়ে ব্যবসাদারি করতে হবে না যে এটা গোপন বিষয়, secret, লোককে জানানো চলবে না। 'গোপ্যং গোপ্যং সদা গোপ্যম্'—এইভাবে গোপনীয়, রহস্যময় করে রাখবার দরকার নেই। যা সত্য তা দিনের আলোক সহ্য করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, তত্ত্ব চারিদিকে প্রসারিত হোক যাতে অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়।

যম-নচিকেতা-প্রসঙ্গে গল্পের ছলে বলা। ঘটনাটি বাস্তবিক কিনা তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি যম এবং নচিকেতা বলে কেউ ছিলেন কি না এ প্রশ্নও বড় নয়। বড় হচ্ছে, আত্মবস্তুকে জেনে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি। দুঃখের নিবৃত্তি বা সুখের প্রাপ্তিও আসল কথা নয়, আসল হলো সেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং গৌণ দৃষ্টিতে তার ফল—সমস্ত শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'[৩]—জ্ঞানের এইরকম নানা প্রশংসা শুনি। প্রশংসাগুলি গৌণ, মুখ্য হলো নিজেকে না জানায় আমরা সব রকমের দুঃখকে ডেকে আনি। তাই শাস্ত্র বলছেন, নিজের স্বরূপকে জান। 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ'[৪]—এক আত্মস্বরূপকে জান, অন্য কথা ছেড়ে দাও। অন্য কথা বা চিন্তা, অর্থ একই। আত্মাকে ভুলে মানুষ অশেষ

---

১. গীতা—১৮/৬৭
২. মহানারায়ণোপনিষদ্—৩৮/২
৩. ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭/১/৩
৪. মুণ্ডকোপনিষদ্—২/২/৫

দুঃখের দ্বারা পীড়িত। তাই তার প্রথম প্রয়োজন আত্মাকে জানা। আর আত্মাকে জানলেই সর্ব প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয়, মানুষ পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ভিতরে কোন অপূর্ণতা, অপবিত্রতা, কোন সীমা, সঙ্কীর্ণতা থাকে না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই।

কঠোপনিষদের কাহিনীভাগ সংক্ষেপে হলো—নচিকেতা পিতার সত্যরক্ষার জন্য যমের বাড়ি গেলেন। নচিকেতা ছোট ছেলে, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত। যমের সঙ্গে তাঁর অনেক প্রশ্ন-উত্তর হলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ছলে শ্রুতি আমাদের শেখাচ্ছেন—প্রধানত নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে। আগেই বলা হয়েছে শ্রদ্ধাবান হলে অধিকারী হওয়া যায়। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'[১] —শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল এই একটি কারণে নচিকেতার কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। তিনি চান আমাদের সন্তানেরা নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাসম্পন্ন হোক। তত্ত্বকে জানবার জন্য যমের বাড়ি যেতেও তারা যেন পশ্চাৎপদ না হয়। অল্পবয়সেই নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করেছিল।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বলা হলো। হয়তো গ্রন্থে সব কথা নেই। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এসব কথার অবতারণা করেছেন। ভাষ্যকার যা এক জায়গায় বলেননি তা অন্যত্র বলেছেন। পরবর্তীরা সেকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনায় মূল বা ভাষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বেদান্তের তত্ত্ব যতটা সম্ভব সুবোধ্য করার প্রয়াস করা হবে।

---

১. গীতা—৪/৩৯

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়— [ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু ও শিষ্য] উভয়কে) সহ (সমভাবে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (আমাদের উভয়কে) সহ (অন্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান) সহ (সমান ভাবে) [আমরা উভয়ে যেন] বীর্যম্ ([ব্রহ্মবিদ্যালাভের] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করতে পারি)। নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (অধীত বিদ্যা) তেজস্বি (তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হোক), [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (সকল বিঘ্নের বিনাশ হোক)।

'সহ নৌ অবতু'—পরমেশ্বর আমার এবং আমার আচার্যের অর্থাৎ শিষ্য ও গুরু উভয়ের চিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা উভয়কে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। 'সহ নৌ ভুনক্তু'—ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে পরমানন্দ সেই আনন্দ-অমৃতে আমাদের পরিতৃপ্ত করুন। 'সহ বীর্যং করবাবহৈ'—আমরা দুজনেই যেন আত্মজ্ঞানরূপ শক্তির দ্বারা শক্তিমান হই। 'তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু'—আমাদের অধীত বিদ্যা যেন নিষ্প্রভ না হয়। 'মা বিদ্বিষাবহৈ'—আমরা যেন পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন না হই। পরস্পরের ভ্রান্তিজনিত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা তার জন্য যেন পরস্পরকে দ্বেষ না করি। অর্থাৎ গুরু যেন শিষ্যের অনবধানতার জন্য বিরক্ত না হন এবং শিষ্যও যেন গুরুর ত্রুটির জন্য শ্রদ্ধাহীন না হয়।

'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'—আত্মজ্ঞান লাভের যাবতীয় প্রতিবন্ধক উপশান্ত হোক। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই তিনপ্রকারের দোষ দূরীকরণের জন্য তিনবার শান্তি বলা হলো। আধ্যাত্মিক দুঃখ হলো দেহসম্বন্ধী অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক রোগসকল, আধিভৌতিক দুঃখ ভূত-সম্বন্ধী অর্থাৎ হিংস্র বা সর্বপ্রকার প্রাণীদের দ্বারা যে বিঘ্ন ঘটে, আর আধিদৈবিক বলতে দৈব বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বোঝায়। এই তিনপ্রকার বিঘ্নেরই যাতে সমূহ বিনাশ ঘটে, তারা যাতে জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক না হয় সেইজন্য তিনবার শান্তি উচ্চারিত হলো।

কঠোপনিষদ্

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥১॥

অন্বয় ঃ—বাজশ্রবসঃ (বাজশ্রবার পুত্র, উদ্দালক) উশন্ (যজ্ঞফল কামনা করে) হ বৈ [অতীত বিষয়ের স্মারক শব্দদ্বয়] সর্ববেদসম্ (সর্বস্ব) দদৌ (দান করেছিলেন)। তস্য (তাঁর, বাজশ্রবসের) হ [এইরকম শোনা যায়] নচিকেতাঃ (নচিকেতা) নাম (নামক) পুত্র (পুন্নামক নরক থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ, পুত্র) আস (ছিলেন)।

বাজ মানে অন্ন, অন্নদান করার জন্য যাঁর 'শ্রবঃ' বা যশ হয়েছিল তাঁর নাম বাজশ্রবা। তাঁর পুত্র হলেন বাজশ্রবসঃ নামক ঋষি, তিনি 'সর্ববেদসং দদৌ' —সমস্ত ধন দান করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করেছিলেন, যে যজ্ঞে—যা কিছু সম্পত্তি আছে—সব দান করতে হয়। যজ্ঞটি করবার উদ্দেশ্য যজ্ঞের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই যজ্ঞের দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, জগতের সব ঐশ্বর্য লাভ করা যায়। সুতরাং এই যজ্ঞ করার মূলে আছে কামনা। যজ্ঞ করা হয় কামনাপ্রেরিত হয়ে—তা সে কামনা স্বর্গ, ইহজগতের ঐশ্বর্য বা পুত্র যা-ই হোক না কেন। মানুষের কামনা অনন্ত। শাস্ত্র জানিয়ে দিচ্ছেন, এক একটি কামনা পূরণের জন্যে এক একটি বিশিষ্ট অলৌকিক উপায় আছে। লৌকিক উপায়ে যা পূরণ হয় না তার জন্য শাস্ত্রীয় অলৌকিক উপায়ের বিধান। যেমন—'সুবর্গকামো যজেত'[১]—স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞ করবে। এই ধরনের সকাম ক্রিয়াকর্ম এখনো করা হয়, তখনো করা হতো। মানুষের মনে যতদিন কামনা থাকবে ততদিন এইসব যাগযজ্ঞাদি বা সকাম উপাসনা স্বাভাবিক।

বাজশ্রবসও কামনাপরবশ হয়ে বিশ্বজিৎ যাগ করেছিলেন। তাঁর নচিকেতা নামে পুত্র ছিল। 'তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস'—এই 'হ' শব্দটি থাকায় বোঝাচ্ছে যে, এইরকম শোনা যায়। হ, কিল—সংস্কৃতে এইরকম শব্দের ব্যবহার হয় অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। এগুলি অর্থবাদ, ইতিহাস নয়। এটা যেন আমরা যেমন বলি—এক যে ছিল রাজা, তার যে ছিল মন্ত্রী—এখানে

---

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫

এইভাবে আখ্যায়িকার দ্বারা উপনিষদের আরম্ভ করা হয়েছে, তাৎপর্য হলো বিষয়বস্তুটিকে মনোজ্ঞ করা। কতকগুলি abstract, নির্বস্তু কথা না বলে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলাতে বিষয়টি স্পষ্ট, সুবোধ্য হয়। সেই নচিকেতা সম্বন্ধে বলছেন—

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥২॥

অন্বয় ঃ—[যখন] দক্ষিণাসু (পুরোহিতদের দক্ষিণা দেবার জন্য) নীয়মানাসু ([গবাদিপশু] নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল) [তখন] কুমারম্ সন্তম্ (অল্পবয়স্ক বালক) তম্ হ (সেই নচিকেতার হৃদয়ে) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) আবিবেশ (উৎপন্ন হলো), সঃ (তিনি) অমন্যত (বিচার করতে লাগলেন)।

সেই কুমার বালক নচিকেতার যখন প্রথম বয়স—'কুমারং সন্তং', তখন সেই অল্প বয়সেই পিতার অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য তার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হলো। কখন হলো? যখন সে দেখল যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেবার জন্য কতকগুলি গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেমন শ্রদ্ধার উদয় হলো? না, যজ্ঞ যদি করতে হয় তাহলে যেমন যেমন বিধান আছে তদনুসারে করা উচিত। সামর্থ্য নেই বা ইচ্ছা নেই, সুতরাং কোন একটি অঙ্গহানি করে, যথাযথ প্রয়াস না করে একটা অনুকল্প দেওয়া সঙ্গত নয়। যেমন একটা গরুর বদলে এক টাকা মূল্য ধরে দেওয়া হলো যা গরুর অনুকল্প, যদিও এক টাকায় গরু পাওয়া যায় না। যজ্ঞে গোদানের বিধান আছে। নচিকেতার পিতা বুদ্ধিমান—তা না হলে অবশ্য কেউ সংসারে বড় হতে পারে না ; তিনি বেছে বেছে এমন কতকগুলি গরু নিয়েছেন যেগুলি কিনতে তাঁর বিশেষ অর্থব্যয় হয়নি। অথবা যেগুলি তাঁর বাড়িতেই ছিল আর কোন কাজে লাগত না। এরকম গরুই ব্রাহ্মণদের দক্ষিণার জন্য দিচ্ছেন। কথায় বলে 'মরা গরু ব্রাহ্মণকে দান'—এখানে মরা না হলেও মৃতপ্রায় বটে। এই সময় নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হওয়াতে তিনি ভাবলেন—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

অন্বয় ঃ—পীত-উদকাঃ (যারা শেষ জল পান করেছে এখন আর করবে না) জগ্ধতৃণাঃ (তৃণভক্ষণ শেষ করেছে, আর খাবে না) দুগ্ধদোহাঃ (যাদের শেষবারের মতো দুধ দেওয়া হয়েছে আর দেবে না) নিরিন্দ্রিয়াঃ (সন্তান-ধারণে অসমর্থ) তাঃ (উক্তরূপা গাভীগুলি) দদৎ (দানকারী যজমান) সঃ (তিনি) অনন্দাঃ (অসুখকর) নাম (নামক) তে লোকাঃ (সেই যে প্রসিদ্ধ লোকসমূহ) তান্ (সেইসব লোকে) গচ্ছতি (গমন করেন)।

এইরকম গরু যদি কেউ দান করে—'পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহাঃ'—যেগুলি জল যা পান করবার করেছে আর পান করবে না, ঘাস যা খাবার খেয়েছে আর খাবে না, দুধ যা দেবার তা দিয়ে শেষ করেছে, যারা—'নিরিন্দ্রিয়াঃ'—সন্তান প্রসবে অক্ষম। 'তা দদৎ'—এইরকম গরু দান করে কী ফল লাভ হবে? না, 'অনন্দা নাম তে লোকাঃ'—অনন্দলোক, যে লোকে আনন্দ নেই, অসুখকর—'তান্ স গচ্ছতি'—সেই লোকে গমন করে অর্থাৎ নিরানন্দে কাল যাপন করে। কোথায় যজ্ঞকারী স্বর্গে যাবে, না তার বদলে দুঃখময় স্থানে যায়। কেন? না, দেবতাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে। ফাঁকি আমরা যতটা সম্ভব সব কাজেই দেবার চেষ্টা করি। ধরা পড়লে বলি এ তো সবাই করে, আমি একা করি না। আমরা আমাদের কর্তব্য এড়িয়ে যাই, ফাঁকি দিই আর নিজেকে বোঝাই—যেভাবে হোক করলেই হলো। যজ্ঞ করেছি এই যথেষ্ট, গরু দিতে হবে ঠিকই কিন্তু কেমন গরু দিতে হবে তা কি বলা আছে? কাজেই গরু যেমনই হোক তাতেই গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'দেবতা কি আমাদের চেয়েও আহাম্মক!' তাঁর 'ভাববার কথা' গ্রন্থে আছে যে, একজন কর্মবাড়ির কড়া-মাজার মতো সুরে ভজন গান করছেন। চোবেজী জিজ্ঞাসা করলেন—কী করছ? সে বলল, আমি ভগবানের মন ভেজাচ্ছি। চোবেজী বললেন—ভগবান কি আমার চেয়েও আহাম্মক যে আমারই যাতে মন ভিজছে না তাতে তাঁর মন ভিজবে![১] ঠিক সেইরকম মানুষ মনে করে, গরু দেবার কথা, যেমন গরুই দেওয়া হোক ব্রাহ্মণরা তাতেই তুষ্ট হয়ে যাবেন। ব্রাহ্মণরা এমন গরু পেয়ে খুশি হবেন না জানা কথা। তবে তাঁদের তুষ্ট হওয়া না হওয়াটা বড় নয়, আসল হচ্ছে যজ্ঞটি পূর্ণ করা, তারপরে ব্রাহ্মণরা যা ভাবেন ভাবুন। আমার ফললাভ তো হবে।

এ হলো শ্রদ্ধাহীন লোকের কথা। যিনি শ্রদ্ধাবান তিনি কোনকিছুই এভাবে করতে পারেন না, তাঁকে সবই সুষ্ঠুভাবে করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, ভগবান মন দেখেন, কী দিচ্ছ না দিচ্ছ তা কি আর দেখেন? তিনি দেখেন না, কিন্তু যে দিচ্ছে সে তো দেখে। সে যখন ভগবানকে শ্রদ্ধাভক্তি করে কিছু নিবেদন করে তখন যতদূর সম্ভব বেছে ভাল জিনিস দেবে। তা না করে নৈবেদ্য দিতে হবে বলে যেমন-তেমন কলা আর সন্দেশ কিনে এনে নৈবেদ্য সাজালাম, এটা শ্রদ্ধার অভাবের পরিচয়। শ্রদ্ধার অভাবে লোকে এইরকম কার্পণ্য করে। যখন মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব পাঠায় তখন ওরকম করে পাঠায় না। বন্ধুর বাড়িতে বিশেষ উপলক্ষে যখন উপহার দেয় তখন বেছে বেছে ভাল জিনিস দেয়। ভগবানের ক্ষেত্রেই অন্যরকম করে। শ্রদ্ধা থাকলে এমন করত না।

---

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪২

ঐরকম জলপানে অসমর্থ, তৃণভক্ষণে অপারগ, দুগ্ধ ও বৎসপ্রদানে সামর্থ্যহীন গাভীগুলি দক্ষিণা দিতে দেখে নচিকেতার হৃদয়ে আঘাত লাগল। কারণ তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। তিনি ভাবলেন, পিতা এ কী করছেন! এরকম জরাজীর্ণ গাভী দান করলে যজ্ঞের সুফল লাভ তো হবেই না বরং বিপরীত ফল হবে। আমি তাঁর সন্তান। তাই আমার কর্তব্য তাঁর কাজ যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে তা দেখা। প্রাণ দিয়েও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন করে পিতার অনিষ্ট নিবারণ করা পুত্রের কর্তব্য। এক্ষেত্রে নচিকেতার যা করণীয় তা বিচার করে তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন—

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

অন্বয় ঃ—স হ (সেই নচিকেতা) পিতরম্ (পিতাকে) উবাচ (বললেন), তত (তাত, হে পিতা) মাম্ (আমাকে) কস্মৈ (কাকে ; কোন্ ঋত্বিক্‌কে) দাস্যসি ইতি ([দক্ষিণাস্বরূপ] দেবেন) দ্বিতীয়ম্ তৃতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার) [পিতাকে এই প্রশ্ন করলেন]। [অনন্তর ক্রুদ্ধ পিতা উদ্দালক] তম্ হ (সেই পুত্রকে) উবাচ (বললেন) ত্বা (তোমায়) মৃত্যবে (যমকে) দদামি (দান করছি) ইতি।

'সঃ হ পিতরম্ উবাচ তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি'—হে তাত, আপনি আমাকে কোন্ ঋষির নিকট অর্পণ করবেন? একথার তাৎপর্য হলো এই যজ্ঞে সর্বস্ব দিতে হয়। সর্বস্ব মানে যা কিছু সম্পদ নিজের আছে। সন্তানও সর্বস্বের মধ্যে পড়ে। সর্বস্ব যখন দান করতে হবে আমিও তার অন্তর্ভুক্ত, অতএব আপনি আমাকে যে ঋষির নিকট দান করছেন আমি তাঁর কাছে যাই। এ তো নতুন কথা! ছেলেকে কেউ আবার এমন করে দিয়ে দেয় নাকি? পিতাকে তিনি এরকম বললেও, কী একটা বাচালতা করছে বলে পিতা নচিকেতার বাক্য উপেক্ষা করলেন। তবু ছেলে ছাড়বার পাত্র নয়। 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ'—দুবার, তিনবার প্রশ্ন করলেন। তখন পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'মৃত্যবে ত্বা দদামীতি'—তোমায় যমকে অর্পণ করলাম। রেগে গেলে বাবার চেয়ে মায়েরাই বেশি অনেক সময়ে এরকম করে বলেন—যা, যমকে দিলাম। অবশ্যই তা বিরক্তিসূচক মুখের কথামাত্র, বাস্তবিক তো আর ছেলেকে যমকে দেন না। এখানেও নচিকেতার পিতা সেইরকম বললেন। পুত্র বুঝল কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু ক্রোধবশেই পিতা ঐরকম কথা বলেছেন। তবু পিতার এ কথা যেন মিথ্যা না হয়, তাই পিতৃবাক্য শ্রবণ করে নচিকেতা নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন—আমাকে যমের বাড়ি পাঠাবার ইচ্ছা তো পিতার হবার কথা নয়, আমি কিছু মন্দ কাজ করিনি।

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি ॥৫॥

অন্বয় ঃ—[পিতার ক্রুদ্ধ উত্তর শুনে নচিকেতা ভাবলেন] বহূনাম্ (অনেক সন্তানের মধ্যে) প্রথমঃ ([কোন কোন ক্ষেত্রে আমি] শ্রেষ্ঠ) বহূনাম্ (অনেকের মধ্যে) মধ্যমঃ (মধ্যস্থানীয়) এমি (হতে পারি) [কিন্তু কখনোও অধম নই] ; যমস্য (যমরাজার) কিম্ স্বিৎ (কিই বা) কর্তব্যম্ (এমন প্রয়োজন) যৎ (যা) [পিতা] অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) করিষ্যতি (সম্পন্ন করবেন)?

'বহূনামেমি প্রথমঃ'—অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, 'বহূনামেমি মধ্যমঃ'—অনেকের মধ্যে মধ্যম, একেবারে অধম তো নই। তথাপি পিতা এরকম কথা বললেন কেন? 'কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যম্'—যমের এমন কী কাজ আছে 'যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি'—যা পিতা আমাকে দিয়ে করাতে চান? এখানে আর বিস্তার করে কিছু বলা নেই। পুত্র যখন যমের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত, পিতা বিস্মিত হলেন, সত্যই কি পুত্রকে কেউ যমের বাড়ি পাঠায়? মুখের কথা বলেছি বলে তাকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়? তখন নচিকেতা পিতাকে বুঝিয়ে বলছেন—

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতা পিতাকে বললেন] পূর্বে (আপনার পূর্বপুরুষরা) যথা (যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন) অনুপশ্য ([সেই কথা] আনুপূর্বিক চিন্তা করুন) তথা (সেইরকম) অপরে (বর্তমান সজ্জনগণও সত্যনিষ্ঠ) প্রতিপশ্য (এইকথা বিচার করুন)। মর্ত্যঃ (মানুষ) সস্যম্ ইব (ক্ষেত্রজাত শস্যের মতো) পচ্যতে (জীর্ণ হয়ে বিনষ্ট হয়) পুনঃ (আবার) সস্যম্ ইব (শস্যের মতো) অজায়তে (উৎপন্ন হয়)। [সুতরাং সর্ববস্তুর নশ্বরতা স্মরণ করে সত্যরক্ষা করে আমাকে যমের কাছে প্রেরণ করুন।]

পিতা, আপনি যখন বলে ফেলেছেন তখন সে কথার অন্যথা করে আমাকে যেতে বাধা দেবেন না। সত্যরক্ষার জন্য আমার যমের বাড়ি যাওয়া অনুমোদন করুন। 'অনুপশ্য যথা পূর্বে'—চিন্তা করে দেখুন আপনার পিতৃপিতামহগণ যে প্রকার আচরণ করেছেন, যে আচরণ সকলের সমর্থনযোগ্য, 'প্রতিপশ্য তথাঽপরে'—এবং বর্তমান সাধুগণ যেরকম সত্যপরায়ণ তা পর্যালোচনা করে আপনিও সত্যনিষ্ঠ হোন। আমাকে যমের কাছে প্রেরণ করে আপনার কথার সত্যতা রক্ষা করুন। যদি বলেন যে তাহলে আমাকে আর ফেরত পাবেন না তার উত্তর হচ্ছে—'সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ'—মানুষ কেন, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। যা কিছু উৎপন্ন হয় তা-ই নশ্বর, জন্ম হলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শস্যের মতো মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত, বিনষ্ট হয়, শস্যের মতোই পুনরায় জন্মায়। গীতায় যেমন বলেছেন—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।'[১]

—যে জন্মগ্রহণ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত, আবার যার মৃত্যু হয় তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়মকে পরিহার করা যায় না। তাই এ নিয়ে শোক করা উচিত নয়। বলা বাহুল্য কঠোপনিষদের শ্লোকই গীতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নচিকেতা সাধারণ ছেলে নয়। পিতাকে বোঝাচ্ছেন, আপনি আপনার কথা রাখুন, আমার জন্য ভাববেন না। তিনি বুঝলেন কি না সেকথা আর নেই।

সে যাই হোক, তাঁকে বুঝিয়ে নচিকেতা সশরীরে যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন যমরাজ অন্যত্র ছিলেন, অতএব তাঁর পরিজনেরা তাঁকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে অতিথি-সৎকারের জন্য খেতে দিলেন। নচিকেতা খেলেন না। ভাবলেন, পিতা যখন আমাকে যমকে প্রদান করেছেন তখন যম যা বলবেন তাই করব, তার আগে আমি খাব না। যমের আগমন প্রতীক্ষায় তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসে যাপন করলেন। তারপর যম প্রবাস থেকে ফিরলে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে বললেন—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

অন্বয় ঃ—[যমের অনুপস্থিতির কালে নচিকেতা তাঁর আলয়ে পৌঁছান। তিনদিন পর যমরাজ প্রত্যাগত হলে যমের আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে বললেন] ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবিৎ অথবা ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী) অতিথিঃ (স্বয়ং স্বেচ্ছায় উপস্থিত ব্যক্তি) বৈশ্বানরঃ (সকল কলুষহারী অগ্নিসদৃশ [হয়ে]) গৃহান্ প্রবিশতি (গৃহে প্রবেশ করেন)। [গৃহস্থ] তস্য (সেই অতিথির) এতাম্ (পাদ্যার্ঘ্য দান [দ্বারা]) শান্তিম্ কুর্বন্তি ([শ্রম দূর করে] তৃপ্তি বিধান করেন)। বৈবস্বত (হে সূর্যপুত্র) উদকম্ (জল) হর (নিয়ে এস)।

'বৈশ্বানরঃ প্রবিশতি অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহান্'—ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে আসেন ; আগুন যেমন সব জ্বালিয়ে দেয় তেমনি অতিথিকে যদি সন্তুষ্ট না করা হয় তাহলে ঘরবাড়ি সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অতিথির সমুচিত সমাদর না হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। 'তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্'—হে সূর্যপুত্র যমরাজ, তুমি তাড়াতাড়ি পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর। অতিথি-সৎকারের সূচনা কিভাবে করতে হবে এখানে তা বলে দিলেন। সেই কালে অতিথি-সৎকার গৃহস্থের একটি বিশেষ কর্তব্য বলে গণ্য

---

১. গীতা—২/২৭

হতো, এটা নরঋণ বলে ধরা হতো। দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম নৃযজ্ঞ বা অতিথি-সৎকার। অতিথি-সৎকার করলে নরঋণ বা নৃঋণ থেকে মানুষ মুক্ত হয়। মুণ্ডক-উপনিষদে আছে—

'যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।।'[১]

—চাতুর্মাস্য বলে একটি যাগ আছে, তার অঙ্গ হিসাবে যদি অতিথিসেবা না করা হয় তাহলে সেই যাগের ফল তো হয়ই না উপরন্তু বিপরীত ফল হয়। এখানে অর্থাৎ যমের বাড়িতে আবার বিশেষ করে অতিথি ব্রাহ্মণ, সে উপবাসী রয়েছে, তাকে তৃপ্ত করতে না পারলে সর্বনাশ হবে। সুতরাং জলের দ্বারা যেমন অগ্নির প্রশমন করা হয় তেমনি নচিকেতার জন্য জল আহরণ করুন। অর্থাৎ অগ্নি যেন তার কোন অনিষ্ট না করে। না করলে কী হবে?

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

অন্বয় ঃ—যস্য গৃহে (যার বাড়িতে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অনশ্নন্ (অনাহারী হয়ে) বসতি (বাস করেন) [সেই] অল্পমেধসঃ (হীনবুদ্ধি) পুরুষস্য (ব্যক্তির) আশাপ্রতীক্ষে (বস্তুবিশেষ প্রাপ্তির অভিলাষ এবং অভীষ্ট বস্তু পাবার প্রতীক্ষা) সঙ্গতম্ (সজ্জনসঙ্গ) সূনৃতাম্ (শোভন বাক্য) ইষ্টাপূর্তে (যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া) চ (এবং) পুত্রপশূন্ (পুত্র পশু দ্বারা উপলক্ষিত জনবল ও ধনবল) সর্বান্ (সমস্ত কিছুকেই) এতৎ (ব্রাহ্মণের এই অনাহার) বৃঙ্‌ক্তে (বিনাশ করে)।

যার বাড়িতে ব্রাহ্মণ-অতিথি অভুক্ত থাকেন সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির—'আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাম্'—আশা, প্রতীক্ষা, সঙ্গত, সূনৃতা ইত্যাদি লাভ হয় না। অপ্রাপ্ত বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষার নাম আশা। প্রতীক্ষা হলো প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। সঙ্গত, সাধুসঙ্গের এবং সূনৃতা, প্রিয়বাক্যের দ্বারা লোককে সন্তুষ্ট করার ফল। 'ইষ্টাপূর্ত' বলতে বোঝায়—ইষ্ট অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের, এবং পূর্ত অর্থাৎ সাধারণের জন্য কূপ-খননাদি জনকল্যাণমূলক কর্মের ফল। এগুলি শুভ কর্ম—যা থেকে লোকে শুভ ফল আশা করে। ব্রাহ্মণ-অতিথি গৃহে অনাহারে থাকলে এই ইষ্টাপূর্তাদির ফল নষ্ট হয়। আরো কী নষ্ট হয়? 'পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্'—সকল পুত্র ও পশু, অর্থাৎ সন্ততি ও সম্পত্তি। তৎকালে গবাদি পশু বড় সম্পদ বলে পরিগণিত হতো অর্থাৎ যার যত গোধন, সমাজে সে তত সম্পদশালী বলে গণ্য হতো। যে দুর্বুদ্ধি লোকের বাড়িতে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় থাকে তার এসব নষ্ট হয়ে যায়।

---

১. মুণ্ডক—১/২/৩

এখানে অতিথিসেবার ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে সকলেই অতিথিকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করত। এখন বোধহয় আর সে দিন নেই। এখন অতিথিকে কেউ গ্রহণও করে না আর অতিথি হয়ে সাধারণতঃ কেউ যায়ও না। একজন অপরিচিত লোককে সমাদর করা দূরে থাক, একমুঠো খাবার কিংবা একটুখানি থাকবার জায়গাও কেউ দেয় না। আমরা অনেক সময় শুনতাম, মানুষটি দেব-দ্বিজ-অতিথি-পরায়ণ। এখন মনে কামনা-বাসনা থাকলে একটু পূজা-অর্চনা করে। দ্বিজসেবা যদি করে তো ঐ কানা গরু দিয়ে করে আর অতিথিসেবাকে সমাজে একেবারে বর্জন করা হয়েছে, ও আর এখন চলে না। সে যাই হোক, তখনকার দিনে এইরকম অতিথিসেবা করা হতো। না করলে অমঙ্গল হবে এমন একটি ধারণা ছিল। তাই যমের আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁকে এই কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে যম ছুটলেন কী করে অতিথিকে শান্ত করা যায়। গিয়ে দেখলেন একটি ছোট ছেলে। হয়তো ভরসা হলো একে সহজেই শান্ত করা যাবে—এখনো এর মন সরল আছে, সহজেই বুঝবে। তিনি বলছেন—

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽ-
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯॥

অন্বয় ঃ—[তখন যম নচিকেতাকে বললেন] ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ) নমস্যঃ (পুজনীয়) অতিথিঃ ([তুমি] অতিথি) অনশ্নন্ (উপবাস করে) যৎ (যেহেতু) মে গৃহে (আমার বাড়িতে) তিস্রঃ রাত্রীঃ (তিন রাত্রি) অবাৎসীঃ (বাস করেছ) তস্মাৎ (সেজন্য) [প্রতি রাত্রির জন্য একটি করে] ত্রীন্ (তিনটি) বরান্ (অভিলষিত বস্তু) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি), মে (আমার) স্বস্তিঃ (মঙ্গল) অস্তু (হোক)।

হে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-সন্তান সুতরাং ব্রাহ্মণ—তুমি অতিথি এবং আমার নমস্য। যমরাজ দেবতা তবু তাঁর কাছেও ব্রাহ্মণ-অতিথি নমস্য। তোমাকে প্রণাম করি—'নমস্তে'। 'স্বস্তি মে অস্তু'—তোমার আশীর্বাদে আমার কল্যাণ হোক; কোন অকল্যাণ যেন না হয়। তুমি তিনরাত্রি আমার গৃহে অভুক্ত অবস্থায় আছ—'তিস্রো রাত্রীঃ যদবাৎসীঃ গৃহে মে অনশ্নন্'। 'তস্মাৎ'—সুতরাং—'প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব'—প্রতি রাত্রির জন্য একটি করে মোট তিনটি বর প্রার্থনা কর। যা চাইবে তা-ই পাবে। খুব ভাল প্রস্তাব, খুব ভাল offer ! এখানে কোন জটিল দার্শনিক ব্যাপার নেই। সরলভাবে গল্পটি আরম্ভ করা হয়েছে। এরপর নচিকেতা প্রত্যুত্তর কি দিলেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া, reaction কী হলো—সে বিষয়গুলি ভাববার।

নচিকেতা বুঝেছেন পিতা রোষবশে তাঁকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছেন, তাছাড়া সন্তানকে হারিয়ে তিনি বেদনা বোধ করছেন, দুশ্চিন্তা করছেন। সুতরাং নচিকেতা বলছেন—

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥১০॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতা উত্তর দিলেন] মৃত্যো (হে মৃত্যুদেবতা) গৌতম (আমার পিতা গৌতম) যথা (যেন) শান্তসঙ্কল্পঃ (উৎকণ্ঠারহিত) সুমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত) মা অভি (আমার প্রতি) বীতমন্যুঃ (ক্রোধশূন্য) স্যাৎ (হন)। ত্বৎ (আপনার কাছ থেকে) প্রসৃষ্টম্ (প্রত্যাবৃত্ত) মা (আমার সঙ্গে) অভিবদেৎ (অভিবাদন করেন, অর্থাৎ ভালভাবে কথা বলেন) প্রতীতঃ (চিনতে পারেন)। ত্রয়াণাম্ (তিনটির মধ্যে) এতৎ (এই) প্রথমম্ (প্রথম) বরম্ (বর) বৃণে (প্রার্থনা করি)।

'শান্তসঙ্কল্পঃ'—আমার জন্য পিতা যে মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ভোগ করছেন তা বিদূরিত হোক। 'বীতমন্যুঃ'—তিনি ক্রোধমুক্ত হোন এবং 'সুমনাঃ'—আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, প্রথম বরে এই আমার প্রার্থনা। বালকের মতোই প্রার্থনা। আরো কথা হলো—'ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীতঃ'—যখন আপনি আমাকে ফেরত পাঠাবেন—নচিকেতা ধরে নিয়েছেন এত খাতির করে যখন বর দিতে চাইছেন তখন তাঁকে একেবারে শেষ করে ফেলবেন না সুতরাং ফেরত পাঠাবেন—তখন যেন পিতা আমাকে চিনতে পারেন, সাদরে গ্রহণ করেন। 'এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে'—তিনটির মধ্যে প্রথম বররূপে এইটিই চাই।

নচিকেতা বালক, এত অল্প সময়ের মধ্যেই কী করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—এটা আশ্চর্য। এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। তাঁর প্রার্থিত তিনটি বরের একটা ক্রম আছে। প্রথম কী বর চাইলেন? বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, মানুষের প্রথম কামনা ইহলোকের সুখ। এখানে নচিকেতার কামনা হলো, তাঁর পিতা তাঁকে আদর করে ফিরিয়ে নেবেন। যমের বাড়ি থেকে ফিরে যাবেন তিনি ধরেই নিয়েছেন। অথবা বলবার এমন ভঙ্গি—যাতে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি ফিরে যাবেন—যম এরকম ব্যবস্থাই করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, একজন বর চাইলে—নাতির সঙ্গে সোনার থালাতে ভাত খাবে ; একসঙ্গে ঐশ্বর্য হলো, পুত্র-পৌত্র হলো ; এক বরেই তিনটি কামনা পূর্ণ হবে। যাই হোক, নচিকেতার তিনটি বরের প্রথমটি হলো ইহলোকের সুখ। যম দেখলেন এ বর দেওয়া কিছু কঠিন নয়। খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১॥

অন্বয় ঃ—[এই প্রার্থনার উত্তরে যম বললেন] আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালক, তোমার পিতা) মৎপ্রসৃষ্টঃ (আমার দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে) পুরস্তাৎ (পূর্বে) যথা [আসীৎ] (যেমন) [স্নেহশীল ছিলেন] [তথা] প্রতীতঃ (তোমাকে চিনতে পেরে তোমার প্রতি) [সেইরূপ] ভবিতা (থাকবেন) মৃত্যুমুখাৎ (যমদ্বার থেকে) প্রমুক্তম্ (প্রত্যাগত) ত্বাম্ (তোমাকে) দদৃশিবান্ (দেখে) বীতমন্যুঃ (বিগতক্রোধ হয়ে) রাত্রীঃ (রাত্রিগুলিতে) সুখম্ (সুখে) শয়িতা (নিদ্রা যাবেন)।

তথাস্তু—তা-ই হবে। 'ঔদ্দালকিঃ আরুণিঃ'—এখানে ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন—হয়তো তার নাম আরুণি, উদ্দালকের পুত্র অথবা উদ্দালক তার নাম, আরুণির পুত্র; কিংবা উদ্দালক ও আরুণি দুজনেরই পুত্র। দুজনের পুত্র কেমন করে হয়? দত্তকপুত্র হলে হয়। দত্তকপুত্রের জন্মদাতা পিতা এবং দত্তকরূপে গ্রহীতা যে পিতা—উভয়েই পিতৃতুল্য। সে উভয়েরই পুত্ররূপে পিতৃকার্য করতে পারে—এইজন্য তাকে উভয় পিতার সন্তান বলে। যম বললেন—'যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীতঃ'—তোমার পিতা পূর্বে যেমন তোমার প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তুমি ফিরে গেলে তোমাকে চিনতে পেরে তেমনই থাকবেন। তিনি—'সুখং রাত্রীঃ শয়িতা'—রাত্রে সুখে নিদ্রা যাবেন। নচিকেতা চেয়েছিলেন পিতা যেন 'শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাঃ' হন ; তিনি তাও হবেন। উৎকণ্ঠাশূন্য হবেন। 'বীতমন্যুঃ'—তোমার প্রতি তাঁর ক্রোধ চলে যাবে এবং 'ত্বাং দদৃশিবান্'—তোমাকে তিনি দেখবেন—'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্'—মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছ। নচিকেতা প্রথম বরে এইটি লাভ করলেন। সব বিস্তার করে বলা নেই। তাৎপর্য হলো—তুমি ইহকালের আত্মীয়-পরিজনের সুখ চাইছ তা পাবে। গৃহে শান্তি হবে, তোমার পিতা তোমাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হবেন, তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় বরে তিনি চাইছেন স্বর্গলোক অর্থাৎ পারলৌকিক সুখ।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বলছেন] স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে) কিঞ্চন (কোনও) ভয়ম্ ন অস্তি (ভয় নেই)। তত্র (সেখানে) ত্বম্ ন (আপনি নেই, মৃত্যুর

অধিকার নেই) জরয়া (জরার জন্য) ন বিভেতি (কেহই ভীত নন)। অশনায়াপিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) উভে (উভয়কেই) তীর্ত্বা (অতিক্রম করে) শোকাতিগঃ (বিগতশোক হয়ে) স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গলোকে আনন্দে থাকে)।

নচিকেতা যমকে বললেন, শুনেছি স্বর্গে মানুষ খুব আনন্দে থাকে। 'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি'—স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই। 'ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি'—মৃত্যু সেখানে নেই, সেখানে কেউ জরার ভয়ে ভীত হন না। 'উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে'—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয় থেকে মুক্ত হয়ে, 'শোকাতিগঃ'—শোকদুঃখের অতীত হয়ে, 'মোদতে স্বর্গলোকে'—যজ্ঞানুষ্ঠানকারী স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন। স্বর্গের বর্ণনায় পুরাণাদি মুখর। সেখানে রোগ-শোক নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। এটা ভাল কি মন্দ তা বোঝা মুশকিল। ক্ষুধা যদি না থাকে খাদ্যবস্তু ভোগ করা যাবে না। তৃষ্ণা না থাকলে পানীয় ভোগ করা যাবে না। তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাদের যে যন্ত্রণা দেয় সেই যন্ত্রণা সেখানে নেই, জরা মৃত্যু নেই। ভরসার কথা বটে। বেদে আছে—'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম'[১]—যজ্ঞ করে, সোমরস পান করে আমরা অমর হয়ে গিয়েছি। স্বর্গলোকের বর্ণনা অতি লোভনীয়। স্বর্গলোককে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যা আমাদের কাছে মনোজ্ঞ হবে। সেখানে নন্দনকানন, পারিজাত ফুল আছে, কত আনন্দ, নৃত্যগীত চলছে। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে যে সুখ মানুষ কল্পনা করতে পারে—তার পরাকাষ্ঠা সেখানে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিভিন্ন দেশে স্বর্গের কল্পনা একটু ভিন্ন ভিন্ন হলেও তা অতীব সুখকর এবং মনোরম। আরব, ইহুদীদের দেশ মরুভূমি। সেখানে স্বর্গের কল্পনা হচ্ছে চারিদিকে জলের প্রবাহ। আরো বর্ণনা আছে, একটি বিশেষ জাতির কথা সেখানে বলা আছে। তাদের সমস্ত দিন কাটে একটি বরাহের পিছনে ছুটে ছুটে। দিনের শেষে সেই বরাহটিকে শিকার করে। এবং সবাই আনন্দ করে তার মাংস খায়। পরের দিন আবার সেই বরাহটি বেঁচে ওঠে। কারণ, মারতে মারতে সব বরাহ শেষ হয়ে গেলে কি হবে? কাজেই মৃত বরাহ রোজ সকালে বেঁচে ওঠে। আবার তাকে নিয়ে সেই ছুটোছুটি, আনন্দ করা এবং অবশেষে তাকে মেরে খাওয়া। স্বর্গলোকে দেবতারা খেটে খান না, তাঁদের কিছু করতে হয় না। যখন যা চাইবেন তাই পাবেন। আরো বর্ণনা আছে, দেবতারা সুরা পান করেন, তাই তাঁদের জন্য একেবারে সুরাপূর্ণ সরোবর। কত খাবে খাও।

এসব শুনে আমরা ভাবব এ তো ছেলেমানুষি। এটা আমাদের ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে আর—এই যে ধনদৌলতের পিছনে ছুটছি—এটা তো ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে না। এর মধ্যে কোন তৃপ্তিদায়ক সারবস্তু নেই—পেতে কষ্ট, রাখতে

---

১. ঋগ্বেদ সংহিতা—৮/৪৮/৩৯

কষ্ট—এসব জেনেও আলেয়ার পিছনে ছোটার মতো অর্থের পিছনে ছুটছি। কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করেও শান্তি হয় না। তবু তার পিছনে যে ছুটছি এটা কি বুদ্ধির পরিচয়? যে বুদ্ধি নিয়ে ইহজগতে ভোগের পিছনে ছুটছি সেই বুদ্ধি নিয়েই স্বর্গাদি কল্পনা করে তারও পিছনে ছুটছি। যে ভোগ এখানে চাইছি তা শত শত গুণে অতিরঞ্জিত করে স্বর্গে পাব কল্পনা করে নিয়ে তার আশায় বসে আছি।

ইহলোকের নিশ্চিন্ততা হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে তাই নচিকেতা এখন পরলোকের সুখ চাইছেন। যমকে বলছেন, শুনেছি স্বর্গলোক এইরকম এবং আরো শুনেছি তোমার কাছে সেই স্বর্গলোকের চাবিকাঠি আছে। স্বর্গলোকের নানাবিধ মহিমা যেমন আমরা শুনে থাকি নচিকেতাও তেমনই শুনেছেন। সবই শোনা কথা, কেউ দেখেনি। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা একে পরীক্ষাও করে নেওয়া যায় না। স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ও তার উপায় এবং স্বর্গবাস—এসব শাস্ত্র ছাড়া আর কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। শোনা যায় মৃত্যুর পরে জীবের কী অবস্থা হয় এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে, যাকে para-psychology বলা হয়। কিন্তু এই গবেষণা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, বৈজ্ঞানিকরা বিষয়টিকে বিজ্ঞানের বিচার্য বলে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানের অন্বেষণ বা গবেষণার একটা মর্যাদা নির্দেশ করা আছে। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে প্রত্যক্ষ জগৎ, বিজ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তারই অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে যে-তত্ত্বের পরীক্ষা হয় না সে-তত্ত্বকে বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের এটি স্বনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা, self-imposed limitation, বিজ্ঞান এর বাইরে যাবে না। মানুষের যদি যাবার ইচ্ছা হয় যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার বিচরণ ও অনুধাবন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে না, philosophy বা দর্শনের বিষয় হতে পারে।

দর্শন আর বিজ্ঞানের সীমারেখা কোথায় তা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আজকাল আমরা সব জিনিসেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি। এটা বিজ্ঞানের যুগ, তাই বিজ্ঞানের সীলমোহর না থাকলে কোন জিনিস বাজারে চলে না। কাজেই যেন-তেন-প্রকারে বিজ্ঞানের ছাপ, তার সমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞান বলে, এটি বিজ্ঞানের অপব্যবহার, আমরা যেখানে সীমা টেনেছি তার বেশি যাওয়া এবং বিজ্ঞানের নাম দিয়ে দর্শনকে প্রচার করা চলবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জেম্স্ জীনস, এডিংটন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব লিখে গিয়েছেন, কিন্তু অন্য বৈজ্ঞানিকরা তার বিরোধিতা করেছেন। এ সম্বন্ধে একটি বইতে জেম্স্ এবং এডিংটন্-কে কটাক্ষ করে আইনস্টাইন আর ম্যাক্স প্লাংক্-এর মন্তব্য আছে। ম্যাক্স প্লাংক্ বলছেন—এগুলিকে বিজ্ঞানের নামে চালানো

হচ্ছে, আর আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন—It is not only nonsense but objectionable nonsense—এটা শুধু অর্থহীন নয়, এরূপ অর্থহীন প্রচার আপত্তিজনক। অর্থাৎ বিজ্ঞান কোনক্রমেই তার সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে না। যদি কোনদিন দার্শনিক তত্ত্বকে বিজ্ঞানের এলাকার ভিতরে আনা যায় তখনই সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বলা যাবে, তার পূর্বে নয়। এই স্বর্গলোক এবং নচিকেতার প্রার্থিত তৃতীয় বর প্রসঙ্গে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে বক্তব্য আছে তাকে ঠিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বলা চলে না। প্রণালী বৈজ্ঞানিক হলেও সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক বলে গ্রাহ্য নয়। একথা আমরা পরে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

সুতরাং স্বর্গলোক সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্র। শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি কোন বিশেষ শুভ কর্ম আছে যা করলে লোকে স্বর্গলোকে যেতে পারে। স্বর্গলোকে গেলে কী পাবে? না, প্রচুর সুখ পাবে। মনে রাখতে হবে সেই সুখগুলি সবই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই জগতেই আমরা একটু বেশি অর্থ উপার্জন করে ভোগের সামগ্রী যাতে বেশি পাওয়া যায় তার জন্য লালায়িত হচ্ছি। আর যেখানে ভোগের সামগ্রী অফুরন্ত এবং দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যাবে, সেখানে কেন যাব না? মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে কী করে, কী করে স্বর্গে যাওয়া যাবে তা শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। 'সুবর্গকামো যজেত'[১]—স্বর্গকামনা করে যাগ করবে। সোমযাগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যাগ আছে যা করলে স্বর্গে যাওয়া যায়। শাস্ত্র বলছেন—'অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি'[২]—চাতুর্মাস্য যাগ করলে অক্ষয় ফললাভ হয়। উপার্জিত অর্থ খরচ করতে করতে ফুরিয়ে যায় কিন্তু এ এমন সম্পদ যা ফুরিয়ে যাবে না। এইভাবে মানুষ শাস্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শাস্ত্রের নির্দিষ্ট প্রণালীতে জীবনকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। এগুলি কি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য? অবশ্যই। শাস্ত্র যদি স্বর্গকে প্রতিপন্ন না করে বা যদি দেহান্তরগামী আত্মাকে প্রতিপন্ন না করে তাহলে এগুলি জানবার অন্য কোন উপায় নেই। অর্থাৎ যাঁরা আস্তিক, বেদশাস্ত্র মানেন তাঁরাও শাস্ত্রের প্রামাণ্যেই এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন না। এইরকম স্বর্গের কথা নচিকেতা বেদবিদ্‌গণের কাছে শুনেছেন বা শাস্ত্রে পড়েছেন। তাই যমের কাছে সেই স্বর্গে যাবার উপায় জিজ্ঞাসা করছেন।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥১৩॥

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫
২. আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র—৮/১/১

অন্বয় ঃ—মৃত্যো (হে মৃত্যুর অধিপতি) স ত্বম্ (আপনিই) স্বর্গ্যম্ (দিব্যলোকপ্রাপ্তির সাধনরূপ) অগ্নিম্ (অগ্নিবিদ্যা) অধ্যেষি (অধিগত আছেন) ত্বম্ (আপনি) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাশীল) মহ্যম্ (আমাকে) প্রব্রূহি ([সেই বিদ্যা] বিশেষভাবে উপদেশ দিন)। [কারণ] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গলোকবাসী যজমানরা) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব) ভজন্তে (লাভ করে)। দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরের দ্বারা) এতৎ (এই অগ্নিবিদ্যার জ্ঞান) বৃণে (প্রার্থনা করি)।

'মৃত্যো,—হে যমরাজ, 'ত্বম্ স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্ অধ্যেষি'—আপনি স্বর্গপ্রদ অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত আছেন। 'প্রব্রূহি ত্বং মহ্যম্'—সেই অগ্নিতত্ত্ব আমাকে বলুন। যদি বলেন—আমি অধিকারী কিনা, 'শ্রদ্দধানায়'—তাহলে বলব আমি শ্রদ্ধাবান। সেই শ্রদ্ধাবানকে দিতে আপনার আপত্তি হবার কথা নয়। যদি প্রশ্ন ওঠে—জেনে কী হবে? এমন জিনিস জানব না! 'স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে'—স্বর্গবাসীরা অমরত্ব লাভ করেন, শাস্ত্র ও বিজ্ঞজনেরা একথা বলেন। অতএব—'এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ'—দ্বিতীয় বরে আমার প্রার্থনা—আমি অগ্নিবিদ্যার অনুষ্ঠান করে স্বর্গসুখ ভোগ করতে চাই।

প্রথম আর দ্বিতীয় বরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। প্রথম বর ঐহিক সুখ এবং দ্বিতীয় বর পারলৌকিক সুখ-সম্বন্ধীয়। দুটিই এখানে পেয়ে গেলে মরবার পর কী হবে বলে আর আশঙ্কা থাকবে না। বেঁচে থেকেও সুখভোগ করব আবার মরেও সুখ হবে। অনন্তকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করবেন—এই আশা নিয়ে নচিকেতা যমের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করলেন। আমরা দেখব, যম তাঁর প্রার্থনা সানন্দে পূরণ করেছেন। এগুলি দিতে যমের কোন বাধা নেই কারণ দুটি বরেই নচিকেতা যমের হাতের মুঠোয় রইলেন। যদি যমের হাত থেকে বেরিয়ে যেতেন তাহলে একটু চিন্তার কথা ছিল।

এখানে মনে রাখতে হবে, এই যাগযজ্ঞাদির উপদেশ শুধু শুনলে হবে না, তদনুসারে অনুষ্ঠান করতে হবে। শাস্ত্রের বিধান এই যে, যদি স্বর্গ চাও তাহলে এই যে যজ্ঞের কথা বললাম নিখুঁতভাবে তার অনুষ্ঠান কর। নাহলে ফললাভ হবে না। কর্মকাণ্ডের বিধি সম্পর্কেই এই কথা। ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি বোঝা যায় যে আত্মা কোন কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না—'ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্'[১]—কর্মের দ্বারা আত্মার বৃদ্ধিও হয় না, হ্রাসও হয় না—তখন আমাদের আর করণীয় কিছু থাকে না। বুঝতে পারি আত্মাতে সুখ বা দুঃখ নেই—'ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ'[২]—এবং আমিই যখন সেই আত্মা

---

১. বৃহদারণ্যক—৪/৪/২৩

২. কঠোপনিষদ্—২/২/১১

তখন আমারও সুখ-দুঃখ নেই। এই জ্ঞান তৎক্ষণাৎ মুক্তি এনে দেয়। যজ্ঞীয় কর্ম ভবিষ্যতে ফল দেয়। এখন যজ্ঞ করা হলো, মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হবে। এখনই যদি স্বর্গে যাওয়া হয় তাহলে কর্মের ব্যাপারটাই সব গোলমাল হয়ে গেল। মানুষ এই পৃথিবীর ভোগ শেষ করে তার পরে স্বর্গে যেতে চায়। না হলে, স্বর্গে যাওয়া তার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হবে। সুতরাং সে এখন কর্ম করে তার ফলটি safe deposit vault-এর locker-এ জমা রাখবে। পরে যখন দরকার হবে চাবি খুলবে, ভোগ করবে। মানুষের এইরকম আকাঙ্ক্ষা এবং শাস্ত্রেরও এতে সমর্থন।

জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে বড় পার্থক্য এখানে। জ্ঞান—তৎক্ষণাৎ মুক্তিপ্রদ, আর কর্ম—কালে ফলপ্রদ। কর্ম এখন করা সমাপ্ত হলো আর কালে যে ফল ফলবে—তা সেই কর্মেরই ফল তা কী করে বোঝা যাবে? কার্য এবং কারণের একটা সম্বন্ধ থাকা চাই। আমরা দেখছি, কারণরূপ কর্ম নাশ হয়ে গেল, কার্যরূপ স্বর্গ তখনো এল না। তাহলে এ-দুটির কার্য-কারণ সম্বন্ধ হয় কী করে? বীজ নাশ হয়ে গিয়ে গাছ হয়—একথা বলা হয় বটে কিন্তু বস্তুতপক্ষে বীজটা একেবারে নাশ হয় না। বীজ বপনের পরে তার ক্রমিক পরিবর্তন হতে থাকে এবং অবশেষে মহীরুহে পরিণত হয়। যজ্ঞীয় কর্মের কিন্তু একান্তই নাশ হয়ে যায়, তার কোন অংশ কোনরূপেই অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে স্বর্গকে যদি সেই যজ্ঞীয় কর্মের ফল বলা হয় সেই স্বর্গ আসবে কোথা থেকে? মীমাংসকেরা তার উত্তরে বলেন, কর্ম করবার পর সেটি যখন পূর্ণ হলো তখন তা থেকে একটি ফল হয় যা দেখা যায় না। তাকে বলা হয় 'অপূর্ব'। যেমন মাটির নিচে বীজটার অবস্থা দেখা যায় না, চারা হয়ে উঠলে তখন দেখা যায়। সেইরকম কর্ম করবার অব্যবহিত পরে তার একটা সূক্ষ্ম ফল, যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সেই 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয়। একে অপূর্ব কেন বলে? না, কর্ম করবার পূর্বে তা ছিল না। কর্মের পরে সেই অপূর্ব রইল প্রত্যক্ষের অগোচররূপে। তারপর যখন কাল উপযোগী হবে তখন তা স্বর্গরূপফলপ্রদ হবে। অতএব কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ হতে কোন বাধা হলো না।

উত্তর-মীমাংসক বা বেদান্তীরা এই 'অপূর্ব' মানেন না। তাঁদের মতে এই 'অপূর্ব' সত্যই একটি অপূর্ব বস্তু যার সম্বন্ধে না আছে শাস্ত্র প্রমাণ, না আছে প্রত্যক্ষ অনুভব। সিদ্ধান্তকে সার্থক করবার জন্য এটা একটা অনুমান মাত্র। কেবল অনুমানের দ্বারা কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না। এখানে প্রত্যক্ষ বা শব্দ কোন প্রমাণই নেই। তখন পূর্বপক্ষ বলেন, বেদকে যদি স্বীকার কর তাহলে বেদের স্বীকৃত তত্ত্বকে গ্রহণ করবে না? সিদ্ধান্তী বলেন, আমরা অন্যভাবে এর অর্থ করি। আমরা বলি, আমাদের কৃতকর্ম কোন চেতন ব্যক্তিকে আশ্রয়

করে থাকে। সেই চেতনা আমি নয়, কারণ আমার এ-সম্বন্ধে কোন অনুভূতি থাকে না। সেই কর্ম ঈশ্বরকে অবলম্বন করে থাকে, সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরের মনে থাকে। তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি করেন তখন তাঁর মনে বীজাকারে যা ছিল তা তাঁর ইচ্ছারূপে অভিব্যক্ত হয়ে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয় এবং জীবকে তার কৃতকর্ম অনুসারে তিনি ফল দেন। সুতরাং এখানে কর্মের যে স্বর্গাদির কারণতা তাতে কোন দোষ হচ্ছে না, আবার অপূর্বকেও মানবার দরকার নেই। সকল মীমাংসকেরা ঈশ্বরের কল্পনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বলেন, কর্মের দ্বারা অর্জিত ফল যখন অবশ্যম্ভাবী তখন ঈশ্বর আর কী করবেন? তিনি একজন record-keeper clerk-এর মতো যেমন যেমন কর্ম আছে তেমন তেমন ফল দিয়ে যাবেন। আর কিছুই নয়। কর্মের দ্বারাই ফল হয় বললেই যথেষ্ট হয়, ঈশ্বরকে মানার দরকার নেই।

যাই হোক, এই মীমাংসকদের একদল তো ঈশ্বরকে উড়িয়েই দিয়েছেন। আর একদল কোনরকম করে ঈশ্বরের সত্তাকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্রতা দাবি না করেন তাহলে আমরা মানতে পারি। স্বতন্ত্র হলে তিনি স্বেচ্ছাচারী হবেন এবং স্বেচ্ছাচারী হলে কর্মের আর কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা রইল না। তিনি ফল দিতে পারেন, না-ও পারেন—এইরকম ঈশ্বরকে মানলে আমাদের কর্মের যে শৃঙ্খলা chain, সেটা নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং আমরা এ মত মানি না। এইভাবে তাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেন। উত্তর-মীমাংসাবাদী বৈদান্তিকেরা অর্থাৎ যাঁরা ফলদাতা ঈশ্বর মানেন, তাঁরা বলেন—ঈশ্বর যে ফল দিতে বাধ্য এমন নয়। তিনি স্বতন্ত্ররূপেই ফল দিয়ে থাকেন, ব্যতিক্রম করেন না। আমি ভাল করি, ইচ্ছা করলে মন্দ কাজও করতে পারি, কিন্তু করি না। এখানেই আমার স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রতা মানে এই নয় যে স্বাতন্ত্র্য দেখাবার জন্য আমাকে মন্দ কাজও করতে হবে। ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছায় তিনি কর্মের অনুরূপ ফল দেন। তাঁদের মীমাংসা এইরকম।

এখানে স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে যমের কাছে নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করলে যম তার উত্তরে বললেন—

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—[যমরাজের উত্তর] নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), স্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত), অগ্নিম্ (অগ্নিবিদ্যা), প্রজানন্ (উত্তমরূপে জেনে), তে (তোমাকে), প্র ব্রবীমি (বিস্তৃতভাবে বলছি)। মে (আমার কাছে), তৎ উ (সেটি), নিবোধ (অবহিত হয়ে শোন)। ত্বম্ (তুমি),

এতম্ (এই অগ্নিকে), অনন্তলোক-আপ্তিম্ (দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন) অথো (আবার) প্রতিষ্ঠাম্ (নিখিল বিশ্বের আশ্রয়) গুহায়াম্ (বিদ্বানগণের বুদ্ধিরূপ গুহাতে) নিহিতম্ (অবস্থিত) [বলে] বিদ্ধি (জানবে)।

'স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ তে প্র ব্রবীমি'—স্বর্গলাভের উপায়ভূত অগ্নির স্বরূপ আমি জানি, তা তোমাকে সবিশেষ বলছি। 'তৎ উ মে নিবোধ'—তুমি আমার কাছ থেকে একাগ্রমনে শোন। 'ত্বম্ এতম্ অনন্তলোকাপ্তিম্ অথো প্রতিষ্ঠাম্'—তুমি জেনো, এই অগ্নিই স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ও জগতের আশ্রয়-স্বরূপ। কারণ, এই অগ্নির অভিমানিনী দেবতা বিরাট, তাই তাঁর কৃপায় স্বর্গলোক প্রাপ্তি হবে এটা স্বাভাবিক। তিনি না থাকলে জগৎ নিরাধার হয়ে যায়। তিনি জগতের আশ্রয়রূপ, স্থিতির কারণ, আর—'বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্'—এঁকে হৃদয়গুহাতে নিবিষ্ট বলে জানবে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে এটি গোপন তত্ত্বরূপে আছে। এই বস্তুটি তুমি জানতে চাইছ। আমি পূর্ব থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তুমি যা চাইবে তা দেব, অতএব দ্বিতীয় যে বর চেয়েছ তা দিচ্ছি। এই বলে যমরাজ সঙ্গে সঙ্গে নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যাটি দিলেন।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—[যমরাজ] তম্ (নচিকেতাকে), লোকাদিম্ (জগৎ-কারণ, প্রথমোৎপন্ন), অগ্নিম্ (অগ্নি-বিদ্যা, বিরাট পুরুষরূপ অগ্নির বিষয়), তস্মৈ (তাকে, নচিকেতাকে), [অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য যজ্ঞবেদী নির্মাণের উদ্দেশ্যে] যাঃ (যেরূপ) যাবতীঃ বা (এবং যতগুলি) ইষ্টকাঃ (ইষ্টক) [প্রয়োজন] যথা বা (এবং যেভাবে সাজাতে হবে) [সেই সমস্ত] উবাচ (বললেন)। স চ অপি (এবং নচিকেতাও) তৎ (মৃত্যুকথিত সমস্ত বিষয়) যথোক্তম্ (যথাযথ রূপে) প্রত্যবদৎ (পুনরায় বললেন)। অথ (অনন্তর) মৃত্যুঃ (যম) [এই পুনরুচ্চারণে] তুষ্টঃ (প্রসন্ন হয়ে) পুনঃ এব (পুনরায়) অস্য (নচিকেতাকে) আহ (বললেন)।

'তস্মৈ লোকাদিং তম্ অগ্নিম্ উবাচ'—যমরাজ নচিকেতাকে সৃষ্টবস্তুর আদিভূত অগ্নির বিষয়ে উপদেশ দিলেন। জগতের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ হলেন হিরণ্যগর্ভ এবং হিরণ্যগর্ভের পরে স্থূলীভূত সমষ্টিরূপ হলেন বিরাট। সেই লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান যে হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট তাঁর সম্বন্ধে যম নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন। 'যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা'—কিপ্রকার এবং কতগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করতে হয় ও কিরূপে অগ্নি চয়ন করতে হয় বললেন। অর্থাৎ বেদী কিভাবে রচনা করতে হবে, যজ্ঞটি কেমনভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে, তাতে কী কী উপকরণ লাগবে তিনি সব যথাযথভাবে শেখালেন। এখানে যতগুলি ইঁট

যেমনভাবে লাগবে সে বিষয়ে বলা হলো। বৎসরব্যাপী এই যজ্ঞ, বৎসরের তিনশ ষাট দিন এবং তিনশ ষাট রাত্রি, মোট সাতশ কুড়ি দিনরাত্রি। এক-একটি দিনরাত্রি যেন এক-একটি ইঁট। এটি উপনিষদ্ বলে ক্রিয়াকাণ্ডের সবিস্তার বর্ণনা এখানে নেই। অন্যত্র আছে, যেখানে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এখানে পরের তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য এসবের উল্লেখমাত্র করা হলো।

নচিকেতার অসাধারণ মেধা ও ধারণাশক্তি। 'স চ অপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তম্'—যম যেমন যেমন বলেছেন নচিকেতা তেমন তেমন আবার আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন, ঠিক হয়েছে তো, আপনি এই কথাই বলেছেন তো? 'অথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ'—যম নচিকেতার কথায় প্রীত হলেন। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি শিক্ষক স্বভাবতই প্রসন্ন হন এবং যা শিক্ষণীয় তার চেয়েও বেশি শিখিয়ে দেন। এখানেও সেইরকম তুষ্ট হয়ে যম আবার বলছেন—

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥১৬॥

অন্বয় ঃ—মহাত্মা (মহান্ হৃদয় যমরাজ), প্রীয়মাণঃ (প্রীত হয়ে), তম্ অব্রবীৎ (নচিকেতাকে বললেন), ইহ (এই বরদান প্রসঙ্গে), অদ্য এব (আজই), তব (তোমাকে), ভূয়ঃ (আবার, অর্থাৎ চতুর্থ) বরম্ (বর) দদামি (দিচ্ছি)। অয়ম্ অগ্নিঃ (এই অগ্নি) তব এব (তোমারই) নাম্না (নামে) ভবিতা (প্রসিদ্ধ হবে)। চ (অধিকন্তু) অনেক রূপাম্ (বিচিত্ররূপা) ইমাম্ (এই) সৃঙ্কাম্ (মালা অথবা অনিন্দিত কর্মময় গতি) গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

শিষ্যের উপযুক্ততা দেখে—'তম্ অব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা'—সদাশয় যমরাজ প্রীত হয়ে তাঁকে বললেন—'বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ'—তোমাকে আরো এই বর দিচ্ছি। তোমাকে তিনটি বর দেবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা তো দেবই, তাছাড়াও তোমার প্রতিভায় প্রীত হয়ে তোমাকে আরো একটি বর দিচ্ছি। তিনি উদারচেতা—তাই কৃপণতা করছেন না যে যা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তার চেয়ে বেশি কেন দেব। বলছেন—'তবৈব নাম্না ভবিতা অয়মগ্নিঃ'—এই যজ্ঞাগ্নির নাম আজ থেকে তোমার নামেই হবে। সকলে এই অগ্নিকে নাচিকেত-অগ্নি বলবে। 'সৃঙ্কাং চ ইমাম্ অনেকরূপাং গৃহাণ'—আর আমার সন্তুষ্টির পরিচায়করূপে এই রত্নময়ী মালা তোমাকে দিচ্ছি। রত্নময়ী মালা, তার ভিতরে হয়তো ঘুঙুরজাতীয় কিছু আছে অথবা রত্নগুলি পরস্পরের আঘাতে একটা সুন্দর শব্দ করছে ; কিংবা যজ্ঞের কথা হচ্ছে, সুতরাং এখানে মালা মানে হয়তো আর একপ্রকারের এমন একটি যজ্ঞ যাতে বহু ফল পাওয়া যায়। যে যজ্ঞের বিষয় নচিকেতা জানতে চাননি যম তা-ও নচিকেতাকে দিচ্ছেন।

পরের শ্লোকে যমরাজ নাচিকেত-যজ্ঞের স্তুতি করছেন, লোককে এই যজ্ঞ করতে প্ররোচিত করবার জন্য। যজ্ঞ যে সাধারণ নয়, মহাফলপ্রদ—সেই কথা বলে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে লোককে আকৃষ্ট করছেন।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৭॥

অন্বয় ঃ—ত্রিভিঃ (মাতা পিতা ও গুরু অথবা শ্রুতি, স্মৃতি ও বিদ্বান দ্বারা), সন্ধিম্ (সন্ধান, উপদেশ), এত্য (প্রাপ্ত হয়ে), ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার নাচিকেত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন), ত্রিকর্মকৃৎ (যিনি স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও দানরূপ ত্রিবিধ কর্ম করেন) [তিনি] জন্মমৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যুকে) তরতি (অতিক্রম করেন) [এই অমরত্বও কিন্তু মাত্র কল্পান্তকালস্থায়ী] ব্রহ্ম-জ-জ্ঞম্ (অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ থেকে জাত, সর্বজ্ঞ) ঈড্যম্ (স্তুতিযোগ্য) দেবম্ (দীপ্যমান বিরাট পুরুষরূপ অগ্নিকে) বিদিত্বা (জেনে) নিচায্য (নিশ্চিতরূপে আত্মস্বরূপে অনুভব করে) ইমাম্ (হৃদয়ে উপলব্ধিরূপ) শান্তিম্ (প্রশান্তি) অত্যন্তম্ (সম্যকরূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)।

'ত্রিণাচিকেতঃ'—তিনবার যিনি নাচিকেত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন বা অধ্যয়ন, জ্ঞানলাভ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা যিনি নাচিকেত-অগ্নি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছেন তিনি 'ত্রিভিঃ সন্ধিম্ এত্য'—মাতা, পিতা এবং আচার্য, এই তিনটির সঙ্গে সম্বন্ধলাভ করে অর্থাৎ এই তিনজনের থেকে উপদেশ পেয়ে জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছেন। এখানে সুন্দর কথা বললেন যে, মানুষের চরিত্রের পূর্ণতার জন্য এই তিন জায়গা থেকে শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। যতদিন উপনয়ন না হয় ততদিন মায়ের কাছে, উপনয়নের সময় থেকে পিতার কাছে, কারণ পিতাই সাধারণত উপনয়ন দিতেন ; তারপর পিতার বিদ্যা সব অধিগত করে আচার্যের কাছে পাঠ নিলে বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়।

এ সম্বন্ধে অন্য শ্রুতিতে এরকম বলা হয়েছে—'যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীৎ।'[১] লোকে যেমন মাতা, পিতা এবং আচার্যের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে বলতে পারে, শিলিনের পুত্র সেইরকমই বলেছিলেন। বিদ্যার পরিপূর্ণতা এইভাবে হয়। আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ মানা হয়। জন্মের আগে থেকেই সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হচ্ছে। কিভাবে? শাস্ত্র বলছেন যে, সৎ পুত্রের জনকজননী হতে হলে পিতা-মাতার তপস্যা করতে হয়। কাজেই সন্তানের শিক্ষার সূচনা জন্মের পূর্ব থেকে, তারপর জন্ম থেকে এই ক্রম চলবে। প্রতি পদে মায়ের কাছ থেকে—মাতৃস্তন্যের

১. বৃহদারণ্যক—৪/১/২

সঙ্গে সঙ্গে যেন শিক্ষা আসে। সে শিক্ষা ক্রমশ জীবনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। তারপর পিতার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তি। সেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আচার্যের কাছে। এইভাবে শিক্ষালাভ করে 'ত্রিকর্মকৃৎ'—তিনটি কর্ম করে। কী কী কর্ম? যজ্ঞ, দান ও বেদ-অধ্যয়ন। এই তিনটি কর্ম করে নিজেকে প্রস্তুত করে। উপযুক্ত হবার জন্য এই প্রস্তুতি। তারপর—'তরতি জন্মমৃত্যু'—জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে। কিভাবে করে? না, যদি স্বর্গে যেতে পারে তাহলে জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করাই হলো। সেখানে মৃত্যু নেই। সুতরাং জন্মও নেই। আরো বলছেন—'ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি'—ব্রহ্মজ, ব্রহ্মের থেকে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশমান—'দেবম্', 'ঈড্যং'—পূজনীয়, তাঁকে জেনে এবং 'নিচায্য'—তাঁর সঙ্গে অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়ে—'ইমাং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি'—স্বসংবেদ্য অর্থাৎ স্বহৃদয়ে উপলব্ধ অনন্ত শান্তি লাভ করেন। যম নিজে যে শান্তির অধিকারী সেই শান্তি চিরকালের জন্য প্রাপ্ত হন।

তারপর যম নাচিকেত-যজ্ঞের আরো প্রশংসা করছেন—

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৮॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে) ত্রিণাচিকেতঃ (তিনবার নাচিকেত-অগ্নির অনুষ্ঠানকারী), এতৎ (পূর্বোক্ত), ত্রয়ম্ (যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও সাজানোর প্রণালী) বিদিত্বা (অবগত হয়ে) এবম্ (এই প্রকার আত্মস্বরূপের) বিদ্বান (উপলব্ধি করে) নাচিকেতম্ (নাচিকেত-অগ্নিকে) চিনুতে (চয়ন করেন, অর্থাৎ নাচিকেত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি) পুরতঃ (দেহাবসানের পূর্বেই) মৃত্যুপাশান্ (কাম-ক্রোধ-লোভাদিরূপ সাংসারিক বন্ধন) প্রণোদ্য (ছিন্ন করে) শোকাতিগঃ (শোক থেকে মুক্ত হয়ে) স্বর্গলোকে (স্বর্গে) মোদতে (আনন্দে থাকেন)

'ত্রিণাচিকেতঃ ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা'—ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নিচয়নবিধি জেনে যিনি তিনবার নাচিকেত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন, অথবা এই যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন, যিনি এই অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জেনে ধ্যান করেন, কী করে যজ্ঞটি করতে হয়, যজ্ঞে কী কী বস্তুর উপযোগ করতে হয় ও কেমন করে করতে হয়, সব জেনে তারপর যিনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন 'চিনুতে নাচিকেতম্'—নাচিকেত-অগ্নিকে চয়ন করেন অর্থাৎ যিনি এইভাবে এই যজ্ঞ করেন। তাঁর কী ফললাভ হয়? 'স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য'—তিনি শরীরত্যাগের পূর্বেই মৃত্যুর পাশ থেকে অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এখানে—'পুরতঃ' বলা হচ্ছে কারণ শরীরপাতের পূর্বেই

মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, কাজেই আমরা যে অর্থে মৃত্যুকে অতিক্রম করা বলি এ তা নয়। এখানে মৃত্যুর অর্থ অজ্ঞান, অধর্ম, রাগদ্বেষ। তা থেকে মুক্ত হয়ে তারপর—'শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে'—শোকের অতীত হয়ে, সর্বপ্রকার মনঃকষ্টবর্জিত হয়ে তিনি স্বর্গলোকে আনন্দ করেন অর্থাৎ সেই বিরাটের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আনন্দ ভোগ করেন। নাচিকেত-অগ্নি চয়নের পরিণাম এই। যজমান যাতে এই যজ্ঞে প্ররোচিত হয় তাই শ্রুতি এগুলি ব্যাখ্যা করে বললেন। যদি তুমি এই ফল চাও তোমাকে এটি করতে হবে—শাস্ত্র মানুষকে এইভাবে নিয়োগ করে। যেখানে শাস্ত্রে 'যজেত' বলা আছে সেখানে শাস্ত্রকারেরা অর্থ করেন 'যাগ করবে'। অর্থাৎ 'লিঙ্' প্রয়োগের দ্বারা বিধান দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি যদি স্বর্গ চাও তাহলে তোমাকে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হবে—'সুবর্গকামো যজেত'[১]। এখানে স্বর্গলোকের পারে গিয়ে আনন্দ করে—বলাতে সমস্ত কর্মের প্রশংসা করা হয়ে গেল।

এখন যম উপসংহার করছেন এই বলে—

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥১৯॥

অন্বয় ঃ—নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে) যম্ (যে অগ্নিতত্ত্বের জ্ঞান) অবৃণীথাঃ (প্রার্থনা করেছিলে) এষঃ (এই) স্বর্গ্যঃ (সেই স্বর্গসাধন) অগ্নিঃ (অগ্নিবিদ্যা) তে (তোমাকে) [দিলাম]। জনাসঃ (লোকেরা) এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে) তবৈব (তোমারই নামে) প্রবক্ষ্যন্তি (অভিহিত করবে)। নচিকেতঃ (নচিকেতা) তৃতীয়ম্ বরম্ (তৃতীয় বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)।

'যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ'—তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নি প্রার্থনা করেছিলে—'এষ তে অগ্নিঃ নচিকেতঃ স্বর্গ্যো'—হে নচিকেতা, স্বর্গসাধন সেই অগ্নি তোমাকে দিলাম। 'এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসঃ'—এখন থেকে লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করবে। নচিকেতার নামের সঙ্গে চিরকাল এই অগ্নি সংবদ্ধ হয়ে রইল কারণ তাঁর মতো এমন অপূর্ব মেধাসম্পন্ন শিষ্য যম পাননি। দুটি বর নচিকেতা পেয়েছেন, অধিকন্তু আরো একটি বর তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এখন—'তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব'—তোমার তৃতীয় বরটি বাকি আছে, সেটি প্রার্থনা কর।

---

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫

আগেই বলেছি, নচিকেতা প্রথম বরে লৌকিক এবং দ্বিতীয় বরে পারলৌকিক সুখ চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের এর বেশি কাম্য কিছু থাকে না, এখানেই মানুষের জিজ্ঞাসার বা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি। ইহলোকে এবং তারপরে পরলোকে ভোগ করা হলো এবং তা অনন্তকাল ধরে। সুতরাং আর কী চাই? বাস্তবিক এরকম হলে মানুষের কী আনন্দ হতো! চিরকাল ধরে ভোগ করে যেত! নচিকেতাকে এই দুটি বর দিয়ে যম নিশ্চিন্ত। যাক্, যা দেবার সবই তো দেওয়া হয়ে গেল। তৃতীয় বরে নচিকেতা আর কী চাইবে—বলায় যেন একটু আভাস রয়েছে যে, চাইবার মতো আর কিছু তো থাকার কথা নয়। যা যা মানুষের কাম্য সবই দেওয়া হয়েছে। যমরাজ তখনো ভাবতে পারেননি যে, এর পরেও কিছু কাম্য থাকতে পারে। এর পরেও মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে কি?

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥২০॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনা] মনুষ্যে (মানুষের তথা জীবমাত্রের) প্রেতে (মৃত্যু হলে) অয়ম্ (দেহাতিরিক্ত এই আত্মা) অস্তি (আছেন) ইতি (এই কথা) একে (কোন কোন লোক [বলেন]) চ (এবং) ন অস্তি (আত্মা নেই) ইতি একে (এই কথা কেউ কেউ বলেন) ইয়ম্ যা (এই যে) বিচিকিৎসা (সংশয়) এতৎ (এই বিষয়টি) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হয়ে) অহম্ (আমি) বিদ্যাম্ (জানতে চাই)। বরাণাম্ (প্রার্থনাসমূহের মধ্যে) এষঃ (এইটি) তৃতীয়ঃ বরঃ (তৃতীয় বর)।

'মনুষ্যে প্রেতে য ইয়ং বিচিকিৎসা'—মানুষের মৃত্যুর পরে এই যে সন্দেহ, সংশয়। কী সংশয়? 'অস্তি ইতি একে নায়মস্তীতি চ একে'—কেউ বলেন পরলোকে আত্মা আছেন, কেউ বলেন মৃত্যুর পর দেহান্তরগামী আত্মা নেই। 'এতৎ'—এটি অর্থাৎ আত্মার 'অস্তিত্ব' বা 'অনস্তিত্ব' বিষয়টি—'বিদ্যাম্ অনুশিষ্টঃ ত্বয়া অহম্'—আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে আমি জানতে চাই—'বরাণাম্ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ'—বরগুলির মধ্যে এইটি তৃতীয়।

তৃতীয় বরে নচিকেতা এককথায় আত্মার স্বরূপ কী তা জানতে চাইলেন। আমরা আগে দেখেছি প্রথম দুটি বরে নচিকেতা ইহলোক ও পরলোকের সুখ চেয়েছেন এবং তা পেয়েওছেন। ঐ দুটি বরেই সমস্ত সুখকল্পনার পরিসমাপ্তি হয়ে গিয়েছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি চাইবার কিছু থাকে না। কিন্তু নচিকেতা বুঝতে পারছেন, যা তিনি পেয়েছেন তাতেই সমস্ত পাওয়া পূর্ণ হয়নি।

তৃতীয় বরে নচিকেতা যে অন্য জিনিস জানতে চাইছেন তার দ্বারা বিষয়টি একটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। নচিকেতা বলছেন, যা আমি পেয়েছি তা-ই যথেষ্ট নয়, আমি আত্মাকে জানতে চাই। যে আত্মা সম্বন্ধে লোকের এত সংশয়, যাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না—সেই আত্মতত্ত্ব আমার জিজ্ঞাস্য। চার্বাক প্রমুখ অনেক দার্শনিক বলেন, এই দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু নাশ হয়ে যায়। আধুনিককালেও চার্বাকের অভাব নেই বরং তাঁদের সংখ্যা আরো বেড়েছে। তাঁরাও বলছেন, মরবার পর আর কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই। যে উপাদানে শরীর তৈরি সেইসব উপাদান মৃত্যুর পর তাদের স্ব স্ব সত্তায় ফিরে যায়। চলতি বাংলায় আমরা একে বলি, পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশে যায়। বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষের দ্বারা গবেষণাগারে দেখিয়েছেন একটি মোমবাতি নিঃশেষে জ্বালালে তার বিভিন্ন উপাদানগুলি কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। সুতরাং যাকে মোমবাতি বলছিলাম সেই একটি compound অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর সংহতি মাত্র। সেই সংহতি ভেঙে যাওয়ায় বিভিন্ন উপাদানগুলি তাদের স্ব-স্বরূপে ফিরে যায়, মোমবাতি বলে কোন বস্তু আর থাকে না। শরীরটাও মোমবাতির মতো একটি মিশ্র বস্তু বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে তৈরি। এই মিশ্রণটা যখন ভেঙে যায়, disintegrate করে, তখন কী হয়? বিভিন্ন উপাদানগুলি তাদের নিজের নিজের স্থানে অর্থাৎ নিজ নিজ ধাতুতে ফিরে যায়। তারপর? তারপর কী হয়—এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন যেন থেকেই যায়, উত্তর পাবার নিশ্চিত, অসন্দিগ্ধ একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্বেষণ কোন্ পথে যাবে? মৃত্যুর পর কী থাকে—প্রত্যক্ষের দ্বারাও বোঝা যায় না, অনুমানের দ্বারাও গম্য নয়। মানুষের যে কল্পনা 'আমি' বলে আছে, সেই কল্পনার তখন অবসান হয়ে যায়। কাকে আশ্রয় করে কল্পনা হবে? এখন দেহকে আশ্রয় করে 'আমি' কল্পনা চলছে। যখন দেহরূপ আশ্রয় থাকবে না তখন 'আমি'র কল্পনাও আর সম্ভব নয়। সুতরাং 'আমি' সেখানে নিঃশেষিত হয়ে গেল। শুধু চার্বাকরাই নয়, অনেক বড় বড় দার্শনিক পর্যন্ত এই মত পোষণ করেন।

এই মতের খণ্ডনে সিদ্ধান্তী বলবেন, কর্মের নিয়মকে মানতে হলে আমাদের বলতে হয় যে মরবার পরেও কিছু থাকে, নাহলে আমি যে এ জীবনে এত কাজ করলাম তার ফল কোথায় যাবে? দেহের সঙ্গে কর্মফলও যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে কর্মের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। অভুক্ত কর্মফল নিঃশেষিত হয় না। 'মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি'[১]—ভোগ না করে শতকোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না, এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। দেহের সঙ্গে সঙ্গে কর্মফলও বিনষ্ট হয় বললে সেই সিদ্ধান্তের হানি হয়।

---

১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড—২৬/৭১

চার্বাকশ্রেণীর দার্শনিকেরা এবং অনেক বৈজ্ঞানিক প্রত্যুত্তরে বলবেন, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হলে তবে তো তার হানি হবে। সিদ্ধান্তের যে প্রতিষ্ঠাই হলো না তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, শরীর নষ্ট হয়ে গেলে সব চলে গেল। সিদ্ধান্ত তো হাওয়ায় দাঁড় করানো চলে না। সুতরাং সিদ্ধান্তের আবার হানি কী? সিদ্ধান্তী এঁদের প্রতিপ্রশ্ন করবেন, শরীরনাশের পর আর কিছু থাকে না, এ বিষয়ে তোমাদের কোন প্রমাণ আছে? এঁরা জবাব দেবেন, না প্রমাণ নেই। তবে প্রমাণ করবার দায় তো আমাদের নয়। তোমরা যদি বল কিছু থাকে তাহলে তা প্রমাণ করতে হবে তোমাদেরই।

এখন, সিদ্ধান্তী কী করে প্রমাণ করবেন? প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণিত হবে না, কারণ পরলোক কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। আমরা সে সম্বন্ধে কেবল কল্পনা করি। জগতের মতো করে পরলোককে কেউ দেখেনি, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ চলতে পারে না। অনুমানও চলে না। কেন চলে না? এ সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম যুক্তি আছে। সেটা একটু ন্যায়ের কথা হলেও এখানে দুর্বোধ্য বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেখানে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করছি না সেখানে সে বস্তুকে অনুমানের দ্বারা জানতে পারি। অনুমানও একটা প্রমাণ। যেমন, পাহাড়ের উপর ধোঁয়া দেখছি, আগুন দেখছি না। ধোঁয়া দেখে অনুমান করতে পারি যে পাহাড়ে আগুন আছে। কেন? না, যেখানে যেখানে ধোঁয়া দেখেছি সেখানে সেখানে আগুনও দেখেছি। রান্নাঘরে যখন ধোঁয়া ওঠে, দেখেছি সেখানে আগুন থাকে। আর এমন কোন ক্ষেত্র দেখিনি যেখানে ধোঁয়া আছে অথচ আগুন নেই। পাহাড়ের উপর ধোঁয়া দেখছি সুতরাং ওখানেও আগুন আছে। এরই নাম অনুমান। ওখানে আগুন প্রত্যক্ষ করছি না, দূরত্বের জন্য তা দৃষ্টিপথের বাইরে। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমান হচ্ছে। সেইরকম পরলোকে আত্মা আছে কিনা, প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমানে বলব। কিন্তু এখানে অনুমানও চলবে না, কারণ যেখানে অনুমান করব তার প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। যেমন পাহাড়ে আগুন অনুমান করছি, পাহাড় প্রত্যক্ষ না করলে তাতে আগুনের অনুমান হয় না। এইসব দৃষ্টান্তে ন্যায়শাস্ত্রে সাধ্য, ব্যাপ্য, পক্ষ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই শব্দগুলির ভিতরে মারাত্মক কিছু নেই। সাধ্য অর্থাৎ যা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করতে হবে, এক্ষেত্রে আগুন ; অনুমানের দ্বারা সাধনভূত লিঙ্গ বা হেতু হলো ধোঁয়া। যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে তাকে বলে পক্ষ, এখানে পক্ষ হলো পাহাড়। পক্ষ অর্থাৎ পর্বতের প্রত্যক্ষ হচ্ছে বলে আগুনের অনুমান হচ্ছে। পরলোক তো প্রত্যক্ষই হচ্ছে না সুতরাং সেখানে আত্মার অনুমান হবে কেমন করে? এখানে পক্ষের অনুভব নেই তাই অনুমানও চলতে পারে না। বেশিরভাগ দার্শনিক চার রকম প্রমাণ মানেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এ ছাড়াও অর্থাপত্তি আর অনুপলব্ধি নামে আরো দুটি প্রমাণ আছে যা সকলে মানেন না। আত্মা সম্বন্ধে শব্দই একমাত্র প্রমাণ, আর কোন প্রমাণ

নেই। শব্দের অর্থ আপ্তবাক্য। কাজেই নচিকেতা যমরাজকে বলছেন, আমার আত্মাকে জানবার অন্য কোন উপায় নেই, আপনিই বলে দিন। এই যে পরের কাছ থেকে শুনে জানা এর নাম শব্দজ্ঞান। নচিকেতা যমরাজের কাছ থেকে শুনে জানবেন। যমরাজ অতীন্দ্রিয় অনুভবসম্পন্ন, নচিকেতা তাঁকে পেয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে, এমন লোক আর পাবেন না যিনি আত্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন। সুতরাং যমরাজের কাছ থেকেই আত্মতত্ত্ব জানতে চান।

আগেই বলেছি, ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত সুখ পাওয়ার পরেও অপূর্ণতা থাকে। কেন থাকে? না, আমি যদি নিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই, তাহলে ভোগসম্পদ আমার কী কাজে লাগবে? তাতে দুদিনের আনন্দ পেতে পারি কিন্তু বিচার করে দেখলে সেই আনন্দ তো দুঃখেরই নামান্তরমাত্র। সুতরাং আমার স্বরূপকে না জানা পর্যন্ত কোন ভোগই আমাকে নিত্যতৃপ্তি দিতে পারবে না। আমি নিজেই যদি অনিশ্চিত হই তাহলে এসব ভোগ কার জন্য? কার জন্য ইহলোক এবং পরলোকের ভোগ সঞ্চয় করব? কী লাভ আমার? এইসব প্রশ্ন মনে জাগে। সুতরাং আত্মাকে না জানা পর্যন্ত কোন সুখই মানুষকে নিত্যতৃপ্ত করতে পারে না। আত্মাকে জানা দরকার, যিনি হচ্ছেন খুঁটি, আমার কেন্দ্র। আমার কেন্দ্রকে, আমার 'আমি'কে যদি না জানি তাহলে অন্য হাজারটা জিনিস জেনে আমার কী লাভ? ১-এর পরে যত শূন্য বসানো যায় তার মূল্য বাড়ে, আর ১-কে মুছে দিলে সমস্ত মূল্য শেষ হয়ে যায়, শূন্য হয়ে যায়। সেইরকম যতকিছু আমরা জ্ঞান বলি, ভোগের বস্তু, ঐশ্বর্য বলি, ঐ 'আমি'-কে মুছে দিলে সব গেল। কাজেই 'আমি'-কে জানা দরকার। 'আমি'-কে যদি স্পষ্টরূপে জানা যায় তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, জানবার আর কিছু বাকি থাকে না। অতএব সবকিছু নির্ভর করছে এই প্রশ্নের উপর—আমার স্বরূপ কী?

প্রশ্ন উঠবে—নচিকেতা যদি এতই বুদ্ধিমান তাহলে গোড়ায় কেন ওসব চাইলেন? তার উত্তর হচ্ছে—মানুষের বুদ্ধি ক্রমশ বিকশিত হয়। নচিকেতা গোড়া থেকেই যে আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। তাঁর ভিতরে অন্য অন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন সে আকাঙ্ক্ষাগুলি মিটল তখন তাঁর মনে নতুন করে জিজ্ঞাসা জাগল। এই জিজ্ঞাসা আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কোন-না-কোন সময়ে আত্মজিজ্ঞাসা জেগে ওঠে। চিরকাল নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ থাকতে পারে না। তার 'আমি'-কে জানবার ইচ্ছা হয়। প্রথম হয়তো নিজেকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কিন্তু তারপর মনে সন্দেহ ওঠে যে, আমার 'আমি'-কে যদি না জানি তাহলে এসব ধনৈশ্বর্য নিয়ে কী করব? এসব পেয়ে লাভ কী? এইজন্য 'আমি কে'—এই প্রশ্ন মনে জাগে। নচিকেতার মনেও জেগেছে। তাই এই প্রশ্ন করেছেন।

যার মৃত্যু হয়েছে তার কথা হচ্ছে না, যারা জীবিত থাকে তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, যে গেল সে কি আছে না নেই? যে লোকটি ছিল, যাকে নিয়ে এতদিন কাটল, এত আলাপ পরিচয় ব্যবহার, যাকে কেন্দ্র করে হয়তো একটা ইতিহাস রচিত হতে চলেছে, মৃত্যু কি চিরকালের জন্য তার সম্বন্ধে একটা ছেদ টেনে দিল? সে কি আর রইল? যদি থাকে তো কিভাবে রইল? যে চলে গেল—আমরা জানি না তার মনে কি উঠছে। সুন্দরভাবে নচিকেতা এই প্রশ্নটি এখানে তুলেছেন। মা তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন। মায়ের মনে প্রশ্ন—সে কি আছে? স্ত্রী স্বামীকে বা স্বামী স্ত্রীকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রশ্ন—সে কি আছে? এই প্রশ্ন মানুষের চিরন্তন। অন্য কোন প্রাণীর মনে এ প্রশ্ন ওঠে কিনা আমরা জানি না, তাদের মন আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু বিচারশীল মানুষ মাত্রেরই মনের এই জিজ্ঞাসা, সে কি আছে?

আমরা কল্পনা করে নিই সে আছে এবং কল্পনা অনুসারে সে যা যা ভালবাসত সেইসব জিনিস শ্রাদ্ধাদিতে তার উদ্দেশে অর্পণ করি। তবু প্রশ্নটি থেকেই যায়, উত্তর পাওয়া যায় না। উত্তর পাওয়া যায় না বলেই সন্দেহ জাগে, সত্যি আছে কিনা—এখানেই কি সব শেষ? এখানেই যদি সব শেষ হয় তাহলে মানুষের সব নীতিবোধ ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কোন প্রয়োজন নেই ভালভাবে চলবার, যেরকম করে পারি চলব। 'হেসে নেও—দু-দিন বৈ তো নয় ; কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।'[১]—কিন্তু তাতে কি সত্যি সত্যি প্রশ্নটা শেষ হয়ে যাচ্ছে? শেষ হচ্ছে না, জিজ্ঞাসার অবসান হচ্ছে না।

আমরা তো পরলোকগত আত্মা সম্বন্ধে কতরকম শুনি, planchette করি, দৈবজ্ঞের কাছে গিয়ে, চণ্ড নামিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আরো কত কী করি। কেন? যা দেখতে পাই না, শুনতে পাই না, যা দেখবার শুনবার জানবার কোন উপায়ই আমাদের নাগালের ভিতর নেই অথচ জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা-ই আমরা নানা পথে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। নচিকেতা যমরাজের কাছে এই প্রশ্নের উত্তরই জানতে চাইছেন।

আগেই বলেছি যে, এই প্রশ্ন যমরাজ হয়তো অনেকের কাছে শুনেছেন কিন্তু উত্তর দেবার দরকার হয়নি। কারণ সে উত্তর ধারণা করবার মতো যোগ্য অধিকারী কেউ ছিল না। সকলেই জিজ্ঞাসা করেছে, করেই পথ চলতে আরম্ভ করেছে। উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করেনি। যেমন বাইবেলে আছে Pontius Pilate স্বগতোক্তি করেছিলেন, 'What is truth ?'[২] কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গিয়েছিলেন। 'সত্য কী'—এ সম্বন্ধে

১. দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী — সম্পাদক ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সং (১৩৫৩), পৃঃ ৫৬৬।

২. The Bible, John 18 : 38

জিজ্ঞাসা মনে ওঠে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর, সমাধান জানবার ধৈর্য মানুষের নেই, তারা নিজের নিজের কাজে চলে যায়। মা সন্তানকে হারিয়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি আছে? তারপর আর অপেক্ষা নেই। জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে হবে। যতই আঘাত আসুক তা জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না, জীবনযাত্রা চলতেই থাকল। প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে গেল। প্রায় সব মানুষেরই এই অবস্থা। সুতরাং যমরাজের কাছে কেউ প্রশ্ন করলেও তাঁর উত্তর দেবার দরকার হয়নি। নচিকেতা সেরকম প্রষ্টা নন, উত্তর না নিয়ে যে তিনি নিবৃত্ত হবেন না এটা আমরা পরে দেখব। যমরাজ এখন নচিকেতাকে পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করে দেখবেন। যারা উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে, প্রশ্ন করেই পথ চলতে আরম্ভ করে, যাদের উত্তর না দিলেও চলে, নচিকেতা কি তাদেরই মতো একজন? তাই যমরাজ বলছেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২১॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতার প্রার্থনা শুনে যমরাজ তাঁর নিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বলছেন] পুরা (পূর্বকালে) অত্র (এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে) দেবৈঃ অপি (দেবতাদের দ্বারাও) বিচিকিৎসিতম্ (সংশয়িত হয়েছিল) হি (কারণ) এষঃ (এই) অণুঃ (অতিসূক্ষ্ম) ধর্মঃ (আত্মতত্ত্ব) ন সুবিজ্ঞেয়ম্ (দুরধিগম্য)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), অন্যম্ বরম্ (অন্য বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। মা (আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ করো না) মা (আমার কাছে) এনম্ (এই প্রার্থনা) অতি সৃজ (পরিত্যাগ কর)।

'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা'—দেবগণেরও এ বিষয়ে সংশয় ছিল, তাঁরাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান। আমরা জানি মানুষের চেয়ে দেবতারা অনেক বেশি জ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু সেই দেবতাদেরও—অর্থাৎ মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীব যাঁরা—তাঁদেরও এ সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়নি। আর বাস্তবিকই এই তত্ত্বটি অতিশয় সূক্ষ্ম, দুর্বিজ্ঞেয়—'অণুরেষ ধর্মঃ'। কেন? না, আগেই বলা হয়েছে—আমাদের জানা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি এক্ষেত্রে কাজ করছে না। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়টি জানতে পারছি না, আবার মন-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। বিষয়টি সহজবোধ্য নয়—'ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্'। অতএব নচিকেতা, তুমি এই অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে এত আগ্রহশীল না হয়ে—'অন্যং বরং বৃণীষ্ব'—অন্য বর চাও, যা তোমার কাজে লাগবে।

যমরাজের বলার তাৎপর্য, বিষয়টি এত সূক্ষ্ম যে, দেবতাদেরও এ সম্বন্ধে যখন সন্দেহ রয়েছে তখন তুমি শুনলেও হয়তো বিষয়টি বুঝতে

পারবে না। সুতরাং তোমার প্রাপ্য তৃতীয় বরটি বৃথা নষ্ট করো না। এইভাবে তুমি যদি জিদ কর, আমাকে হয়তো বলতে হবে, কিন্তু তাতে বোধহয় তোমার কোন লাভ হবে না। কারণ, তুমি বুঝতেই পারবে না। দেবতারাই পারেন না, আর তুমি তো মানুষ এবং তার উপরে আবার বালক। যমরাজ আরো বলছেন, আমাকে—'মা উপরোৎসীঃ'—উপরোধ করো না। 'অতি মা সৃজৈনম্'—আমার কাছে এই বর প্রার্থনা পরিত্যাগ কর, অন্য বর চাও। একথা কেন বলছেন? কারণ, যমরাজ নচিকেতাকে ভাল করে পরীক্ষা না করে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে প্রস্তুত নন। ভাল করে যাচিয়ে-বাজিয়ে দেখে নিতে হবে আত্মতত্ত্ব শুনবার তিনি প্রকৃত অধিকারী কিনা। অধিকারী বিচার না করে যমরাজ হঠাৎ এত সূক্ষ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে চান না। কাজেই এত করে বুঝিয়ে বলছেন এবং আরো বলবেন। নচিকেতা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাই বলছেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥২২॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতার প্রত্যুত্তর] কিল (যখন) দেবৈঃ অপি (দেবতারাও) অত্র (এই বিষয়ে) বিচিকিৎসিতম্ (সংশয়াকুল হয়েছিলেন) চ (এবং) মৃত্যো (হে মৃত্যু-অধিপতি) ত্বম্ (আপনি) যৎ (যেহেতু) ন সুজ্ঞেয়ম্ (দুর্বিজ্ঞেয়) আত্থ (বলছেন) [তখন] ত্বাদৃক্ অন্যঃ (আপনার মতো আর কেউ) অস্য (আত্মতত্ত্বের) বক্তা (উপদেষ্টা) চ (এবং) ন লভ্যঃ (পাওয়া যাবে না)। এতস্য (এর) তুল্যঃ (সমান) অন্যঃ কঃ চিৎ (অপর কোন) বরঃ (প্রার্থনা) ন (নেই)।

'দেবৈঃ অত্র অপি বিচিকিৎসিতং কিল'—শোনা যায় দেবতারাও এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন—'ত্বং চ মৃত্যো যৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ'—এবং হে যমরাজ, আপনিও বলছেন যে, এই আত্মতত্ত্ব সহজবোধ্য নয়। অথচ—'বক্তা চ অস্য ত্বাদৃক্ অন্যো ন লভ্যঃ'—এ বিষয়ে আপনার মতো উপদেষ্টাও পাওয়া যাবে না। অতএব আমি মনে করি—'ন অন্যো বরঃ তুল্যঃ এতস্য কশ্চিৎ'—এই বরের সদৃশ অন্য কোন বর নেই।

নচিকেতা যমকে বলছেন—আপনি যে এর পরিবর্তে অন্য বর চাইতে বলছেন কিন্তু আর কী চাইব? এর মতো অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অন্য কিছুই নেই। আমাকে এই বিষয়টি জানতেই হবে। আমি এ ছাড়া আর কিছু চাই না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত পৃথিবীতে বা স্বর্গে অপর কোন বস্তুই আমার কাম্য নয়। এই বলে নচিকেতা আগ্রহ দেখালেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলছেন—এর মতো আর জিজ্ঞাসা কিছু নেই কারণ এই আত্মজ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তিলাভ সম্ভব। নচিকেতা এখনো মুক্তির কথা

বলেননি, জিজ্ঞাসু হয়ে বলছেন। ভাষ্যকার ভাবপূরণ করে দিয়ে বলছেন যে, এটি হলো নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির হেতু। নিঃশ্রেয়স্ শব্দের অর্থ শুধু শ্রেয় নয়—'নিতরাং শ্রেয়ঃ'—পরম কল্যাণ। যাকে মুক্তি বলা হয়েছে তার প্রাপ্তির কারণ আত্মজ্ঞান। সুতরাং এই বরের তুল্য অন্য আর কিছু নেই। ভাষ্যকার বলছেন—'অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্বস্য এব'[১]—অন্য সব বরের ফল যখন অনিত্য তখন অন্য কোন বরই এই আত্মজ্ঞানের তুল্য হতে পারে না।

নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানতে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং কিছুতেই সেই সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না। যম নচিকেতার বিবেকবৈরাগ্য পরীক্ষার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন—

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥২৩॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতাকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য যম তাঁকে প্রলুব্ধ করছেন] শতায়ুষঃ (শতবর্ষজীবী) পুত্রপৌত্রান্ (পুত্রপৌত্রাদি) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। বহূন্ (অনেক) পশূন্ (গবাদি প্রাণী) হস্তি-হিরণ্যম্-অশ্বান্ (হাতি, সুবর্ণাদি ধন, অশ্বসমূহ) ভূমেঃ (পৃথিবীর) মহৎ আয়তনম্ (বিস্তীর্ণ অঞ্চল) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। স্বয়ম্ চ (এবং নিজেও) যাবৎ (যত) শরদঃ (বৎসর) ইচ্ছসি (চাও) জীব (জীবিত থাক)।

'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব'—শতবর্ষ আয়ুবিশিষ্ট পুত্র-পৌত্র প্রার্থনা কর। 'বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্'—বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ—যেসব ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আছে, যেসব ঐশ্বর্য মানুষ কামনা করে, সেগুলি তুমি প্রচুর পরিমাণে চাও। 'ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব'—এ পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্য চাও। যদি বল যে, এ সমস্ত ঐশ্বর্য ফেলে একদিন চলে যেতে হবে, দুদিনের জন্য ঐশ্বর্য নিয়ে কী করব তাহলে—'স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি'—তুমি নিজেও যত বছর ইচ্ছা বেঁচে থাক, সে বর আমি দিচ্ছি। কারণ আমি মৃত্যুর অধিপতি, যত দীর্ঘ পরমায়ু চাও দেব।

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৪॥

---

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—১/১/২২

অন্বয় ঃ—এতৎ তুল্যম্ (এর মতো) যদি বরম্ (অন্য কোন প্রার্থনা) মন্যসে (মনে হয়) [তাই] বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) চ (অথবা) বিত্তম্ (প্রভুত ধন) চিরজীবিকাম্ (দীর্ঘজীবন) [চাইতে পার]। নচিকেতঃ (নচিকেতা) ত্বম্ (তুমি) মহাভূমৌ (বিশাল ভূখণ্ডের অর্থাৎ সাম্রাজ্যের) এধি (অধিপতি হও) ত্বা (তোমাকে) কামানাম্ (দিব্য এবং পার্থিব যাবতীয় কাম্যবস্তুর) কামভাজম্ (ইচ্ছানুরূপ ভোগে সমর্থ) করোমি (করছি)।

'এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং'—যদি এর তুল্য অন্য কোন বর প্রার্থনীয় মনে কর তাও 'বৃণীষ্ব'—চাও। 'বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ'—জীবন এবং জীবনধারণের উপযোগী প্রভুত সম্পদও প্রার্থনা কর। 'মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি'—হে নচিকেতা, তুমি সুবিশাল রাজ্যের উপর আধিপত্য কর। 'কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি'—তোমাকে পার্থিব এবং স্বর্গীয় যাবতীয় কাম্যবস্তুর অধিপতি করছি। এ সবই যমরাজ দিতে পারেন কারণ তিনি সত্যসঙ্কল্প, ইচ্ছামাত্র যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। কাম্যবস্তুগুলি আরো বিস্তার করে পরের শ্লোকে বলছেন—

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫॥

অন্বয় ঃ—মর্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) যে যে কামাঃ (যে সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু) দুর্লভাঃ (দুষ্প্রাপ্য) [সেই] সর্বান্ (সমস্ত) কামান্ (কাম্যবস্তু) ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর)। ইমা (এই সমস্ত) [তোমার সামনে উপস্থিত] রামাঃ (সুন্দরী রমণীসকল) সরথাঃ (রথাসীন) [ও] সতূর্যাঃ (নানা বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত) ; ঈদৃশাঃ (এইরকম রমণীবৃন্দ) হি (নিশ্চিত) মনুষ্যৈঃ (সাধারণ মানুষের) ন লম্ভনীয়া (অনধিগম্যা)। মৎপ্রত্তাভিঃ (আমার দ্বারা প্রদত্ত) আভিঃ (এদের দ্বারা) পরিচারয়স্ব [নিজের] (সেবা করাও) ; নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) মরণম্ (মৃত্যু সম্বন্ধে) মা অনুপ্রাক্ষীঃ (অনুরূপ প্রশ্ন করো না)।

'যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে'—মনুষ্যলোকে যেসব কাম্যবস্তু দুর্লভ সেসব 'ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব'—ইচ্ছামতো প্রার্থনা কর। 'ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যাঃ'—রথারূঢ়, বাদ্যযন্ত্র সহকারে বর্তমান এই যে অপ্সরাগণ—'ন হি ঈদৃশা লম্ভনীয়াঃ মনুষ্যৈঃ'—এদের মতো ভোগের বস্তু মনুষ্যলোকে লভ্য নয়। প্রলোভনের বস্তুগুলি যেন সামনে ধরে দিচ্ছেন। 'আভিঃ মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব'—আমার প্রদত্ত এদের দিয়ে তোমার পরিচর্যা করাও। 'নচিকেতো মরণং মা অনুপ্রাক্ষীঃ'—হে নচিকেতা, মরণ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করো না।

ছেলে যখন কাঁদে, দুরন্তপনা করে, মা খেলনা দেন। ছোট হলে চুষিকাঠি, বড় হলে আরো কত কী দেন! এখানে মনে রাখতে হবে যে, যমরাজ যা দিতে চাইছেন সে সবই খেলনা, যা দিয়ে নচিকেতাকে ভোলাবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে এ খেলনা সুলভ নয়। বিশাল রাজ্য, জগতের সমুদয় ঐশ্বর্য—সব সামনে ফেলে দিয়ে বলছেন, সব তুমি নাও, ভোগ কর। বাইবেলে আছে—ভগবান যীশু চল্লিশদিন উপবাসী থেকে সাধনা যখন শেষ করছেন তখন শয়তান এসে তাঁকে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দেখিয়ে বলছে, এ সবই তোমাকে দেব যদি তুমি আমার ভজনা কর।[১] যমরাজও সমস্ত ভোগ্যবস্তু নচিকেতার সামনে যেন ধরে দিচ্ছেন, 'ইমা রামাঃ' বলে। নচিকেতাকে একেবারে চরম পরীক্ষায় ফেলছেন। নচিকেতা এত প্রলোভনেও বিচলিত না হয়ে বলছেন, আমি বিচার করে দেখেছি যে, আপনি যা দিতে চাইছেন তা নশ্বর, অতএব ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥২৬॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতার উত্তর] অন্তক (হে সর্ববিনাশক) শ্বোভাবাঃ (শ্বঃ—আগামীকাল পর্যন্ত ভাবাঃ—থাকবে কি না অর্থাৎ অনিশ্চিত অস্তিত্ববিশিষ্ট [ভোগ্যবস্তুসমূহ]) মর্ত্যস্য (মরণশীল জীবের) সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সমূহের) যৎ এতৎ তেজঃ (এই যে শক্তি) [তাকে] জরয়ন্তি (ক্ষয় করে) অপি (উপরন্তু) সর্বম্ জীবিতম্ এব ([হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ] সকলের জীবনই) অল্পম্ (ক্ষণস্থায়ী), বাহাঃ (রথাদি) তব এব (আপনারই) [থাকুক] নৃত্যগীতে (নৃত্যগীতাদিও) তব (আপনার থাক)।

'অন্তক'—হে যমরাজ, আপনি যে পুত্র, পৌত্র, বিশাল সাম্রাজ্য, অপ্সরাদি আমাকে দিতে চাইছেন সে সবই—'শ্বোভাবাঃ'—আগামীকাল থাকবে কিনা সন্দেহ। অতিনশ্বরতা বোঝাবার জন্য 'শ্বোভাবাঃ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর কার ভোগ্য এগুলি? 'মর্তস্য'—যে মানুষ নিজে মরণশীল, তার। ঐশ্বর্যগুলি থাকবে না আর যাকে দেবে সেও নশ্বর। তাছাড়া—'সর্বেন্দ্রিয়াণাং যৎ এতৎ তেজঃ জরয়ন্তি'—এরা মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে জীর্ণ করে। তাই ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ভোগ করে সুখে থাকব সে আশাও নেই।

প্রথমত ভোগ্যবস্তুগুলি নশ্বর, দ্বিতীয়ত ভোক্তা নশ্বর, তৃতীয়ত ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের তেজবীর্য ক্ষয় হয়ে যায়। আর যমরাজ যে বলছেন দীর্ঘ জীবন

---

১. The Bible, Mathew—4 : 2, 8-9

দেবেন, তার উত্তরে নচিকেতা বলছেন—'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব'—জীবন যত দীর্ঘই হোক, অনন্ত কালের তুলনায় তা স্বল্পই। তার একটা সীমা আছে। সোনার পাথরবাটির মতো অক্ষয় জীবন হয় না। মানুষের জীবন অনন্ত হতে পারে না। আমাদের পরমায়ু পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, বড় জোর একশ বছর। কিন্তু অনন্ত কালের তুলনায় তা-ই বা কতটুকু! অতএব—'তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে'—অশ্বরথাদি বাহন, অপ্সরাদির নৃত্যগীত, এসব আপনারই থাক, আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বুঝেছি এতে আমার আনন্দ নেই। এই কথাই পরের মন্ত্রে বিস্তার করে বলছেন—

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭॥

অন্বয় ঃ—মনুষ্যঃ (মানুষ) বিত্তেন (ধনসম্পদের দ্বারা) ন তর্পণীয়ঃ (পরিতৃপ্ত হয় না) ত্বা (আপনাকে) চেৎ (যদি) অদ্রাক্ষ্ম (দেখে থাকি) বিত্তম্ (ধনাদি) লপ্স্যামহে (লাভ করব) যাবৎ (যতদিন) ত্বম্ (আপনি) ঈশিষ্যসি (শাসন করবেন) [ততদিন] জীবিষ্যামঃ (জীবিত থাকব)। তু (পরন্তু) সঃ (পূর্বোক্ত সেই) বরঃ এব (বরই) মে (আমার) বরণীয়ঃ (কাম্য)।

'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো'—বিত্ত, ঐশ্বর্য দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারি। ধনদৌলত পেয়ে কে কবে সন্তুষ্ট হয়েছে? ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দুঃখকে বরণ করে নিতে হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সুখ আসে দুঃখের মুকুট মাথায় পরে, তাকে নিলে তার মাথার মুকুটটিকেও নিতে হবে।[১] এর থেকে রেহাই নেই। দেখা গিয়েছে বিত্তের দ্বারা অর্জিত সুখ ক্ষণস্থায়ী। ঐশ্বর্য প্রচুর পরিমাণে হলেও তখন মনে হবে যে, আর একজনেরও তো এরকম ঐশ্বর্য আছে। তৃপ্তি কিছুতেই নেই। আর যদি আমার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী কেউ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। আরো যদি এই কথা মনে ওঠে যে, ঐশ্বর্য চিরকাল থাকবে না অথবা আমিও চিরকাল বেঁচে থাকব না, তাহলে ভোগের সব আনন্দ চলে গেল। আরো বলছেন—'লপ্স্যামহে বিত্তম্ অদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা'—আপনি একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা আর আমি যখন আপনাকে দেখেছি তখন যতদিন আপনি যমের পদে অধিষ্ঠিত আছেন ততদিন বিত্ত ও দীর্ঘজীবন না চাইলেও আমি পাব—"জীবিষ্যামঃ

---

১. The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, Calcutta, 12th reprint (1985), Vol. V, P. 419.

যাবৎ ঈশিষ্যসি ত্বম্'। আপনার দর্শনলাভের ফলে এই আমার মস্ত লাভ হয়েছে। নচিকেতা হিসাবী ছেলের মতো কথা বলছেন। 'বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব'— অতএব সেই যে আত্মজ্ঞান আমি চেয়েছি সেই বরই আমার প্রার্থনীয়।

নিজের মনের বিচারকে স্পষ্টতর করে আরো বলছেন—

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৮॥

অন্বয় ঃ—ক্বধঃস্থঃ (কু+অধঃ+স্থঃ, অধঃ—[দ্যুলোকের] নিম্নে, কু—পৃথিবীতে, স্থঃ—অবস্থিত) কঃ (কোন্) জীর্যন্ মর্ত্যঃ (জরামরণশীল ব্যক্তি) অজীর্যতাম্ (জরারহিত) অমৃতানাম্ (দেবতাদের) উপ-ইত্য (নিকটে উপস্থিত হয়ে) প্রজানন্ ([পুরুষার্থ সম্বন্ধে] প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে) [এবং] বর্ণ-রতি-প্রমোদান্ (শারীরিক শোভা-সৌন্দর্য, ক্রীড়াবিশেষ, বিবিধ আমোদ-আহ্লাদ) অভিধ্যায়ন্ [অনিত্যরূপে] (বিশেষভাবে মননপূর্বক) অতিদীর্ঘে জীবিতে (দীর্ঘ জীবনে) রমেত (আনন্দ পায়)?

'অজীর্যতাম্ অমৃতানাম্ উপেত্য'—জরামৃত্যুহীন দেবতাদের সান্নিধ্য লাভ করে—'জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃ স্থঃ প্রজানন্'—স্বর্গাদির অধোভাগে অবস্থিত এই পৃথিবীর অধিবাসী জরামরণশীল মানুষ দেবতাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি সম্ভব জেনে অর্থাৎ অন্যান্য ভাল জিনিস পাওয়া যেতে পারে বুঝে—'অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্'—অপ্সরাদির রূপ, তাদের সঙ্গে ক্রীড়াজনিত সুখ যে অনিত্য ও দুঃখপ্রদ তা সম্যকরূপে বিচার করে—'অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত'—অতিদীর্ঘ জীবনে কে আনন্দিত হবে?

আমরা ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে বিচার করে দেখি না যে এগুলি বাস্তবিক আমাদের কতটুকু সুখ দিতে পারে। প্রকৃত বিচারশীল মানুষের এতে মন উঠবে না, দীর্ঘ জীবন পেলেও নয়। ভোগ্যবস্তুগুলি যে শুধু নশ্বর তা-ই নয়, সেগুলি তুচ্ছও এবং পরমতত্ত্বকে ভুলিয়ে রাখে। ছোট ছেলেকে খেলনা দিয়ে ভোলানো যায় ; কিন্তু যে বিচারশীল, যার মন জাগ্রত, বিষয়গুলির মূল্য যে হিসাব করে দেখতে শিখেছে, চাকচিক্যে মুগ্ধ নয়, তার কাছে সেগুলি তুচ্ছ বোধ হবে। খুব রঙচঙে একটা চুষিকাঠি দিলে ছোট ছেলে সোনার গয়নাও হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু নচিকেতা সেইরকম শিশু নন, নির্বোধ নন। তিনি বস্তুগুলিকে বিচার করে দেখেছেন। যমরাজ যা দিতে চাইছেন সেগুলির মূল্য তিনি হিসাব করে দেখেছেন। তারপরে বলছেন—

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৯॥

অন্বয় ঃ—মৃত্যো (হে যম)। যস্মিন্ (যাতে [যে আত্মার বিষয়ে]) [লোকাঃ (সাধারণ মানুষ)] ইদম্ বিচিকিৎসন্তি (এরূপ সংশয় করে থাকে) যৎ [চ] ([এবং] যে [আত্মতত্ত্বের নির্ণয়]) সাম্পরায়ে (পরলোক সম্বন্ধী) মহতি (মহৎ প্রয়োজনের নিমিত্ত) তৎ নঃ ব্রূহি (তা আমাদের বলুন।)

শ্রুতি বললেন—যঃ (যে) অয়ম্ (এই) বরঃ (বর) গূঢ়ম্ (গহনে, গভীরে প্রবিষ্ট) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করেছে) তস্মাৎ (তার থেকে ভিন্ন) অন্যম্ (অন্য কিছু) নচিকেতাঃ (নচিকেতা) ন বৃণীতে (চায় না)।

'মৃত্যো'—হে যমরাজ, 'যস্মিন্ ইদং বিচিকিৎসন্তি'—কারো মৃত্যু হলে যে একটা সংশয় থাকে যে, আত্মা আছে অথবা নেই—'যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নঃ তৎ'—মহতি অর্থাৎ মহৎ প্রয়োজনের নিমিত্তভূত অর্থাৎ মুক্তির হেতুভূত সেই পরলোকবিষয়ক আত্মজ্ঞান আপনি আমাকে উপদেশ করুন। নচিকেতা আগেও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রশ্ন তুলেছেন, এখানেও সেই একই কথা বলছেন। তাই পরলোকবিষয়ক আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন ; নতুবা শুধু আত্মজ্ঞান বললেই হতো।

মন্ত্রটির শেষার্ধে বলছেন, 'যঃ অয়ং বরঃ গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঃ'—এই সেই বর, যা গহনে প্রবিষ্ট, যেন পর্বত-গহ্বরের মধ্যে লুকানো অর্থাৎ গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয়, 'ন অন্যং তস্মাৎ নচিকেতা বৃণীতে'—নচিকেতা তা ছাড়া অনিত্য বস্তু কিছু চায় না, এটি যেন শ্রুতির বাক্য।

মানুষ যখন নিত্যবস্তু ব্যতীত অনিত্য কিছু চায় না তখন কিছুতেই তার আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করা যায় না। নচিকেতাকে ভোলাবার মতো আর কোন বস্তু যমের কাছে নেই। যা কিছু ছিল—ঐশ্বর্য, দীর্ঘ জীবন ইত্যাদি সব দিয়ে তিনি প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছেন এবং যে তত্ত্ব নচিকেতা জানতে চাইছেন তার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ নচিকেতার যে আত্মজ্ঞান নাও হতে পারে এরকম ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ভোলেননি। তিনি বুঝেছেন চাইবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো এই আত্মজ্ঞান। এর তুল্য দ্বিতীয় বস্তু কিছু নেই। নচিকেতা সেই আত্মজ্ঞানই চাইছেন। একথা বলে শ্রুতি এখানে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর উপসংহার করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

যমরাজ চেষ্টা করেছেন নচিকেতা যাতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ পরিত্যাগ করে তাঁর কাছ থেকে অন্য কোন বিষয় বররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু নচিকেতা বিভ্রান্ত হবার পাত্র নন। 'আমি ঐ আত্মতত্ত্বই চাই এবং আত্মতত্ত্বের তুলনায় অন্য সমস্ত বিষয় অকিঞ্চিৎকর'—তাঁর এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল। নচিকেতাকে যম বহু প্রকারে পরীক্ষা করেছেন, সে সব পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ। যখন কিছুতেই তাঁকে প্রলোভিত করা গেল না তখন যমরাজ বুঝলেন নচিকেতা যোগ্য অধিকারী। পরে তাঁর প্রশংসা করে তিনি বলেছেন—'আমার যেন তোমার মতো প্রশ্নকর্তা হয়' (১।২।৯) অর্থাৎ শিষ্য যদি পেতে হয়, তবে যেন নচিকেতার মতো শিষ্য পান। শিষ্য সম্পর্কে গুরুর এর চেয়ে বড় প্রশংসাবাক্য আর কী হতে পারে?

অতঃপর যমরাজ নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। গোড়াতেই কিন্তু আত্মতত্ত্বের কথা না বলে প্রথমে তার ভূমিকা হিসাবে তিনি বলছেন যে, জগতে দুটি বিষয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে—একটি প্রেয়, অপরটি শ্রেয়। যা আপাতমধুর বিষয় তা প্রেয়, আর যা পরিণামে রমণীয় তাই শ্রেয়। প্রেয়কে পরিত্যাগ করে শ্রেয়কে সর্বান্তঃকরণে বরণ না করলে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান লাভ করবার এটা পূর্ব শর্ত।

কেবল বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্ব বোঝা যাবে না। কেউ যদি বুদ্ধিমান হয়, সে যুক্তির সাহায্যে অপরের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে। এমন যুক্তি নেই যার খণ্ডন হতে পারে না। সুতরাং শুধু যুক্তির সাহায্যে কাউকে আত্মতত্ত্ব বোঝানো যায় না। যদি যেত তাহলে এককথায় বলে দিলেই হতো যে, আত্মা এই। আত্মতত্ত্বকে ধারণার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রথমে প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করতে হবে।

আত্মজ্ঞান এরকম দুরূহ কেন? না, আমাদের মন যতক্ষণ বিষয়াসক্ত থাকে ততক্ষণ আত্মতত্ত্বের ধারণা করা যায় না। যেমন কথামৃতে আছে মাস্টারমশায় বলছেন, 'এ কি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাব!'[১] এখানেও ঐ কথা। আত্মতত্ত্ব কি সাহিত্য, না গণিত, না ঐরকম একটা কিছু যে, বুদ্ধির সাহায্যে বোঝানো যাবে? প্রশ্ন হতে পারে, যদি বুদ্ধির সাহায্যে বোঝানো না যায় তাহলে বোঝাবার অন্য উপায় কী আছে? যমরাজ তো অলৌকিক

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৯৩), পৃঃ ১৯

উপায় কিছু অবলম্বন করেননি, কোনরকম যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেননি। বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছেন, মানুষ যেভাবে বোঝে এবং বোঝায় তাই করেছেন। ঠিক কথা, কিন্তু লক্ষণীয় যে, যমরাজ আত্মজ্ঞ এবং নচিকেতা প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে অবলম্বন করার যোগ্য অধিকারীও বটে। আত্মজ্ঞানলাভের দুটি শর্তই এখানে পূর্ণ হয়েছে।

আবার প্রশ্ন হতে পারে, যখন কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত পড়তে যায় তখন অধ্যাপক তো বলেন না যে, আগে প্রেয়কে ত্যাগ করে এস তবে পড়াব। তিনি যা বলেন তার দ্বারা কি বেদান্ত বোঝানো যায় না? এ প্রশ্নের দুটি উত্তর—যায় এবং যায় না। বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বোঝাবার তিনি ততটুকুই বোঝান, কিন্তু শুধু বুদ্ধির দ্বারা বেদান্তের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। বেদান্তের পুঁথিগত তত্ত্ব শুনে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? না, তত্ত্বকে জেনে সমস্ত অনাত্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। এই বন্ধনমুক্তি, শাস্ত্রে যাকে অজ্ঞানের নিবৃত্তি বলা হয়েছে, তা হতে হলে তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি চাই। যে জ্ঞান বুদ্ধিগম্য, যা প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্জিত নয়, তাকে বলা হয় পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান হলে প্রত্যক্ষ যে অজ্ঞান তা দূর হয় না। এটি পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে যে, অজ্ঞান প্রত্যক্ষ। সাক্ষাৎভাবে অজ্ঞান অনুভব করছি, যুক্তির সাহায্যে নয়। এই সাক্ষাৎভাবে অনুভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অজ্ঞানকে দূর করতে হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই। অন্য কোন উপায়ে প্রত্যক্ষ অজ্ঞান দূর হয় না। অধ্যাপক অধ্যাপনা করে যা বোঝাচ্ছেন তা শুনে পরোক্ষ জ্ঞান হবে, অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না। বেদান্তের ভাল অধ্যাপক, ভাল বক্তা—যুক্তি, বুদ্ধির দ্বারা বেদান্ত বুঝিয়ে দেবেন। শুনে মনে হবে যা বলেছেন খাঁটি কথা, এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু মনে হবে, সবই তো বললেন কিন্তু—'কিন্তু'-টি রয়েই গেল। অর্থাৎ সব কথাই বলা হলো কিন্তু সংশয় যাচ্ছে না, অসংশয়িত জ্ঞান হচ্ছে না। মনে কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে, যে খটকাকে হয়তো পরিষ্কার করে ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যাচ্ছে না। এইজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তত্ত্বকে পরোক্ষভাবে জানলে কাজ হবে না, অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এখানে শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম কথা আছে। পরোক্ষ জ্ঞান কাকে বলে? যা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূত নয়। যেমন একটা শহরের কথা শুনলাম বা বইতে পড়লাম, এটা পরোক্ষ জ্ঞান। আবার অনুমানাদির দ্বারাও যে জ্ঞান হয়, তাও পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান কখনো পরোক্ষ হয় না। আত্মাকে জানে না, তাঁকে অনুভব করছে না এমন কোন ব্যক্তি নেই। যে যত জড়বুদ্ধিই হোক কেউ মনে করে না আমি নেই। সুতরাং আমার সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান সে জ্ঞান কখনো পরোক্ষ হয় না। তাহলে আত্মার সম্বন্ধে পরোক্ষ আর অপরোক্ষ জ্ঞান, এই দুটি বিভাগ কেমন করে হতে পারে? হতে পারে এইভাবে

যে, সাধারণ মানুষের আত্মা সম্বন্ধে শব্দ থেকে যে জ্ঞান হচ্ছে তা অসন্দিগ্ধ, অবিপর্যস্ত নয়। সংশয়-বিপর্যয়-রহিত জ্ঞান হচ্ছে না। সংশয় রয়েছে—আত্মা কি এমন, না অন্যরকম? বিপর্যয় রয়েছে—আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা বলে মনে করছি। যে জ্ঞানে সংশয়-বিপর্যয় আছে সে জ্ঞানকে কার্যত পরোক্ষ জ্ঞানই বলতে হবে। বুদ্ধির সাহায্যে যতই আমাকে বোঝানো যাক যে, আমি কর্তা, ভোক্তা নই, তবু প্রতি পদে আমার মনে হচ্ছে আমি কর্তা, ভোক্তা। হাজার বার 'আত্মা জ্ঞানস্বরূপ' বললেও আমি সর্বদা অনুভব করছি যে, আমি অজ্ঞ। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুভূত এই অজ্ঞানকে যতই যুক্তির সাহায্যে মিথ্যা প্রমাণিত করা হোক তা কিছুতেই দূর হবে না। অতএব বন্ধনমুক্তিও হবে না।

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধনমুক্তি, সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি। আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করছি এইজন্য। 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'[১]—আত্মাকে যিনি জানেন তিনি শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। উপনিষদ্ পাঠের উদ্দেশ্য এই। নতুবা কতকগুলি শব্দ জেনে কিছু লাভ নেই। শব্দগুলিকে সুবিন্যস্তভাবে বলে অপরকে মোহিত করাও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো কী করে আমরা অজ্ঞানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে। আমাদের প্রয়োজন কি সে সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। বেদান্ত অধ্যয়ন 'কাকদন্ত-পরীক্ষা'[২] নয়। কাকের দাঁত নেই তবু যদি কেউ তার দাঁত দেখতে চায় সে কাজটা নিষ্ফল হয়। বেদান্তের অন্বেষণ সেরকম নিষ্ফল, ব্যর্থ নয়। এ অন্বেষণের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। অজ্ঞান-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সেই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে বেদান্ত পাঠ নিষ্ফল হবে। তাতে আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি হবে না। আমরা সেরকম বেদান্ত চাই না। কাজেই আসল বেদান্তজ্ঞান লাভ করতে হলে যে জ্ঞান অসন্দিগ্ধ এবং অবিপর্যস্ত, অসম্ভাবনা-বিপরীত-ভাবনা-রহিত, সেই জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ, কেবল তার দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। তাই যমরাজ প্রথমেই বললেন যে, এইরকম জ্ঞান লাভ করতে হলে একটি মাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করা।

জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা গেলেও অধিকাংশ মানুষই প্রেয়কে চায়। প্রেয় অর্থাৎ ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি। স্বর্গাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব অনিত্য সুখ, জন্য বা উৎপাদ্য সুখ—যা উৎপন্ন করা যায়, যা কর্মের দ্বারা লাভ করতে হয়। এইরকম সুখই মানুষের কাম্য, আবার দুঃখের পরিহারও তার কাম্য। ইহজগতের মতো পরজগতেও আমরা সুখ চাই এবং তার সঙ্গে যে দুঃখ মিশ্রিত আছে তা চাই না। জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ইহলোকে ও পরলোকে সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহারের সন্ধানে মানুষের

---

১. ছান্দোগ্য—৭।১।৩

২. মীমাংসা দর্শন—৬।২।১, শাবরভাষ্যের উপর টুপ্‌টীকা দ্রষ্টব্য।

বিরামহীন অন্বেষণ চলেছে। এই সুখের প্রাপ্তি বা দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তারা এমন ব্যাকুল যে, অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। প্রেয় তাদের পেয়ে বসেছে।

আপাতদৃষ্টিতে যেখানে আমরা মনে করি প্রেয়ের অন্বেষণ নয়—যেমন ঐতিহাসিকের বা বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ—সেখানেও, সাক্ষাৎভাবে দেখা না গেলেও গৌণভাবে, প্রেয়েরই অন্বেষণ রয়েছে। ভিতরে একটু অভিমান আছে যে, বড় বৈজ্ঞানিকরূপে আমি একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করব, বড় দার্শনিক বা বড় ঐতিহাসিক হিসাবে একটা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করব। সেই প্রতিষ্ঠা অপর সকলকে বিস্মিত করবে, এইরকম একটা আকাঙ্ক্ষা ভিতরে থেকেই যায়। আমরা মনে করি নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে অন্বেষণ করছি। সুতরাং এক কথায় প্রেয়কে নিয়ে সবাই ব্যাপৃত।

আর একদল আছেন যাঁরা বলেন, এর একটু ওর একটু মিলিয়ে মিশিয়ে নিলেই তো হয়। জগতের সুখ দুঃখ তো দেখতেই হবে, তার সঙ্গে আত্মজ্ঞান একটু যুক্ত করলে মন্দ হয় না। চিত্রটা সম্পূর্ণ হয়। এরকম ভাব মনে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—গৃহিণীর সারা দুনিয়া থেকে সংগৃহীত নানারকমের আসবাব আছে, কিন্তু এখন ফ্যাশন জাপানি কোন জিনিস ঘরে রাখা, তাই তিনি একটি জাপানি ফুলদানি কিনে ঘরে রাখলেন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এইরকম। ভোগের জন্য তাদের সবরকমের জিনিস আছে কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না থাকায় জীবন যেন ঠিকভাবে চলছে না।[১]

সবরকমের ভোগের উপকরণ আমার প্রয়োজন, তারই সঙ্গে ধর্মের একটা ফুলদানি থাকলে মন্দ হয় না, এই মনোভাব অনেকেরই আছে। তাঁরা ধর্মকে জীবনের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে চান। বলেন, এ-ও কর, ও-ও কর, বাড়াবাড়ি কোনটারই ভাল নয়। 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্'—সংস্কৃত করে বলে দিলে আর কথা নেই। সুতরাং জাগতিক সুখ যা আছে তা ভোগ করতে হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও করতে হবে। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকটা অক্ষুণ্ণ রেখে তারপর ওদিকটা অর্থাৎ ধর্মটা একটু হোক তাতে আপত্তি নেই, ভালই হবে।

এছাড়া আর একটি থাকের মানুষ আছেন যাঁরা বলেন, এতেও হবে না। আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ এমন কঠিন ব্যাপার যে, সেখানে কোনরকমেই মনের ভাগাভাগি করে নেওয়া সম্ভব নয়। পুরো মনটি সেদিকে দিতে হবে। আর তার জন্য অন্য সব ছাড়তে হবে। এরকম ব্যক্তি বিরল। আমরা দেখব এই উপনিষদেই বলা হয়েছে, এমন লোক খুব কম। অধিকাংশ মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগকেই চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে। আর বুদ্ধিমান কিছু লোক মনে করছে, তা করলে সর্বনাশ—মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি বিশৃঙ্খলা হবে।

---

১. বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৯৩), পৃঃ ১৩১

সেজন্য ধর্মের একটু প্রলেপ দিলে ভাল হয়, যাকে বলে thin veneer—উপর উপর একটা হালকা প্রলেপ থাক। বেশি হলে গোলমাল। ভোগের উপর ধর্মের যৎসামান্য প্রলেপ দিলে ভাল—এরকম বলেন। সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ তাঁদের কল্পনাতীত। অতি বিরল কিছু মানুষই ভোগাসক্তি বর্জন করে ধর্মলাভের জন্য পুরো মন দিতে প্রস্তুত। নচিকেতা সেই রকম দুর্লভ অধিকারী, নচিকেতা পথে ঘাটে মেলে না, কারণ তিনি আত্মতত্ত্বের জন্য অসাধারণ মূল্য দিতে প্রস্তুত। এই কথাগুলি মনে রেখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নচিকেতাকে যমরাজ কী বলছেন, তা দেখা যাক।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১॥

অন্বয় ঃ—শ্রেয়ঃ (অমৃতত্বলাভের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) অন্যৎ (অবিদ্যা থেকে ভিন্ন) উত (এবং) প্রেয়ঃ (জাগতিক অভ্যুদয়-প্রাপ্তির সাধন অপরা বিদ্যা) অন্যৎ এব (নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যা থেকে ভিন্ন)। তে উভে (সেই বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই) নানার্থে (পৃথক পৃথক ফললাভের উদ্দেশ্যে) পুরুষম্ (মানুষকে) সিনীতঃ (আবদ্ধ করে)। তয়োঃ (সেই শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যা) আদদানস্য (গ্রহণকারীর) সাধু (মঙ্গল) ভবতি (হয়)। য উ (কিন্তু যে) প্রেয়ঃ (পার্থিব ভোগবাসনাকে) বৃণীতে (বরণ করে) [সে] হীয়তে অর্থাৎ ([প্রকৃত পুরুষার্থ থেকে] ভ্রষ্ট হয়)।

'অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ উত এব প্রেয়ঃ'—শ্রেয় অর্থাৎ পরমকল্যাণময় আত্মজ্ঞান অবিদ্যা থেকে ভিন্ন, প্রেয় অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি, ব্রহ্মবিদ্যা থেকে পৃথক। 'তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ'—এরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে বদ্ধ করে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী চেষ্টায় প্রবৃত্ত করে। শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, প্রেয়ের প্রয়োজন অভ্যুদয়লাভ, উভয়ের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে মানুষ যথাযথ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের প্রবৃত্তি শ্রেয়ের জন্যও হতে পারে, প্রেয়ের জন্যও হতে পারে। তবে—'তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি'—উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয়। আর—'হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে'—যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হন।

সোজা কথা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ দুটি জিনিস চাইছে। তার মধ্যে বেশির ভাগ লোকের দৃষ্টি প্রেয়ের দিকে, আর শ্রেয়ের প্রতি লক্ষ্য মুষ্টিমেয় দু-চারজন মানুষের। প্রেয়কে বরণকারী জীবনের প্রয়োজন থেকে ভ্রষ্ট হন—একথা বলছেন কেন? ভোগের অন্বেষণ করলে ভোগ তো পাওয়া যায়।

তার উত্তর, প্রেয়ের অন্বেষণ জীবনের সার্থকতা দিতে পারে না। কিছু আনন্দের ছিটে-ফোঁটা আমরা তা থেকে পাই। দুঃখ-নিবৃত্তির অক্লান্ত চেষ্টা করে কখনো কখনো দুঃখের লাঘবও কিছু হয়। কিন্তু তাতে আমাদের হৃদয়ের গভীরে পরমপ্রাপ্তির যে গোপন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা মেটে না। এইজন্য বলছেন প্রেয়কে গ্রহণ করলে জীবনের মূল লক্ষ্য আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষলাভ থেকে বিচ্যুত হয়, পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয়, কারণ তাঁর আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। অভ্যুদয়ের সাধন অপরা-বিদ্যাকে পরিত্যাগ করে নিঃশ্রেয়স্-সাধন ব্রহ্মবিদ্যাকে গ্রহণ করায় তিনি সার্থকতা লাভ করেন।

নচিকেতা তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তবু তাঁকে তাঁর স্থানে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যম একথা বললেন। যাতে ভবিষ্যতে তাঁর মনে কোন সন্দেহ না ওঠে, মন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। সেই উদ্দেশ্যে সাবধান করে দিচ্ছেন—এই কথাগুলি সবসময় তোমার মনে রাখতে হবে।

তার পরের কথা—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥২॥

অন্বয় ঃ—শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়েই) মনুষ্যম্ এতঃ (মানুষের নিকট উপস্থিত হয়) ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) তৌ (উভয়কেই) সম্পরীত্য (ভালভাবে বিচার করে) বিবিনক্তি (পরস্পরের পার্থক্য নির্ধারণ করেন) ধীরঃ (ধৈর্যশীল প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) প্রেয়সঃ (ভোগৈশ্বর্যরূপ কাম্যবস্তু থেকে) শ্রেয়ঃ হি (মোক্ষসাধন ব্রহ্মবিদ্যাকেই) অভি বৃণীতে (নিশ্চিত-রূপে গ্রহণ করেন)। মন্দঃ (অবিবেকী ব্যক্তি) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণরূপ ক্ষেমের জন্য) প্রেয়ঃ (অপরা-বিদ্যাকে) বৃণীতে (আশ্রয় করে)।

'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যম্ এতঃ'—শ্রেয় এবং প্রেয় এ দুটি মানুষের কাছে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এ দুটিই মানুষের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা রূপে রয়েছে, দুটিকেই সে চায়। দুটি যেন পরস্পর মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। আমরা যে তিনটি থাকের মানুষের কথা বলেছি তাঁদের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় থাকের মানুষ তাঁরা বলেন—এর-ও খানিকটা হোক, ওর-ও খানিকটা হোক। যমরাজ তাঁদের কথা এখানে বলছেন না। শ্রেয় আর প্রেয়কে মিশিয়ে নিতে বলছেন না। বলছেন, শ্রেয় আর প্রেয় মিশ্রিত হয়েই যেন আমাদের কাছে আসে। এই আপাত মিশ্রণের ভিতরে কতখানি শ্রেয়ের ভাগ আর কতখানি প্রেয়ের ভাগ তা আমরা হিসাব করতে, বিচার করতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি সেরকম শুদ্ধ নয়। বুদ্ধি সূক্ষ্ম হলেই হবে না। বুদ্ধি যদি শুদ্ধ, নির্মল না হয়, বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকে,

তাহলে শ্রেয় এবং প্রেয়কে পৃথক করা যায় না। প্রেয়কেই কখনো শ্রেয় মনে হবে। আমরা সুখ চাই কিন্তু কোন্ সুখটি কাম্য ভেবে দেখি না। নিত্য এবং অনিত্য সুখের পার্থক্য বিচার করে, অনিত্যকে পরিহার করে নিত্য সুখকে চাইব এরকম মনোভাব আমাদের প্রায়ই থাকে না। কিন্তু—'ধীরঃ'—ধীমান, বিচারশীল, বিবেকী ব্যক্তি—'তৌ'—সে দুটিকে, প্রেয় ও শ্রেয়কে—'সম্পরীত্য'—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে—'বিবিনক্তি'—পৃথক করেন। ধীর ব্যক্তি নিত্য-সুখ আর অনিত্য-সুখ, এই দুটিকে পৃথক করে নিয়ে—'শ্রেয়ঃ প্রেয়সো অভিবৃণীতে'—প্রেয় থেকে শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করেন। দুটিকে আলাদা করে না নিলে কোন্‌টিকে গ্রহণ আর কোন্‌টিকে ত্যাগ করব, বোঝা যায় না। কাজেই আগে বিশ্লেষণ, বিচার করে তাদের পৃথক করে নিতে হয়। পৃথক করার পর ধীর ব্যক্তি দেখেন যে, শ্রেয়ই কল্যাণপ্রদ। তাই তিনি প্রেয়কে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সকলেই তা পারে না, যাঁরা বুদ্ধিমান, বিবেকী—বিবেকী শব্দের অর্থই হচ্ছে পৃথক-করণে সামর্থ্যবান—তাঁরাই পারেন। আর—'মন্দঃ'—অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তি বিচারের দ্বারা শ্রেয় আর প্রেয়কে পৃথক করতে পারে না। শ্রেয়ই একমাত্র কল্যাণের পথ তা বুঝতে না পেরে সে—'প্রেয়ঃ বৃণীতে'—প্রেয়কে বরণ করে। কেন করে?—'যোগ-ক্ষেমাদ্'—যোগ এবং ক্ষেমের জন্য। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তির নাম 'যোগ' আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের নাম 'ক্ষেম'। এই যোগ আর ক্ষেমের জন্য সে পরম কল্যাণকে ছেড়ে অকল্যাণকে গ্রহণ করে। কারণ সে অবিবেকী, পৃথক-করণে সামর্থ্যহীন বলে শ্রেয়ের দিকে দৃষ্টি দেয় না, প্রেয়কে বরণ করে নেয়।

এইভাবে শ্রেয় এবং প্রেয় যে একটি অপরটির বিপরীত, একটিতে কল্যাণের প্রাপ্তি আর একটিতে হানি, উভয়ের মধ্যে এইরকম স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে যমরাজ নচিকেতার প্রশংসা করে বলছেন—

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩॥

অন্বয় ঃ—নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), স ত্বম্ ([যে বারংবার আমার দ্বারা প্রলোভিত হওয়া সত্ত্বেও অবিচলিত চিত্ত] সেই তুমি) প্রিয়ান্ (প্রিয়পাত্রসমূহের) চ (এবং) প্রিয়রূপান্ কামান্ (প্রীতিপ্রদ কাম্য পদার্থসমূহের) অভিধ্যায়ন্ ([অসারতা, অনিত্যতা] বিশেষভাবে চিন্তা করে) অত্যস্রাক্ষীঃ ([তাদের] সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছ)। এতাম্ বিত্তময়ীম্ (এই ধনৈশ্বর্যদায়ক) সৃঙ্কাম্ (সংসার-মার্গ) যস্যাম্ (যাতে) বহবঃ (অনেক) মনুষ্যাঃ (ব্যক্তিই) মজ্জন্তি (মগ্ন হয়, আসক্ত হয়) [তা] ন অবাপ্তঃ (গ্রহণ করনি)।

নচিকেতঃ'—হে নচিকেতা—'স ত্বং'—সেই তুমি, যাকে আমি বারংবার প্রলোভিত করেছিলাম। 'প্রিয়াং প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্'—প্রিয় এবং প্রিয়রূপ ভোগ্যবস্তুসমূহ। দেহটি স্বতঃপ্রিয়, দেহ ও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যারা অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি, তারা হলো প্রিয়। কারণ, দেহে 'আমি' বোধ আছে। আর স্ত্রীপুত্রাদিতেও গভীর মমত্ববোধ আছে বলে তারাও স্বভাবতই প্রিয়। প্রিয়রূপ হলো—যারা প্রীতিপ্রদ, গৌণভাবে আনন্দদানকারী, যেমন অপ্সরা প্রভৃতি। আগন্তুক অপ্সরাদিতে 'আমি' বুদ্ধি হয় না, গৌণভাবে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় মাত্র। তাই অপ্সরা প্রভৃতি স্বতঃপ্রিয় নয়, আনন্দ দেয় বলে প্রিয়। এইজন্য এদের প্রিয়রূপ বলা হয়েছে। এইরকম যে প্রিয় এবং প্রিয়রূপ কাম্য বস্তুসমূহ, হে নচিকেতা, তুমি তাদের—'অভিধ্যায়ন্ অত্যস্রাক্ষীঃ'—বিচার করে অসার, অনিত্য ভেবে স্থির করে ত্যাগ করেছ। বিচার না করলে ত্যাগ করা যায় না। তুমি দেখেছ পুত্রবিত্ত, অপ্সরাদি, দীর্ঘজীবন সবই মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেয় না। দেখে, তুমি—'নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীম্ অবাপ্তঃ'—বিত্তময়ী সৃঙ্কা—অর্থাৎ প্রেয়রূপ রত্নমালা বা সংসার-গতি, ঐশ্বর্যময় ভোগের পথ গ্রহণ করনি।

এই ভোগের পথে গেলে কী হয় তা বলছেন—'যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ'—যাতে বহু মানুষ মগ্ন হয়, ডুবে যায়। অধিকাংশ মানুষ এই পথে গিয়ে ক্লেশ পায়, মৃত্যুগ্রস্ত হয়। মৃত্যু মানে—অজ্ঞানরূপ মৃত্যু। অবিদ্যা-কাম-কর্ম—অজ্ঞান, অজ্ঞানের জন্য বাসনা, বাসনার জন্য প্রবৃত্তি। এর ভিতর দিয়ে গিয়ে মানুষ নিমজ্জিত হয়, আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে থাকে। শাস্ত্র বলছেন—আত্মাকে ভুলে থাকার নামই মৃত্যু। বেশির ভাগ মানুষ না জেনে এই মৃত্যুপথে চলছে। তারা মনে করছে—এই বুঝি জীবনের পথ। জানে না যে, মৃত্যুর পথে চলছে। নচিকেতা সে পথে যাননি, কাজেই তিনি অসাধারণ। প্রশংসা করলে ভাল শিষ্যের মনে উৎসাহ জাগে। যমরাজ তাই নচিকেতার প্রশংসা করে তাঁর এই যে আত্ম-অন্বেষণ, সেই অন্বেষণের ভিত্তিকে দৃঢ় করছেন।

তারপর আগে যে কথা হচ্ছিল—যদি এমনই হয়, ভোগের পথে গেলে বিনষ্ট হতে হয় তাহলে, শ্রেয় আর প্রেয়কে মিলিয়ে মিশিয়ে, এর খানিকটা, ওর খানিকটা, মিশিয়ে নিয়ে চল। চলতি কথায় যেমন বলে—'জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি/সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি'![১] অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ আমাদের এ-ও হোক ও-ও হোক—যোগও হোক, ভোগও হোক। সংসারকে একেবারে জলাঞ্জলি না দিয়ে সংসারও হোক, আবার আত্ম-অন্বেষণও হোক।

এসব হলো সত্যের সঙ্গে আপস করা। যতদিন আমরা এ-ধরনের কথা অর্থাৎ একটির সঙ্গে আর একটির যোগ করার কথা বলব, ততদিন বুঝতে

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭৫

হবে আমাদের আত্ম-অন্বেষণের আগ্রহ প্রবল হয়নি। তাছাড়া, মেশামেশি যে সম্ভবই নয়, সেকথা এবার স্পষ্ট করে বলছেন—

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥৪॥

অন্বয় ঃ—যা অবিদ্যা (ঐহিক সুখসাধনরূপ যে অপরা-বিদ্যা) বিদ্যা চ (এবং অমৃতত্বসাধন পরা-বিদ্যা) এতে (এই দুটি) দূরম্ (অত্যন্ত) বিপরীতে (ভিন্ন) বিষূচী (বিরুদ্ধফলপ্রদ) ইতি (এইরূপে) জ্ঞাতা (পরিচিত) ; নচিকেতসম্ (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যাভীপ্সিনম্ (পরাবিদ্যার অভিলাষী) মন্যে (মনে করি) বহবঃ (অনেক) কামাঃ (কাম্য বস্তু) ত্বা (তোমাকে) ন অলোলুপন্ত (প্রলুব্ধ করল না)।

শ্রেয় এবং প্রেয়—এই দুটি বিদ্যা এবং অবিদ্যা বলে—'জ্ঞাতা'—পরিচিত। 'দূরম্ এতে বিপরীতে বিষূচী'—এ দুটি অতিশয় বিপরীত, এবং ভিন্নফলপ্রদ। বিদ্যার নিষেধার্থে নঞ্ প্রত্যয় করে অবিদ্যা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় বিদ্যা আর অবিদ্যা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। যেন পূর্ব আর পশ্চিম, আলো আর অন্ধকার। আলোর খানিকটা আর অন্ধকারের খানিকটা নিলাম—এরকম কখনো দুটিকে একসঙ্গে নেওয়া যায় না। হয় আলো, নয় অন্ধকারকে নিতে হবে। যেমন, পূর্ব আর পশ্চিমদিককে কখনো এক করা যায় না। এরা বিপরীতমুখী। সুতরাং যারা মনে করে—শ্রেয় আর প্রেয়ের মধ্যে এর-ও খানিকটা ওর-ও খানিকটা নিয়ে অগ্রসর হবে—তারা ভ্রান্তিতে পড়েছে। দুটিকে মিশ্রিত করে জীবনের পথে চলব—এ অবাস্তব কথা।

তারপর আবার নচিকেতাকে প্রশংসা করে বলছেন—'বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে'—নচিকেতা, তোমাকে তত্ত্বাভিলাষী মনে করি। তোমার ব্যবহারে, তোমার সিদ্ধান্তে নিষ্ঠা দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি অবিদ্যার নয় বিদ্যার আকাঙ্ক্ষী। তাই—'ন ত্বা কামা বহবঃ অলোলুপন্ত'—বহু প্রকারের ভোগ্যবস্তু তোমাকে প্রলুব্ধ করে শ্রেয়োমার্গ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

যমরাজ নচিকেতাকে পরীক্ষা করবার জন্য নানারকম ভোগ্যবস্তু দিতে চেয়েছিলেন, সেসব তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচলিত করতে পারেনি। ভাব হচ্ছে এই, যদি কেউ নচিকেতার মতো সত্যসন্ধ হন, লক্ষ্যে ঐরকম দৃঢ় থাকতে পারেন তবেই তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবেন। মূল্য না দিয়ে কেউ আত্মজ্ঞান পায় না এবং সেই মূল্য আবার সামান্য মূল্য নয়, সর্বস্বদান! যাঁরা সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, তাঁরাই বস্তুলাভ করেন—অপরে নয়।

কিন্তু সাধারণ লোক যারা তারা কী করে? যমরাজ এখন সেই কথাই বলছেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৫॥

অন্বয় ঃ—অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যার মধ্যে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার ও কাম্যবস্তু দ্বারা পরিবৃত যারা) স্বয়ম্ (নিজেদের) ধীরাঃ (বুদ্ধিমান) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (পণ্ডিত বলে মনে করে) [সেই] দন্দ্রম্যমাণাঃ (কুটিল স্বভাব) মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) পরিয়ন্তি ([লোক থেকে লোকান্তরে] পরিভ্রমণ করতে থাকে) যথা (যেমন) অন্ধাঃ (দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগণ) অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত হয়ে) [পরিভ্রমণ করতেই থাকে, যথাস্থানে উপনীত হতে পারে না]।

'অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ'—অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েও যারা—'স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ'—নিজেদের জ্ঞানী, পণ্ডিত বলে মনে করে, হয়তো তাদের কিছু জাগতিক সাফল্য লাভ হয়েছে, তাই ভাবে যাদের সেরকম সাফল্য লাভ হয়নি তারা নির্বোধ। বলে, এরা বুদ্ধিহীন, বুদ্ধি থাকলে আমাদের মতো কিছু গুছিয়ে নিতে পারত। এই গুছিয়ে নেওয়াটাই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ! সংসারে যেরকম করেই হোক, প্রয়োজন হলে অপরকে প্রবঞ্চিত করেও নিজের একটা প্রতিষ্ঠা—position করে নিতে হবে। কেউ বলে—ওঃ, অমুক ব্যক্তি, একজন self-made man! আগে যেন পশু ছিল, তারপর মানুষ হয়েছে! জাগতিক সাফল্যেই এরা গৌরব বোধ করে। নিজেদের খুব বুদ্ধিমান, পণ্ডিত বলে ধরে নেয়, শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আর একদল নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে বলেন, শাস্ত্র বলছেন যাগযজ্ঞ কর তাহলেই যা পাবার সব পাবে। তা যদি না কর তো সর্বনাশ। যারা এই কর্মকাণ্ডের পথে না চলে অন্য পথে চলছে তারা শাস্ত্রবিগর্হিত কাজ করছে। এই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ বলে দাবি করেন, শাস্ত্রের মর্ম যেন তাঁরাই বোঝেন। তাঁরা আরো বলেন, যাগযজ্ঞাদি নিয়মিতরূপে করলেই কল্যাণ। যজ্ঞাদি কতদিন করতে হবে? জীবনের শেষ পর্যন্ত। 'যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ'—যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অগ্নিহোত্র যাগ করতে হবে। ফল কী হবে? অক্ষয় স্বর্গলাভ। আবার এই জগতের ভোগও করতে পারবে। কারণ অগ্নিহোত্র করলেই যে সব ছাড়তে হবে এমন কথা নয়। একটু সংযম হয়তো দরকার কিন্তু ইহজগতের ভোগের বস্তু সবই পাবে আর পরজগতে গিয়ে তো কথাই নেই! এই কথাটি তাঁরা নানারকমে আকর্ষণীয় ভাবে বলেন। গীতার ভাষায় 'পুষ্পিতাং বাচম্'[১]। শুনলে মনে হয়, সত্যিই

১. গীতা—২/৪২

তো, এই জগতে সুখে দিন কাটবে আর পরজগতে তো সুখ একেবারে কায়েম করে নেওয়া হলো! যজ্ঞের ফল যাবে কোথায়?

এই শাস্ত্রজ্ঞ দলটির পাণ্ডিত্যের অভাব নেই। কচ্‌কচ্‌ করে বেদান্তের কথাগুলি কেটে দেবেন—যদিও তা কাটা যায় না। বলবেন, কর্মেই বেদের আসল তাৎপর্য। তাঁরা বলেন বেদান্তের পথটা পথই নয়, শাস্ত্রের তাৎপর্যই ওতে নেই। শাস্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে কর্ম করায়। বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে এঁরা অজ্ঞানে একেবারে ডুবে আছেন। কেন? না, দেহেন্দ্রিয়াদির সাথে অভিন্ন বোধ করে তাঁরা নিজেদের কর্তা, ভোক্তা বলে মনে করছেন। তাঁরা যাগযজ্ঞাদি কর্ম করেন, নিজেদের কর্তা জ্ঞান করেন এবং ইহজীবনে বা পরজীবনে যাগযজ্ঞের ফল ভোগ করেন। কিন্তু আত্মা স্বরূপত অকর্তা, অভোক্তা। আত্মাতে এই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বোধের নামই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানেরই ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে লৌকিক এবং বৈদিক সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তিতে। তাই প্রবৃত্তিপরায়ণ সকল মানুষই, কি শাস্ত্রজ্ঞ কি অশাস্ত্রজ্ঞ, সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের জ্ঞানী, পণ্ডিত মনে করেন। ফল কী হচ্ছে? না, এই অবিবেকীরা নানানদিকে পরিভ্রমণ করছে, জরা ব্যাধিতে ক্লিষ্ট হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তরে আবর্তিত হচ্ছে। তাঁদের অবস্থা কি রকম?—'অন্ধেন এব নীয়মানাঃ যথা অন্ধাঃ'—অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধদের মতো। কয়েকজন দৃষ্টিহীন লোক চলছে আর তাদের যে পরিচালিত করছে সেও অন্ধ। পরিণাম কী হয়? তারা পথ চিনতে না পেরে গর্তে পড়ে। সেইরকম এই সব পণ্ডিতম্মন্যেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নানা দুঃখের ভাগী হচ্ছে।

এই কথা বলে যমরাজ বোঝালেন যাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, যাঁরা লক্ষ্যে স্থির, যাঁরা আত্মজ্ঞানের জন্য সর্বত্যাগ করতে প্রস্তুত কেবল তাঁরাই সেই পরম কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥৬॥

অন্বয় ঃ—সাম্পরায়ঃ (সম্পরায়=পরলোক, সাম্পরায়ঃ=পারলৌকিক সাধন) প্রমাদ্যন্তম্ (বিষয়াসক্তি হেতু প্রমাদগ্রস্ত) বিত্তমোহেন (ধনমোহে) মূঢ়ম্ (বিমূঢ়—অজ্ঞানের দ্বারা আবৃতচিত্ত) বালম্ (বালকের ন্যায় অবিবেকীর) প্রতি (সমীপে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না)। অয়ম্ (এই) লোকঃ (দৃশ্যমান জগৎ) অস্তি (আছে) পরঃ ন (পরলোক নেই) ইতি (এইরকম) মানী (চিন্তাকারী ব্যক্তি) পুনঃ পুনঃ (বার বার) মে (আমার) বশম্ (বশ্যতা, অধীনতা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) [জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ ভোগ করতে থাকে]।

যারা আসক্তচিত্ত তাদের কাছে—'ন প্রতিভাতি সাম্পরায়ঃ'—পরলোক প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন প্রকাশ পায় না। 'সাম্পরায়ঃ' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন—'সম্পরা ঈয়তে ইতি সম্পরায়ঃ। তৎসম্বন্ধী সাম্পরায়ঃ'—যার দ্বারা দেহান্তে মানুষ সাধনোচিত লোকে গমন করে। বৈদিক সাধন-প্রণালীর দ্বারা মানুষ জন্মান্তরে উচ্চ শ্রেণীতে, উচ্চ পদবীতে আরোহণ করতে পারে, দেবলোক প্রাপ্ত হতে পারে। যারা বালবুদ্ধি তারা সেই প্রণালী জানে না। যাদের বুদ্ধি অমার্জিত, অন্তঃকরণ অসংস্কৃত তাদের বালবুদ্ধি বলেছেন। বালক বলতে আমরা যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, সরলমনা বুঝি এখানে তা নয়। এখানে বালক মানে শাস্ত্রীয়-বুদ্ধিবিহীন, বিবেকহীন, মূঢ় ব্যক্তি। সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, যার লৌকিক জ্ঞান আছে—হয়তো সাধারণের চেয়েও একটু বেশি মাত্রাতেই আছে—তাকেও কিন্তু বালক বলা হচ্ছে। কারণ তার শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির শোধন হয়নি, সেই অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছে পরলোকে উচ্চস্থান লাভ করবার সাধন অজ্ঞাত। কারণ সে—'প্রমাদ্যন্তম্'—প্রমাদগ্রস্ত, এ বিষয়ে অবধানশূন্য। কেন?—'বিত্তমোহেন মূঢ়ম্'—ধনৈশ্বর্যাদির মোহে সমাচ্ছন্ন। তার কাছে শাস্ত্রীয় জ্ঞান—যার দ্বারা স্বর্গাদি লোক এমনকি হিরণ্যগর্ভত্ব পর্যন্ত লাভ হতে পারে—সেসব প্রকাশ পায় না। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তি মনে করে—'অয়ং লোকো, নাস্তি পর ইতি মানী'—স্ত্রীপুত্র ভোগৈশ্বর্যবিশিষ্ট এই দৃশ্যমান লোকই বিদ্যমান আছে, এর অতিরিক্ত কোন অদৃষ্ট পরলোক নেই। এরূপ ব্যক্তি দেহাত্মবাদী, দেহকেই একমাত্র সত্য বলে জানে। সে—'পুনঃ পুনঃ মে বশম্ আপদ্যতে'—বার বার মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। এরূপ ইহসর্বস্ব ব্যক্তি দেহের পরিচর্যা করে আনন্দ পায়, তারই যথাসাধ্য তৃপ্তিসাধন করতে সচেষ্ট থাকে। আর কিছু উচ্চতর লক্ষ্য থাকতে পারে বলে সে জানে না। Ingersoll যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন—তাঁর জীবনের লক্ষ্য হলো জগৎ-রূপ লেবুকে নিংড়ে যতদূর সম্ভব রস বার করে নেওয়া। ঐশ্বর্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকায় এরূপ লোকের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নেই। এখানে বুঝতে হবে যে, এই শ্লোকের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান নয়, শাস্ত্রজ্ঞান, যার ফলে অলৌকিক উপায়ে ইহজগতের ধারণায় যাবতীয় ভোগের পরাকাষ্ঠা যে স্বর্গলোক সেই স্বর্গলোক লাভের উপায় জানা যায়।

শাস্ত্র বলছেন—স্থূলদেহের অবসানের পর প্রাণীর তিনরকমের গতি হয়। এক, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে উচ্চতর লোকে স্থানলাভ। সেই উচ্চতর লোকের আবার দুটি স্তর আছে, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের নাম পিতৃলোক। যাঁরা কেবল কর্ম অনুষ্ঠান অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি করেন, উপাসনা করেন না তাঁরা—'কর্মণা পিতৃলোকঃ'[১]—কর্মের ফলে পিতৃলোকে যান। এর অর্থ, একটু উচ্চতর স্থিতি হয়, যেখানে ভোগের মাত্রা মর্তলোক থেকে বেশি। পিতৃলোক সম্বন্ধে আমাদের

১. বৃহদারণ্যক—১/৫/১৬

ধারণা যেখানে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা আছেন, এটি তা নয়। দেবতাদের মধ্যে পিতৃগণ বলে একটি পর্যায় আছে, যাঁরা মুখ্য দেবতাদের থেকে একটু নিম্নশ্রেণীর। তাঁদের লোকের নাম পিতৃলোক। বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা পিতৃলোক অপেক্ষা উচ্চস্তরে গতি হয়। সেই স্তরের নাম দেবলোক।— 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ'[১]—বিদ্যা-সহিত কর্ম, উপাসনা-সহিত কর্মের দ্বারা দেবলোকে গতি হয়। যাদের জন্মান্তরে বিশ্বাস আছে এবং যারা কেবল লৌকিক জীবন নয়, শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে উন্নততর জীবন লাভ করবার চেষ্টা করে, তাদের ভিতরে এই দুটি শ্রেণী। ভোগের কমবেশি অনুসারে পিতৃলোকের ভিতরেও তারতম্য থাকে। দেবলোকেও দুরকম গতি আছে। একটি চান্দ্রপথ বা দক্ষিণায়ন আর একটি সৌরমার্গ বা উত্তরায়ণ। এই দুটি যথাক্রমে কর্মী এবং উপাসকদের মার্গ। যখন সূর্যের উত্তরাভিমুখে গতি হয়—সেই ছয় মাস উত্তরায়ণ আর বাকি ছয় মাস, সূর্যের গতিপথ যখন দক্ষিণ দিকে—তখন দক্ষিণায়ন। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব শরশয্যায় উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করবেন বলে উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন[২]। এটি পুরাণের ব্যাখ্যা। শ্রুতি বলছেন, উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নে মৃত্যুর দ্বারা কোন বিশেষ কালে মৃত্যুকে বোঝাচ্ছে না। তৎ তৎ কালাভিমানী একজন করে দেবতা আছেন। উত্তরায়ণ অনুসরণ করে যাঁরা যান তদভিমানী দেবতাকে অবলম্বন করে তাঁদের গতি হয়, আর দক্ষিণায়নে যাঁদের মৃত্যু হয় দক্ষিণায়নের অভিমানী দেবতাকে অবলম্বন করে তাঁদের গতি হয়। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন কাল ছাড়াও ঐরকম দুটি পথ শাস্ত্রে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। গীতায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥'[৩]

—শবদাহ কালে চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে। অগ্নি প্রকাশাত্মক। প্রথমে অগ্নিকে আশ্রয় করে তারপরে তার জ্যোতিকে অবলম্বন করে ব্রহ্মবিদ্ যাচ্ছেন। এ সবই প্রকাশাত্মক। তারপরে ক্রমান্বয়ে দিন, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের পথ অবলম্বন করে মৃত ব্যক্তি যাচ্ছেন। সেই পথ দিয়ে যাঁরা যান তাঁরা ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আর দক্ষিণায়ন সম্বন্ধে গীতায় সংক্ষেপে বলেছেন—

'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥'[৪]

—এটি অন্ধকারময় পথ। চিতাতে অগ্নির সঙ্গে ধূমও নির্গত হয়। ধূম অপ্রকাশাত্মক। তাই প্রথমে বললেন ধূম তারপর রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন। এই পথটি হলো অপ্রকাশাত্মক অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন। অজ্ঞানময় পথ দিয়ে 'চান্দ্রমসং

১. বৃহদারণ্যক—১/৫/১৬ ; ২. মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ১১৪/১০৮-১০
৩. গীতা—৮/২৪ ; ৪. তদেব—৮/২৫

জ্যোতিঃ'—চন্দ্রলোক অবধি যেতে পারে। যাগযজ্ঞাদি করা হয়েছে, কাজেই ভোগের স্থান চন্দ্রলোকে গতি হচ্ছে। যাঁরা চন্দ্রলোকে গিয়ে ভোগ করেন তাঁদেরই পিতৃগণ বলে। আর এর বিপরীতক্রমে যাঁরা উত্তরায়ণের পথে গিয়ে স্বর্গাদি লোকে যান তাঁরা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হন। তাঁরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানময় দেহ ও মন ধারণ করেন।

এখন, ঐ যে উত্তরায়ণের পথে যাবার কথায় বললেন—'তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥'—এই পথে যাঁরা যান তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—এখানে পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার বিষয়টি যেন একটু সহজ করে দেওয়া হয়েছে। গীতাতেই অন্যত্র আছে—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'[১]—হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক থেকেই আবার ফিরে আসতে হয়। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং আবার ফিরে আসে, এই কথার ভিতরে কোথায় যেন বিরোধ আছে। উত্তরায়ণের পথে যাঁরা যান, এখানে তাঁদের ভিতরে দুটি প্রধান বিভাগ বর্ণনা করা আছে। যাঁরা প্রভূত পুণ্য অর্জন করেছেন তাঁদের 'ব্রহ্মবিদ্' বলা যেতে পারে। এঁরা ব্রহ্মলোকে গিয়ে মুক্তি লাভ করেন। ঐ ব্রহ্মলোকেই দুই প্রকার সাধকের গতি হচ্ছে। তাঁরা সকলেই জ্ঞানপ্রধান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একদলকে ফিরে আসতে হয় আর অপর দলকে ফিরতে হয় না। যাঁদের ফিরে আসতে হয় তাঁদেরই লক্ষ্য করে গীতায় বলা হয়েছে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলেই পুনরাবর্তী। কেউ কেউ অবশ্য ব্যাখ্যা করেন—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কথার তাৎপর্য হলো ব্রহ্মলোকের নিচে পর্যন্ত। কিন্তু গীতার ভাষা থেকে মনে হয় যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্তি। যাঁরা ক্রমমুক্তির পথে ব্রহ্মলোকে যান, তাঁদের জ্ঞানের সামান্য প্রতিবন্ধকটুকুও দূর হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং মুক্ত হয়ে যান। ব্রহ্মলোককে অনেক সময় হিরণ্যগর্ভের লোক বলা হয়। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মলোকে গমনের অর্থ হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হয়ে যান। ঐ একটু যে প্রারব্ধের বিঘ্ন ছিল, সে বিঘ্নটুকু দূর হয়ে যাওয়ায় তাঁদের মুক্তি হয়ে গেল, আর বাকি যাঁরা রইলেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ভোগ পূর্ণ হবার পর আবার ফিরে আসতে হয়।

তাহলে আমরা মোটামুটি দুটি পথ দেখলাম—একটি কর্মের বা অজ্ঞানের পথ যার ফল চন্দ্রলোক, আর অপরটি উপাসনা বা কর্ম সহিত উপাসনা, যাকে বিদ্যার পথ বলে, যার ফলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ হয়। এই ব্রহ্মলোকগামীদের আবার দুটি শ্রেণী। যাঁরা ক্রমমুক্তির পথে যাচ্ছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যান, আবার কেউ কেউ আবার ফিরে আসেন পুনরাবর্তী হয়ে। এ দুটি ছাড়া তৃতীয় কিছু পথ আছে কি? শাস্ত্র বলছেন— আছে। যারা শাস্ত্র অনুসারে চলে না, যারা স্বভাব-চালিত, যাদের জীবন কেবল যাকে বলে **instinctive**,

১. গীতা—৮/১৬

তারা কর্মপ্রেরিত হয়ে জন্মাচ্ছে এবং সুখদুঃখ ভোগ করছে মাত্র। তাদের ভোগদেহে আর শুভাশুভ কর্ম সৃষ্টি হচ্ছে না। এদের উপলক্ষ করেই আলোচ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—'সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ'[১]—শস্যের মতো জন্মায় ও মরে। এই হলো তৃতীয় পথ। এই পথের পথিকদের উদ্দেশ্য করে যম বলছেন, এরা—'পুনঃ পুনঃ বশমাপদ্যতে মে'—বার বার আমার অধীনতা স্বীকার করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। এই ভবচক্র নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে যতদিন না তাদের পূর্বসঞ্চিত শুভ বা অশুভ কর্ম অন্যপ্রকার জন্ম উৎপন্ন করে। প্রবল পাপের জন্য হয়তো খুব কষ্টের জন্ম হয় অথবা প্রবল পুণ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত কোন শুদ্ধ জীবনের আরম্ভ হয়। সে জন্মে আবার নতুন করে কর্ম সঞ্চয় হতে পারে এবং শুভ কর্ম সঞ্চয় হওয়ায় জীব উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। যারা শাস্ত্রীয় কোন পথকে অবলম্বন করে না তারা প্রায় এই তৃতীয় পন্থার মধ্যে পড়ে যায়। তা কর্মেরও পথ নয়, জ্ঞানেরও পথ নয়।

শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন, এই যে চক্র, vicious circle, এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় আছে। তবু মানুষ তা অবলম্বন করে না কেন? তার উত্তর, শাস্ত্রকথাও সকলের শোনবার ইচ্ছা হয় না। বিশেষ করে এখানে আলোচ্য যে আত্মজ্ঞান তা উঁচু থাকের কথা। এই আত্মজ্ঞানের দ্বারা জন্মমৃত্যু-পরম্পরার হাত থেকে নিষ্কৃতি হতে পারে। কিন্তু আত্মজ্ঞান শোনবার অবকাশ মানুষের নেই আর শুনলেও তা ধারণা হয় না।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে আত্মা) বহুভিঃ (অনেকের কাছে) শ্রবণায় অপি (কেবলমাত্র শ্রবণের জন্যও) ন লভ্যঃ (সুলভ নন), যম্ (যাঁর সম্বন্ধে) শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করলেও) বহবঃ (অনেকেই) ন বিদ্যুঃ (জানতে পারে না) অস্য (এই [সেই] আত্মার) বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্যঃ (দুর্লভ) অস্য লব্ধা (এই আত্মতত্ত্বের বোদ্ধা) কুশলঃ (অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন)। কুশলানুশিষ্টঃ (সূক্ষ্মবুদ্ধি, নিপুণ আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট) জ্ঞাতা (আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) আশ্চর্যঃ (অতি বিরল)।

অনেকের কাছে আত্মা শ্রবণের দ্বারাও লভ্য নন। এই জীবনের কর্মাদি নিয়ে তারা এত ব্যাপৃত যে আত্মতত্ত্ব শোনবার অবকাশ তাদের নেই। আমরা

---

১. কঠোপনিষদ্—১/১/৬

সর্বদাই এ কথা শুনতে পাই—কখন করব? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কত কাজ, কখন ভগবানের কথা শুনব? ধর্মকথা শোনার অবকাশ নেই, অবসর পায় না। কাজেই—'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ'—আত্মা সম্বন্ধে শুনতেও পায় না। আর যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সৎকথা কানে এল—'শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ'—যারা শোনে, তাদের ভিতরেও অনেকে এঁর স্বরূপকে জানে না। এসব কথার তাৎপর্য কী, এগুলো প্রকৃতই কাজে লাগবে কি না বুঝতে পারে না।

আত্মতত্ত্ব শুনেও যে বুঝতে পারা যায় না—একথা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি, ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। আমরা জানি, বার বার শুনছি, শুনেও কি দৃঢ় ধারণা হচ্ছে? সেই দৃঢ় ধারণা হওয়াকেই জানা বলছেন। শুনে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া, তা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? বলছেন, 'আশ্চর্যো বক্তা'—এই আত্মতত্ত্বের বক্তা, উপদেষ্টা আশ্চর্য, দৈবাৎ পাওয়া যায়। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা বলতে বোঝাচ্ছে—যিনি তাঁর অনুভব থেকে কথা বলেন, কেবল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন না। আর—'কুশলোঽস্য লব্ধা'—আত্মতত্ত্বকে লাভ করবে, শুনে ধারণা করবে—এরকম কুশল অর্থাৎ নিপুণ লোকও আশ্চর্য অর্থাৎ দুর্লভ। অতএব—'আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ'—কুশল ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে এই আত্মতত্ত্বকে জানবেন সেইরকম লোকও অতিশয় দুর্লভ।

যম নচিকেতাকে অবহিত করবার জন্য আত্মতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়ত্ব, দুর্লভত্বের কথা নানাভাবে বলছেন। আগেই বলেছেন, বিষয়টি সহজ নয়, দেবতাদেরও এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, আর আমি বললেও যে তুমি ধারণা করতে পারবে এমনও নয়। তা সত্ত্বেও নচিকেতা আগ্রহী হয়েছেন। সুতরাং নচিকেতাকে তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন যাতে তাঁর বুদ্ধি এ-বিষয়ে কেন্দ্রিত হয়ে থাকে। সে যাতে এই তত্ত্বটি অবধানপূর্বক ধারণা করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত গুরু উপযুক্ত শিষ্যকে তত্ত্বটি দান করবার পূর্বেই অবহিত করে দিচ্ছেন এই বলে যে, যেমন তেমন করে বোঝা যাবে না, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তত্ত্বটিকে বোঝবার চেষ্টা কর। যদি সুকৃতি থাকে বুঝতে পারবে। এই বিদ্যাকে গ্রহণ করবার জন্য নচিকেতাকে এইভাবে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৮॥

অন্বয় ঃ—**বহুধা** ([আছেন কি নেই, কর্তা না অকর্তা ইত্যাদি] বিবিধ প্রকারে) **চিন্ত্যমানঃ** (বিতর্কিত) **এষঃ** (এই আত্মা) **অবরেণ** (অনাত্মজ্ঞ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট) **নরেণ** (ব্যক্তির দ্বারা) **প্রোক্তঃ** (বর্ণিত হলে) **সুবিজ্ঞেয়ঃ** (সম্যকরূপে উপলব্ধ) **ন** (হন না)। **অনন্যপ্রোক্তে** (ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট হলে) **অত্র** (এই আত্মা সম্বন্ধে) **গতিঃ** (পূর্বোক্ত

বিতর্ক) ন অস্তি (থাকে না [সংশয়ের অবসান হয়])। অণুপ্রমাণাৎ (অণুপরিমিত বস্তু থেকেও) [আত্মা] অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) হি (এই কারণেই) অতর্ক্যম্ ([প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অগোচর বলে] তর্কের বিষয়ভূত নন)।

'এষ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ'—এই যে আত্মা যাঁর সম্বন্ধে তুমি জানতে চেয়েছ—এঁকে সহজে জানা যায় না। 'অবরেণ নরেণ প্রোক্তঃ'—অবর অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন উপদেষ্টা যখন আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন তখন তা সহজে বোঝা যায় না। কেন না—'বহুধা চিন্ত্যমানঃ'—এই আত্মাকে লোকে বহুরূপে চিন্তা করে। আমরা কখনো শরীরকে, কখনো ইন্দ্রিয়গুলিকে, কখনো প্রাণকে, কখনো মন বা বুদ্ধিকে আত্মা বলে ভাবি। আত্মা সম্বন্ধে আমাদের কল্পনাও নানাবিধ। কখনো ভাবি তিনি এক, কখনো ভাবি অনেক। কখনো মনে হয় দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়, কখনো বিশ্বাস করি তিনি দেহাতীত। এমনকি কখনো ভাবি আত্মা আছে কিংবা নেই, কর্তা কিংবা অকর্তা, শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ। যে বস্তু সম্বন্ধে যত বিভিন্ন রকমের কল্পনা থাকে, সেই বস্তু তত দুর্জ্ঞেয়।

তাহলে উপায় কী? বলছেন—'অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি'—অনন্য অর্থাৎ যিনি নিজেকে আত্মারূপে জানেন অথবা আত্মা স্বরূপত এক ও অদ্বিতীয় বলে জানেন। আত্মা এইরূপে অনন্যপ্রোক্ত হলে—'গতিরত্র নাস্তি'—এ বিষয়ে 'গতি' থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার এই শ্লোকটির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ 'গতি' অর্থ করেছেন সংসারগতি। আত্মাকে জানলে আর সংসারগতি অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়ে যেতে হয় না। আবার 'গতির' সঙ্গে লুপ্ত অ-কার যুক্ত করে কেউ 'অগতি' করেছেন। এইরকম অনন্যপ্রোক্ত অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন উপদেশ করেন তখন আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান না হয়ে পারে না—'অগতিঃ অত্র নাস্তি'। যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন এর তাৎপর্য হলো, যে-সে বললে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি উপদেশ করেন তাহলেই উপযুক্ত শ্রোতার উপর সেই উপদেশের প্রভাব পড়ে। তখন সে আত্মতত্ত্বকে ধারণা করতে পারে। কিন্তু তেমন লোক কোথায় যিনি নিজে অনুভব করে আমাদের উপদেশ দেবেন। নচিকেতা বলেছেন—'বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যঃ'[১]—এই বিষয়ে তোমার মতো বক্তা আর নেই। তখনকার দিনেও যদি যম ছাড়া আর বক্তা না থাকেন, এখন আর বেশি কোথায় পাওয়া যাবে। অতএব এই দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে বলবার লোক নেই, বোঝবার লোকও নেই।

আত্মা কেন দুর্জ্ঞেয়? কারণ, তিনি 'অণীয়ান্ হি অতর্ক্যম্ অণুপ্রমাণাৎ'—অণুপরিমাণ থেকেও অণুতর, সূক্ষ্ম। জগতের সব সূক্ষ্মবস্তুর ভিতরে আত্মা সূক্ষ্মতম। আমরা সূক্ষ্ম বিচার করতে করতে জগৎকে হয়তো পরমাণুতে নিয়ে

---

১. কঠোপনিষদ্—১/১/২২

গেলাম, কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলে বললাম। ন্যায়শাস্ত্রে এইভাবে বলেছেন, 'ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, অণু'—এখানে অণুর অর্থ হবে পরমাণু। পরমাণুর পরে আর কিছু বলা নেই, শেষ কথা হলো পরমাণু। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলা যায় পরমাণু বা atom শেষ কথা নয়, তাকে আরো ভাগ করা যায়, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। এদেরও পিছনে যদি আরো যাই তাহলে পাব শক্তি, energy। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শক্তি জড়শক্তি। বিজ্ঞান এর মধ্যে চেতনাকে জুড়ে দেয় না। কারণ, বিচারের দ্বারা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করে করে দার্শনিকেরা এক সূক্ষ্ম তত্ত্বে পৌঁছান, আবার গবেষণার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক যেখানে পৌঁছান তা হলো শক্তি, energy। তাঁদের মতে এই শক্তির পর আর কিছু যদি থেকেও থাকে এখনো পর্যন্ত তা জানবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি।

এখানে দর্শন বলবে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে চরম তত্ত্ব অর্থাৎ energy বা শক্তি, তা কি জ্ঞানের বিষয়? সেটি জ্ঞানেরই বিষয়, নাহলে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে কী করে? কার জ্ঞানের বিষয়? বিষয় আর বিষয়ের জ্ঞাতা কি এক হয়? বিজ্ঞান এর উত্তর জানে না। কারণ, এ একটা দার্শনিক বিচার। বিজ্ঞানের বিচারের একটা প্রণালী আছে। বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করে তাঁরা যে সত্যে পৌঁছেছেন, দ্রষ্টাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেননি, আলাদা রেখেছেন। দ্রষ্টা তার নিজে থেকে পৃথক দৃশ্যজগৎকে বিচার করে ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছে। কাজেই এখানে দ্রষ্টা আর দৃশ্য দুটি ভিন্ন বস্তু। দর্শন যখন বিচারের শেষে তার চরম সূক্ষ্মতত্ত্ব 'আমি'-তে এসে পৌঁছায়, তখন দুটি বস্তু একসঙ্গে জড়িয়ে যায়। কোথায় জড়িয়ে যায়? মনে। যখন বিচার করে বলছি 'আমি'—সে 'আমি'-টি কী? মনের তরঙ্গ। মনের বৃত্তি। 'সেটি কি আমি?' তাও ঠিক বলা যায় না। কারণ, বৃত্তিগুলিকে জানে কে? যে জানে সে যদি বৃত্তিরূপ হতো তাহলে সে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল হতো। আবার যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, সে পরিবর্তনশীল দৃশ্যকে জানতে পারত না। এটা গভীরভাবে ভাববার বিষয়। 'আমি' যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে বাইরের পরিবর্তন সে বুঝতে পারবে না। দৃশ্য পরিবর্তনশীল, দ্রষ্টাও যদি সেরকম হয়, তাহলে দৃশ্য তার কাছে পরিবর্তনশীলরূপে প্রতিভাত হবে না। পরিবর্তনকে লক্ষ্য করবার জন্য একটি অপরিবর্তনশীল স্থিতিতে অবস্থিত হওয়া দরকার, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনকে দেখবে। দ্রষ্টাও যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে পরিবর্তনকে দেখবে কে? এটি বিজ্ঞানের নয়, দর্শনের কথা।

বিজ্ঞান আর দর্শনের ভেদ কেন করছি? না, বিজ্ঞান কতকগুলি নিয়ম করে নিয়ে নিজেকে সেই নিয়মে আবদ্ধ করেছে, তার ব্যতিক্রম করবে না। সেই ছক অনুসারে সে চলবে। বাহ্যজগৎকে বিশ্লেষণ করতে করতে চলা,

এই অনুসারে সে চলছে। যে বিশ্লেষণ করছে তাকে এই বিচারের ভিতরে টেনে আনা হয়নি। দার্শনিক বলেন—তাকেও আন। বৈজ্ঞানিকের জবাব—না, ওটা ভিন্ন ধারা। আমরা যখন মনোজগতের বিশ্লেষণ করব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই করব। মানে, যে আমি দ্রষ্টা, যে দেখছি সেই 'আমি'-কে বিশ্লেষণ করা। তারও উপায় আছে। প্রথমে বলছেন—আমি যার সঙ্গে পরিচিত আন্তর বস্তু বলে, তা হলো মন। এই মনকে বিশ্লেষণ করলে কী পাই? না, কতকগুলি চিন্তার প্রবাহ, বৃত্তি-পরম্পরা, stream of consciousness পাই। যেমন জলবিন্দুর প্রবাহ যখন চলে, তাকে আমরা একটা নাম দিই, বলি স্রোত বা নদী। তা হচ্ছে সদা পরিবর্তনশীল কতকগুলি জলবিন্দুর সমষ্টি। মনকে বিশ্লেষণ করলে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত বৃত্তিগুলিকে পাই। কে পায়? কে দেখে? যদি বলি আমি দেখি, সেই প্রশ্ন আবার উঠবে—এই আমি কে? যদি 'মন' হয় তাহলে, সেই মন কার দেখবার বিষয়? একটি মনের বৃত্তিকে দেখবার জন্য আর একটি মন কল্পনা করব। সেই মনটিকে দেখবার জন্য আবার তার পিছনে আর একটি মন কল্পনা করতে হবে, এইভাবে অনবস্থাদোষ হবে। এই পরম্পরা অনন্তভাবে চলবে। তাহলে 'আমি' কাকে বলব? বিজ্ঞানী বলবেন—এর পরে আর কিছু আমরা জানি না। প্রাচীন কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনকে উড়িয়েই দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য—ওসব অলীক চিন্তার দরকার নেই। যা পাচ্ছি—এই শরীর, তাকে ধর, তাহলে মনও তার ভিতরে এসে যাবে। মনটি বিশেষ অনুধাবন করবার মতো বস্তু নয়, এটি উপজাত (by-product)। যেখানে মস্তিষ্কের কোষ, brain cell-গুলি আছে, মন তার একটি বিশেষ ক্রিয়া মাত্র। কী ক্রিয়া তা আর বিচার করে বলা হচ্ছে না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বলেন, আমরা ওরকম বলব না। মনকে যখন ভাবব তখন আমরা শরীরের ভিতর দিয়ে বিচার করে ভাবব না, মনের ভিতর দিয়ে বিচার করব। বৃত্তি, চিন্তার ভিতর দিয়ে যেগুলি পাচ্ছি তাদের by-product বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মনোবিজ্ঞানে psycho-analysis (মনোবিশ্লেষণ) প্রভৃতি কতরকম শাখার উদ্ভব হয়েছে। বিচিত্র সব তত্ত্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার শেষ তত্ত্বটি কি যখন ভাবতে যাই, তখন বিজ্ঞানের ধারায় কোন চিন্তা আর প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন করেন, মনের এই যে বিভিন্ন অবস্থা, প্রবাহ বা পরম্পরা যাকে বলছি তাকে জানছে কে? সে যদি একটি পরম্পরা হয়, তার যদি স্থিতিশীলতা না থাকে, তাহলে সে জানতে পারে না।

এই স্থায়িত্বকে বৌদ্ধরা একটি কাল্পনিক বস্তু বলেছেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে তত অবহিত নয়। এ সমস্ত পরিবর্তনের ভিতরেও স্থায়ী একটা কিছু আছে, যাকে আমরা ধরতে পারছি না। ঐ—'বহুধা চিন্ত্যমানঃ'—নানারকম

করে তার ব্যাখ্যা চলছে। বিষয়টিকে যখন ধরতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কারণ আমরা যে ধারায় বিষয়কে জানি সেই ধারা এখানে কাজে লাগছে না। বেদান্ত বলছেন—যার দ্বারা জান সেই-ই তুমি। কিসের দ্বারা জানি? বুদ্ধির দ্বারা। বুদ্ধিকে জানি কার দ্বারা? শেষকালে যার দ্বারা জানি অর্থাৎ যখন বলি যে জানে, সে-ই আত্মা, সে-ই হলো 'তুমি'। বিষয়টিকে এমনি একটি ধারা দিয়ে বোঝানো হলো। হয়তো খানিকটা কল্পনা করে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাকে পরিষ্কার করে ধরতে পারছি না। তাই বলছেন, যত সূক্ষ্মতম বস্তু কল্পনা করছি তার চেয়েও সূক্ষ্ম। সুতরাং—'অতর্ক্যম্'—তর্কের অতীত। তর্ক কিছু দূরে যায়, তারপর আর এগোতে পারে না। সুতরাং যতদূর তর্ক যেতে পারে নিয়ে যাও কিন্তু তার দ্বারা আত্মাতে পৌঁছাতে পারবে না। অতএব আত্মতত্ত্ব বোঝা সুকঠিন। এই কথা বলে যম নচিকেতাকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৯॥

অন্বয় ঃ—প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম) ত্বম্ (তুমি) যাম্ (যে [মতি]) আপঃ (প্রাপ্ত হয়েছ) এষা (এই) মতিঃ (পরমাত্মবিষয়া বুদ্ধি) তর্কেণ (শাস্ত্রবিরোধী বৃথা বিচারের দ্বারা) ন আপনেয়া (পাওয়া যায় না)। অন্যেন (অতার্কিক ব্রহ্মাত্মদর্শী ব্যক্তির দ্বারা) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট বুদ্ধি বা উপদেশ) সুজ্ঞানায় (সম্যক জ্ঞান সম্পাদন করে)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) [তুমি] বত (স্নেহ ও শ্রদ্ধাসূচক অব্যয়) সত্যধৃতি (পরমাত্মাকে জানার জন্য দৃঢ়সংকল্প) অসি (হয়েছ); নঃ (আমাদের কাছে) ত্বাদৃক্ (তোমার মতো) প্রষ্টা (জিজ্ঞাসু) ভূয়াৎ (হোক বা আসুক)।

'প্রেষ্ঠ'—হে প্রিয়তম, 'যাং ত্বমাপঃ এষা মতিঃ'—শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য যে আত্মজ্ঞান তুমি লাভ করেছ সেই জ্ঞান কেবল—'তর্কেণ ন আপনেয়া'—তর্কের দ্বারা অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির কৌশলের দ্বারা প্রাপ্তব্য নয়। অথবা, 'তর্কেণ ন আপনেয়া'—তর্কের দ্বারা এই মতি দূর করা যায় না। 'অন্যেন এব প্রোক্তা'—কেবল তর্কবিদ্ নন এরকম 'অন্য' অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হলে তবেই তা—'সুজ্ঞানায় ভবতি'—প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হবার উপযোগী হয়। হে নচিকেতা, তুমি—'সত্যধৃতিঃ বত অসি'—যথার্থ জ্ঞানের ধারণা-বিশিষ্ট। 'বত' শব্দের দ্বারা অনুকম্পা বা আদর বোঝায়। 'ত্বাদৃক্ প্রষ্টা নো ভূয়াৎ'—তোমার মতো প্রশ্নকর্তা হয় না কিংবা, 'নঃ'—আমাদের পুত্র বা শিষ্য যেন—'ত্বাদৃক্ প্রষ্টা ভূয়াৎ'—তোমার মতো প্রশ্নকর্তা হয়।

গুরু বা আচার্যের অভিপ্রায় অনুসারে যে-শিষ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভের উপযোগী প্রশ্ন করে, তার প্রতি গুরু সবিশেষ প্রীত হন। এটা স্বাভাবিক। যারা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ না করে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করতে চেষ্টা করে, তারা শুষ্ক তর্কের দ্বারা কখনো আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। কারণ, যে বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়, অনুমানেরও বিষয় হয় না, শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তার স্বরূপ-নিরূপণ হয় না। তাই শ্রুতি বললেন—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—কেবল তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বোঝা যায় না।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥১০॥

অন্বয় ঃ—শেবধিঃ (কর্মফলরূপে প্রাপ্ত আপাতরম্য সম্পদসমূহ) অনিত্যম্ (অচিরস্থায়ী) ইতি (ইহা) অহম্ (আমি) জানামি (জানি)। হি (যেহেতু) তৎ (সেই) [ব্রহ্মবস্তু] ধ্রুবম্ (শাশ্বত) হি (যেহেতু) [তৎ (সেই)] অধ্রুবৈঃ (অনিত্য বস্তু দ্বারা) ন প্রাপ্যতে (পাওয়া যায় না) ততঃ (সেইজন্য) [সমস্ত জেনেও] ময়া (আমার দ্বারা) অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ (যজ্ঞসাধন বিনাশশীল বস্তুসমূহের দ্বারা) নাচিকেতঃ (নাচিকেত নামক) অগ্নিঃ (অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞ) চিতঃ (অনুষ্ঠিত হয়েছেন) [এর দ্বারা] নিত্যম্ (যাম্যপদ রূপ আপেক্ষিক নিত্যত্ব) প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হয়েছি)।

যমরাজ প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন, 'অহং জানামি শেবধিঃ অনিত্যং'—আমি জানি যে ঐশ্বর্য অর্থাৎ কর্মফল অনিত্য। 'ধ্রুবং তৎ'—সেই ধ্রুব অর্থাৎ নিত্যবস্তু, আত্মবস্তু—'অধ্রুবৈঃ ন প্রাপ্যতে'—অনিত্য যাগাদির দ্বারা প্রাপ্য নয়। 'ততঃ'—তা সত্ত্বেও, অনিত্য সাধনের দ্বারা নিত্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তা জেনেও আমি—'নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ'—নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছি এবং পরিণামে এই অনিত্য যাগাদির দ্বারা—'নিত্যং প্রাপ্তবান্ অস্মি'—আপেক্ষিক ভাবে নিত্য, দীর্ঘকালস্থায়ী যমের পদবী প্রাপ্ত হয়েছি। তাৎপর্য এই, তুমি আমা অপেক্ষাও অধিকতর বৈরাগ্যবান, কারণ তুমি আমার মতো ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হওনি।

এরূপ অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন না হলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না, এটাই তাৎপর্য।

অতঃপর আত্মজ্ঞানের ফলশ্রুতির দ্বারা সেই বস্তুলাভের জন্য নচিকেতাকে প্ররোচিত করে শ্রুতি পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের অবতারণা করছেন।

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥১১॥

অন্বয় ঃ—নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) ধৃত্যা (ধীরভাবে) দৃষ্ট্বা (বিচার করে) ধীরঃ (প্রশান্তচিত্ত হয়ে) [তুমি] কামস্য (ভোগ্যবিষয়সমূহের) আপ্তিম্ (প্রাপ্তি) জগতঃ (বিশ্বভুবনের) প্রতিষ্ঠাম্ (অধিষ্ঠান-স্বরূপ) ক্রতোঃ (যজ্ঞ ও উপাসনার) অনন্ত্যম্ (আনন্ত্যম্, অনন্ত ফলস্বরূপ) অভয়স্য পারম্ (সর্বভয়নিবারক) স্তোম (প্রশংসনীয়) মহৎ (অণিমাদি ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত) উরুগায়ম্ (চিরকালব্যাপী) প্রতিষ্ঠাম্ (অবস্থিতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব) অত্যস্রাক্ষীঃ (সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছ)।

যমরাজ নচিকেতাকে আরো প্রশংসা করে বলছেন—'নচিকেতঃ'—হে নচিকেতা, 'জগতঃ প্রতিষ্ঠাং'—জগতের আশ্রয়রূপ যে হিরণ্যগর্ভত্ব সেই পদপ্রাপ্তিই হলো 'কামস্য আপ্তিম্'—সকল কামনার শেষ কথা, ভোগপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। সেই পদ হলো—'ক্রতোঃ অনন্ত্যম্'—আনন্ত্যম্—যজ্ঞের অনন্ত ফলস্বরূপ। 'অভয়স্য পারম্'—পরম অভয়স্থান এবং—'স্তোমমহৎ'—স্তুতিযোগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত। হিরণ্যগর্ভ পদের আরো কী বৈশিষ্ট্য আছে? না—'উরুগায়ং প্রতিষ্ঠাম্'—বহুকাল স্থায়ী তার প্রতিষ্ঠা।

হে নচিকেতা, তুমি অসাধারণ, কারণ ভোগের চরম অবস্থা যে হিরণ্যগর্ভ পদবী লাভ, সেই প্রতিষ্ঠাও তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তুমি 'ধীরঃ'—ধীমান অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন, শ্রেয়-প্রেয় বিচারে পারদর্শী। তাই তুমি—'ধৃত্যা দৃষ্ট্বা'—খুব ধৈর্য সহকারে বিচার করে দেখেছ যে এইরূপ প্রতিষ্ঠাও আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিকূল। সুতরাং 'অত্যস্রাক্ষীঃ'—তা অনায়াসে পরিত্যাগ করেছ। অর্থাৎ তুমি পরমপদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় চরম কাম্য বস্তুও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করনি। এ বড়ই আনন্দের বিষয়। সত্যই তুমি আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

তারপর যম নচিকেতার প্রার্থিত আত্মতত্ত্বের প্রশংসা করছেন যাতে এই গভীর বিষয়ে প্রশ্নকর্তার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। তাই বলছেন—

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥১২॥

অন্বয় ঃ—[তোমার জিজ্ঞাসিত] তম্ (সেই) দুর্দর্শম্ (কঠোর সাধনার দ্বারা উপলব্ধব্য) গূঢ়ম্ (অতি গহন অব্যক্ত-স্বরূপ) অনুপ্রবিষ্টম্ (সর্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত) গুহাহিতম্ (বুদ্ধিরূপ গুহাতে অনুভূয়মান) গহ্বরেষ্ঠম্ (ষড়্‌রিপু সংবলিত দেহে বিরাজিত) পুরাণম্ (সনাতন) দেবম্ (দীপ্যমান্ আত্মাকে) অধ্যাত্ম-যোগ-অধিগমেন (একাগ্রচিত্তে নিদিধ্যাসনরূপ অধ্যাত্ম-যোগের দ্বারা) মত্বা (উপলব্ধি করে) ধীরঃ (সুধী ব্যক্তি) হর্ষশোকৌ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব) জহাতি (পরিত্যাগ করেন)।

'দেবং'—দেব শব্দের দ্বারা এখানে ইন্দ্রাদি কোন দেবতাকে বোঝাচ্ছে না। এই শব্দটির ধাতুগত অর্থ প্রকাশমান, স্বপ্রকাশ। এই প্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে জানার পর—'ধীরঃ হর্ষশোকৌ জহাতি'—ধীমান, বিবেকবান, জ্ঞানবান ব্যক্তি হর্ষ এবং শোক উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। তিনি এই আনন্দ ও দুঃখের পারে গিয়ে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হর্ষ ও শোক ত্যাগের জন্য তাঁর কোন চেষ্টার দরকার হয় না। তখন হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না, তাঁর নাগাল পায় না। তিনি এদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। 'জহাতি' পদটি বিধির দ্যোতক নয়। 'জহাতি' মানে—ত্যাগ করবেন, 'ত্যাগ করা উচিত'—এরকম বোঝাচ্ছে না। কারণ এটা স্বরূপে প্রতিষ্ঠ জ্ঞানীরই প্রসঙ্গ, জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের নয়। এখানে আত্মতত্ত্ব লাভের প্রয়োজন বোঝা গেল। এই জ্ঞানলাভের ফলে আমাদের কী লাভ হবে? না, সুখ-দুঃখের অতীত হতে পারব।

সাধারণ মানুষ হয়তো সুখ-দুঃখের অতীত এই তত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হবে না। কেন না তারা বলবে, যার সুখ নেই দুঃখও নেই তার তো গাছ পাথরের মতো অবস্থা! এইরকম মনোভাব তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা পাথরের দশা নয়। পাথরের মধ্যে সুখ-দুঃখের প্রকাশ নেই, কিন্তু আত্মাতে শুধু যে সুখ-দুঃখ অপ্রকাশ তা-ই নয়, সুখ-দুঃখ সেখানে নেই-ই। সুখ-দুঃখের অতীত এই অবস্থা, এটি জড় অবস্থা নয়। জড় অবস্থা হলে বীজাকারে সুখ-দুঃখের কারণ সেখানে থাকত। সুখ-দুঃখের কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান, যতদূর অজ্ঞানের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত সুখ-দুঃখেরও রাজত্ব। সেখানে অজ্ঞানের লেশ থাকা পর্যন্ত তারা হয় প্রকাশিত রূপে, না হয় অনভিব্যক্ত বীজরূপে থাকে। তাই সুখ-দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি নেই। আত্মার স্বরূপ যদি কেউ বোঝে, নিজেকে আত্মা বলে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে এই বীজটুকুও চলে যায়, ফলে সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়। আর এই অবস্থা লাভ করাই আমাদের চরম কাম্য। সুখের অতীত কেন হব? দুঃখকে এড়াতে চাই ঠিকই, কিন্তু সুখকে তো এড়াতে চাই না! তার উত্তর আগেই দিয়েছেন যে—যা কিছু অনিত্য তা দুঃখময়। সুখ যদি অনিত্য হয় তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে দুঃখময়। যে সুখের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এই সুখকে দুঃখের রূপান্তর বলে বুঝে তাকে পরিহার করতে হবে, সুখ-দুঃখের অতীত ভূমিতে যেতে হবে। আত্মজ্ঞ হলেই সুখ-দুঃখ থেকে মুক্তি। কিন্তু সে মুক্তি লাভ করা যে সহজ নয় সে কথা শ্লোকটির অন্য অংশে বলছেন।

প্রথমেই বলছেন সেই আত্মতত্ত্ব 'দুর্দর্শম্'—যাঁকে দর্শন করা অতিশয় কঠিন, বহু আয়াসসাধ্য। কেন? কারণ তিনি—'গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্'—সাধারণের অগম্য

এবং গূঢ়, অর্থাৎ গোপন কোণে লুকিয়ে আছেন। কেমন ভাবে? অজ্ঞানের আবরণের দ্বারা নিজেকে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। তাহলে তাঁকে জানা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। না, ঠিক তাও বলা যায় না। তিনি 'গুহাহিতম্'—হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত। অর্থাৎ যদিও তাঁকে আমরা সংসার ধর্ম-বর্জিত রূপে অনুভব করতে পারি না, তবুও আমরা তাঁকে হৃদয়গুহাতে অবস্থিত রূপে জানি। সেখানে থেকে তিনি আমাদের জ্ঞানের উদ্ভাসন অর্থাৎ প্রকাশ করছেন। এখানে বিশেষ অর্থে 'গুহাহিতং' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং'—গুহাও বলছেন গহ্বরও বলছেন। দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ। হৃদয়-গুহাতে থেকে তিনি মনের সমস্ত বৃত্তিকে উদ্ভাসিত করছেন। মন জড়বস্তু। মনের যত তরঙ্গ সেগুলিও নিজেরা প্রকাশ পায় না। তিনি হৃদয়ে থাকায় তরঙ্গগুলি প্রকাশিত হচ্ছে বলে বলা হলো 'গুহাহিতম্'।

আমরা এই বিষয়ে অন্য এক উপনিষদের একটি শিক্ষা পাচ্ছি যে, হৃদয় হলো জ্ঞানের কেন্দ্র। মস্তিষ্ক বলেননি, বলেছেন হৃদয়। 'হৃদয়েন হি... জানাতি'[১]—হৃদয়ের দ্বারাই মানুষ সব জানে। শাস্ত্রে মনকে জড় বলা হয়েছে। জড় হলো মনের উপাদান এবং চেতনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ নয়, পরোক্ষ সম্বন্ধ। আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করছেন বলে তাঁর আলোকে অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁকে সাক্ষাৎভাবে জানছি না কিন্তু মনের সমস্ত বৃত্তিগুলির প্রকাশকরূপে জানছি। তাঁর পরিচয় পরম্পরাক্রমে পাচ্ছি। যখন তাঁর অনুভব হচ্ছে তখন তা উপাধিযুক্তরূপে হচ্ছে। উপাধি মানে একের ধর্ম যা অন্য বস্তুতে আরোপিত হয়। জড়ের ধর্ম পরিবর্তন, সুখ-দুঃখ, এইগুলি চেতন আত্মাতে আরোপিত হয়। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এগুলি সব আত্মার উপাধি। এই উপাধিযুক্তরূপে, অনাত্ম ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন। আর তিনি আছেন বলে জড়ের ধর্মগুলিও প্রকাশিত। তিনি যদি না থাকতেন তাহলে 'জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ' হতো, সমস্ত জগৎটা অন্ধকার হয়ে যেত। কারণ, পরপ্রকাশ যে বস্তু, তা প্রকাশমান কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হয় না। যেমন, প্রকাশমান সূর্য না থাকলে পৃথিবীর কোন বস্তুই আমরা দেখতে পেতাম না। সূর্যের প্রকাশধর্মী যে আলো সেই আলোকেও যিনি প্রকাশ করছেন তিনি হলেন আত্মা। মনের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছু জানতে পারি না। সেই মন আবার যাঁর কিরণে উদ্ভাসিত, তিনিই আত্মা। মনকে স্বপ্রকাশ না বলার যুক্তি আছে। যা স্বপ্রকাশ তা নিত্য। স্বপ্রকাশ বস্তু অনিত্য হতে পারে না। উৎপত্তি এবং বিনাশ যে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার প্রভাবে বস্তু প্রকাশিত বা তিরোহিত হয়, সেই কারণকেই আমরা প্রকাশমান বলি। কার্যকে বলি না। মনের ধর্মগুলি, বৃত্তিগুলি হলো কার্য—যেহেতু তা উৎপত্তি-বিনাশশীল। সুতরাং

---

১. বৃহদারণ্যক—৩/৯/২৩

বৃত্তিস্বরূপ মনকে আমরা স্বপ্রকাশ বলতে পারি না। মনের দ্বারা সব জানি, মনকে জানি কার দ্বারা? যদি বলি মননের দ্বারা জানি তাহলে একটা logical fallacy হয়—ন্যায়ের, তর্কের একটা দোষ হয়, যে কর্তা সে-ই কর্ম হয়ে যায়। আমি আমার দৃশ্যবস্তুকে জানি। দৃশ্যবস্তু আর আমি যদি এক হতাম তাহলে আমি আর দ্রষ্টা হতে পারতাম না। দৃশ্যবস্তু থেকে আমার ভিন্ন হওয়া চাই। আমি যদি মনকে জানি তাহলে মন থেকে আমার ভিন্ন হওয়া চাই। তা নাহলে মনকে জানতে পারতাম না। তাহলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত এল যে মন স্বপ্রকাশ নয়। অতএব যাঁর আলোকে মন প্রকাশিত তিনিই আত্মা, তিনিই স্বপ্রকাশ। মন পরপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ আত্মা যদি হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থান না করেন অর্থাৎ তাঁর আলোকে মন যদি উদ্ভাসিত না হয় তাহলে মনের সাধ্য নেই জগতের কোন বস্তুকে প্রকাশ করে। সুতরাং তিনি—'গুহাহিত'—রয়েছেন এই কথা ধরে নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করছি না, তবু বুঝতে পারি তিনি ব্যতীত কোন জ্ঞান হতে পারে না।

তিনি যদি হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত হন তাহলে তাঁকে আমরা দেখি না কেন? অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে তাঁকে অনুভব করি না কেন? তার উত্তরে বলছেন—'গহ্বরেষ্ঠম্'—গহ্বরে, দুর্গম প্রদেশে হৃদয় মধ্যে তিনি অবস্থান করছেন। এইজন্য তিনি প্রকাশিত নন। ভাব হচ্ছে এই, যেমন একটা গর্তের চারপাশে দেওয়াল থাকলে ভিতরের বস্তু দেখা যায় না তেমনি যে হৃদয়-গহ্বরে তিনি রয়েছেন সেখানে অজ্ঞানের, বিষয়ের দেওয়াল রয়েছে। নানা বস্তু, নানা জ্ঞান আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইজন্য সেই আত্মবস্তুকে আমরা বুঝতে পারি না। তাই এখানে বললেন, তিনি—'গহ্বরেষ্ঠম্'—গহ্বরে অবস্থিত।

এরপরে বলা হয়েছে সেই আত্মা—'পুরাণম্'। যেহেতু স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ বা অপ্রকাশের কোন কারণ নেই সেইহেতু স্বপ্রকাশ আত্মবস্তু 'পুরাণম্'। পুরাণ শব্দের অর্থ করা হয়েছে—'পুরাপি নব এব'[১]—পুরাতন হয়েও নতুনই। পুরাতন কাকে বলে? না, যার অঙ্গের বিকার হয়েছে। অর্থাৎ নতুন অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেমন সুন্দর ছিল এখন তা নেই। তার অঙ্গের বিকার হয়েছে, ধর্মের অপচয় হয়েছে। কিন্তু আত্মা পুরাতন হয়েও, নিত্যকাল থেকেও 'নব এব'—তিনি নতুনই। অর্থাৎ তাঁর কোন বিকার, অপচয়, উপচয়, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। এইজন্য তিনি পুরাণম্।

এমন যে আত্মা, তাঁকে জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, দেখে হর্ষ-শোক থেকে উত্তীর্ণ হন। কী উপায়ে তিনি সেই আত্মতত্ত্বকে জানেন? 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন'—অধ্যাত্মযোগের প্রাপ্তির দ্বারা। অধ্যাত্মযোগ কাকে বলছেন? আত্মসম্বন্ধী যোগ।

---

১. গীতা, শাঙ্করভাষ্য—২/২০

যোগ মানে উপায়। সুতরাং আত্মসম্বন্ধী যে যোগ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির উপায়কে অধ্যাত্মযোগ বলা হয়। সেই অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করে ধীর, বিবেকী ব্যক্তি আত্মাকে জানেন। আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তাঁকে জানবার কোন উপায় নেই। কেননা তিনি বিষয় নন, বিষয়ী। তাঁকে বিষয় করা যায় না। যিনি সর্বদা বিজ্ঞাতা, তাঁকে কি করে, কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানবে?—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'[১]—ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে অচল। তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা আর সব বস্তু তাঁর জ্ঞেয়। এখন, সেই নিত্য জ্ঞাতা যিনি তাঁকে আমরা জ্ঞানের বিষয় করতে পারি না। এইজন্য তিনি আমাদের কাছে অজ্ঞেয়বৎ হয়ে রয়েছেন। আমাদের বুদ্ধি কাজ করে বিষয়কে নিয়ে। বিষয়কে অবলম্বন করে অন্তঃকরণের পরিণাম প্রাপ্তি হয়। আত্মা সম্বন্ধে সেই প্রশ্ন খাটে না। কারণ আত্মা নির্বিষয়। সুতরাং যেমন করে বিষয়জ্ঞান হয় তেমন করে আত্মজ্ঞান হতে পারে না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, আত্মাকে কেউ জানতে পারে না। এইজন্য আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই হলো আত্মাকে জানা। এ ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই। এখানে যম বলছেন—ধীর ব্যক্তি সেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগাধিগমের দ্বারা জানেন। আত্মবিষয়ক যে যোগ, আত্মাতে স্থিতিরূপ যে যোগ, সেই যোগের দ্বারা তাঁকে জানেন। কথাটি বেদান্তের একেবারে নিষ্কর্ষ বলে মনে রাখতে হবে। বেদান্ত বলেন, আত্মবস্তু হচ্ছেন স্বপ্রকাশ। আমরা প্রকাশস্বরূপ হতে পারলে তাঁর উপলব্ধি হয়। অতএব তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্ম-অভিন্নরূপে তাঁকে আমরা প্রকাশ করতে পারি, অন্য কোন উপায়ে নয়।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—**সঃ** (সেই) **মর্ত্যঃ** (মরণশীল ব্যক্তি) **এতৎ** (এই ব্রহ্মতত্ত্ব) **শ্রুত্বা** (সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ করে) **সম্পরিগৃহ্য** (সম্যকরূপে অবধারণপূর্বক) **ধর্ম্যম্** (ধর্মসম্মত) **এতম্** (এই) **অণুম্** (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মাকে) **প্রবৃহ্য** (দেহাদি থেকে পৃথক করে) **আপ্য** (প্রাপ্ত হয়ে, উপলব্ধি করে) **মোদনীয়ম্** (আনন্দস্বরূপকে) **লব্ধ্বা** (লাভ করে) **হি** (নিশ্চয়ই) **মোদতে** (আনন্দিত হয়)। **নচিকেতসম্** (নচিকেতার কাছে) **সদ্ম** ([ব্রহ্মরূপ] সদন বা গৃহ) **বিবৃতম্** (উন্মুক্ত হয়েছে) **মন্যে** (মনে করি)।

'এতৎ শ্রুত্বা মর্ত্যঃ'—মরণশীল জীব এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করে—'সম্পরিগৃহ্য'—সম্যকরূপে তাকে পরিগ্রহণ করে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তাকে স্বীকার করে,

১. বৃহদারণ্যক—২/৪/১৪

আত্ম-অভিন্নরূপে তাকে গ্রহণ করে—'প্রবৃহ্য ধর্ম্যং'—ধর্মসহায়ে লভ্য এই আত্মবস্তুকে অনাত্মবস্তু থেকে পৃথক করে—'এতম্ অণুম্ আপ্য'—এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব লাভ করে—'মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা'—আনন্দের উৎসস্বরূপ এই আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে—'মোদতে'—আনন্দ করে। এই বলে যমরাজ বলছেন—'নচিকেতসং সদ্ম বিবৃতং মন্যে'—আমি মনে করি নচিকেতার জন্য এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মগৃহের দ্বার উন্মুক্ত।

যমরাজ আত্মাকে অনাত্মবস্তু থেকে পৃথক করতে বলছেন। এই পৃথক করাটি আত্মজ্ঞানলাভের পক্ষে অপরিহার্য। যদিও বলা হয়েছে—'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে'[১]—দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনো বিলোপ হয় না। স্বপ্রকাশ বস্তুকে কেউই অপ্রকাশ করতে পারে না। তথাপি নিত্যপ্রকাশমান হয়েও আত্মা কিন্তু আমাদের কাছে স্বরূপত অজ্ঞাত। কারণ সর্বদাই আত্মার উপরে অজস্র প্রকারের অনাত্মবস্তুর প্রতিফলন হচ্ছে। ফলে আত্মা অনাত্মরূপে অথবা আত্ম-অনাত্ম মিশ্রিতরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছেন। জড়ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে চেতন আত্মা আমাদের কাছে জড়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। যেমন দেহরূপ উপাধি তার ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে আত্মাকে দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত মনে করাচ্ছে। ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিগুলি আত্মাকে ইন্দ্রিয়ধর্মী করে দেখাচ্ছে। মনরূপ উপাধি তার ধর্ম আরোপের দ্বারা আত্মাকে সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্টরূপে দেখাচ্ছে। কাজেই সবসময় আমরা আত্মাকে জানছি অথচ সঠিকরূপে জানছি না, উপাধি-ধর্ম মিশ্রিত-রূপে জানছি। এই মিশ্রিত জ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞানের জন্য আমাদের এই সুখ-দুঃখাদি বোধ হচ্ছে। সমস্ত সংসারধর্মের অতীত যে আত্মতত্ত্ব আমাদের স্বরূপ, তাকে আমরা সংসারধর্মবিশিষ্ট-রূপে বোধ করে হাহাকার করছি। ভাবছি আমাদের জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু হচ্ছে। বারবার এইরকম মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছি। সংসারের নানা যাতনা সবসময় ভোগ করছি। হা-হুতাশ করছি। এর থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ উপায় অতি সোজা—যা যমরাজ নচিকেতাকে বললেন—'প্রবৃহ্য'—অনাত্ম বস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক করা। এই পৃথক করার কথা নানাভাবে শাস্ত্র বারবার বলছেন।

সংস্কৃত ভাষায় 'বিবেক' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে পৃথগ্‌করণ। আত্মার সঙ্গে অনাত্মধর্ম মিশে গিয়েছে। আমরা বুদ্ধির সাহায্যে খুব বিচার করে সকল অনাত্মধর্মগুলিকে আত্মা থেকে সরিয়ে ফেলব, পৃথক করব। যেমন চাল থেকে তুষকে পৃথক করতে হয় তেমনি আত্মা থেকে অন্য আবরণকে পৃথক করতে হয়। এই পৃথগ্‌করণের পর যে অনাত্মবস্তু আত্মার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অভিন্নরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল সেগুলি লয় পাবে এবং আত্মা যা তা-ই থাকবেন। যেমন স্ফটিকের কাছ থেকে লাল ফুলকে সরিয়ে নিলে স্ফটিকের কোন পরিবর্তন

১. বৃহদারণ্যক—৪/৩/২৩

হবে না, যা ছিল তা-ই থাকবে। কেবল জবাফুলের লাল রঙ যা স্ফটিকের সঙ্গে অভিন্নরূপে আমাদের অনুভব হচ্ছিল সেই উপাধি-ধর্ম চলে যাবে। উপাধি-ধর্ম চলে গেলেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হবে।

অনাত্মবস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারছি না বলেই আত্মার উপলব্ধি হয়েও আমরা আত্মাকে স্বরূপে জানছি না। এজন্য যে অবাস্তব প্রতীতি হচ্ছে তা-ই অজ্ঞান। অবাস্তব কেন? না, অনাত্মধর্মগুলি সত্য সত্যই আত্মাতে নেই, তবুও যেন আত্মাতে আছে এইরকমের প্রতীতি হচ্ছে। কাজেই এই প্রতীতি অবাস্তব বা মিথ্যা। আত্মাতে আরোপিত এই মিথ্যা ধর্মগুলিকে সরিয়ে ফেলতে পারলে, পৃথক করতে পারলে আত্মাকে প্রকাশ করবার জন্য আর কোন চেষ্টা করতে হয় না, কোন প্রকারান্তর অবলম্বন করতে হয় না। কারণ, আত্মা স্বপ্রকাশ। আত্মা আমাদের নিত্য অপরোক্ষ বস্তু।

কথাটা তো বলতে খুব সোজা যে পৃথক কর। করব কি করে? যখন করতে যাই তখন দেখি যেন এমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভিতরে রয়েছি যা কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না। শাস্ত্র বলছেন—আলোর সঙ্গে অন্ধকারের কোন অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে কি? না, বন্ধন নেই, সেটা অসম্ভব। আলো আর অন্ধকারকে যেমন একসঙ্গে বাঁধা যায় না তেমনি অনাত্মা আর আত্মা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। তাদের ধর্মের মিশ্রণ হওয়া কোন রূপেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এমন মোহগ্রস্ত যে কিছুতেই এই সাধারণ কথাটি ধারণা করতে পারছি না। 'আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ'[১]।। —যদি—'আত্মা এইপ্রকার'—বলে কেউ নিশ্চিতরূপে জেনে থাকে তাহলে—'কিমিচ্ছন্'—কী ইচ্ছা করে—'কস্য কামায়'—কিসের কামনায়—'শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ' —এই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হবে? দুঃখ হলো শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম, আত্মাকে তারা স্পর্শ করতে পারে না। দুঃখের নামান্তররূপ যে সুখ, সে সুখও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এইটি যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আর এই সুখ-দুঃখের দাস হয়ে থাকব না। কথাটা সোজা, কিন্তু বিপরীত সংস্কার এমন দৃঢ় হয়ে আছে যে কিছুতেই তাদের পৃথক করতে পারছি না। শাস্ত্র বলছেন—এটি অভ্যাস করতে হবে। 'কথামৃত' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের কথা। 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।'[২] এই যে নিত্য ও অনিত্য, ঈশ্বর এবং জগৎ বা ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য, এগুলিকে পৃথক করতে পারলে আর কিছু করবার বাকি থাকবে না। তখনই আত্মানুভূতি হবে।

---

১. বৃহদারণ্যক—৪/৪/১২

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫

আমরা বলি, আত্মাকে কি জানা যায়? শাস্ত্র তো পড়লাম, তাতে তো অনুভূতি হচ্ছে না। 'অনুভূতি' কথাটার মানে কী? অনুভূতি কি একটা আজগুবি কোন অবস্থা? তা নয়। অনুভূতি মানে অপরোক্ষ, অসন্দিগ্ধ, অবিপর্যস্ত জ্ঞান, যে জ্ঞানের ভিতরে কোন সন্দেহ নেই, বিকার নেই। অর্থাৎ যেটি যা সেটিকে ঠিক সেইভাবে, নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানার নাম অনুভূতি। তবে পরোক্ষ জ্ঞানও আছে। যেমন, লণ্ডনের বর্ণনা শোনা আর লণ্ডন দেখা—দুটো কি এক হবে? লণ্ডন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যাতে স্পষ্ট হবে, তাকে বলব লণ্ডনের অনুভূতি। আর লণ্ডন সম্বন্ধে শোনা কথা হলে, তা হবে পরোক্ষ জ্ঞান, একটা অস্পষ্ট ধারণা। সেইরকম শাস্ত্র পড়ে বা শুনে আত্মা সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা হয়—তাকে আমরা পরোক্ষ জ্ঞান বলতে পারি। আর আত্মাকে যখন স্বরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি তখন তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা আত্মানুভূতি বলি।

এখানে অবশ্য আমাদের কথার ভিতরে একটু ত্রুটি থাকছে। লণ্ডন আমাদের থেকে ভিন্ন বস্তু, আমার থেকে দূরে। লণ্ডন সম্বন্ধে শোনা একরকম, আর সেখানে গিয়ে দেখা আর একরকম। কিন্তু আত্মা তো আমার থেকে দূরে নন। আত্মা তো সর্বদাই আমার সঙ্গে রয়েছেন অর্থাৎ তিনিই আমার স্বরূপ। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে কি পরোক্ষ জ্ঞান হয়? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র খুব জোর দিয়ে বলেছেন, আত্মা হলেন নিত্য অপরোক্ষ স্বপ্রকাশ বস্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক বিষয়ে যে ধরনের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাঁর সম্বন্ধে সেই ধরনের পরোক্ষ জ্ঞান কখনো হতে পারে না। যেহেতু আত্মা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে রয়েছেন, আমাদের থেকে দূরে নন, কাজেই ঘটপটাদি বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞানের মতো আত্মার জ্ঞান কখনো পরোক্ষ হয় না। শাস্ত্র আরো বলেন—পরোক্ষ জ্ঞান না হলেও আমরা একে পরোক্ষ বলি এইজন্য যে, আত্মার সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান আমাদের হচ্ছে না। 'পরোক্ষমিতি অনুল্লেখাদ্ অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ'[১]—নিত্য অপরোক্ষ যিনি তাঁকে পরোক্ষ রূপে গ্রহণ করতে না পারলেও ফলটা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে পরোক্ষেরই মতো। শাস্ত্র থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান হচ্ছে না, আত্মবিষয়ক সন্দেহ যাচ্ছে না। কোন জিনিসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে সে সম্বন্ধে যেমন আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আত্মা সম্বন্ধে ঠিক সেইরকম নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হচ্ছে না বলে পারিভাষিক শব্দে পরোক্ষ জ্ঞান না বললেও ফলটা একই দাঁড়াচ্ছে। এইরকম জ্ঞানের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটছে না। সুতরাং এই জ্ঞানকে বলব 'পরোক্ষ', অথবা বলব 'অপরোক্ষ জ্ঞান' নয়।

শাস্ত্র বলছেন—আমাদের সংশয় বা সন্দেহের কারণ হচ্ছে দৃঢ় বিপরীত-সংস্কার। অনেকদিন ধরে এই অনুভব হয়েছে যে ওখানে যেন একটা সাপ

১. পঞ্চদশী—৭/৫৪

দেখেছি, ভয়ে সেদিকে যাই না। তারপর আলো এনে দেখা গেল ওটা সাপ নয়, দড়ি। তবু সেদিকে গেলেই সেই ভয়. বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এই আমাদের অবস্থা! শাস্ত্র বলে দিলেন আমরা জন্মমৃত্যুহীন আত্মা। কিন্তু আমাদের এমন দৃঢ়মূল বিপরীত সংস্কার যে সন্দেহ যায় না। এই সন্দেহ যতদিন উঠবে ততদিন আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না আর ততদিন জন্মমৃত্যুর হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাব না।

সংশয় কখন যাবে? শাস্ত্র বলছেন—তাঁকে দেখবার পর সমস্ত সংশয় চলে যাবে। 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ....তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'।[১] তাঁকে দেখবে কখন? না, যখন সংশয় যাবে। সংশয় গেলে তবে তাঁকে দেখা আর তাঁকে দেখলে তবে সংশয় যাওয়া, কথাটা মনে হয় হেঁয়ালির মতো। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করলে হেঁয়ালি মনে হবে না। অসন্দিগ্ধ জ্ঞান আর অপরোক্ষ জ্ঞান এক কথা। সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত যে জ্ঞান সেই জ্ঞান হলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হলো। তারপর আর সংশয় হবে না। যতক্ষণ সংশয়ের অবকাশ আছে ততক্ষণ তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা যাবে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, কেবল শব্দ শুনে অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হবে না।

আত্মাকে অসন্দিগ্ধরূপে জানতে হলে যে উপায়গুলি অবলম্বন করতে হবে সেগুলি কী কী? অন্যত্র আছে—

'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥'[২]

—খুব দরকারি কথা, অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের উপায়গুলির কথা এখানে বলা হয়েছে। প্রথমে আচারশুদ্ধি চাই। 'ন অবিরতঃ দুশ্চরিতাৎ'—যে পাপাচরণ থেকে বিরত হয়নি সে প্রজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা এই আত্মাকে পাবে না। তাই আচারশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। 'আচারশুদ্ধি' মানেই হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এক কথায় বলেছেন, মন মুখ এক করা বা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ—এগুলির অনুশীলন করা। এই অনুশীলনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হবে। চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাজারবার শাস্ত্রকথা শুনলেও শাস্ত্রের তাৎপর্য আমাদের অন্তরে রেখাপাত পর্যন্ত করবে না। গোড়ার কথা সেইজন্য যে দুশ্চরিত বা পাপাচরণ থেকে বিরত হতে হবে। তারপর বলেছেন—'ন অশান্তঃ'—যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেননি, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের ধারণা হবে না। 'ন অসমাহিতঃ'—যিনি মনকে ধ্যেয় বস্তুতে কেন্দ্রিত করতে শেখেননি, মনের একাগ্রতা অভ্যাস করেননি, তাঁরও বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হবে না। 'অশান্তমানসঃ বা অপি'—অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। ধ্যেয় বস্তুতে মনকে কেন্দ্রিত করার

১. মুণ্ডক—২/২/৮
২. কঠোপনিষদ্—১/২/২৪

পর যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ধ্যেয় বস্তুতে মন সমাহিত হচ্ছে, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় সমাধি বলি, সেই সমাধি না হওয়া পর্যন্ত এই অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না। 'সম্যক্ আধীয়তে ইতি সমাধিঃ'—মন সম্পূর্ণরূপে এই আত্মাতে অবস্থান করবে, এরই নাম সমাধি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না।

আত্মাকে অসন্দিগ্ধভাবে জানতে হলে আত্মা সম্বন্ধে বারবার শুনতে হবে—শ্রোতব্যঃ, মনে মনে বিচার করতে হবে—মন্তব্যঃ, বিচার করে যে তত্ত্ব পেলাম তাতে চিত্তকে নিবিষ্ট করে রাখতে হবে—নিদিধ্যাসিতব্যঃ। সবই ঠিক, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, যে মন দিয়ে এই অনুশীলন, অভ্যাসগুলি করব সেই মনের যথোচিত শুদ্ধি হয়েছে কিনা। তা না হয়ে থাকলে সে মন কাজে লাগবে না। ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কিছু কাটতে চেষ্টা করলে তা কাটা তো যায়ই না, তলোয়ারটাই ভেঙে যায়। তাই আগে মন-রূপ যন্ত্রটাকে উপযোগী করতে হবে। যাকে ধর্ম বলি সে সবই এর ভিতরে এসে পড়ে। 'ধর্ম্য' অর্থাৎ ধর্মের দ্বারাই আত্মবস্তু লভ্য। ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত প্রণালীগুলি সবই মনের শুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মন শুদ্ধ হলে তখন বিচার কাজে লাগবে। মনের শুদ্ধি মানে—যে মন এখন আমাদের এবং আত্মতত্ত্বের মধ্যে আবরণ সৃষ্টি করে রয়েছে—সেই মন তখন স্বচ্ছ হয়ে যাবে, ভেদজ্ঞান দূর করে দেবে। আমরা যে আত্মা থেকে অভিন্ন এটি বোধ হবে। যদিও আত্মা সর্বদাই আমার থেকে অভিন্ন কিন্তু এখন যে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে এই ভ্রান্ত ভেদজ্ঞান তখন অপসারিত হবে। এই হলো প্রণালী। এই প্রণালী অনুযায়ী যদি চেষ্টা না করা হয়, তাহলে কেবল অধ্যয়ন বা তর্কবিতর্ক বা আলোচনার ফল কিছু হবে না, আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শাস্ত্র এইকথা বারবার বলেছেন।

এই পৃথককরণ আর অপরোক্ষ অনুভূতির মাঝে কোন অন্তরাল, কোন মধ্যবর্তী সাধন নেই যার দ্বারা আত্মবস্তুকে লাভ করা যায়। আত্মা আমাদের থেকে ভিন্ন নন বলে তাঁকে পাবার প্রশ্নই ওঠে না। অনাত্ম-ধর্ম থেকে পৃথক করলেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এরই নাম প্রাপ্তি। নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুর আর প্রাপ্তি হতে পারে না। আমার খেয়াল নেই যে আমার গলায় হার আছে, খুব ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। একজন দেখিয়ে দিল হার গলাতেই রয়েছে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে হারটা হারিয়ে গিয়েছিল, পাওয়া গিয়েছে কি? বলতে হয়, হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছে। তার অর্থ, হারিয়ে যাওয়া জিনিস যেমন অন্যত্র খুঁজে সংগ্রহ করতে হয় সেরকম নয়। অপ্রাপ্ত বলে যে ভ্রম হচ্ছিল সেই ভ্রমের দূরীকরণের নামই এখানে পাওয়া। আত্মবস্তুর অপ্রাপ্তির বোধ দূর হয়ে গেল। যেমন—ধান থেকে তুষ বাদ দিয়ে চাল পাওয়া। যখন ধান হাতে নিয়েছি চালকেও নেওয়া হয়েছে। চাল সেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু নয়

কিন্তু তবু চাল পাচ্ছি না। তুষের আবরণ থাকার জন্য চাল আমার কাছে প্রাপ্ত হয়েও অপ্রাপ্ত। তুষ সরিয়ে দিলে তখন চালের প্রাপ্তি হলো। সে প্রাপ্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির মতো নয়—তুষের আবরণ থেকে বিমুক্তরূপে প্রাপ্তি। কাজেই যমরাজ যে এই শ্লোকে—'আপ্য'—বলেছেন, তা ঠিক অন্য বস্তুর প্রাপ্তির মতো নয়। নিরাবরণরূপে, অনাত্মধর্মবর্জিতরূপে আত্মার অনুভবকেই এখানে 'আপ্য' বলা হয়েছে।

তারপর যমরাজ যে কথাগুলি বলছেন তাতেও ঐ প্রাপ্তিরই বিশদীকরণ করা হয়েছে। সেই মোদনীয় আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে লাভ করে আত্মজ্ঞ পুরুষ আনন্দ করেন। এসব কথা আত্মবস্তুর অপরোক্ষ অনুভূতিকে বোঝাবার চেষ্টা মাত্র, এগুলি কোন ক্রম নয়। যে জিনিস আমাদের খুব দরকার বা খুব প্রিয়, তা পেলে মনে একপ্রকার বৃত্তি ওঠে, তার নাম সুখ বা আনন্দ। প্রাপ্তির সঙ্গে সেই আনন্দের একটা ক্রম আছে। লৌকিক বস্তু প্রথম ক্রম, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির যোগ হলো দ্বিতীয় ক্রম, তার ফলে অন্তঃকরণে যে সুখাকারা বৃত্তি ওঠে তা হলো তৃতীয় ক্রম। এগুলি পরপর হয়। কিন্তু আত্মবস্তু তো নিত্য প্রাপ্ত। সুতরাং এখানে ঐরকম কোন ক্রম হচ্ছে না। ধাপে ধাপে নয়, একসঙ্গেই ঐ তিনটির আবির্ভাব হয়। পৃথককরণের পর ক্রমপ্রাপ্তি নয়, পৃথককরণ মাত্রই প্রাপ্তি। আবার প্রাপ্তির পর আনন্দানুভূতি নয়, প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দানুভূতি। এই আনন্দকে আনন্দাকারা বা সুখাকারা বৃত্তি বলে না। কারণ, আত্মা আনন্দস্বরূপ। আত্মার অনুভব মানে সেই আনন্দস্বরূপের অনুভব। আত্মবস্তু আর আনন্দ দুটি পৃথক বস্তু নয়, পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণসম্বন্ধ নেই। সেই আত্মবস্তু মোদনীয়। তার মানে এই নয় যে আনন্দের যোগ্য, মোদনীয় মানে আনন্দস্বরূপ। 'স মোদতে'—মানে সে আনন্দ করে, তা নয়, সে আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকে। মোদন একটা নতুন কিছু নয়, ধর্মান্তর সৃষ্টির সূচক নয়। এটি তাঁর স্বরূপের নির্বচন। লৌকিক বস্তু লাভ করার আনন্দের সঙ্গে আত্মবস্তু লাভের আনন্দের এই পার্থক্য।

তারপর নচিকেতাকে প্রশংসা করে যমরাজ বলছেন—'বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে'—নচিকেতার জন্য এই আত্মতত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত বলে মনে করি। সদ্ম মানে গৃহ। সুতরাং যমরাজের কথার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, নচিকেতার জন্য গৃহ উন্মুক্ত। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, তাই সম্ভাব্য অর্থ নিতে হবে। গৃহ মানে একটি পরিচ্ছিন্ন স্থান। আত্মা যদি পরিচ্ছিন্ন হন তবেই তিনি সেই পরিচ্ছিন্ন স্থানে থাকতে পারেন। অপরিচ্ছিন্ন আত্মা পরিচ্ছিন্ন গৃহে থাকতে পারেন না। এখানে গৃহ মানে হচ্ছে আত্মস্বরূপ। গৃহ নয়—'গৃহ ইব'। 'সদ্ম ইব সদ্ম'—যেন গৃহ। তাহলে—সদ্ম মানে দাঁড়াল—আত্মস্বরূপানুভূতি। এই অনুভূতির জন্য নচিকেতার কাছে দ্বার উন্মুক্ত। অর্থাৎ এই আত্মবস্তুকে আবরণে

ঢাকা দেয়, আচ্ছাদিত করে—এমন আর কিছু নচিকেতার কাছে রইল না। দরজা খোলা, বাধা রইল না। যমরাজ বলছেন, আত্মতত্ত্ব অনুভূতির পক্ষে কোন বাধা আর নচিকেতার রইল না, এইরকম মনে করি। 'মনে করি' বলার তাৎপর্য হলো—এখনো অবধি নচিকেতাকে উপদেশ পূর্ণরূপে দেওয়া হয়নি। তাঁকে উপদেশ দেওয়া আরম্ভ হয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও যমরাজ বলছেন যে নচিকেতার কাছে দরজা খোলা অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে নচিকেতা এই আত্মতত্ত্বের অধিকারী। 'হবে' আর 'হয়েছে' সমানার্থক। অদূর ভবিষ্যতে এই আত্মতত্ত্ব নচিকেতার কাছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবে, এই বলে নচিকেতাকে প্রশংসা করলেন যমরাজ।

আত্মপ্রশংসা শুনে অভিভূত না হয়ে নচিকেতা পুনরায় আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন এবং এমনভাবে প্রশ্ন করছেন যে শুনলেই মনে হবে তিনি আত্মার স্বরূপ জানেন। তাহলে প্রশ্নের তাৎপর্য কী? এখানে তাৎপর্য হলো নচিকেতা কেবল বুদ্ধির সাহায্যে আত্মতত্ত্বকে জানতে চাইছেন না অর্থাৎ সংশয়বিপর্যয়রহিত আত্মজ্ঞান চাইছেন। এখানে যা বলা হলো, তা আত্মতত্ত্বের দিক্-দর্শন হলেও তার দ্বারা নচিকেতা সংশয়-বিপর্যয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন, তাঁর জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে—এমন বোঝা যায় না। এর পরেও প্রশ্ন-উত্তরের অবকাশ থাকে। তাই নচিকেতা আবার প্রশ্ন করছেন—

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—[নচিকেতার উক্তি]—ধর্মাৎ (শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের ফল) অন্যত্র (থেকে পৃথক) অধর্মাৎ (অশাস্ত্রীয় কর্মের ফল) অন্যত্র (থেকে পৃথক) [ধর্মাধর্ম বিবর্জিত] অস্মাৎ (এই) কৃতাকৃতাৎ (কৃত অর্থাৎ কার্য, অকৃতাৎ অর্থাৎ কারণ থেকে) অন্যত্র (বিলক্ষণ) চ (এবং) ভূতাৎ (অতীত) ভব্যাৎ (ভবিষ্যৎ) চ (এবং) [বর্তমান থেকে] অন্যত্র (ভিন্ন) যৎ (যে) তৎ (সত্য বস্তু) পশ্যসি (আপনি জানেন) তৎ (তাই) বদ ([আমাকে] বলুন)।

'যৎ তৎ পশ্যসি'—আপনি যে আত্মতত্ত্ব জানেন—'তৎ বদ'—সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ আমাকে দিন। যে আত্মতত্ত্ব—'ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ অন্যত্র'—কার্য বা কারণ উভয় থেকে ভিন্ন। 'ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ'—অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কাল থেকেও ভিন্ন। এই আত্মতত্ত্ব আপনি জানেন—'যৎ তৎ পশ্যসি'—সেই বস্তুবিষয়ক উপদেশ আমাকে বলুন—'তৎ বদ'।

শাস্ত্র যে কর্মগুলি অনুষ্ঠেয় বলে নির্দেশ করেছেন তাদের ধর্ম বলা হচ্ছে। এই ধর্মের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ হবে না, স্বর্গাদিলাভ হবে। এই স্বর্গাদিসুখ নিত্য নয়, উৎপাদ্য, অতএব নাশ্য। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মকে অধর্ম বলা হয়েছে। এই ধর্ম এবং অধর্ম থেকে ভিন্ন বলাতে, সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধগুলি থেকে আত্মজ্ঞানকে পৃথক করা হলো।

তাছাড়া এই আত্মতত্ত্ব কৃত এবং অকৃত থেকেও ভিন্ন। কৃত বা কার্য, যা কর্মের ফল এবং অকৃত বা কার্যের বিপরীত অর্থাৎ কারণ; তা থেকে এই আত্মতত্ত্ব ভিন্ন। দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে বলা হয় কার্য, আর তার কারণ হলো কর্ম বা অবিদ্যা। 'অবিদ্যাকামকর্ম'—এই তিনটি শব্দ বহুবার শাস্ত্রে পরপর ব্যবহৃত হয়েছে। আচার্য শঙ্কর অনেক জায়গাতেই এই তিনটি শব্দ একই ক্রমে ব্যবহার করেছেন। 'অবিদ্যা' মানে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান, যে অজ্ঞানের জন্য আত্মার স্বরূপকে জানা যায় না এবং যে অজ্ঞানের জন্য আত্মাকে শুভাশুভ কর্মের কর্তা এবং সুখদুঃখাদি ফলের ভোক্তারূপে মনে হয়। অবিদ্যা থেকে আসে 'কামঃ'। আত্মার স্বরূপ না জানার জন্য আমাদের মনে অপূর্ণতাবোধ থাকে এবং ঐ অপূর্ণতা দূর করবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা হয় তাই কাম। ঐ আকাঙ্ক্ষা-প্রেরিত হয়ে পূর্ণতালাভের জন্য 'কর্ম' করছি। এইভাবে অবিদ্যা, কাম, কর্ম—তিনটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। একটি থাকলে আর দুটি আসবে। এখানে সংক্ষিপ্ত করে বলছেন, দেহেন্দ্রিয়াদি 'কার্য', এবং তৎপূর্বে যে কৃতকর্ম তা 'কারণ'। কার্য ও কারণ থেকে ভিন্ন যে আত্মা সেই আত্মার কথা নচিকেতা জানতে চাইছেন।

সেই আত্মা আরো কিরকম? অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক। ভাষ্যকার বলছেন— বর্তমান থেকেও পৃথক। অতীত ও ভবিষ্যৎ যা বলা হলো তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানকেও ধরে নিতে হবে। কারণ, স্বরূপত অবিভাজ্য, অখণ্ড কালকে আমাদের বুদ্ধি অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। এই মুহূর্তে যে চিন্তা বা অনুভব হচ্ছে, তাকে বর্তমান আর তার আগেরগুলিকে অতীত এবং আগামীগুলিকে ভবিষ্যৎ বলি। একই কালের এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ দ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন নন। তাঁকে দেশ কাল বা অন্য বস্তু দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। আত্মা সর্বদেশে, সর্বকালে ও সর্ববস্তুতে রয়েছেন। এদেশের আত্মা, ওদেশের আত্মা বা বর্তমান কালের আত্মা, অতীতের আত্মা ও ভবিষ্যতের আত্মা, কিংবা এ-বস্তুর আত্মা ও-বস্তুর আত্মা—এরকম ব্যবহার নির্বোধেও করবে না। নচিকেতা বিশেষ করে এই ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য আত্মাকেই জানতে চাইছেন। যে আত্মা দেহে পরিচ্ছিন্ন অথবা দেহান্তরগামী নন, যিনি এসবের অতীত, নচিকেতা তাঁরই উপদেশ চাইছেন। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ করুন, একথা বললেই যথেষ্ট হয় না। তাই নচিকেতা আত্মাকে বিশেষিত করে বললেন যে, আমি সেই আত্মার উপদেশ চাই যিনি এসবের অতীত।

যমরাজ এখানে তদনুরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেবেন এবং সেই উপদেশের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে আরো কতকগুলি সাধনের কথা বলবেন যেগুলি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে পরম্পরাক্রমে উপযোগী। এই পরম্পরা অনুসরণের প্রয়োজন আছে কারণ আত্মাকে সহসা জানা যায় না, ক্রম অনুসরণ করে ধীরে ধীরে, স্থূলরূপ, তার থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর রূপ—এইভাবে ক্রমশ আত্মতত্ত্বে পৌঁছানো

যায়—অরুন্ধতী-দর্শন ন্যায়ের মতো। অরুন্ধতী একটি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র, হঠাৎ নজরে পড়ে না। তাই প্রথমে বলা হবে, ঐ যে সাতটি তারা, ঐ হলো সপ্তর্ষি। তাদের মধ্যে ঐ তারাটির নাম বশিষ্ঠ। এইবার বশিষ্ঠের পাশে লক্ষ্য করলে একটি খুব অস্পষ্ট ছোট্ট তারা দেখা যাবে। তারই নাম অরুন্ধতী। এইভাবে ক্রমশ বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও এক কথায় উপদেশ দিলে ধারণা হয় না। কাজেই ধীরে ধীরে, মানুষ যেভাবে জানতে অভ্যস্ত সেইভাবে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, তার থেকে সূক্ষ্মতর, অবশেষে সূক্ষ্মতম—এইভাবে একটু একটু করে তাকে নিয়ে গিয়ে সেই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—'অণোরণীয়ান্'—বলে যাকে বলা হয়েছে, সেই তত্ত্বে পৌঁছাতে হয়।

যমরাজও এইভাবেই নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—[মৃত্যুদেবতার উত্তর] সর্বে বেদাঃ (সম্পূর্ণ বেদশাস্ত্র অর্থাৎ সারভূত উপনিষদ্‌সমূহ) যৎ (যে) পদম্ (গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য তত্ত্বকে) আমনন্তি (নির্দেশ করেন) চ (এবং) সর্বাণি তপাংসি (সর্ববিধ তপস্যা) যৎ (যে তত্ত্ব) বদন্তি (প্রতিপাদন করে) যৎ (যে বস্তুর) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষী হয়ে) [লোকে] ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচারীর ব্রত) চরন্তি (পালন করে) তৎ (সেই) পদম্ (ঈপ্সিত তত্ত্ব) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলছি) এতৎ (ইনিই) ওম্ ইতি (ওঙ্কার পদবাচ্য)।

প্রথমে ওঙ্কার সম্বন্ধে বলছেন—'সর্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি'—সমগ্র বেদ যাকে অভিন্নরূপে—'পদ'—অর্থাৎ প্রাপ্তব্য বলে নির্দেশ করেন—'তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি'—সকল তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন যাকে প্রতিপাদন করে—'যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'—যে বস্তুকে লাভ করবার জন্য সাধুরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিধিপূর্বক গুরুগৃহে বাস, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি আচরণ করেন। 'তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি'—আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলছি—'ওম্ ইতি এতৎ'—ওম্‌ই সেই পদ।

আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে যমরাজ ওঙ্কারের উপদেশ করলেন—এটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। এর তাৎপর্য এই যে, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য বস্তু। সেই তত্ত্বকে হঠাৎ তার স্বরূপে বর্ণনা না করে, মন তাঁকে কী উপায়ে ধারণা করবার উপযোগী হয়—এই প্রসঙ্গে, প্রথমে ওঙ্কারের উপাসনার

কথা বললেন। ওঙ্কারের উপাসনা আত্মতত্ত্বকে ধারণার পক্ষে সহায়ক হবে। শুদ্ধবুদ্ধিতে যে তত্ত্বকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, অপরোক্ষরূপে অনুভব করা যায়, তাঁকে অশুদ্ধ মন দিয়ে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে মনের শুদ্ধির জন্য অথবা তত্ত্বকে সহজবোধ্য করবার জন্য যমরাজ প্রথমে ওঙ্কারের উপাসনার কথা বললেন।

আত্মোপলব্ধিই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য, বেদ সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন। তবে বেদ সাক্ষাৎভাবে আত্মতত্ত্বের কথা সব জায়গায় বলেন না, পরম্পরাক্রমে, নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলেন। কর্ম এবং উপাসনার ভিতর দিয়ে সাধককে নিয়ে গিয়ে ক্রমশ আত্মতত্ত্বের অধিকারী করেন।

বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভূতিতে। জীব যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয় অর্থাৎ জীবের অব্রহ্মভাব তার স্বরূপ নয়, ঔপাধিক, উপাধিবশত তার উপরে আরোপিত, এ বিষয়টি সমগ্র বেদই বোঝাচ্ছেন। 'সর্বে বেদাঃ'—বলার মধ্যে খুব জোর, emphasis রয়েছে। এই জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একথা বোঝানো যে, বেদ কেবল যাগযজ্ঞ করতে বলেন তা নয়, আত্মার স্বরূপকেও প্রকাশ করেন। শেষেরটিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃত তাৎপর্য। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিরও তাৎপর্য পরম্পরাক্রমে আত্মজ্ঞানে।

মীমাংসকদের অভিমত হলো—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্ তস্মাৎ অনিত্যমুচ্যতে'[১]—বেদের 'অর্থ' অর্থাৎ তাৎপর্য কর্মে। বেদ মানুষকে কর্মে নিযুক্ত করে, যা কর্মকে প্রতিপাদন করে না, তা অনর্থক। কিন্তু বেদের কোন অংশকেই অনর্থক বলা চলে না। এইজন্য কর্মকে প্রতিপাদন করে না এমন অংশগুলিকে মীমাংসা দর্শনে কর্মের সহকারী বা কর্মের অঙ্গরূপে বলা হয়েছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই কথাতেই বেদের তাৎপর্য বলে অদ্বৈতবাদীরা বলেন। মীমাংসকরা তা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে—জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য অসম্ভব। তাঁরা বলেছেন—আমি জানলাম জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন, তাহলে কথাটা কী দাঁড়াল? জীব কর্তা বা ভোক্তা নয়। জীব যদি কর্তা বা ভোক্তা না হয়, তাহলে—'সোমেন যজতে'[২] —সোম যাগ করবে, একথা কাকে বলা হলো? কর্তা না থাকলে যজ্ঞের অধিকারী নেই, সুতরাং সোমযাগ করতে বলা অর্থহীন। আবার বেদ বলছেন, 'সুবর্গকামো যজেত'[৩]—স্বর্গসুখ ভোগ করবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করবে। কিন্তু ভোক্তাই যদি না থাকে অর্থাৎ কামনাবিশিষ্ট কোন জীব না থাকে তবে কার জন্য বেদ এসব বিধান দিয়েছেন? যদি এই বাক্যগুলি কারো জন্য বিধান রূপে না দেওয়া হয়, তাহলে এগুলি

১. জৈমিনী সূত্র, ১/২/১
২. তৈত্তিরীয় সংহিতা—৩/২/২
৩. তদেব—২/৫/৫

অর্থাৎ বিধিবাক্যগুলি নিরর্থক হবে। অতএব বেদ অপ্রমাণ হবে। এরকম বেদবিরোধী অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং মীমাংসকদের মতে কর্মেই বেদের তাৎপর্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতা কিভাবে হবে? সেগুলি তো সাক্ষাৎভাবে কর্ম নয়। এর উত্তরে মীমাংসকরা বলছেন, উপাসনা কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। কর্মকে আর একটু ব্যাপক অর্থে যদি গ্রহণ করি তাহলে একদিকে যাগযজ্ঞাদিতে আহুতি দেওয়া প্রভৃতিকে যেমন শারীরিক কর্ম বলা যায়, তেমনি কর্মের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত দেবতার চিন্তাকে মানসকর্ম বলা যেতে পারে। যদি বলা যায়—বেদের উপনিষদ্ অংশে যেখানে জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তার কী ব্যাখ্যা হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকরা বলেন—এই অসম্ভব বাক্যগুলির অভিধেয় অর্থ গ্রহণ করা চলবে না, লক্ষণার দ্বারা সেগুলির অর্থ নির্ণয় করতে হবে। জীব অল্পশক্তি, ব্রহ্ম সর্বশক্তি ; জীব অল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ; জীব নশ্বর, ব্রহ্ম অবিনশ্বর। সুতরাং জীব আর ব্রহ্মের একত্ব বা অভেদ সম্ভব নয়। কাজেই লক্ষণার দ্বারা আমরা অর্থ করে নেব যে, যজমান নিজেকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করবেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'[১]। এরকম ভাবনার দ্বারা যজমানের বিশেষভাবে শুদ্ধি হয় এবং যজ্ঞীয় কর্মের অঙ্গরূপেই এই শুদ্ধি তাঁর প্রয়োজন। অনুরূপভাবেই বলা হয়েছে যূপকাষ্ঠকে সূর্যরূপে ভাবনা করবে। যূপকাষ্ঠ কিছু সূর্য নয়। সুতরাং 'আদিত্যো যূপঃ'[২]—এইরকম কথা থাকলেও, আদিত্যকে যূপ বলে গ্রহণ করতে হবে না। সেখানে বুঝতে হবে যে, যূপকাষ্ঠকে আদিত্যরূপে ভাবনা করতে হবে। এই ভাবনার দ্বারা যূপকাষ্ঠের শুদ্ধি হবে। যাঁরা পূজাদি করেন তাঁদের জানা আছে জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি করতে হয়। কেন? না, এগুলি শুদ্ধ হলে পূজার উপযোগী হবে। অশুদ্ধ বস্তু পূজার অঙ্গ হতে পারে না। এইরকমই যজমান যিনি ব্রহ্ম নন, তাঁকে 'আমি ব্রহ্ম' বলে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করতে বলছেন, ব্রাহ্মীভাবনা দ্বারা তিনি শুদ্ধ হয়ে যজ্ঞে যজমানরূপে কাজ করতে পারবেন। অতএব যজ্ঞীয় কর্মে যজমানের শুদ্ধিপ্রসঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে। এই হলো মীমাংসকদের কথা।

বেদ অন্ত্য অর্থাৎ চরম প্রমাণ। তার অর্থ বুঝবার জন্য আমাদের লৌকিক প্রণালী অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। অর্থাৎ আর পাঁচটা বিষয় যেভাবে বুঝে থাকি বেদকে সেইভাবেই বুঝতে হবে। তবে মীমাংসকগণ বলেন, বেদার্থ গ্রহণ করবার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য। কারণ, সাধারণত বক্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে, তার বিবক্ষা অর্থাৎ সে কী বলতে

১. বৃহদারণ্যক, ১/৪/১০

২. কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২/১/৫/২

চাইছে—তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। একটা লৌকিক উদাহরণ দেওয়া যাক। মা ছেলেকে বলছেন, 'বিষ খা'। এখানে মাকে আমরা জানি, মা-ছেলের সম্বন্ধও জানি। অতএব প্রাণঘাতক 'বিষ' মা ছেলেকে খেতে বলবেন—এ কখনোই হতে পারে না। অতএব এ ক্ষেত্রে 'বিষ খা' শব্দে আক্ষরিক অর্থ ও তাৎপর্য কখনোই এক হবে না। অনেক সময় কেবল ভাষা নয়, মুখের ভাবভঙ্গি,আকার-ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা ইত্যাদির দ্বারাও মানুষের মনের কথা বোঝা যায়—

'আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥'[১]

কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ বলে এর কোন বক্তা নেই। সুতরাং বক্তা সম্বন্ধে কোন ধারণা করে নিয়ে বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করা যাবে না। বেদশাস্ত্রে প্রযুক্ত শব্দগুলি ছাড়া অর্থগ্রহণের অন্য কোন উপকরণ নেই। এই কারণে বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বেদের মধ্যে এত বিভিন্ন রকমের কথা আছে যে সেগুলির সামঞ্জস্য করা দুরূহ ব্যাপার। অতএব ব্যাখ্যাতৃগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে অর্থ আবিষ্কার করেছেন। কেউ বলেছেন, সমস্ত বেদ যে একই কথা বলতে চাইছেন তা আমরা ধরে নেব কেন? বেদে নানাজনের অবদান আছে। এক একজন ঋষি এক এক কথা বলেছেন। প্রত্যেকের কথার যতটুকু মূল্য, ততটুকুই আমরা গ্রহণ করব। তার চেয়ে বেশি করা, একের কথার সঙ্গে অপরের কথার সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাওয়া দুরাগ্রহ মাত্র। যাঁরা বেদ অনুশীলন করেন, তাঁরা বুঝবেন পণ্ডিতদের এই কথা নিরর্থক বা যুক্তিহীন নয়। কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বেদের অনেক কথার ভিতরে যেন পারস্পরিক কোন সম্বন্ধ নেই। ফলে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হচ্ছে না। মীমাংসকগণ বহু অধ্যবসায়ের ফলে বেদের অর্থ নিরূপণ করবার একটা সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করেছেন, যা বেদানুসারী অন্য অন্য সম্প্রদায়ও মেনে নিয়েছেন এবং সেই প্রণালী প্রয়োগ করে নিজের নিজের মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে এই—বেদের কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে যতই অসংবদ্ধ বলে মনে করা হোক, তাদের ভিতর একটা অনুস্যূত সম্বন্ধ আছে। পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট কথাগুলি যে সবসময় সহোচ্চারিত হবে অর্থাৎ একসঙ্গে বলা হবে তা নয়।

'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে।।'[২]

---

১. মনুসংহিতা—৮/২৬
২. উপরোক্ত উদ্ধৃতিটির আকরগ্রন্থ নির্দেশ করা যায়নি।

কাজেই বাক্যের তাৎপর্য বুঝবার জন্য ছয়টি উপায় অবলম্বন করতে হয়। এই ছয়টি উপায় হলো—(১) উপক্রম ও উপসংহার, অর্থাৎ কি পটভূমিকায় বাক্যটি আরম্ভ করা হয়েছে—শেষ করাই বা হয়েছে কিভাবে (২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি করা হয়েছে কি না। (৩) বিষয়টির অপূর্বতা আছে কি না অর্থাৎ আগে যদি কোথাও বলা না হয়ে থাকে বা প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্তব্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টির অপূর্বতা আছে। (৪) ফল—বেদবাক্য বিচারের ফল কী? নিষ্ফল কথা বেদ বলে না। সুতরাং ফল দেখেও সিদ্ধান্ত বুঝতে হয়। (৫) অর্থবাদ—বেদে অনেক বাক্য আছে যাদের স্বার্থে কোন তাৎপর্য নেই অর্থাৎ প্রকরণবহির্ভূত করে স্বতন্ত্রভাবে পড়লে তাদের ঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৎসত্ত্বেও সেগুলি নিরর্থক বা অপ্রমাণ নয়। তাদের তাৎপর্য বুঝতে হবে বিধিবাক্যগুলির স্তুতিতে অথবা নিষেধবাক্যের দ্বারা যে বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার নিন্দায় এবং (৬) উপপত্তি—অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থ নিরূপণের অনুকূল যুক্তির সাহায্যেও বেদার্থ বিচার করতে হবে। এই ছয়টি উপায়ের সাহায্যে মীমাংসকগণ আপাত অসংবদ্ধ বেদবাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করে থাকেন। যেমন, বেদের একটি মন্ত্রে কখনো কখনো দুজন দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। যে সমাজে যাগযজ্ঞ খুবই প্রচলিত সে সমাজে এটি একটি বাস্তব সমস্যা যে এরূপ মন্ত্র দুজন দেবতারই উদ্দেশে ব্যবহার করা হবে না একজনের উদ্দেশে? একজনের হলে কোন্ জনের? মীমাংসকগণ মনে করেন কর্মেই বেদের তাৎপর্য। সুতরাং ঐ ছয়টি উপায়ের সাহায্যে তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। তাঁদের মতে যেখানে বিধিলিঙের প্রয়োগ নেই সেখানেও বুঝে নিতে হবে বিধিলিঙ্ রয়েছে। যেমন, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি'[১]—বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ হলো—অগ্নিহোত্র যাগ করে। মীমাংসকগণের ব্যাখ্যায় 'জুহোতি'কে পড়তে হবে 'জুহুয়াৎ'। বিধিলিঙ্ 'জুহুয়াৎ' প্রয়োগের ফলে বুঝতে হবে এই বাক্যে অগ্নিহোত্র যাগ করার বিধান দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং—'অগ্নিহোত্রং জুহোতি'—এই বাক্যটি তখন বিধিবাক্যরূপে গৃহীত হবে। মীমাংসকমতে বিধি এবং নিষেধেই সমগ্র বেদের তাৎপর্য। 'এটা কর' বলে কর্মের বিধান দেওয়া আর ওটা করো না বলে অবৈধ কর্মের নিষেধ করা ছাড়া বেদের আর কোন তাৎপর্য নেই।

মীমাংসকদের অর্থ-নিরূপণের প্রণালী মেনে নিলেও বেদের তাৎপর্য যে কেবল কর্মে—একথা সবাই মেনে নেননি। অদ্বৈতবাদীদের মতে কর্মেই কেবল বেদের তাৎপর্য নয় জ্ঞানেও তাৎপর্য আছে। আত্মজ্ঞানের বিষয়ে বিধিবাক্যের অবকাশ নেই। প্রশ্ন হতে পারে, একথা কি ঠিক? কর্ম বা উপাসনায় যেমন বিধি আছে, জ্ঞানেও সেইরকম বিধি আছে। বলা হয়েছে—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[২]। 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থ 'করা উচিত'।

---

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—১/৫/৯

২. বৃহদারণ্যক—২/৪/৫, ৪/৫/৬

বিধিলিঙেরও এই একই অর্থ। বিধিলিঙের মতো 'তব্য' প্রত্যয় দিয়েও বিধিবাক্য বোঝানো হয়ে থাকে। অতএব এখানে 'দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'তব্য' প্রত্যয় দিয়ে আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে দর্শনাদির বিধান করা হলো। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন—না, ঐসব জায়গায় বিধির কিছু নেই। আত্মাকে জানবে এরকম বিধান দেওয়া যায় না। আত্মাকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জানবার জন্য মানুষের একটা সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে। প্রবৃত্তি সৃষ্টি করবার জন্য কোন বিধির প্রয়োজন নেই। যেমন, 'সুখং অনুভবেৎ'—সুখ অনুভব করবে—এরকম কোন বিধি হয় না। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সুখ অনুভব করে। সেইরকম আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিধির প্রয়োজন নেই। তাহলে 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বলা হলো কেন? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এগুলি বিধির ছায়া অর্থাৎ দেখতে বিধির মতো হলেও আসলে এরা বিধি নয়। মানুষ নিজের আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করতে, অনুভব করতে, তাঁতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে আপনা থেকেই চাইলেও কতকগুলি প্রতিবন্ধকের কারণে পারে না। বিধিচ্ছায়াপর বাক্যগুলির প্রয়োগ শুধু সেই প্রতিবন্ধকগুলি দূর করবার জন্য। মনের যেসব সংস্কার বা বৃত্তি আত্মস্বরূপ অনুভবের পরিপন্থী, সেগুলিকে নিরস্ত করবার জন্যই 'তব্য' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। ওগুলি বিধি নয়।

তারপর বিচার্য এই যে, উপক্রম-উপসংহারাদি যে ছয়টি উপায়ে বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, মীমাংসকদের সেই প্রণালী জ্ঞানকাণ্ডেও প্রয়োগ করা যায় কি না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যায়। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বিস্তার করে দেখিয়েছেন যে, আত্মজ্ঞানের কথা উপক্রমে ও উপসংহারে বলা হয়েছে। বারবার তার উল্লেখ অর্থাৎ অভ্যাস আছে। এই জ্ঞান আর কোন উপায়ে উপলব্ধ হয় না, তাই এর অপূর্বতাও আছে। আত্মজ্ঞানের ফলও বলা আছে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি। জ্ঞানেই যে বেদের তাৎপর্য—এই সিদ্ধান্তের সহযোগী হিসাবে অর্থবাদ আর উপপত্তিও কাজ করছে। সুতরাং কর্মেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য—মীমাংসকদের এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা মীমাংসকদের প্রণালীকে পূর্ণরূপে স্বীকার করেও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা আরো বলেন, মীমাংসকরা যে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলেন তারও কোন যুক্তি নেই। এর বিরুদ্ধে তাঁরা যা যা যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি সব খণ্ডন করা যায় এবং শঙ্করাচার্য তা খণ্ডন করে দেখিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, বিষয়টি তিনি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে তো প্রতিষ্ঠা করলেন কিন্তু আর একজন সূক্ষ্মতর যুক্তি প্রয়োগ করে সেগুলিকে খণ্ডন করবে কি না। শঙ্কর এ বিষয়ে গোঁড়া নন। তিনি বলছেন, করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তা না করছে ততক্ষণ আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকব না কেন? তিনি তারপর বলেছেন যে, তিনিও বোঝেন যুক্তি কিছুটা দূর গিয়ে তারপর আর যেন দাঁড়াবার মতো ভূমি পায় না। যুক্তি কতদূর অবধি যেতে পারে? না,

যতদূর উপাধির নিবৃত্তির ক্ষেত্র। যুক্তির কাজ হচ্ছে আরোপের নিরাকরণ। আত্মবস্তুর উপর যত অনাত্মধর্ম আরোপিত হয়েছে, সেই আরোপগুলির ক্রমাগত নিরাকরণ, নিবারণ করে যাওয়া, শাস্ত্রে যাকে অপবাদ বলে। তারপর যুক্তি থেমে যায়, কারণ আর কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তাহলে যুক্তির দ্বারা আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে কি? হবে না। তাহলে তা কি অপ্রতিষ্ঠ? না, তাও নয়, বরং আত্মতত্ত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ং প্রকাশমান। সূর্যকে দেখবার জন্য যেমন প্রদীপের দরকার হয় না তেমনি স্বপ্রকাশ আত্মাকে প্রকাশ করবার জন্য আর কোন যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলছেন—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি'[১]—সেই আত্মতত্ত্ব কোথায় প্রতিষ্ঠিত? না, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা তাও বলা যায় না।

এর তাৎপর্য কী? যদি বলা যায় স্বমহিমা মানে তাঁর নিজের মহিমা, সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি—তাহলে তিনি আর তাঁর মহিমা কি দুটি ভিন্ন বস্তু? যেমন গৃহস্বামী বললে গৃহ আর তার স্বামী বা অধীশ্বর ভিন্ন বলে বোঝা যায় তেমনি তিনি ও তাঁর মহিমা, দুটি কি ভিন্ন? না, তা নয়। কাজেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলতেও বাধছে। উপনিষদ্ তাই বলছেন—তাও যদি না বল, তাহলে বল তিনি স্বমহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নন। এইরকম করে প্রচুর যুক্তি বিশ্লেষণের সাহায্যে যেন ভয়ে ভয়ে আত্মস্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। একথা কখনো স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, এই তত্ত্ব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, হতে পারে না। আবার কখনো বলেছেন সেটি স্বপ্রকাশ বলে অপ্রতিষ্ঠও নয়। এ দুটি কথা একই সঙ্গে বলতে হচ্ছে। পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্তীকে বলছেন—তর্ক সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। সিদ্ধান্তীর উত্তর—ঠিক কথা, পারছে না। তখন পূর্বপক্ষ বলছেন—তা যদি না পারে তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত অপ্রতিষ্ঠ, অতএব তা বাচালতা, উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। সিদ্ধান্তী বলছেন—তা নয়, এটি স্বপ্রতিষ্ঠ। তোমরা আত্মধর্ম বলে এর বিপরীত যা কিছু বল, সেগুলি যে তা নয় একথা প্রমাণ করতে পারি। অর্থাৎ সবরকম আরোপের অপবাদ নিরসন করতে পারি। তোমার সিদ্ধান্ত সহজে খণ্ডন করতে পারি। আর আমার সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথা যদি বল, সে চেষ্টা আমি করিনি। প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, তা স্বপ্রতিষ্ঠ।

দার্শনিক দিক দিয়ে সিদ্ধান্তীর এই কথাটি খুব প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক কথা। যাঁরা পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন Bradley তাঁর বিখ্যাত Appearance and Reality গ্রন্থে appearance সম্পর্কে বলেছেন, যা কিছু আমরা দেখছি তা যেমন ভাবে দেখছি তা তেমন নয়, তার প্রতীতি হচ্ছে মাত্র। Appearance তার আছে কিন্তু সত্যকে সেখানে আমরা সত্যরূপে

---

১. ছান্দোগ্য—৭।২৪।১

অনুভব করছি না। এই কথাটি যে নিখুঁত যুক্তির সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন তা অপূর্ব। অতি সুন্দরভাবে তিনি ঐ গ্রন্থের প্রথমাংশে appearance-কে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তারপরে তাঁর মনে হলো, তাহলে সত্য কি তা বলতে হয়। সেই চেষ্টা তিনি করলেন গ্রন্থের Reality অংশে। আমাদের মনে হয় Bradley-র সে চেষ্টা খুব সার্থক হয়নি। অনেক চেষ্টা করেও আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারছি না। সত্যের একটা সর্ববাদিসম্মত লক্ষণ পর্যন্ত বার করতে পারছি না। আমাদের এই অসামর্থ্যের ফলে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ বিভ্রান্তিকে দূর করবার জন্য যুক্তি খুব উপযোগী। আত্মায় আরোপিত ধর্মকে অপবাদ বা খণ্ডন করবার জন্য, নিরস্ত করবার জন্য যুক্তি কাজে লাগে। কিন্তু তারপর? তারপর বলছেন, 'উপশান্তোঽয়ম্ আত্মা'[১]—এই আত্মা শান্ত, সমস্ত প্রবৃত্তিশূন্য। যখন সমস্ত আত্মধর্মের অপবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ করা হয়ে গেল তখন আর যুক্তির করণীয় কিছু রইল না।

কোন বস্তু আলোর ক্ষেত্রের মধ্যে এলে তা প্রকাশিত হয়। বস্তু যদি না থাকে তাহলে আলো কাকে প্রকাশ করবে? প্রকাশ্য কিছু না থাকলে সে নিজেকে প্রকাশ করবে কি? তারই উত্তরে বলা হয়েছে—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি'[২]—নিজেকে নিজেই প্রকাশ করলে সে প্রকাশ্য এবং প্রকাশক দুই-ই হলো। কিন্তু যে কর্তা সে কর্ম হতে পারে না, কাজেই নিজেকে প্রকাশ করে এ কথা বলা যায় না। অন্য প্রকাশকও আর কেউ নেই। তাহলে কি 'জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ' হবে? জগৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে? আসল বস্তুকে জানাই যাবে না? তাহলে কি বলতে হবে—the thing is unknown and unknowable ? Reality, আত্মবস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়? না, তা নয়। যে বস্তু সদাপ্রকাশশীল তাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলা চলে না। আত্মবস্তু জ্ঞেয়ও বটে, জ্ঞেয় নয়-ও বটে। জ্ঞাতও বটে জ্ঞাত নয়-ও বটে। তা কিরকম?—'নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ'[৩]—আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে ভাল করে জেনেছি, আবার এও মনে করি না যে আমি জানি না। জানি এবং জানি না—এ তো হেঁয়ালির কথা। জানি এবং জানি না—এই দুটি কথা এক বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। হয় বল জানি, না হয় বল জানি না, কিংবা বল আমার জ্ঞান সংশয়জ্ঞান। এই তিন রকম ছাড়া চতুর্থ রকম কিছু থাকতে পারে না।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐ তিনটির কোনটিই প্রযোজ্য নয়। তাঁকে আমি জানি একথা বলতে পারি না, কারণ জানা মানে জ্ঞানের বিষয় করা—তিনি জ্ঞানের বিষয় নন। আবার জানি না বলতে পারি না কারণ, নিত্য প্রকাশমান ব্রহ্মকে জানি না কী করে বলব? 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে'[৪]—দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনো

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—৩/২/১৭ ; ২. ছান্দোগ্য—৭/২৪/১

৩. কেনোপনিষদ্—২/২ ; ৪. বৃহদারণ্যক—৪/৩/২৩

বিলোপ হয় না। আর সাধারণের হলেও সকলেরই যে সংশয়জ্ঞান হতে হবে এরকম কোন যুক্তি নেই। কারো না কারো অসন্দিগ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার হচ্ছে। অতএব অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম এমন বস্তু যাঁকে বেদ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। তাহলে—'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি'—কেন বলা হলো? না, ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যে ভ্রান্তি আছে, বেদ তার অপসারণে উপযোগী। এই অর্থেই বুঝতে হবে যে সমগ্র বেদ তাঁর কথাই জানাচ্ছেন। আর আত্মতত্ত্বকে জানবার জন্য আমরা কায়িক, বাচিক, মানসিক তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, ইন্দ্রিয়সংযম করছি। এ সবের তাৎপর্য মাত্র এইখানে যে, এগুলি অনাত্মভ্রম দূর করে দেবে। এছাড়া সাক্ষাৎভাবে এদের যে কোন উপযোগিতা নেই এটি মনে রাখলে তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সাধনের অহঙ্কার থাকবে না। কারণ অহঙ্কার কী নিয়ে করব? যেগুলি নিয়ে করব তাদের নিজেদের কোন দাম নেই। ব্রহ্মাজ্ঞানের আবরণ অপসারণের সহায়ক বলেই তারা প্রয়োজনীয় এবং সে কাজে তারা যতদূর সহায়ক হবে ততদূর পর্যন্ত তাদের সার্থকতা। আমাদের ভাবতে হবে সেই আবরণ অপসারিত হয়েছে কি? তা না হয়ে থাকলে আমি সাধনসম্পন্ন বলার কোন সার্থকতা নেই।

আত্মতত্ত্বের উপদেশ করতে গিয়ে যমরাজ কেন ওঙ্কারের উল্লেখ করলেন তা সংক্ষেপে আগেই বলা হয়েছে। যে তত্ত্বকে জানবার জন্য বহু কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মচর্যাদি অনুষ্ঠান, সেই তত্ত্বকেই তিনি সংক্ষেপে বলছেন, ওম্। অ-উ-ম এই তিনটি বর্ণের সংযোগে নিষ্পন্ন ওম্ শব্দটি। তিনটি বর্ণের দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বোঝাচ্ছে। বিভিন্ন অবস্থা বা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত রূপ ওঙ্কার ব্রহ্মের প্রতীক। নির্গুণ নিরাকার অব্যক্ত রূপে উপাসনা করতে পারি না বলে তাঁর একটা রূপ কল্পনা করতে হয়। প্রথম রূপকে বলা হলো 'ওঁ' কারণ, এই ওঙ্কার থেকেই সমস্ত বর্ণমালার উদ্ভব। সকল ধ্বনির অস্ফুট রূপ হচ্ছে ওঙ্কার। ব্রহ্ম যেমন জগতের আদি, তাঁর থেকেই জগৎপ্রপঞ্চ, তেমনি ওঙ্কার সমস্ত ধ্বনির আদি। এর বিস্তার হয়ে সব শব্দ, ভাবের উৎপত্তি এবং ভাব থেকে বস্তুর উদ্ভব। এই হলো ধারা—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, তার থেকে সূক্ষ্মতম। এই ওঙ্কার ত্রিমাত্র এবং তার সঙ্গে একটি অর্ধ মাত্রা বলেছে। চণ্ডীতে আছে—'অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ'[১]। অর্ধমাত্রা মানে অস্ফুট, অনভিব্যক্ত তত্ত্ব—যাকে বৈয়াকরণরা স্ফোট বলেছেন। স্ফোট মানে শব্দের অনভিব্যক্ত রূপ, যা থেকে বিভিন্ন শব্দের প্রকাশ। 'ওঁ' ব্রহ্মের অনভিব্যক্ত স্বরূপ, যা থেকে জগতের সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অভিব্যক্তি। এইজন্য ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়।

এবার এই মন্ত্রে ব্রহ্মের দুরকম প্রতীক বলা হয়েছে—

---

১. শ্রীশ্রীচণ্ডী—১/৭৪

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥১৬॥

অন্বয় ঃ—[ওঙ্কাররূপ] এতৎ (এই) অক্ষরম্ এব (অক্ষরই) হি (প্রসিদ্ধ) ব্রহ্ম (অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ), এতৎ এব অক্ষরম্ (এই অক্ষরই) হি (সুনিশ্চিত) পরম্ (পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা)। এতৎ এব অক্ষরম্ (এই অক্ষর পুরুষকেই) হি (সম্যক) জ্ঞাত্বা (জেনে) যঃ (যিনি) যৎ (যা) ইচ্ছতি (কামনা করেন) তস্য (তাঁর) তৎ হি (তা-ই) [সিদ্ধ হয়]।

'এতৎ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম'—অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই অপরব্রহ্মস্বরূপ, 'এতৎ হি এব অক্ষরং পরম্'—এবং এই অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপও। কারণ, এই অক্ষর বা ওঙ্কারই উক্ত উভয় প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন। দুয়েরই প্রতীকরূপে ওঙ্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। এইজন্য সব বেদেই ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঙ্কারে লয় হয়'।[১] অর্থাৎ স্থূল বস্তুকে লয় করতে হয় সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মের সর্বশেষে ওঙ্কারে পর্যবসান। ওঙ্কার কিসে লয় হয়? যে ভাবের অভিব্যক্তি নেই, যার কোন বাচক শব্দ কিছু নেই সেই অনভিব্যক্ত ভাবে লয় হয়। অনভিব্যক্ত রূপকে ধারণা করতে পারব না বলে তার প্রথম অভিব্যক্তি যেন ওঙ্কার। 'এতৎ এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা'—এই ওঙ্কারকে পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্মরূপে জেনে যিনি যেমন রূপে উপাসনা করবেন—'যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ'—তাঁর তদনুসারে ফল লাভ হবে। বেদে ওঙ্কারের উপাসনা বহু প্রশংসিত।

অক্ষর মানে যার পরিবর্তন হয় না। বর্ণগুলির পরিবর্তন মানে তার বিকৃতি হয়েছে। সেই বিকৃত শব্দের যা প্রাকৃত রূপ, কারণরূপ তাকে অক্ষর বলা হয়। এখানে বলা হয়েছে, ইনিই হচ্ছেন সেই ওঙ্কার, সেই বর্ণরূপী পরব্রহ্ম এবং তিনিই আবার অপরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপ অপরব্রহ্ম। অপরব্রহ্মের কারণরূপ বা কারণাতীত স্বরূপ পরব্রহ্ম। দুটি ভিন্ন ব্রহ্ম নয়, একই ব্রহ্মের দুটি প্রকার। একটি প্রকার অপরব্রহ্ম মানুষের উপাস্য, আর একটি প্রকার পরব্রহ্ম মানুষের জ্ঞেয়। একটিকে লাভ করতে হয়, আর একটিকে জানতে হয়। পরব্রহ্ম, যেটি আমাদের স্বরূপ তাঁকে লাভ করা যায় না, তাঁকে কেবল জানতে হয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বলে অপরোক্ষ অনুভূতি করতে হয়। আর যেটি আমাদের থেকে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বলে মনে হয় সেই অপরব্রহ্মকে লাভ করতে হয়। যেমন, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা ঈশ্বর কিন্তু আমাদের স্বরূপ নন, তিনি হিরণ্যগর্ভ। উপাসনার দ্বারা তাঁকে লাভ করতে হয়, তাঁর সঙ্গে তন্ময়তা বোধ করতে হয় যাকে বলে 'তদ্রূপাপত্তি বা তদ্রূপপ্রাপ্তি' অর্থাৎ তিনি প্রাপ্তব্য। আর যিনি সর্বব্যবহারের অতীত, যিনি আমাদের স্বরূপ তাঁকে লাভ করা যায় না, তিনি জ্ঞাতব্য। শাস্ত্র বিশেষ করে একথা বলেছেন,

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪

একটি প্রাপ্তব্য আর একটি জ্ঞাতব্য। মানুষের জগদ্ব্যাপারে কর্তৃত্ব নেই। সে অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে হিরণ্যগর্ভতা প্রাপ্ত হলে তাঁর সমস্ত শক্তি তার ভিতরে স্ফুরিত হতে পারে। উপাসনার ফলে এটি লাভ হয়। কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম তাঁকে এইভাবে লাভ করার কিছু নেই, তিনি আমাদের নিত্যস্বরূপ। তাঁকে কেবল স্বরূপরূপে জানতে পারি, এই জানাটাই সেখানে সার্থকতা।

প্রশ্ন ওঠে যে, জানা এবং তার ফল—এ দুটি এক হয় না। যেমন, আমি জানলাম যাগযজ্ঞাদি কী করে করতে হয়, কিন্তু তার দ্বারা আমার স্বর্গাদি ফল লাভ হয় না। সেইরকম পরমেশ্বরকে সমস্ত কার্যকারণের, স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত বলে, তাঁর থেকে জগৎ উৎপন্ন বলে জানলাম, তাতে আমার কী পরিণাম লাভ হলো? কিছুই হলো না। তার উত্তরে বলছেন—শুধু এইভাবে জানা নয়, তাঁকে যদি আত্ম-অভিন্নরূপে জানা যায় তাহলে, আমার ভিতরে যেসব ক্ষুদ্রতা, অবগুণ রয়েছে, সেগুলি দূর হয়ে যায়। অতএব জানার সঙ্গে সঙ্গেই তার যা কিছু ফল তা একত্রে আসে—জানা এবং হওয়া, দুটি একই সঙ্গে হয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'[১]—কথাটির তাৎপর্য এইখানে যে—ব্রহ্মকে যদি কেউ আত্মরূপে জানেন, তাহলে তিনি আর ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন থাকেন না। তার মানে এ নয় যে তিনি ব্রহ্ম হন, হওয়ার দরকার হয় না। হওয়া মানেই তাঁর থেকে ভিন্নরূপ যে ধারণা, যা আরোপিত, সেই ধারণার অপনোদন। জ্ঞানের দ্বারা এই ভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম, তথা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দূর হয়। অজ্ঞান দূর হতেই বোঝা গেল যে জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি এসব আমাতে নেই। দুঃখের নিবৃত্তি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়, জ্ঞানকে নতুন করে দুঃখনিবৃত্তির উপায় রূপে আর ব্যবহার করতে হয় না। জ্ঞানের সাহায্যে দুঃখনিবৃত্তি হবে তা নয়, জ্ঞানের অর্থান্তর দুঃখের নিবৃত্তি। নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে জ্ঞান হলো, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানের কার্য যে ক্ষুদ্রত্ববোধ বা অনানন্দত্ব বোধ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ থেকে নিজেকে ভ্রষ্ট বলে মনে হওয়া, সেসব বোধগুলি দূর হয়ে যায়। এখানে প্রাপ্তি আর জ্ঞান এ দুটি ভিন্ন নয়, একই বস্তু, তাই একে প্রাপ্তি বলে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হয়। প্রাপ্ত বস্তুর আর প্রাপ্তি হয় না, তার অনুভব হয় মাত্র।

উপাসকের রুচি উৎপাদন করার জন্য ওঙ্কারের আরো প্রশংসা করা হচ্ছে এই মন্ত্রে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৭॥

---

১. মুণ্ডক—৩/২/৯

অন্বয় ঃ—এতৎ (এই ওঙ্কারোপাসনা) শ্রেষ্ঠম্ আলম্বনম্ ([অপরব্রহ্ম প্রাপ্তির] সর্বপ্রকৃষ্ট উপায়), এতৎ (এই) পরম্ আলম্বনম্ ([পরব্রহ্ম প্রাপ্তির] শ্রেষ্ঠ সাধনা), এতৎ (এই) আলম্বনম্ (ওঙ্কারের সাধন) জ্ঞাত্বা (অবহিত হলে) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মস্বরূপে) মহীয়তে (পূজিত হন)।

অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি সাধনের মধ্যে এই ওঙ্কারসাধন অবলম্বন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ—'এতৎ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্'। আবার পরব্রহ্ম জ্ঞানসাধনের মধ্যে এই ওঙ্কারসাধনই পরম সাধন—'এতৎ আলম্বনং পরম্'। পরাপর উভয় ব্রহ্মের সাধনরূপে ওঙ্কারের স্থান বিশিষ্ট। তাই বলছেন, এই আলম্বন বা উপায়কে যিনি জানেন তিনি—'ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'—ব্রহ্মলোকে মহিমা প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে ওঙ্কারের উপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা, কারণ ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়েছে। ওঙ্কারদশায় শব্দাদির পূর্ণরূপে অভিব্যক্তি হয়নি। প্রতীক কাকে বলে? কোন একটি বস্তুকে যা ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝিয়ে দেয়, সাক্ষাৎভাবে বলে না, তাকে বলে প্রতীক। ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যায় বলে ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলে। ওঙ্কার-প্রতীক ব্রহ্মের জগৎরূপে বিবর্তিত হওয়ার প্রাক্‌কালীন অবস্থাকে বোঝায়। তাই একে ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা হয়েছে। এই সাধনের দ্বারা ব্রহ্মলোকে সাধকের মহিমা হতে পারে দুই ভাবে। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে সাধক তাঁকে জানতে পারে এবং অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি হলে তাঁকে লাভ করতে পারে। অর্থাৎ যদি কেউ এই ওঙ্কাররূপকে অবলম্বন করে অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন তাহলে তিনি হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর মতো ঐশ্বর্যশালী হন ও সকলের উপাস্য হয়ে যান। এই স্বরূপতাপ্রাপ্তি মানে ব্রহ্মলোকে মহিমা প্রাপ্ত হওয়া।

কে এই হিরণ্যগর্ভ? ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ যেন জগতের প্রথম অভিব্যক্তির অবস্থা। তখনো তাঁর ভিতরে বৈচিত্র্য ফুটে ওঠেনি। তাঁর মনে প্রথম এই জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা জাগল এবং সেই ইচ্ছা থেকে জগৎ সৃষ্টি যেখানে আরম্ভ হবে সেই সৃষ্টির মুখকে, দ্বারকে বলে হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সত্তা থেকে প্রভাময়, উজ্জ্বল, প্রকাশময় যে গর্ভ। গর্ভস্থ সন্তান যেমন পরে তার স্বরূপতা, স্থূলদেহাদি প্রাপ্ত হয়, তেমনি হিরণ্যগর্ভ হলো প্রথম অবস্থা যা পরে জগৎরূপে বিবর্তিত হয়, বিবর্তিত বা পরিণামপ্রাপ্ত যাই বলি। ব্রহ্মরূপে যখন দেখি তখন পরিণাম বলি না, বিবর্ত বলি। হিরণ্যগর্ভ বলতে ব্রহ্মের ঠিক সেইরূপ অবস্থা নয়। এখানে হিরণ্যগর্ভ মানে যিনি 'জগৎসিসৃক্ষু ঈশ্বর'—জগৎসৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত ব্রহ্ম। জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি যে স্বরূপ গ্রহণ করলেন সেই স্বরূপকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন—

'নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥'[১]

---

১. গীতা, ভাষ্যভূমিকা, মঙ্গলশ্লোক।

—নারায়ণ, যিনি পরব্রহ্ম, তিনি—'অব্যক্তাৎ পরঃ'—অব্যক্ত, যাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়েছে, তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভেরও উৎপত্তিস্থান হলেন নারায়ণ। 'অণ্ডম্ অব্যক্তসম্ভবম্'—সেই অব্যক্ত থেকে প্রথমে অণ্ডরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হলো। 'অণ্ডস্য অন্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী'—এই অণ্ডের মধ্যে এই সমস্ত লোক, এই সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট পৃথিবী—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ইত্যাদি। অণ্ড, কোষ বা ডিম্বাকার কেন বলা হয়? না, এই জগৎ তাঁর ভিতর থেকে অভিব্যক্ত হবে। যেমন ডিমের ভিতর থেকে পাখি বেরোয়। নিজের বিশেষত্বকে প্রচ্ছন্ন রেখে পাখি অনভিব্যক্তরূপে ডিমে অর্থাৎ বীজে থাকে।

তাৎপর্য এই যে, যদি আমরা স্থূল জগৎ থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মের দিকে যাই, তার অনভিব্যক্ত রূপে যখন পৌঁছাই তখন আমরা বলি ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মের অণ্ড বা বীজাকার। তারও পরে এগিয়ে গেলে পাই অব্যক্ত, তখন কার্য-কারণের পুরো অভিব্যক্তি হয়নি, এইজন্য তাঁকে অব্যক্ত বলে। আরো উপরে গেলে—'পরঃ'—যিনি সর্ববিক্রিয়ারহিত। সর্ব কার্য-কারণ-সম্বন্ধশূন্য, অনির্দেশ্য, অবাচ্য বলে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর নাম পর্যন্ত দেওয়া যায় না বা নাম দিলেও সেই নাম তাঁকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না। কারণ, তিনি নামরূপের অতীত। এইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে—অশব্দ। যাই বলা হোক, তা পরব্রহ্মের বাচক বললে ভুল হবে, তা গৌণভাবে পরব্রহ্মকে বুঝিয়ে দেয় মাত্র। বলাবাহুল্য, যিনি 'অশব্দম্' তিনি স্বভাবতই—'অব্যবহার্যম্'—তাঁকে নিয়ে উপাসনাদি করা যায় না। জাতি-গুণ-ক্রিয়া না থাকায় তাঁকে চিন্তার বিষয় করা যায় না। মন তাঁকে ভাবতে পারে না। কাজেই তাঁর একটা ব্যবহার্য রূপ দেবার জন্য যেন ওঙ্কারের সৃষ্টি, যাঁকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করে পরব্রহ্ম বলে ভাবতে পারি।

সাধক যদি অপরব্রহ্মের উপাসক হন, তাহলে ওঙ্কারের উপাসনার ফলে তিনি হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন—একথা বলা হলো। ফলে তিনি হিরণ্যগর্ভের জগৎ-সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্য অর্থাৎ মহিমা প্রাপ্ত হন। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, বিভিন্ন জীব যদি ওঙ্কার উপাসনার দ্বারা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ প্রাপ্তির ফলে জগৎস্রষ্টা হয়, তাহলে সৃষ্টির ভিতরে শৃঙ্খলা থাকবে কী করে? কারণ, এক-একজনের সৃষ্টি এক-একরকম হতে পারে। উত্তরে বলা হয়, সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা নষ্ট হবার ভয় নেই কারণ জীব স্বরূপত পৃথক সত্তা নিয়ে জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মশক্তি লাভ করে না। ব্রহ্মের সঙ্গে সমতা মানে এই নয় যে ব্রহ্মতুল্য বিভিন্ন জীব হবে। তবে বিভিন্ন জীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হলে নিজ ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার লোপ করে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকবে। তাহলে আর জগৎ-কর্তৃত্বে বিশৃঙ্খলা হবার কোন আশঙ্কা নেই। অর্থাৎ জগৎকর্তা জীবত্ব রেখে জীব হতে পারেন—এরকম নয়, জীব তার জীবত্ব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরে পরিণত হয়, তার স্বরূপ তখন ঈশ্বরাভিন্ন হয়। সুতরাং যে দোষ আমরা কল্পনা করেছিলাম—তা হয় না।

এ তো গেল অপরব্রহ্মস্বরূপতার কথা। পরব্রহ্মস্বরূপতার ক্ষেত্রে উপাসনা দ্বারা অপরোক্ষ অনুভূতির কথা অদ্বৈত বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, উপাসনার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হয়, যার ফলে ব্রহ্মে স্থিত হবার সামর্থ্য লাভ হয়। 'শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত'[১]—উপাসনার দ্বারা যে শর তীক্ষ্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়েছে সেই নিশিত বুদ্ধিই ব্রহ্মে স্থির হতে পারে। পরব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তির পথে উপাসনা আমাদের সহায় হয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কারণ হয় না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মস্বরূপতা উৎপাদ্য বস্তু নয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তি এমন ব্যাপার নয় যা আমরা কর্মের পরিণামে লাভ করতে পারি। উপাসনাও কর্মের অন্তর্ভুক্ত, তার পরিণামে আমাদের ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশের অন্তরায় দূর হয়। অন্তরায় দূর হওয়ার অর্থই হচ্ছে উপাসনার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হওয়া। এই শুদ্ধির জন্য উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অদ্বৈত বেদান্তীরা স্বীকার করেন।

উপাসনা পরম্পরাক্রমে আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ হতে পারে এইভাবে। উপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হয়, যাকে সাধারণ ভাষায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞান বলি। সেই বৃত্তি হলে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হচ্ছে, সে জ্ঞানটি তাহলে উৎপাদ্য। তা না হয়ে, সেই জ্ঞান যদি সর্বদাই থাকে, তাহলে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কোন কালেই থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখলে ব্রহ্মজ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞানকে বলা হয় উৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই উৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানটি নিত্য নয়। যেহেতু নিত্য নয় সেই হেতু এই জ্ঞানের দ্বারা দ্বৈতাপত্তি হচ্ছে। ব্রহ্ম একটি, আর ব্রহ্মজ্ঞান আর একটি, দুটিকে স্বীকার করলে দ্বৈতাপত্তি হয়। তার উত্তরে দার্শনিকরা বলেন, এই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির কাজ অজ্ঞানের নাশ, সেটি করে দিয়ে ঐ বৃত্তি আর থাকে না। থাকে না কেন? তার নাশ কে করে? উত্তরে বলা হয়, তার নাশ করতে হয় না আপনি নষ্ট হয়। এইরকম বললে আবার নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে দোষ হয়। আপনি নাশ হওয়া মানে বিনা কারণে কার্য হলো। এটি অপসিদ্ধান্ত, যা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, নাশ বলব না নাশ্য-নাশক সম্বন্ধ সেখানে কিছু নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সেই বৃত্তিটি আর থাকে না এই কথা বলব। তাহলে কথার ভিতরে দোষ রইল না। কিন্তু থাকা আর না থাকার কাদাচিৎক হবে কি? অর্থাৎ কখনো থাকবে কখনো থাকবে না, এমন হবে কি? এইসব কূট প্রশ্ন ওঠে। তার উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তী বলেন কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়াও, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ও তারপর শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান—এ দুটির কিরকম সম্বন্ধ? না, একটি চলে যায় আর একটি প্রকাশ পায়। বৃত্তিটি চলে যায় আর অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানটি থাকে। এর ভিতরে আর কোন সম্বন্ধ আমরা স্বীকার করব না। 'যা যা প্রমা সা সা স্বসমানবিষয়কাজ্ঞান-তৎপ্রযুক্তবিশিষ্টকাল

১. মুণ্ডক—২/২/৩

পূর্বত্বশূন্যকাল বৃত্তিঃ'[১]—বলে একটি দীর্ঘ পদ আছে। নৈয়ায়িকের ঢঙকে বাদ দিলে যার মানে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হলে তারপর আর সে বৃত্তিও থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানটি অবশিষ্ট থাকে সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদ্য হলো না, উৎপাদ্য হলো বৃত্তিটি। বৃত্তি উৎপাদ্য, সেইজন্য বৃত্তিজ্ঞানটিও উৎপাদ্য। কিন্তু তারপর বৃত্তি না থাকায় আর দ্বিতীয় কিছু রইল না যার দ্বারা অদ্বৈতের হানি হবে। সুতরাং তখন শুদ্ধব্রহ্ম যা ছিলেন, সেই স্বরূপেই রইলেন। এই প্রশ্ন ওঠে—থাকা আর না থাকা কাদাচিৎকে কিনা। না, কাদাচিৎকে নয়, তা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তাকে আমরা কার্যকারণশৃঙ্খল দিয়ে বাঁধছি না। একটির পর আর একটি হয়—এরকম হলেই যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকবে তা নয়। যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ উৎপাদ্য নয় বা ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদ্য নয় অতএব তার উৎপত্তির কারণ আর খুঁজতে হবে না। কেবল তার প্রতিবন্ধক যে দ্বৈত সেই দ্বৈতের নিবৃত্তি খুঁজতে হবে। দ্বৈতনিবৃত্তি করতে হলে তার কারণও খুঁজতে হবে, কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের যে প্রতিভাস, যে প্রকাশ, তার কোন কারণ খুঁজবার দরকার নেই। সেই প্রকাশটি কার্য নয়, তিনি স্বপ্রকাশ। কেবল তার প্রতিবন্ধক যে অজ্ঞান, তা বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা নাশ হলো। আর বৃত্তিজ্ঞানও রইল না। এখানে যদি কেউ কিছু দোষ ধরেন তাহলে বেদান্তী বলবেন, সেই দোষটিকে তুমি ন্যায়ের ভাষায় বল তাহলে আমরা তার উত্তর দেব। ন্যায়ের ভাষায় বলতে পারছে না কারণ কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলা হয়নি। বলা হয়েছে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হলে তারপর অবিদ্যা এবং অবিদ্যার জন্য উৎপন্ন যা কিছু দৃশ্যজগৎ তার সমস্ত কারণ সহিত কার্য নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়। অন্তর্হিত হয় বলে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিটি পর্যন্ত তারপরে থাকে না। কারণ সেটিও অবিদ্যার অন্তর্গত।

এখন, এই যে যুক্তির সাহায্যে তর্কের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা—এ সাধকের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। সাধক দেখবেন কী করে তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি করতে পারলেই যথেষ্ট হলো। তারপর সেই নিবৃত্তিটি বা ব্রহ্মজ্ঞানটি কী করে ন্যায়ের দ্বারা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে—সেটা দার্শনিকের কাজ এবং দর্শনের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন রকম করে তার প্রতিপাদন করে। আমরা দেখছি ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞের ব্যবহারকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। যদিও সে চেষ্টা করা কতটা সফল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি না। নৈয়ায়িকের ভাষায় কেবল তাকে একটা অকাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করি মাত্র। প্রশ্ন ওঠে—যদি অজ্ঞান এবং তার কার্য নিঃশেষে দূরীভূত হয়, তাহলে লোকব্যবহার কী করে হবে? শঙ্করের ভাষায়—'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্" "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকোহয়ং লোক ব্যবহারঃ'[২]—সত্য এবং মিথ্যাকে জুড়ে একটা নৈসর্গিক ব্যবহার বরাবর

---

১. সিদ্ধান্তবিন্দু—মধুসূদন সরস্বতী, অষ্টম শ্লোকের ন্যায়রত্নাবলী টীকা, সম্পাদনা ঃ ত্র্যম্বকরাম শাস্ত্রী, বেনারস, ১৯২৮, পৃঃ ৩৯৭

২. ব্রহ্মসূত্র, অধ্যাসভাষ্য

চলে আসছে। কথা হলো, এই ব্যবহারকে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও স্বীকার করব কি না। যদি স্বীকার করি তাহলে বুঝতে হবে ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্যকে নিঃশেষে বিনাশ করতে পারল না। তা যদি না পেরে থাকে তাহলে সেই অবশেষটুকু যাবে কী করে? যখন অবিদ্যার একটু লেশ, একটু ছোঁয়া থেকে যায় তখনই ব্যবহার সম্ভব হয়। সম্পূর্ণভাবে 'আমি'র লোপ হলে ব্যবহার করবে কে? যদি জ্ঞানের পরেও আমি বা অহং অর্থাৎ অবিদ্যার লেশ থাকে তাহলে অদ্বৈত বেদান্তীর মূল সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে, সে কথাটাই ব্যাহত হয়ে গেল। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য। কিন্তু নাশ হয়েও যদি তার একটু রেশ থেকে যায় তাহলে সিদ্ধান্তে হানি হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, সেই রেশটুকু কি করে আবার নাশ হবে—তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

যদি বলা যায় প্রারব্ধ কর্ম থেকে যায়! 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'[১] এই কথাটি ব্যাখ্যা করবার সময় আচার্য শঙ্কর বলেছেন—প্রারব্ধ কর্মকে বাদ দিয়ে অন্য সকল কর্মকে জ্ঞানাগ্নি ভস্ম করে। প্রারব্ধ কর্মটি পর্যন্ত এর ভিতরে পড়ে গেলে ব্যবহারাসিদ্ধি, ব্যবহার হতো না। যদি জ্ঞানীর ব্যবহার না থাকে তাহলে, অদ্বৈত তত্ত্ব যে আছে—সে সাক্ষ্য কে দেবে? যদি বলি—বেদ দেবে তাহলে উত্তর হচ্ছে—বেদের তত্ত্ব অনুভবের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হলে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বেদের তাৎপর্য বোঝার সময় সন্দেহ আসবে, অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতি হবে না। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় না থাকলেও আমরা যদি দেখি যে বেদে প্রত্যক্ষবিরোধী কোন সিদ্ধান্ত আছে তাহলে তার অর্থ করবার সময় স্বভাবতই আমরা খুঁজি কী উপায়ে তা আমাদের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সুসমঞ্জস হতে পারে। অসামঞ্জস্য থাকলে অর্থ গ্রহণে বাধা হয়। যেমন, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি'[২]—ঘোষেরা গঙ্গায় বাস করে। ঘোষেরা তো মাছ নয় যে গঙ্গায় বাস করবে! সুতরাং এটি প্রত্যক্ষবিরোধী কথা। তাই সেখানে প্রত্যক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঙ্গা বলতে গঙ্গার জলপ্রবাহকে না বুঝে আমরা জলপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গঙ্গাতীরকে বুঝি। বেদ অন্ত্যপ্রমাণ হলেও তার অর্থ বুঝতে হবে বৈকি। সুতরাং অর্থ বোঝার সময় শব্দের বাচ্যার্থের যেখানে বাধা হচ্ছে সেখানে লক্ষ্যার্থ আনতে হবে। এখানেও সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবহার যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে ব্যবহারকে অসিদ্ধ করা যাবে না, সিদ্ধান্তকে একটু বদলে নিয়ে প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আনতে হবে। যদি বলা যায়, এতে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় তোলা হলো না কি? এর উত্তর হবে, না; কারণ, বোধগম্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য। প্রত্যক্ষবিরোধী কোন কথা বেদ বললে তাতে বেদের প্রামাণ্য থাকে না। কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ-বিরোধী বিষয়ে বেদবাক্যের

---

১. গীতা, ৪/৩৭

২. বেদান্তসার ঃ—১১৮, সম্পাদক ঃ ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, সং-১৯৬৮, পৃঃ ১৭৮

তাৎপর্য প্রতীত হবে না। সুতরাং বেদের কথাও গ্রহণ করার সময় ভেবে দেখতে হবে। এ সম্বন্ধে আরো অনেক আলোচনা দার্শনিকরা করেছেন। বলছেন, এই যে বলছি—জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন, আপাতত এখানেও তো প্রত্যক্ষের বিরোধ রয়েছে। বেদে ব্রহ্মের যে লক্ষণ বলা হয়েছে তার কোনটিই আমাদের উপর প্রযোজ্য হচ্ছে না। বরং আমরা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তার বিচার করে উত্তরে দেখিয়েছেন জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন, বেদের এই তাৎপর্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষের, অনুমানের বা প্রমাণান্তরেরও বিরোধ নেই। বিরোধ না থাকার জন্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্যে বেদের তাৎপর্য স্বীকৃত হতে পারে।

কিন্তু ব্যবহার সম্বন্ধে কী উপায়? ব্যবহারকে তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না, তা তো সকলেই দেখছে। বেদান্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করবার সময় যা যুক্তি দেওয়া হয়েছে আমাদের মনে হয় শঙ্কর সেই যুক্তিগুলিকেও যে একেবারে সমীচীন মনে করছেন তা নয়। তিনি গতানুগতিকতার অনুসরণ করে বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও অবিদ্যার লেশ থাকে। প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা ছিন্নমূল লতার মতো এই ব্যবহারের অনুবৃত্তি কিছুকাল হতে থাকে এবং প্রারব্ধ কর্ম শেষ হলে স্বতই এই ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। শঙ্কর যদিও জ্ঞানীর ব্যবহারকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'[১]—এই গীতাবচনের ব্যাখ্যায় প্রারব্ধ কর্মকে ছাড়া অন্য কর্মকে জ্ঞানাগ্নি ভস্মীভূত করে বলেছেন, তবুও এই কথার ভিতরে কিছু অপূর্ণতা আছে বলে বোধ করেছেন মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞানের পর লোকব্যবহার তো থাকে দেখা যায়। 'ন হি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম'[২]—যা দেখা যায় তাকে যুক্তির দ্বারা সমর্থনের অযোগ্য বলা যায় না। দৃষ্ট যে লোকব্যবহার তাকে অস্বীকারও করতে পারি না, আর জ্ঞানের সঙ্গে তার যে বিরোধ আছে তাও বলতে পারি না। কারণ, জ্ঞান এবং ব্যবহার দুটিই এক ক্ষেত্রে রয়েছে দেখা যায়। বহু জায়গায় যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দাবি করছেন তিনি ব্রহ্মের স্বরূপেরও বর্ণনা করেছেন। অতএব বর্ণনা যিনি করেছেন তিনি আছেন, তাঁর ব্যবহার আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'বিদ্যার আমি' কি 'অবিদ্যার আমি' সে প্রশ্ন নয়, আমি তো আছে! না হলে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কে বলত? উপদেশ দেবেন এমন আচার্য কোথায় পাওয়া যেত? এই একটা মূল প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে শঙ্কর এইভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানীর ব্যবহারও দেখা যায়, কাজেই তাকে যুক্তিবিরোধী বলা যায় না। দুটি বস্তু যখন একত্র দেখা যায় না তখন তাদের পরস্পরবিরোধী বলা হয়। কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞান রয়েছে এবং ব্যবহারও রয়েছে, সেখানে ঐ ব্যবহার জ্ঞানীর পক্ষে 'অনুপপন্ন'—অযৌক্তিক বলা যায় না।

---

১. গীতা—৪/৩৭

২. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—৪/১/২

তখন প্রশ্ন হবে, ব্যবহার কি চিরকাল থাকবে? তাহলে তো—'অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গাৎ'[১]—মুক্তি হলো না। এর উত্তর বেদান্তের ভাষায় এই বলা যায়—যার উৎপত্তি নেই তার নাশ হবে কী করে? ব্যবহার থাকলে তবে তো তা দূর হবে! ব্যবহারই নেই। না থাকলে ব্যবহার বলছি কেন? বলছি আমাদের অনুভব হচ্ছে বলে—যার জোরে জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারের সহ-অস্তিত্ব পর্যন্ত মানতে বাধ্য হচ্ছি। এই যে অস্তিত্ব মানছি, এই অস্তিত্ব তত্ত্বত না থেকেও আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরই নাম মিথ্যা। মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় হয়ে যাবার পর ব্যবহার থাকল কি গেল তাতে জ্ঞানীর কী আসে যায়? খুব ভাববার কথা। জগৎকে যেন-তেন-প্রকারেণ লোপ করা উদ্দেশ্য নয়। হিটলারের মতো আরো কোন শক্তিশালী কেউ এসে একটা জগৎ-বিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে জগৎকে নাশ করে দেবে, তাত্ত্বিকের জগৎ-নাশ ঐরকম নয়। তাঁর জগৎ-নাশ মানে জগতের সত্যতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি আছে তার নাশ। যদি জগৎ মিথ্যারূপে প্রতীত হয়ে গেল, তারপর সেই মিথ্যা বস্তু থাকল কি গেল তাতে কার কী আসে যায়? যদি বলা হয়, ব্রহ্মজ্ঞের তো জগৎ-ব্যবহার রয়েছে? তার উত্তর হবে, রয়েছে তো রয়েছে। তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে যে সংশয় উঠেছিল তার নিরসন এইভাবে হবে যে, এই ব্যবহার মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, সুতরাং এই মিথ্যাত্ব সেখানে নিশ্চিত হলো। আমি দেখছি আমার দৃষ্টি দিয়ে, এবং এই ব্যবহার কী করে সিদ্ধ করব তার জন্য লেশ-অবিদ্যা[২] প্রভৃতি কল্পনা করছি জ্ঞানীর নিজের দৃষ্টিকোণ কিরকম হবে? তাঁর কোন দৃষ্টিকোণ নেই, কোন angle নেই যেখান দিয়ে তিনি দেখছেন, কারণ সে ব্যক্তিত্বই নেই। অতএব তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধেও প্রশ্ন হয় না। তবে আমরা যারা দ্রষ্টা তাদের কাছে এই ব্যবহারের প্রয়োজন আছে এবং এই ব্যবহারকে সিদ্ধ করবার জন্য নানা রকমের কল্পনা, লেশ-অবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। আমাদের কল্পিত, আরোপিত ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে না। পঞ্চদশীকার বলেছেন—'গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা'[৩]—অপরের আরোপিত আগুন দ্বারা গুঞ্জাপুঞ্জ দগ্ধ হয় না। পাকা গুঞ্জাফলে বন ভরে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় বনে আগুন লেগেছে। এই আগুনে কি গুঞ্জাফল পোড়ে? জ্ঞানীর ব্যবহার অন্যের আরোপিত বলে, তাতে তাঁর জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি কিছু হয় না। এই হলো সিদ্ধান্ত।

তাছাড়া, ব্যবহার যে প্রারব্ধজন্য বলি, তার উত্তরে শুদ্ধ বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখে শঙ্করাচার্য বলেছেন—'প্রারব্ধং সিদ্ধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ/ দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজতামতঃ॥'[৪]—প্রারব্ধ তখনই সিদ্ধ হয় যখন দেহের সঙ্গে আত্মার একটা অভেদ বুদ্ধি, একটা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ নিয়ে ব্যবহার হয়। 'দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ'—দেহের সঙ্গে আত্মার যে তাদাত্ম্য, এটা ইষ্ট অর্থাৎ

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—২/৩/৪০ ; ২. সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—৪/১/১-৪
৩. পঞ্চদশী—১৪/৪৬ ; ৪. বিবেকচূড়ামণি—৪৬০

সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং প্রারব্ধকে সিদ্ধ করার জন্য বেদান্তের এত কূট বিচারের প্রয়োজনই নেই। প্রারব্ধ মানে কতকগুলি অতীতের কর্ম, যা আমাদের দেহধারণ করায় তার ফল ভোগ করবার জন্য। ফল দিতে আরম্ভ করেছে এমন কর্মই প্রারব্ধ। গীতায় 'সর্বকর্মাণি'—সমস্ত কর্ম বলেছেন তবু শঙ্কর জ্ঞানীর ব্যবহারকে যুক্তিসম্মত করবার জন্য তার আওতা থেকে প্রারব্ধ কর্মকে বাদ রেখেছেন। কেন? না, তাহলে যুক্তির দিক দিয়ে সিদ্ধান্তে অসামঞ্জস্য আসে। কিন্তু জ্ঞানীর কোন কর্মই নেই। যেখানে দেহাত্মবুদ্ধি নেই সেখানে কোন কর্মও নেই। 'আমি দেহ থেকে ভিন্ন'—এই বুদ্ধি কারো হলে, সে কি বলবে, আমার প্রারব্ধ? আত্মরূপে সে কি কোন কর্ম করছে? যে আমি বলছি—'আমার প্রারব্ধ', সেই আমি কি আত্মা? না। কারণ, আত্মার কোন কর্ম থাকে না। সুতরাং সেই আমি 'অধ্যস্ত আমি,' যে দেহকে 'আমি' বা দেহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে বোধ করছে। একে বলে দেহাত্মভাব। দেহাত্মভাব থাকলে তবে তার অন্য কর্মের মতো প্রারব্ধরও সিদ্ধি হয়। দেহাত্মভাবও নেই, প্রারব্ধও নেই—এই হলো সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তটিকে যখন ভুলে যাই তখনই বেদান্তের বিভিন্ন উক্তিগুলিকে সুসমঞ্জস রাখবার জন্য ইমারত খাড়া করি, যার সমস্ত অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ হবে। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন থাকে না, যদি জ্ঞানীর ব্যবহারকেও অস্বীকার করি। যা সত্য তাই থাকবে, তার আর কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। বেদান্তের এই সার কথা। মনে রাখতে হবে, এই সার কথাটিও কাকেও বোঝাতে হচ্ছে, কেউ বোঝাচ্ছেন। এই ভেদকে স্বীকার করে বেদান্ত চলে। এইজন্য শঙ্কর বলেছেন—'নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ'[১], 'লৌকিকা বৈদিকাশ্চ'[১ক]—লৌকিক ব্যবহার থেকে বৈদিক ব্যবহারও এর মধ্যে। মনে রাখতে হবে, 'লৌকিকা বৈদিকাশ্চ'—লৌকিক, বৈদিক—সব ব্যবহার। যে বেদের উপর নির্ভর করে অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি, সেই বেদ পর্যন্ত ব্যবহারের সীমার বাইরে নয়। আর সেই অদ্বৈততত্ত্বকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যখন সেই তত্ত্বের প্রকাশ হচ্ছে—'(অত্র) বেদা অবেদাঃ (ভবন্তি)'[২]—তখন বেদও অবেদ অর্থাৎ অজ্ঞানের সীমার ভিতরে পড়ে যায়। বেদও ব্যবহারের অতীত নয়।

ব্যবহারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—লৌকিক আর বৈদিক। যেমন লৌকিক তেমনি বৈদিক ব্যবহারও অর্থাৎ যেখানে—'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৩]—বলা হচ্ছে, তাও এই সীমার ভিতরে রয়েছে। এই কথাটুকু মনে রাখলে বুঝতে পারব কেন শঙ্কর প্রারব্ধকে স্বীকার করেছেন। বৈদিক ব্যবহারকে সিদ্ধ করবার জন্য, এই সমস্ত দর্শনটিকে সুসমঞ্জস ত্রূটিশূন্য করবার জন্য শঙ্কর এইরকম আলোচনা

---

১. ব্রহ্মসূত্র, অধ্যাসভাষ্য ; ১ক. তদেব ;
২. বৃহদারণ্যক—৪/৩/২২ ; ৩. বৃহদারণ্যক—১/৪/১০

করেছেন। সিদ্ধান্তকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু যদি সেই সিদ্ধান্তে কেউ আরূঢ় থাকেন, তাঁর পক্ষে এসব কিছুই প্রযোজ্য নয়। এগুলি সব তাঁর কাছে অসার। সমস্ত বেদ তাঁর কাছে এই অজ্ঞানের সীমার মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—

'যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।'[১]

—যতদূর যাওয়া যায় সবই এর ভিতরে, বেদ-বেদান্ত পর্যন্ত। তার বাইরে কিছু নেই। তবে সবই যদি স্বপ্ন হয় তো এমন স্বপ্নই আমরা দেখব যার ফলে সমস্ত স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়।

প্রশ্ন হলো—আমরা যারা নিজেদের পরিচিত বলে মনে করি, সেই আমরা আমাদের আত্মাকে জানি কিনা। যেভাবে জানি বলে মনে করি—সেই জানার ভিতরে যে অত্যন্ত অসঙ্গতি রয়েছে তা বিচার করলেই বুঝতে পারি। কিন্তু শত বিচার করেও আত্মা সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত—যার মধ্যে কোনরকম অসঙ্গতি নেই তা আবিষ্কার করতে পারি না। এ এক দুর্দৈব, যাকে নিয়ে সর্বদা আমাদের কাজ, যাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারি না, সেই 'আমি'-কেই আমরা জানি না। আবার জানি না যে তাও বুঝি না। আমরা মনে করি জানি, কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, তুমি তোমার যে স্বরূপকে জান—সে স্বরূপ কী? তাহলে তার সঠিক উত্তর দিতে পারব না। কারণ 'আমি' সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত বা অসঙ্গত ধারণা রয়েছে যেগুলি দূর করতে পারছি না। আত্মা সম্বন্ধে আমরা কতরকমের সিদ্ধান্ত শুনি। একরকম হলো—আত্মা এই দেহরূপ মাত্র, দেহের সঙ্গে যার উৎপত্তি এবং লয় কল্পনা করা হয়। এরকম ধারণাও আছে যে, যে আত্মা স্বর্গাদিলোকে গমন করে সে দেহমাত্র নয়। আবার ধারণা আছে যে, এই পরিবর্তনশীল আত্মার জ্ঞাতা যদি অন্য কেউ হন তাহলে তিনিই আত্মা হবেন আর তাঁর জ্ঞানের বিষয় বলে যে আত্মাকে বলছি সেটি বাস্তবিক আত্মা নয়, তাঁরই কোন প্রতিচ্ছায়া। যে আত্মাকে দেহব্যাপী বলি তিনি দেহের কোথায় থাকেন? কেউ বলেন হৃদয়ে, কেউ বলেন মস্তকে, কেউ বলেন তাঁর পৃথক কোন সত্তা নেই, তিনি একটি ভাববস্তু মাত্র, যা দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং দেহের ক্রিয়া বন্ধ হলে তার ক্রিয়াও বন্ধ হয়। সুতরাং দেহাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব মানবার প্রয়োজনই নেই। এরকম নানা মত আছে। এরকম ধারণাও আছে যে, দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে তিনি থাকেন। কেউ বলছেন যে, দেহের এক জায়গায় থাকলে সর্বত্র তাঁর বোধ কেমন করে হয়, সুতরাং দেহের সর্বত্রই তিনি আছেন। তখন

---

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সং (১৩৮৩), পৃঃ ২৬৮

আবার প্রশ্ন ওঠে, দেহের সর্বত্র থাকলে যখন দেহটা ছোট থাকে তখন তিনিও কি ছোট থাকেন, দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় হন? অর্থাৎ দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কিনা। যদি হয় সেই হ্রাস-বৃদ্ধি আমাদেরও হয় কিনা এ প্রশ্নও আছে। আত্মা এত পরিবর্তনশীল হওয়া খুব যুক্তিসহ নয়। এই সিদ্ধান্তের যে বাধা, যে অসঙ্গতি তা দূর করবার জন্য কেউ বলেন—আত্মা সর্বব্যাপী। যদি তাই হন তাহলে, অপর একজনের অনুভব আমার হবে, আমার অনুভব অপর একজনের হবে। তা তো হয় না। সুতরাং সেইরকম সর্বব্যাপিত্বে যেন বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মা সম্বন্ধে এইরকম নানা মতভেদ রয়েছে।

এইজন্য যমরাজ নচিকেতাকে বলেছিলেন আত্মা অতি দুরূহ, দুর্গম, দুর্বোধ্য বস্তু। আত্মতত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করাও বৃথা। দেবতাদেরও এ সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। তবু এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকে জানবার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাও অদম্য এবং মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়তম হলেও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। অনাদিকাল থেকে মানুষ আত্মাকে জানবার চেষ্টা করে আসছে। কবে সে চেষ্টা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে তা সে জানে না। একটির পর একটি সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করছে, পরিত্যাগ করছে। চেষ্টা করে অনেক সময় ব্যর্থ হচ্ছে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলছেন—'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্'[১]—যদি ব্রহ্মকে জেনেছ বলে মনে কর তাহলে ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি অল্পই জান। আরো বলছেন, আত্মতত্ত্বকে খুব ভাল করে জেনেছি এ কথা মনে করি না, আবার আত্মতত্ত্বকে জানি না একথাও মনে করি না। তাঁকে জানি আবার জানি না। কথাটি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। কোন বস্তুকে জানি বললে তাকে জানি না বলা চলে না। যেখানে সমস্যার এইরকম রহস্যপূর্ণ উপসংহার, সেখানে আত্মতত্ত্বকে অসন্দিগ্ধরূপে জানা যে সহজ নয়—এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এই সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয় বেদও এই তত্ত্বকে আমাদের গোচর করে দিতে পারেন না।

তবু মানুষের অন্বেষণ অপ্রতিহতভাবে চলেছে। দার্শনিকরা এইসব বিভিন্ন সন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলছেন মানুষ যেমন করে বিষয়কে জানে তেমন করে আত্মাকে জানতে পারে না। কারণ চেষ্টা ভুল পথে চলেছে। যাকে পূর্বদিকে গেলে পাবার কথা তাকে যেমন পশ্চিমদিকে গেলে পাওয়া যায় না, ঠিক সেইরকম, আত্মা, যিনি আমাদের অন্তরতম, তাঁকে বাহ্যবস্তুর মধ্যে অন্বেষণ করে পাওয়া যায় না। এ সিদ্ধান্ত সহজে বোঝা যায় কিন্তু অন্তরের মধ্যে অন্বেষণ কেমন করে করতে হয়—তা আমরা জানি না। শাস্ত্র বলছেন 'আবৃত্তচক্ষু' অর্থাৎ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে মোড় ফিরিয়ে অন্তর্মুখ করতে হয়। এই অন্তর্মুখ কথাটাও আমাদের কাছে হেঁয়ালিপূর্ণ। চোখ বাইরের দিকে দেখে, তাকে অন্তরের দিকে দেখবার জন্য কেমন করে ফেরাতে হবে—

---

১. কেনোপনিষদ্—২/১

তা আমরা বুঝতে পারি না। শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দকে গ্রহণ করে বাইরে থেকে, তাকে কি করে অন্তর্মুখ করব জানি না। শাস্ত্র বলছেন, ভগবান যেন ঈর্ষাপূর্বক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন তাই তারা বাইরের বস্তু দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। তাঁকে দেখবার উপায় কী? শাস্ত্র বলছেন, আত্মার দিকে, নিজের দিকে মোড় ফেরাও। যে আমাকে খুঁজছি—সেই আমার দিকে কিভাবে মোড় ফেরাব? এ সমস্যার আশু সমাধান হয় না। বহুসাধনার পরিণামে যাকে বলে 'method of trial and error'—শতবার চেষ্টা করে করে বিফলমনোরথ হয়েও আবার চেষ্টা করতে করতে হয়তো কোনক্রমে 'আবৃত্তচক্ষু' হওয়া সম্ভব হবে, তখন আত্মাকে জানা যাবে।

অন্তর আর বাহ্য কাকে বলে তাও আমরা অনেক সময় বুঝি না। একটা ঘরের ভিতর আর বাইরে বললে বুঝি, দেওয়ালের ভিতরের দিক ঘরের অন্তর আর বাইরের দিকটা বাহ্য। কিন্তু আমার অন্তর আর বাহির কী করে বুঝব? ধরা যাক, শরীরের ভিতরটা অন্তর আর তার বাইরেটা বাহ্য। কিন্তু শরীরও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে, তাকে আমরা জানছি অতএব শরীর আমি নয়। সুতরাং তা বাহ্য হয়ে যাচ্ছে। তাহলে যে 'আমি' হলাম সেই অন্তর, সেই আমি কে? এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আমির অন্বেষণকে বলা হচ্ছে অন্তর্মুখ হয়ে অন্বেষণ করা। দেহ বাহ্য জগতের মতোই স্থূল। কারণ, সেটি জ্ঞানের বিষয়। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যজগতের মতো স্থূল না হলেও সেগুলিও স্থূল। কারণ, তা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। ইন্দ্রিয়ের কুশলতা, পটুতা, অপটুতা, মন্দ, ভাল, আমরা জানি সুতরাং ইন্দ্রিয়কে বুঝি। বুঝি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, মনের সাহায্যে। তাহলে ইন্দ্রিয়ও বাহ্য। আরো ভিতরে গেলে কোথায় যাব? মনে। মনের ক্রিয়া আমাদের অনুভবের গোচর। অতএব তাও বাহ্য। মনেরও পশ্চাতে যিনি, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। এই হলো অন্তর্মুখ হয়ে অন্বেষণ করা, 'আবৃত্তচক্ষু' হওয়া বা দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। যিনি মনের পিছনে থাকায় মন ক্রিয়া করে, যাঁর সাহায্য না পেলে মন অচল হয় সেই বস্তুই 'আমি'। সেই বস্তু সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারি কি না—সেই প্রশ্ন রয়েছে। তবে এটুকু বোঝা যায়—একটা সিদ্ধান্তরূপে আমরা এটি গ্রহণ করতে পারি যে, মনের পিছনে যিনি সত্তা রয়েছেন, যাঁর দ্বারা মন ক্রিয়াশীল, আবার যাঁর থেকে বিমুক্ত হলে মন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়—সেই বস্তুটিই আত্মা। 'মনসো মনঃ'[১]—মনের মন বলে তাঁকে বলা হয়েছে।

এই মনের মন বস্তুটিকে কী উপায়ে জানব? এমন কোন করণ নেই। যার দ্বারা জ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারি। তাহলে কি জ্ঞান অপ্রকাশ থেকে যাবে? দার্শনিকেরা বলছেন, তা হতে পারে না, সমস্ত প্রকাশ তাঁর সাহায্যেই হচ্ছে, তিনিই একমাত্র স্বপ্রকাশ যিনি নিজেকে নিজেই প্রকাশ করছেন। আর

১. কেনোপনিষদ্—১/২

সব বস্তুর প্রকাশই তাঁর অধীন। এই হলো সিদ্ধান্ত। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'[১]—যিনি সকলের বিজ্ঞাতা তাঁকে কী উপায়ে জানব? যিনি সকল জ্ঞানের পশ্চাতে থাকেন বলে সকল জ্ঞান সম্ভব হচ্ছে অথচ যিনি কোন জ্ঞানের বিষয় নন—তাঁর সম্বন্ধে আমরা কি চিরকাল অজ্ঞ থাকব? মনে করছি যেন তাঁকে ধরে ফেলেছি, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। তার কারণ আগেই বলেছি—আমাদের প্রণালী দিয়ে গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ। পরপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশের জন্য আলোকের দরকার হয়। কিন্তু যিনি স্বপ্রকাশ তাঁর প্রকাশের জন্য কোন করণের প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রিয়াদি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না বলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে চিরকাল অজ্ঞ থাকব—এটিও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়—জাগতিক বস্তুকে সূর্য প্রকাশ করে। সূর্যকে কে প্রকাশ করে? যখন প্রকাশ করবার কোন বস্তু থাকে না তখন সূর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু সূর্যও স্বপ্রকাশ নয় ; কারণ, তা জ্ঞেয় বস্তু। জ্ঞেয় বস্তুকে কারো জ্ঞানের বিষয় হতে হবে। নাহলে তার প্রকাশ আছে—একথা বলার কোন যুক্তি নেই। যা আছে তার প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষতা। যে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, তা আছে বলা চলে না। সূর্যের প্রকাশও কোন জ্ঞাতার উপর নির্ভর করে। তাই তাকে আর স্বপ্রকাশ বলা যাবে না। যুক্তির ধারাটা এইরকম।

আত্মা সম্বন্ধে কী বলব?—'ন তত্র সূর্যো ভাতি'[২]—সূর্য আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে না। সূর্যের প্রকাশ নির্ভর করে আত্মার উপর। সূর্য আত্মার বিষয়, আত্মার প্রকাশ্য। আত্মার জ্ঞানের বিষয় হয় বলে সূর্য প্রকাশিত। আত্মা কারো জ্ঞেয় বস্তু নন, তাহলে তাঁকে জানব কী করে? জানব জ্ঞানস্বরূপ রূপে, নিত্যবিষয়ীরূপে, বিষয়রূপে নয়। বলছেন, যদি বিষয় না থাকে তাহলে বিষয়ী কোথায় থাকেন? তার উত্তর, বিষয় থাকলে বিষয়ী তাকে প্রকাশ করেন, যখন বিষয় থাকে না, তিনি নিজে স্বপ্রকাশ থাকেন আমরা গৌণভাবে বলি, যা থাকবার তা থাকে। থাকাটা তাঁর কোন ক্রিয়া নয়। অস্তিত্ব আত্মার গুণ নয়, স্বরূপ। এই দৃষ্টিতে আত্মাকে বুঝতে হবে।

তিনি আমার স্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ—আত্মাকে মাত্র এইভাবেই জানা যায়। তাঁকে বলা হয়েছে নিত্যবিজ্ঞাতা। প্রত্যক্ষ না হলে অনুমানও করতে পারা যায় না। কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। কোন প্রমাণ দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। তাহলে বেদের দ্বারা তাঁকে জানা যায় কি? উত্তরে বলছেন, বল তো জানা যায়, বল তো যায় না। '(অত্র) বেদা অবেদাঃ (ভবন্তি)'[৩]—বেদ সেখানে অবেদ হয়ে যান। সুতরাং বেদ, যাঁকে অন্ত্যপ্রমাণ বলা হয়েছে—তাঁর দ্বারাও আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন না। তবে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব বাধা, আবর্জনা

---

১. বৃহদারণ্যক—২/৪/১৪

২. কঠোপনিষদ্—২/২/১৫

৩. বৃহদারণ্যক—৪/৩/২২

আমাদের মনে আছে—বেদ সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ আরোপিত উপাধিগুলি নিরাশ করতে বেদ চেষ্টা করেন। বেদের সার্থকতা এইটুকুই। বেদ যদি আত্মাকে প্রকাশ করতেন, তাহলে আত্মা পরপ্রকাশ হয়ে যেতেন, স্বপ্রকাশ হতেন না। আগেই বলেছি—লৌকিক বুদ্ধি আত্মাকে প্রকাশ করে না। এখন বলছি—শাস্ত্রীয় বুদ্ধিও করে না। সুতরাং যেসব উপায়ে কোন বস্তুকে জানা যায় বলে আমরা মনে করি—সেইসব উপায়গুলিই আত্মাকে জানার জন্য অচল।

আত্মতত্ত্বকে জানবার জন্য শাস্ত্র তবু চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। উপাধিধর্মের নিরাশের দ্বারা চেষ্টা করছেন। উপাধি নিজের ধর্ম অন্য বস্তুতে আরোপ করে। জবাফুল-স্ফটিকের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, উপাধিরূপ ফুল তার নিজের ধর্ম লাল রঙকে স্ফটিকে আরোপ করছে। শাস্ত্র আত্মার উপর আরোপিত ধর্মগুলির নিরাকরণ করেন, আমাদের দৃষ্টির আবরণ দূর করেন।

এই বল্লীর চতুর্দশ মন্ত্রে নচিকেতা ধর্মাধর্ম, কার্যকারণাদি থেকে পৃথক, নির্বিশেষ তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন। যমরাজও ওঙ্কাররূপ প্রতীকোপাসনার মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব তথা পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির পথ নির্দেশ করেছিলেন। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরের মন্ত্রটি বলা হচ্ছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১৮॥

অন্বয় ঃ— [ওঙ্কার পদবাচ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা হচ্ছে] বিপশ্চিৎ (নিত্য চৈতন্যস্বরূপ সর্বজ্ঞ) ন জায়তে (উৎপন্ন হন না) বা ম্রিয়তে (অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হন না) [জন্ম মরণের দ্বারা ছয় রকমের বিকারই প্রতিষিদ্ধ হলো।] অয়ম্ (এই আত্মা) কুতঃ চিৎ ন (অন্য কিছু থেকে সম্ভূত নন) [এই আত্মা থেকেও] কঃ চিৎ ন বভূব (কোন কিছু সম্ভূত হয়নি) [কার্যও নন কারণও নন।] অয়ম্ (ইনি) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সনাতন) শাশ্বতঃ (অবক্ষয়-রহিত) পুরাণঃ (চিরনূতন বা বৃদ্ধিরহিত) শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হলেও) [ইনি] ন হন্যতে (বিনষ্ট হন না)।

'বিপশ্চিৎ'—জ্ঞানবান, যিনি নিজেকে ব্রহ্মরূপে বুঝেছেন, যাঁর চোখের আবরণ অপসৃত হয়েছে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা'—তিনি জন্মান না, মরেন না। এখানে 'বিপশ্চিৎ' শব্দটি খুব অর্থপূর্ণ। জ্ঞানী তখন বোঝেন তিনি আর ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম জন্মান না, মরেন না—বলে বলা হলো 'বিপশ্চিৎ' অর্থাৎ যিনি জন্মান না মরেন না। তাৎপর্য হলো—আমরা জন্ম-মৃত্যু-রহিত হয়েও মনে করি আমাদের উৎপত্তি হচ্ছে, নাশ হচ্ছে। জ্ঞানী তা মনে করেন না। এই উৎপত্তি আর নাশের কথা উল্লেখ করায় তার অন্তর্বর্তী ষড়্ভাববিকারের কথাও বলা হয়ে গেল। যে কোন বস্তুর উৎপত্তি থাকলে তার পরবর্তী বিকারগুলিও থাকবে।

এগুলি হলো—জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি,[১] 'জায়তে'—জন্মায়, 'অস্তি'—বর্তমানে আছে। বর্তমান কথার তাৎপর্য হলো—বস্তুটির কাল-পরিচ্ছিন্ন স্থিতি আছে। 'বিপরিণমতে'—রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, 'বর্ধতে'—বৃদ্ধি পায়, 'অপক্ষীয়তে'—ক্ষয় হয় এবং 'বিনশ্যতি' অর্থাৎ নাশ পায়। অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই এই ছয়টি পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এই শ্লোকের দ্বারা সেই পরিণামগুলির নিরাশ করা হলো। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরকম পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছেন বলে মনে করেন না। 'নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ'—এই আত্মা কোন কারণান্তর থেকে উৎপন্ন হন না, কোন কার্যও তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়নি। তিনি কোন বিকৃতরূপে ছিলেন না, অর্থাৎ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে তিনি নেই। অন্য বস্তু আছে? বললেন, না। তাঁর থেকে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুও নেই। তিনি ছাড়া এই জগতে আর কিছু নেই—'মৎ অন্যৎ নাস্তি'[২]। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা বলেছেন। প্রথমে হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হলেন। তখন তিনি একাকী বলে ভয় পেলেন, 'স' ভাণ্ অকরোৎ[৩]—তিনি যেন কেঁদে ফেললেন। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে কেবল নিজেকেই দেখলেন। তখন তাঁর মনে হলো 'যৎ মদ্ অন্যন্নাস্তি কস্মান্ নু বিভেমি'[৪] যদি আমি ছাড়া আর কিছু না থাকে তবে কোন্ কারণ থেকে আমি ভয় পাচ্ছি? 'সঃ অনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনঃ অপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততঃ অহংনামাভবৎ'[৫]—তিনি নিজেকেই অর্থাৎ আত্মাকেই দেখলেন, তাঁর সব ভয় চলে গেল। এইজন্য যিনি আত্মজ্ঞ তাঁর ভয় থাকে না। তাই জনক রাজাকে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'অভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তঃ অসি'[৬]—হে জনক, তুমি আত্মজ্ঞ হয়ে অভয় হয়েছ। এখানে—'ন বভূব কশ্চিৎ'—বলতে আত্মা ছাড়া আর কোন বস্তু নেই—এ-কথা জোর দিয়ে বলা হলো। অর্থাৎ সমগ্র জগতের এক ব্রহ্মস্বরূপেই পর্যবসান। জ্ঞানীর স্বরূপ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'—আমাদের মনে হচ্ছে দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জন্ম হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি 'অজঃ'—জন্মরহিত, 'নিত্যঃ'—নাশরহিত। নিত্য আর শাশ্বত দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ, তিনি সর্বদা আছেন, তিনি অপরিবর্তনশীল—এই অর্থে বলছেন। 'পুরাপি নব এব ইতি'[৭]—পুরাতন হয়েও যিনি নতুন, চিরকাল একই রকম থাকেন, যাঁর অবয়বের কোন অপচয় বা উপচয় হচ্ছে না। কোন বস্তুর পুরাতন হওয়া মানে—তার অঙ্গের কোন অপচয় হওয়া বা মলিনতার জন্য পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। যে বস্তুর কোন অপচয় বা উপচয় হয় না, অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না সে পুরাতন হয়েও নতুন। এইভাবে আত্মা সম্পর্কে 'পুরাণঃ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

---

১. নিরুক্তম্—১/১/৩ ; ২. বৃহদারণ্যক—১/৪/২ ; ৩. তদেব—১/২/৪
৪. তদেব—১/৪/২ ; ৫. তদেব—১/৪/১ ; ৬. তদেব—৪/২/৪
৭. কঠোপনিষদ, শাঙ্করভাষ্য—১/২/১৮

আরো বলছেন—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—শরীরের বিনাশ হলেও তিনি বিনষ্ট হন না। এ কথা বার বার বলতে হচ্ছে কারণ, আমাদের দৃঢ় সংস্কার রয়েছে—দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎপত্তি, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নাশ। এই কথাটি খণ্ডন করে শ্রুতি বারবার বলছেন যে, দেহের সঙ্গে যে আত্মাকে অভিন্ন বলে ভ্রমজ্ঞান হচ্ছে, সেই আত্মা—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—শরীরের বিনাশ হলেও বিনষ্ট হন না। আত্মা যে শরীর থেকে ভিন্ন, শরীরের কোন ধর্ম যে তাঁকে স্পর্শ করে না—শ্রুতি এই কথাটি বহু প্রকারে শোনাচ্ছেন যাতে আমাদের দৃঢ়মূল সংস্কার ক্ষয় হয়। ফলে আমরা অনাত্মধর্ম-বর্জিত রূপে, শুদ্ধ স্বরূপে নিজেদের উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের হয়তো মনে হবে একই কথার পুনরুক্তি। 'ন জায়তে' বলাও যা আর 'অজঃ' বলাও তাই। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—বলা যা, 'ন ম্রিয়তে'—বলতেও তা-ই বোঝায়। বালককে যেমন নানারকম করে বোঝানো হয়, সেইরকম করে শ্রুতি, যাকে বলে পাখি-পড়ানোর মতো করে আমাদের বোঝাচ্ছেন যে, তুমি নিজেকে শরীরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত, বা শরীরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সুখী-দুঃখী মনে করলেও বস্তুত শরীরের ধর্ম তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। এগুলি অনাত্মবস্তু, আর তুমি আত্মবস্তু—একেবারে বিপরীত। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত থাক এবং জগতের সুখদুঃখাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়ো না। সুখ ও দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুটিই দেহধর্ম, মনোধর্ম। দেহ মন প্রভৃতির অতীত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সুখ-দুঃখাদি আর বিচলিত করতে পারবে না।

আমরা দেখলাম, আত্মবস্তুকে—'তিনি এইরূপ'—এরকম ভাবে বর্ণনা না করে নেতি নেতি করে বলা হলো—'ন জায়তে ম্রিয়তে'—যিনি জন্মান না, যাঁর মৃত্যু নেই ইত্যাদি। তাঁর উপরে উপাধি-ধর্ম আরোপিত হয়ে তাঁকে সেই সেই ধর্মবানরূপে দেখাচ্ছে। এই উপাধিধর্মগুলি যে তাঁতে নেই—এই কথা নেতি নেতি করে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা আত্মতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যায়। তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং বেদও আত্মাকে বা ব্রহ্মকে স্বরূপত প্রকাশ করতে পারেন না। শিবমহিম্ন স্তোত্রে এই বিষয়টি কবি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—'অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি'[১]—শ্রুতিও যাঁর কথা ভয়ে ভয়ে বলেন তিনি এ নন, তিনি এ নন। 'তিনি এই'—এভাবে অস্তিবাচক পদ দিয়ে তাঁর স্বরূপ নির্ণয় কেউ করতে পারে না। এমনকি যখন তাঁকে সৎ-চিৎ-আনন্দ বলি—যা তাঁর নিকটতম নির্বচন, সেখানেও শাস্ত্র সাবধান করছেন। সৎ অর্থে অস্তিত্ববান নয়, সৎ অর্থে তিনি অনস্তি নন, চিৎ মানে তিনি অচিৎ, অপ্রকাশ নন, আনন্দ মানে তিনি অনানন্দ নন। এর চেয়ে বেশি বলতে গেলেই

১. স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদনা: স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, কলকাতা, ১০ম সংস্করণ (১৩৯৩), পৃঃ ১৯৩, শ্লোকসংখ্যা—২

তাঁকে নামরূপের গণ্ডির ভিতরে এনে ফেলা হয়। তাঁকে কোন নাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি না, বেদও পারেন না। বেদ কেবল তাঁর উপরে আরোপিত নামরূপগুলি নিরাশ করে দেন--তিনি এ নন, তিনি ও নন। তিনি কে—তা আমরা জানি না, তাঁর সম্পর্কে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। তবে এটুকু জানি—তিনি না থাকলে আমিও নেই, জগৎও নেই।

পরিবর্তনশীল সব বস্তু যার উপর আরোপিত হয় সেটি অনিত্য নয়, এই অর্থে তিনি নিত্য। অনিত্য বস্তু তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত না থাকলে অনিত্য বস্তুগুলির প্রতীতি হয় না। এইজন্য অধিষ্ঠানকে অনিত্য বস্তু থেকে ভিন্ন করে বোঝাবার জন্য তাঁকে নিত্য বলা হয়েছে। অন্য উপায়ে তাঁর নিত্যতা বুঝবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের সিদ্ধান্তের উপর তাঁর প্রতিষ্ঠা নয়, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ। শাস্ত্র বলছেন,—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি'[১]—তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলতে পার আবার তা না-ও বলতে পার। এইটুকু বলতেও ভয় হচ্ছে যে, তাঁর স্বরূপকে হয়তো ঠিক প্রকাশ করা হলো না। কাজেই এরকম বস্তুকে বোঝানো বা বোঝা সহজ নয়। আমাদের বোঝার যে ধারা—তা অনুসরণ করে চললে কোনদিন সেই আত্মবস্তুতে পৌঁছাতে পারব না। কুকুর যেমন নিজের লেজ কামড়াবার চেষ্টা করে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে কিন্তু লেজের নাগাল পায় না তেমনি এভাবে আত্মার নাগাল আমরা কোনদিন পাব না। আমরা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে বাহ্যবস্তুর মতো করে আত্মাকে ধরতে চেষ্টা করি কিন্তু ধরতে পারি না। এই প্রণালীতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত object, জ্ঞেয়ের রাজ্যের ভিতরেই ঘুরতে হবে, জ্ঞাতার নাগাল পাব না। যেমন, যে সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন বলে মনে করছে—তার দৃষ্টিই আচ্ছন্ন। মেঘ সূর্যকে ঢাকে না, আমাদের দৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করে বলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না। এইরকম, বুদ্ধির উপর আবরণ থাকায় আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ হয়েও যেন—আমাদের কাছে অপ্রকাশ। যেন বলার কারণ, সত্যি সত্যি তাঁর অপ্রকাশ হয় না, প্রতি প্রকাশের সঙ্গে তিনি প্রকাশিত, প্রকাশমান আছেন। 'প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।'[২] প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত রয়েছেন। একটি জ্ঞান-বৃত্তির সঙ্গে আর একটি জ্ঞান-বৃত্তির পার্থক্য আছে কিন্তু যতগুলি বৃত্তি সবই যদি তাঁর প্রকাশে প্রকাশিত থাকে তাহলে পরিবর্তনশীলের ভিতরে অপরিবর্তনশীল তিনি রইলেন।

তিনি নিত্য জ্ঞাতা, জ্ঞানস্বরূপ, ভা-রূপ, স্বপ্রকাশ। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুরই প্রকাশ নেই। এই কথাটুকু আত্মতত্ত্ব অন্বেষণের সময় বিশেষভাবে স্মরণীয়, অনুধাবনযোগ্য। উপনিষদের প্রতি মন্ত্রে এটি যেন বোঝবার চেষ্টা করি যে, আত্মবস্তুকে বাহ্যবস্তুর মতো করে জানা যায় না। প্রদীপের আলো সূর্যকে প্রকাশ

১. ছান্দোগ্য—৭/২৪/১
২. কেনোপনিষদ্—২/৪

করতে পারে না। সূর্যের প্রভার দ্বারা প্রদীপের আলো ম্লান হয়ে যায়। তেমনি আত্মবস্তুর প্রকাশের দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত, তাঁকে কোন প্রকাশধর্মী পদার্থ প্রকাশ করতে পারে না। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ''[১]—সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য-চন্দ্র-তারকাসমূহও প্রকাশ করতে পারে না, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করতে পারে না, এই অগ্নি তাঁকে প্রকাশ করবে কিভাবে? শেষকালে সমাধান করছেন—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—এই সমস্ত জগৎ তাঁর দ্যুতি দ্বারা দীপ্তিমান। শ্রুতির লক্ষ্য এই, দর্শনের উপযোগিতা এইখানে, তাঁর নির্বাধ অনুভবের যে বাধা রয়েছে সেগুলিকে অপসারণ করে দিয়ে সেই স্বরূপের আস্বাদন করানো, আমাদের সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করানো। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় না, আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কারণ, আমরা সর্বদা নিজেদের উপর উপাধি-ধর্ম আরোপ করে, যা আমরা নই—নিজেদের তাই বলে মনে করছি। নিজেদের খণ্ড, অনিত্য, নানা বস্তুধর্মবিশিষ্ট বলে মনে করছি। এই ধর্মগুলির নিরাকরণ করে আমাদের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শাস্ত্রের প্রয়াস। শাস্ত্রকে এই দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

শ্লোকে বললেন—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। বিনষ্ট হবার আশঙ্কা মনে ওঠে এইজন্য যে, শরীরাতিরিক্ত আত্মা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। অশরীরী আত্মাকে আমরা দেখি না। যে আত্মার সঙ্গে আমরা পরিচিত তা কেবল এই শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট যে চেতনবস্তু। শরীর-সম্বন্ধী চেতনবস্তু—এ কথাটিকেও আবার অনুমানের সাহায্যে বুঝতে হচ্ছে। আমরা এমন একটি আমিত্বের সঙ্গে পরিচিত যার একদিকে শরীর আর একদিকে চৈতন্য। যদি বলি এই শরীরটি চেতন তাহলে প্রশ্ন ওঠে মৃতদেহের সকল অবয়ব থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য নেই কেন? অতএব শরীরটুকুই চেতন এটা বলতে পারি না। যদি বলা যায় চৈতন্য শরীরের একটা ধর্ম তাহলে যে 'আমি' এই দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করছি সেই আমিটি কে? সেই 'আমি' যদি আত্মা হয় এবং দেহ যদি তার অনুভবের বস্তু হয় তাহলে দেহ আর আত্মা অভিন্ন হতে পারে না। সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। কর্তা আর কর্ম এক বস্তু হতে পারে না। আমি যদি কর্তা হই তাহলে এই শরীর, যাকে আমি অনুভব করছি তা 'আমি' হতে পারে না। কর্তা এবং তার অনুভবক্রিয়ার কর্ম শরীর—এই দুটি এক হতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে আত্মা আর দেহ ভিন্ন।

আত্মা আর দেহের মধ্যে তাহলে কী সম্বন্ধ ভাবতে হয়। যদি বলি স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধ তাহলে আমি মালিক এবং আমার সম্পত্তি এই শরীর, সমধর্মী হতে পারে না। একটির অস্তিত্ব আর একটির উপর নির্ভর করে না। মালিক

---

১. কঠোপনিষদ্—২/২/১৫

না থাকলেও তার সম্পত্তি থাকতে পারে, সম্পত্তি না থাকলেও মালিক থাকতে পারে। সেইরকম দেহের সঙ্গে আত্মার যদি স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধ হয় তাহলে দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব অনুভব হওয়া উচিত। তা হয় না। দেহের দ্বারা অনধিষ্ঠিত, অসংস্পৃষ্ট যে আত্মা সেই আত্মাকে আমরা জানি না। আত্মা সেখানে সন্দেহের বিষয়, সুতরাং স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধও হলো না।

তাহলে কী সম্বন্ধ হবে? যদি বলা যায় ধর্মধর্মিসম্বন্ধ। আত্মা দেহেরই একটি ধর্ম, দেহ ধর্মী, তাহলে প্রশ্ন হবে—আত্মা দেহের কোন্ অবস্থার ধর্ম? দেহের বিভিন্ন রকম পরিণাম হচ্ছে তার ভিতরে কোন্ অবস্থাটিকে ধর্মী বলব এবং আত্মাকে তার ধর্ম বলব? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। সদ্যোজাত শিশুর দেহ ও তার আত্মা এবং বৃদ্ধের যে দেহ ও আত্মা—অন্তত দেহের দিক দিয়ে দেখলে এ যেন অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। চৈতন্যকে আত্মধর্ম বললে দেহের পরিবর্তনের দ্বারা আত্মার পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হচ্ছে না। সুতরাং চৈতন্যকে আত্মধর্ম বলতে পারছি না। জড়বাদীর দৃষ্টিতে চৈতন্যকে আত্মধর্ম বলা হয়। নৈয়ায়িকরা বলেন, আত্মাতে জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়। তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এ এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। কেন না যুক্তি হলো, আত্মা বিষয়েন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে তাতে জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়। তার আগে আত্মা অজ্ঞান থাকে। এখন প্রশ্ন, অজ্ঞান আত্মাকে স্বীকার করব কী করে? অননুভূত বস্তুকে স্বীকার করব কেন? নৈয়ায়িক বলবেন, অননুভূত বস্তু অনেক আছে তাদের যেমন করে যুক্তির সাহায্যে স্বীকার কর তেমনি করে। দৃষ্টান্ত—আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের অপর পিঠ কখনো দেখতে পাই না, কেবল একটা পিঠই দেখতে পাই। অপর পিঠের কথা অনুমানের দ্বারা জানি। যার একটা দিক আছে তার অপর দিকও থাকবে এটা প্রত্যক্ষ না দেখলেও অনুমানের দ্বারা স্বীকার করি। তেমনি জড়, অচেতন হলেও চৈতন্যধর্মের অধিষ্ঠানরূপে একটি আত্মাকে আমরা যুক্তির দ্বারা স্বীকার করতে বাধ্য হই। এরকম অচেতন আত্মাকে নৈয়ায়িকরা মানেন। এইরকম আত্মাকে একমতে বলে নিত্য চৈতন্য, অবিচ্ছেদ্য চৈতন্যরূপ আত্মা, অপরমতে বলে—অজ্ঞান আত্মা।

আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত রয়েছে। কেবল প্রাকৃত, অমার্জিত বুদ্ধির জন্য নয়, অতিশয় মার্জিতবুদ্ধি যারা তাদের মধ্যেও সন্দেহ আছে। এখানে বিচারের যথেষ্ট অবকাশ আছে। একরকম বিচারের দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত হয়তো স্থির করা হলো, আবার আর এক বিচার-সরণী অবলম্বন করে অপর মতাবলম্বীরা হয়তো সেই সিদ্ধান্তকে একেবারে অযৌক্তিক বলে প্রতিপাদিত করলেন, তাতে দোষ দর্শন করলেন। বেদান্ত বলেন, এটা স্বাভাবিক। যে বস্তু কখনো আমাদের অনুভবের বিষয় হতে পারে না, সেই বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবেই। কারণ, আত্মাকে ঘটপটাদির মতো প্রত্যক্ষের বিষয় করতে পারি না। আত্মা কখনো জ্ঞানের বিষয় হন না। তাই একদিক দিয়ে নৈয়ায়িকের এই সিদ্ধান্তে আমরা ফিরে যাচ্ছি যে, আত্মাকে জানা যায় না।

তাঁকে উপাধি-ধর্ম-সংশ্লিষ্ট করে জানছি অর্থাৎ আত্ম-মনঃসংযোগের দ্বারা জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হন—এরকম ধরে নেওয়া হচ্ছে। আত্মা এবং মন এ দুটির সংমিশ্রণে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিত্য না অনিত্য? অবশ্যই অনিত্য। এখানে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। আত্মাকে জানা বলে যেখানে বলি সেখানে জ্ঞানটি অনিত্য এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকবে। জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়ে আত্মাকে জানা অর্থাৎ তাঁকে সুখীরূপে, দুঃখীরূপে জানা। আত্মার বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বলে যে মনে করছি—সেইরূপে তাঁকে জানা। এগুলির কোনটি নিত্য নয় এবং এগুলি যখন উৎপন্ন হয় তখন আত্মার সম্বন্ধে আমাদের একটা জ্ঞান হয়—সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব গুণগুলি যেখানে নেই, সেখানেও আত্মাকে আমরা জানি কি না? নৈয়ায়িকের মতে, জানি না।

বেদান্তী বলেন, এক এক সিদ্ধান্ত অনুসারে যুক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন এবং এই প্রত্যেকটি যুক্তির ভিতরে দোষ এবং গুণ থাকে। একেবারে দোষমুক্ত অকাট্য যুক্তি এখনো পর্যন্ত বেরোয়নি। শঙ্কর বলেন, কখনো বেরোবে বলেও মনে হয় না। শঙ্কর এত বড় যুক্তিবাদী, তা সত্ত্বেও তিনি কোন যুক্তিকে অকাট্য, অভ্রান্ত বলে মনে করেননি। তিনি বলছেন—এখন একজন যুক্তির দ্বারা বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা করে দোষ দেখিয়ে নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আগামী কাল বেশি তর্কপটু আর একজন এসে পূর্ব সিদ্ধান্তের দোষ বার করতে পারবেন না—একথা জোর করে বলা যায় না। বিচার-সরণী দেখলে আমাদের এই কথা সত্য বলে মনে হয়। দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে বিরোধ চলে আসছে—তার কথাই ধরা যাক। 'অদ্বৈত' শব্দে বোঝা যাচ্ছে—'ন দ্বৈত'—নঞ্ অর্থে বিরোধ। দ্বৈতের সঙ্গে যার বিরোধ—এইরকম অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত হলো। বিরোধ কোন্‌খানে? আমাদের সর্বদা যে-সকল বস্তুর সঙ্গে পরিচয়—তা হলো দ্বৈত। তার সঙ্গে বিরোধ করে, খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে সিদ্ধান্ত হলো যে, দ্বৈত কিছু তত্ত্ব নয়, অদ্বৈতই তত্ত্ব। আবার সেই অদ্বৈতকে খণ্ডন করে আর একজন দ্বৈতবাদী যুক্তি দেখিয়ে 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ লিখলেন, যেখানে দ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। সেই যুক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খণ্ডন করে রচিত হলো—'অদ্বৈতসিদ্ধি' আবার সেই অদ্বৈতের মধ্যে দোষ দেখিয়ে লেখা হলো—'অদ্বৈতশতদূষণী'—অদ্বৈতের একশটা দোষ। একশ কথার কথা, তাদের মতে অনন্ত দোষ। আবার 'শতদূষণীকে' খণ্ডন করে লেখা হলো—'শতদূষণীসম্মার্জনী'—যার মধ্যে একশটা দোষ ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়েছে। তারপর সেই সম্মার্জনীকে দগ্ধ করবার জন্য আগুন এবং সেই আগুনকে নির্বাপিত করার জন্য আবার কোথাও জলের আবিষ্কার হবে কিনা কে জানে? সেইজন্য শঙ্কর বলেন—তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হবে না। তাহলে কিসের দ্বারা হবে? শ্রুতির দ্বারা। শ্রুতি তো রয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে কি? আমরা দেখেছি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাতা শ্রুতির তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করেন।

সুতরাং শ্রুতির দোহাই দিয়ে যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে তা কী করে বুঝব? বুদ্ধির সাহায্যে। শঙ্কর বললেন—আমরা বুদ্ধিকে প্রয়োগ করব, কিন্তু তা স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে নয়। তিনি আত্মা সম্বন্ধে তর্ককে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে চান না। তাঁর মতে—শ্রুতি-অনুসারী তর্ক আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হয়তো করবে কিন্তু সকলের কাছে নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের কাছে এটি দৃঢ় হবে, গ্রহণযোগ্য হবে ঠিকই, কিন্তু তার বিপরীত পক্ষ যে থাকবে না এমন নয়। বিরুদ্ধ পক্ষ আগেও ছিলেন, এখনো আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁদের কথাগুলিকে একেবারে বালসুলভ নির্বুদ্ধিতাও বলা যায় না। অনেক প্রখর বুদ্ধিমান লোক তাঁদের মধ্যে ছিলেন। কাজেই কোন সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধভাবে সর্বকালের জন্য অপরিবর্তিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্বন্ধে বেশি ভরসা রাখা যায় না। তবে মনে হয় যে, সবগুলিই আশ্রয় করে মানুষ এগোতে পারে। সবই জ্ঞানলাভের অনুকূলতা করে। কিন্তু পূর্বসংস্কার অনুসারে কোন একটি সিদ্ধান্ত মানুষের কাছে রুচিকর হয় এবং তার যুক্তি সেই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতেই তৎপর হয়।

এরকম কথা বললে তার মধ্যে একটা বিরাট দোষ এসে যায়। সে তত্ত্ব কি স্বতন্ত্র, না বস্তুতন্ত্র? 'চিদাকাশে যার যা ভাসে'[১]—যে যেমন বোঝে তাই যদি তত্ত্ব হয় তাহলে তার কাছে তত্ত্বটি পুরুষতন্ত্র, বস্তুতন্ত্র হলো না—যাকে ইংরেজীতে Pragmatism—প্রয়োগবাদ বলে। প্রয়োগবাদ কেবল ফলাফল দ্বারা যুক্তি বা নীতির সত্যতা নির্ণয় করে। এ তত্ত্বকে নতুন মতবাদ বলে মনে করলে ভুল করব, এ তত্ত্বও পুরানো। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধেরা বলছেন—সত্য কী? না—'অর্থক্রিয়াকারিত্বমেব সত্ত্বম্'[২]—যার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যেমন, জলাশয়ের জলে স্নান ও পান করা যায়, অতএব জলটি সত্য। মৃগতৃষ্ণিকার জলে এসব করা যায় না—সুতরাং সেটি মিথ্যা। কারণ আমাদের ব্যবহার তার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অতএব যা আমাদের ব্যবহারে লাগে, প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা সত্য। তাহলে সত্য এখানে পুরুষতন্ত্র হয়ে গেল এবং সাধারণ সংস্কারের অত্যন্ত বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। ধরা যাক, একটা দড়িকে সাপ বলে দেখে ছুটে পালিয়ে গেলাম সাপের ছোবল থেকে বাঁচবার জন্য। বাঁচলামও। তাহলে সে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করল। সুতরাং সাপটা সত্য। আবার আলো নিয়ে দেখলাম সেটি দড়ি, সাপ নয়। তখন দড়ি সত্য। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই বস্তুকে সাপও দেখছি, দড়িও দেখছি। তাহলে বস্তুটির সত্যতা আমার দেখার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। সুতরাং সত্যকে জানবার যে 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব' লক্ষণ বলা হয়েছিল সেটি খুব যুক্তিসহ হচ্ছে না। এইজন্য সকলেই বলে—সত্য

১. সঙ্গীত সংগ্রহ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৪
২. ন্যায়মঞ্জরী—জয়ন্ত ভট্ট। সম্পাদনা ঃ সূর্য নারায়ণ শুক্লা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, সংস্করণ (১৯৩৬), উত্তর ভাগ, প্রমেয় প্রকরণ, পৃঃ ১৭।

হলো বস্তুতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র নয়। যে বস্তু সম্বন্ধে সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত হচ্ছে, সেই বস্তুর উপরেই নির্ভর করে তার সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব, দ্রষ্টার উপর নয়। দ্রষ্টার দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন, দ্রষ্টার অনুভবের অপেক্ষা করে সত্য রূপ বদলায় না, সত্যের একটা নিজস্ব রূপ আছে। কিন্তু বস্তুটিকে জানা যায় কি? পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এ সম্বন্ধে নানা সংশয় আছে, কেউ বলেন জানা যায়, কেউ বলেন যায় না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও যদি কেউ অজ্ঞেয়বাদকে অবলম্বন করে, তাকে কেউ আর ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে পারবে না। অজ্ঞেয়বাদ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ সেখানে কোন সিদ্ধান্ত নেই। তাঁরা বলেন বস্তু অজ্ঞেয়, তাকে জানবার কোন উপায় নেই। যখন জানলাম তখন আমাদের বুদ্ধি অনুসারে তাকে একটা রূপ দিলাম, যে রূপ বস্তুর উপর অন্তত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে না। সুতরাং তার বস্তুতন্ত্রতা রইল না। দার্শনিকদের এ এক মহা সমস্যা। এর নিরসনের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যুক্তি অন্তত মানুষকে বলে যে সত্য এত ঘন ঘন পরিবর্তিত হয় না। যদি হয় তাহলে তা সত্য নয়। সত্য এমন এক বস্তু যা আমার দেখার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আমি যখনই দেখি তখনই তাকে একটু ভিন্ন রূপে রূপায়িত করি। সেটা হয়তো সত্য নয়। একদিক দিয়ে দেখলে কথাটি বেদান্তের সঙ্গে খুব ভাল করে মেলে। বেদান্ত বলে আমরা যা দেখছি সেগুলি বস্তুর আসল রূপ নয়। আসল রূপ তাহলে কী? না, আমাদের জ্ঞানের বিষয় থেকে বিভিন্ন বৈচিত্র্য, যা আমাদের দৃষ্টির পরিণাম, সেগুলিকে সরিয়ে ফেললে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সত্য। তা আর পরিবর্তিত হবে না। কিন্তু অবশিষ্ট কী থাকে? কারো মতে কিছু থাকে না, কারো মতে কিছু থাকে। কী থাকে? না, জ্ঞানের বিশেষকে সরিয়ে দিলে জ্ঞান মাত্র থাকে। অপরে বলবেন, এ তো কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। বিশেষকে বাদ দিয়ে জ্ঞানকে কে অনুভব করছে? এটি ভাববার বিষয়। যখনই আমরা অনুভব করি তখনই 'জ্ঞান' হয় এবং তার সঙ্গে—'এবম্প্রকার জ্ঞান'—এই প্রকারতা থাকে। আমি আমার কথা যখন ভাবি তখনো তাই। যখন বলি 'আমি' তখন এই শব্দটির ভিতরেও প্রকারতা আছে এই যে, 'আমি' যে 'তুমি' নয় তোমার থেকে পৃথক। এই যে আর একটি থেকে পৃথক করে নেওয়া হচ্ছে এই প্রকারতা সর্ব জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই প্রকারতাগুলিকে বাদ দিয়ে যে জ্ঞান, বেদান্তবাদী বলেন—সেই জ্ঞানকে অস্বীকার করলে প্রকারতা অজ্ঞাত থেকে যাবে। শুদ্ধ জ্ঞানের অনুভব আমাদের কোথাও নেই। যদি বলি, তাহলে সেই জ্ঞান যে আছে তার প্রমাণ কী? প্রমাণ এই, প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ রয়েছে। 'প্রতিবোধবিদিতং মতম্'[১]—প্রতি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন। তাঁকে অস্বীকার করবার উপায়

---

১. কেনোপনিষদ্—২/৪

নেই, যে করবে তারও সত্তারূপে, আত্মারূপে তিনি থাকবেন। বৈদান্তিক মনে করেন এই যুক্তি অকাট্য।

অপরপক্ষ বলবেন, এ কেবল কথার মারপ্যাঁচ। যে বস্তু আছে বলে বলছ তাকে জ্ঞানের বিষয় করতে পার কি? পার না। কারণ, তিনি হলেন নিত্য বিষয়ী অর্থাৎ বিষয়ের ভাসক, প্রকাশক। যদিও তাঁকে প্রকাশক্রিয়ার কর্তা বলা যায় না। কর্তা বললেই তাঁর পরিচ্ছেদ এসে যাবে। সর্ববস্তুর প্রকাশ হয় তাঁর প্রকাশকে অবলম্বন করে। তিনি স্বতঃ রয়েছেন, আর সব রয়েছে তিনি আছেন বলে। এইভাবে তাঁর সত্তাকে সর্বদাই স্বীকার করতে হয় কিন্তু তাঁর সর্বপ্রকারতা থেকে ভিন্নরূপে অনুভব কখনো হতে পারে না বলে বেদান্তবাদী বলেন।

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, 'নিরস্তসর্ববিশেষম্'[1]—সর্ব বিশেষশূন্য। আমরা কেউ তাঁকে সেইরূপে অনুভব করতে পারি না। তবে সেই 'নিরস্তসর্ববিশেষম্' যে স্বরূপ—সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। একেই গৌণভাবে বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া বা ব্রহ্মকে জানা। ব্রহ্মকে জানা মানে এ নয় যে ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করা হয়েছে। ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্মের অর্থাৎ আত্মার উপরে যে সমস্ত বৈচিত্র্য, প্রকারতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইগুলি থেকে পৃথককরণ। তারপর যা থাকে তাকে আর কেউ প্রকাশ করতে পারে না। কোন শব্দ দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। এইজন্য তিনি বাক্যমনের অগোচর। এরকম বাক্যমনের অগোচর বস্তুকে স্বীকার করার প্রয়োজন কী? স্বীকার না করলে যে স্বীকার করছে না তার অস্তিত্ব থাকে না। যে অস্বীকার করছে তারও ভিতরে আত্মারূপে তিনি রয়েছেন। তাহলে তাঁকে 'অনস্তি' বলে প্রমাণ করবার কেউ রইল না। তিনি রইলেন স্বমহিমাতে, মানে স্বপ্রকাশরূপে। অন্য কোন বস্তুর, ইন্দ্রিয়ের, বৃত্তিজ্ঞানের অপেক্ষা না রেখে, কোন জাতি, গুণ, বা ক্রিয়ার দ্বারা বিশিষ্ট না হয়ে তিনি রইলেন। তাঁর সত্তা নির্বিবাদ, অদ্বৈত বেদান্তী এইরকম মনে করেন।

তাঁকে আমরা আত্মাই বা বলছি কী প্রয়োজনে? আমরা যদি কেবল একটি শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্যকে স্বীকার করি তাতে আমাদের লাভ কী? বিনা প্রয়োজনে কতকগুলি দার্শনিক বিচারের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য নিজেদের সমস্যার সমাধান করা। আমরা আত্মজ্ঞানের অভাবে দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্নরূপে ভাবার ফলে জন্ম-মরণাদি প্রাপ্ত হচ্ছি, সর্বদা দুঃখবোধ করছি। এই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য আত্মবিচারের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও বিচার করে—'অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্'[2]—এই সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে। এই জগৎ অনিত্য, অসুখকর, দুঃখময়। ঠিক কথা। তার প্রতিবিধান কিছু আছে? আছে। কী? নিজেকে জানা।

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—১/১/২০

২. গীতা—৯/৩৩

জ্ঞানের দুটি ভাগ থাকে। একটি জ্ঞাতা আমি আর একটি আমার জ্ঞেয় বস্তু। জ্ঞেয় বস্তুকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে এটি অনিত্য, অসুখকর। এখন আমাকে নিয়ে বিশ্লেষণ। যে আমি জানছি, অর্থাৎ জ্ঞাতা, যে আমি সুখদুঃখ বোধ করছি, অর্থাৎ অনুভবকর্তা সেই 'আমি'-কে বিশ্লেষণ করে পৃথককরণ করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে রয়েছে শুদ্ধ জ্ঞান আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, দেহ। এই মিশ্রণকে 'আমি' বলে বলছি। এখন এই পৃথককরণ প্রক্রিয়াটি আরো অনুসরণ করলে দেখব যে, এর ভিতরে একটিই অপরিবর্তনশীল অব্যভিচারী সত্তা, বাকিগুলি সব ব্যভিচারী অর্থাৎ আসে যায়। এই ব্যভিচারী সত্তাকে অব্যভিচারী সত্তা থেকে পৃথক করলে দেখব অব্যভিচারী সত্তাটি হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞান আর ব্যভিচারী বস্তুগুলি তার সঙ্গে প্রকাশিত নানা বৈচিত্র্য। যেটি অব্যভিচারী সেটিই 'আমি' আর ব্যভিচারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বস্তুটি নিশ্চয় 'আমি' নয়। কারণ, আমি পরিবর্তিত হচ্ছি—এই বুদ্ধি আমাদের থাকে না। সুতরাং আমি যদি অব্যভিচারী হই, দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হই, তাহলে দেহেন্দ্রিয়াদির পরিবর্তন বা তাদের ধর্ম আমাকে কেন ক্লেশ দেবে? আমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ—এই তত্ত্বে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকলে ইন্দ্রিয়াদির পরিণামের দ্বারা সেই 'আমি' পরিণামপ্রাপ্ত হব না। 'গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।'[১] যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের পৃথক পৃথক কর্মবিভাগ জেনেছেন তিনি ইন্দ্রিয়াদিকেই তাদের নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে আছে জেনে কর্মে কখনো আসক্ত হন না এবং কর্তৃত্বাভিমানও করেন না। বিষয়গুলি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পরিণাম, তারা তাদের সীমার মধ্যে থাকুক, আমি কেন নিজেকে তাদের দ্বারা স্পৃষ্ট বলে মনে করব? এই হলো পৃথককরণ। দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি বলে সুখদুঃখাদি আমাদের কষ্ট দিচ্ছে। যদি বিচার করে বুঝি—আত্মা এইরকম, আর—আমি এইরকম, তাহলে আর দেহেন্দ্রিয়াদির দুঃখ আমাদের কেন স্পর্শ করবে? এবার আমরা বলতে পারছি—বেদান্ত বিচার কেন প্রয়োজন। আগেই বলেছিলাম—কেবল তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছায় নয়, কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যই এই জানা, তা হলো সুখদুঃখাদির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ। নিজেকে দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক করে শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সুখদুঃখাদি আর স্পর্শ করতে পারবে না। একেই বলে সমস্ত অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্যের নিবৃত্তি। নিবৃত্তি মানে লোপ নয়, তাদাত্ম্য জ্ঞানের নিবৃত্তি। আর কিছু করার দরকার নেই, জগৎকে ভেঙে চুরমার করার কোন দরকার নেই। চুরমার করলেও মুষলের মতো তা কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না। সুতরাং ওদিক দিয়ে চেষ্টা না করে নিজেকে বিশ্লেষণ করে সুখ-দুঃখাদি থেকে নিজেকে পৃথক করে নিলে তখন সমস্ত জগৎ, সুখদুঃখাদি, নিরাধার হয়ে যাবে। কারণ আমিই

---

১. গীতা—৩/২৮

ভ্রান্ত বুদ্ধি দিয়ে তাদের আধার হয়ে আছি। যদি আমাকে সরিয়ে নিই তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অবাস্তব **নয়,** অতিশয় practical কারণ, যার যত practicality সেগুলো ঐ গণ্ডির ভিতরে। বিচার আমাদের গণ্ডি থেকে বার করে দেয়।

এই ব্রহ্মজ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ বা তর্কের দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাহলে বেদান্তজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ'—এই জ্ঞান কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, প্রমাণান্তরের উপর নির্ভর করে না কারণ, এই জ্ঞানই মাত্র স্বপ্রকাশ। সুতরাং পূর্বে যে বলা হয়েছিল বস্তুর অনুভব না হলে তার বিদ্যমানতা স্বীকার করব না, যার জন্য আত্মাকে পর্যন্ত অস্বীকার করবার চেষ্টা হয়েছে—চার্বাকাদি বা বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের সেই সিদ্ধান্তে দোষারোপ করে অদ্বৈতবাদী অভ্রান্ত বলে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, আত্মার কখনো নিরাকরণ হতে পারে না। আত্মাকে কেউ অস্বীকার করতে, অনস্তিরূপে প্রমাণ করতে পারে না। তাঁকে অস্তিরূপে প্রমাণ করবারো প্রয়োজন নেই। যে বস্তু স্বপ্রকাশ তার প্রকাশের জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা থাকে না। শ্রুতিও তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন না, তাঁর সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি রয়েছে সেগুলি নিরাস করেই শ্রুতির কর্তব্য সমাপ্ত হয়।

পরের মন্ত্রটি এরই বিস্তার মাত্র। যখন আত্মস্বরূপ অনাত্মধর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট হন তখন কী হয় তা বলা হচ্ছে।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয় ঃ—হন্তা (হত্যাকারী) চেৎ (যদি) হন্তুম্ (হত্যা করতে) মন্যতে (অভিলাষী হয়) হতঃ চেৎ (হিংসিত ব্যক্তি যদি) হতম্ ([নিজেকে] মৃত) মন্যতে (মনে করে) তৌ (সেই) উভৌ (হত্যাকারী ও হিংসিত দুজনেই) ন বিজানীতঃ ([এই আত্মতত্ত্ব] সম্যকরূপে জানেন না) [কেন না] অয়ম্ (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না) [অথবা] ন হন্যতে (অপরের দ্বারা হত হন না)।

'হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং'—হননকারী যদি মনে করে আমি কাউকে হত্যা করব অথবা—'হতঃ চেৎ মন্যতে হতম্'—আহত ব্যক্তি যদি মনে করে আমি হত হলাম তবে 'উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ'—তারা উভয়েই জানে না যে—'অয়ং ন হন্তি ন হন্যতে'—আত্মা কাকেও হত্যা করেন না বা কারো দ্বারা হত হন না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দেহের নাশের সঙ্গে আত্মার নাশ হয়। আমি আত্মাকে হনন করব অথবা আত্মা আমার দ্বারা হত হবেন—এই রকম যারা মনে করে, তারা উভয়েই—অর্থাৎ হননক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম—তত্ত্বকে জানে না। ভাব হচ্ছে আত্মা সমস্ত কর্তৃত্ব-কর্মত্ব-ধর্মবর্জিত। শুধু হননক্রিয়া নয় আত্মা যে কোন ক্রিয়ার কর্তাও নন বা ক্রিয়ার ফলের

আশ্রয় কর্মও নন। সমস্ত বিক্রিয়াকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই তিনি, শুদ্ধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। এখানে বিশেষ করে হননক্রিয়াকে উল্লেখ করেছেন এইজন্য যে আমরা সর্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। বস্তুতপক্ষে হত্যা করা বা হত হওয়া দুটোই ভ্রমজ্ঞান থেকে হয়। আমরা কেউই হনন করি না কিংবা হত হই না।

এই বাক্য থেকে এই ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব যে, আমরা তাহলে যতগুলি ইচ্ছা খুন করতে পারি। মানুষকে খুন করে বলব—'নায়ং হন্তি ন হন্যতে'। আমরা বললেও আইন সে কথা শুনবে না। যে শরীরটি হত্যা করেছে আইন তাকে শাস্তি দেবে। এখন, আমার যদি শরীরবোধ না থাকে, হনন করছি—এই কর্তৃত্ববোধ যদি না থাকে তাহলে শাস্তি আমার এমন অনুভব হবে না। কর্তৃত্ববোধ থাকলে হতও হতে হবে। সুতরাং সে অবস্থায় যে কর্ম করবে সে তার ফল পাবে।

এখানে লোকব্যবহার সব লুপ্ত হবে এরকম আশঙ্কার কারণ নেই। লোকব্যবহার হচ্ছে অজ্ঞানকে আশ্রয় করে। অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মাই নিজেকে হন্তা বা হত মনে করছে এবং সেই কৃত কর্মের ফলও সে ভোগ করছে। সুতরাং যে হত্যা করছে তার যদি ফাঁসি হবার কথা হয় ফাঁসি হবে, তার থেকে সে রক্ষা পাবে না। কিন্তু সে যদি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে বুঝবে যে আমি হন্তাও নই, হতও নই 'হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে'[১] কিন্তু এই বলে যে যা খুশি করবার একটা ছাড়পত্র পেয়ে গেল—এরকম মনে করবার কারণ নেই। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে যে প্রতিষ্ঠিত সে হনন করতে যাবেও না। যে দ্বেষাদিবশত মানুষ হননক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় সেরকম দ্বেষাদি তাঁর মনে আসবেই না। সুতরাং তাঁর দ্বারা সমাজব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হবে বলে যে ভয় আমরা করছি তার কোন কারণ নেই। তাঁর দ্বারা জগতের অকল্যাণ হয় না। তিনি এত শুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁকে চেষ্টা করে নীতিপরায়ণ হতে হয় না, তিনি যা করবেন তা-ই নীতিমূলক। তাঁর এত শুদ্ধ সংস্কার হয়ে গিয়েছে যে, মন থেকে সমস্ত অশুভ সংস্কার দূর হয়েছে। স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি তখন সোনার তলোয়ার হয়ে গিয়েছেন। এই তলোয়ার দিয়ে আর কোন হিংসামূলক কাজ হয় না। তাঁর দ্বারা জগতের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কিছু হয় না। তিনি জগতের অকল্যাণ করব না বলে যে অকল্যাণ করেন না বা জগতের কল্যাণ করব এমন সংকল্প করে কল্যাণ করতে থাকেন—তা নয়। তাঁর স্বভাববশত তাঁর দ্বারা কোন অকল্যাণ হয় না, কেবল কল্যাণই হয়। সুতরাং এই ভয় নেই যে ব্রহ্মজ্ঞানী যথেচ্ছাচারী হবেন। সুতরাং শাস্ত্র সাহস করেই বলতে পেরেছেন—'স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন

---

১. গীতা—১৮/১৭

ঈদৃশ এব'[১]—সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আচরণ যেরকমই হোক তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে এরকম যথেচ্ছাচারিতার সমর্থনের কথা ঠাকুর একবার শুনেছিলেন। একজন বেদান্তবাদী সাধু সেই সময়ে পঞ্চবটীতে ছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি ভ্রষ্টাচারী হয়েছেন। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তুমি এমন বেদান্তবাদী, তোমার সম্বন্ধে এসব কী শোনা যাচ্ছে? তিনি বললেন, দুনিয়া তিন কাল মে ঝুঠ হ্যায়, আর তুমি যা শুনেছ সেটাই সত্য? ওটাও ঝুট। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন— চমৎকার ব্রহ্মজ্ঞান তো! তারপরে তার ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রাদ্ধ করলেন।[২] এখানে কথা হলো—ব্রহ্মজ্ঞানের ধুয়া দিয়ে মানুষ যথেচ্ছাচারী হতে পারে না। যদি হয়, বুঝতে হবে সে মানুষ খাঁটি নয়, মেকি।

এই শ্লোকে আত্মা সম্বন্ধে নতুন কোন সিদ্ধান্ত বলা হলো না। পূর্বোক্ত শ্লোকেরই বিস্তার করে দেখানো হলো যে, আত্মার বিনাশ বা বিনাশকর্তৃত্ব কল্পনা করা, দুই-ই ভ্রমাত্মক। এইকথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারিক জগতে এই সিদ্ধান্তকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাব। আত্মার অবিকারিত্ব যদি আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আমরা আর নিজেদের বিকারী মনে করব না এবং যাকে বলা হয়েছে অমরত্ব যা আমাদের স্বভাবধর্ম, যা থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হতে পারি না, যে অমরত্ব পাবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের শাশ্বত, সেই অমরত্ব লাভের জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আমরা যজ্ঞানুষ্ঠানের সোমরস পান করে অমর হইনি, আমরা স্বভাবতই অমর। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে যে অমরত্ব পাব বলে আশা করি তা বাস্তবিক অমরত্ব নয়। সে অমরত্ব যেন একটি বিশেষ গুণ যা কোন ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা আত্মাতে আসবে অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার কর্তা নয়, কর্ম হবেন আত্মা। আগেই নিষেধ করা হলো এরকম কর্মত্ব আত্মাতে হয় না এবং এইভাবে অর্জিত অমরত্ব নিত্য হয় না। বহু ঘটনাকে অনুশীলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই যে, উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে। তাই অমরত্ব যদি উৎপন্ন হয় তাহলে তার বিনাশও কল্পনা করতে হবে। অমরত্বের বিনাশ হলে তা অমরত্বই হতে পারে না। এই অর্জিত অমরত্ব ব্যাঘাত দোষে দুষ্ট।

'তদ্‌যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।
এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।।'[৩]

—এই জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগ্যবস্তু যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই যজ্ঞাদি দ্বারা অর্জিত যে স্বর্গাদি ভোগ, তাও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। পূর্বে যে বললেন

---

১. বৃহদারণ্যক—৩/৫/১
২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, উদ্বোধন, কলকাতা, সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৬৯
৩. ছান্দোগ্য—৮/১/৬

'সোঽমৃতত্বায় কল্পতে'—তার মানে অমরত্ব প্রাপ্য নয়, স্বভাবরূপ, আপাতদৃষ্টিতে এই অমরত্ব যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, মানুষ তার অমরত্বস্বরূপকে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে যাওয়ার ফলে সে যে অমরত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মরণশীল হলো তা নয়। অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় সে নিজেকে মরণশীল মনে করল। জ্ঞানের উন্মেষ হলে অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হয়ে গেলে নিজেকে অমর বলে বুঝতে পারবে। কোন বস্তুই তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয় না, বিচ্যুতি মানে সেই বস্তুর নাশ। অগ্নির স্বভাব দহন, অগ্নি তার সেই স্বরূপ দহন-ক্রিয়া থেকে বিচ্যুত হলে সে আর অগ্নি থাকবে না। অমরত্ব আত্মার স্বভাব। তা থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হতে পারেন না। আগেই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—রাজার ছেলে প্রাসাদের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্নে বাঘ ভাল্লুকের তাড়া খেয়ে সে ভীত, সন্ত্রস্ত। এই বাঘ ভাল্লুক মিথ্যা, সত্য সত্যই ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু সে ভয় পাচ্ছে কারণ স্বপ্ন তার কাছে কতকগুলি ভ্রান্ত অনুভবকে উপস্থিত করছে, যাকে সে বাস্তব বলে মনে করে ভয় পাচ্ছে। স্বপ্ন অবস্থায় যদি অনুভব হতো যে এই বাঘ ভাল্লুকগুলি স্বপ্ন মাত্র—তাহলে তার অভিনয় দেখার মতো আনন্দ হতো। তা না হয়ে ভয় হচ্ছে কারণ, সেগুলিকে সে বাস্তব বলে মনে করছে।

এই যে আমাদের ভ্রান্তি এটাই যত ভয়ের কারণ। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হলে আর ভয় থাকে না। মানুষ তখন জানে যে এসব ভ্রম মাত্র। এই ভ্রান্ত প্রতীতি তাকে আর ভীত করতে পারে না। সে হাসে আর বলে কেমন ভয় দেখাচ্ছে! কোন বহুরূপী হয়তো ভূতের পোশাক বা বাঘ ভাল্লুকের চামড়া গায়ে দিয়ে এসেছে। যে ছেলে বুঝতে পারে না সে ভয়ে জড়সড় হয়, আর যে বুঝতে পারে সে বলে, আরে এতো অমুক, আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। এই মিথ্যাত্ববোধ হলেই যথেষ্ট। আর বেশি কিছু করার দরকার নেই। জগৎকে ভেঙে গুঁড়িয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে না। জগৎ যেমন আছে তেমনই থাকবে। সে তেমনি করেই আমাদের মিথ্যা প্রতীতির বিষয় হতে থাকবে, তাতে কোন বাধা হবে না। কেবল বুঝতে হবে এগুলি ভ্রান্ত, মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। তখন আর মানুষ ভয়ে অভিভূত হবে না। বলছেন, তখন দ্বৈত-প্রতীতিকে নাটকের মতো মনে হবে—'বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ'[১]।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাটি স্মরণ করি—'নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা।'[২]—নিত্যের পর লীলার অনুভূতি এইরকম করে হবে। তখন

১. পঞ্চদশী—৭/১২২
২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২১

দেখবে, মহানটরাজ নটরূপেও নানারকম অভিনয় করছেন এবং এই অভিনয়ে তিনি কখনো রুদ্র কখনো মধুর। এই দুই রূপই মনোহর কারণ তা নাটক, অভিনয় মাত্র। আসলে তিনি মধুরও নন, রুদ্রও নন। তাঁর কোন পরিবর্তন নেই, বিক্রিয়া নেই। এই বোধ হলেই মানুষ নিশ্চিন্ত, সকল ভয় থেকে মুক্ত হয়। শাস্ত্র তাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ভয়টি অজ্ঞানপ্রসূত। অজ্ঞান দূর হলে অর্থাৎ তত্ত্বকে স্বরূপে জানলে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়, বুঝতে পারি যে এসব তাঁর লীলা। এগুলিকে যেন স্বপ্ন-বিলাস বলে মনে হবে। এখানেই জীবন্মুক্তির প্রতিষ্ঠা। জীবন্মুক্তি শব্দের অর্থ এই নয় যে, জগৎ তার কাছে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তাহলে জীবন্মুক্ত শব্দের প্রয়োগ হতো না। জগৎ রয়েছে, দ্বৈতের ভান হচ্ছে, কিন্তু অনুভব হচ্ছে এই দ্বৈত মিথ্যা। যা কিছু দেখছি সব অভিনয় এবং আমি তার দ্বারা অস্পৃষ্ট। (আত্মা, যিনি সুখদুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট) তাঁর স্বরূপ জানলে সমস্ত দ্বৈত প্রতীতি মিথ্যা বলে স্পষ্ট অনুভব হবে।

আত্মতত্ত্ব কী করে উপলব্ধ হয় এখন তাই বলছেন—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয় ঃ—অণোঃ (পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু থেকেও) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) মহতঃ (আকাশাদি বিরাট পদার্থ থেকেও) মহীয়ান্ (অতি বিরাট) আত্মা (এই আত্মা) অস্য জন্তোঃ (এই জীবের) গুহায়াম্ (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) নিহিতঃ (গূঢ়রূপে বিরাজিত)। অক্রতুঃ (কামবিবর্জিত ব্যক্তি) বীতশোকঃ ([বাসনাবিরহিত হওয়ার ফলে] বিগতদুঃখ) ধাতুপ্রসাদাৎ ([নির্বাসনার ফলস্বরূপ] ধাতু অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতালাভ ও বিশুদ্ধির ফলে) আত্মনঃ (আত্মার) তম্ (পূর্ববর্ণিত) মহিমানম্ (ধর্ম বা মহিমা) পশ্যতি (উপলব্ধি করেন)।

আত্মা 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—অণু থেকেও অণুতর, মহৎ থেকেও মহত্তর। এ কথা বলার তাৎপর্য হলো—তিনি অণুও নন মহৎ-ও নন। অণু-মহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল—এগুলি তাঁর উপাধি। এই উপাধিসকলের দ্বারা তিনি যে অস্পৃষ্ট তা বোঝাবার জন্য তাঁকে বলা হলো—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। এই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ রূপে তাঁকে অনুভব করছি, নানা বিকৃতি, পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেখছি, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানলে দেখব এই পরিবর্তনশীলের পিছনে তিনি এক অপরিবর্তনশীল সত্তারূপে রয়েছেন যাঁর উপরে পরিবর্তনগুলি আরোপ মাত্র, যাকে বলে বিবর্ত। তাঁর স্বরূপকে পরিবর্তিত না করে তাদের নিজ নিজ ধর্ম তাঁর উপরে আরোপ করছে। অনাত্মধর্মগুলি আত্মার উপরে একের

পর এক অধ্যস্ত হতে থাকলেও সেই এক অবিকারী আত্মা চিরন্তন অবিকারী রূপেই থাকেন। আরোপিত ধর্মগুলি তাঁতে কোন পরিবর্তন, বিকার আনতে পারে না। এটুকু বোঝাবার জন্যই তাঁকে এভাবে বলা হলো। নাহলে তাঁকে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, বিশাল থেকেও বিশালতর, এভাবে বলার কোন তাৎপর্য থাকে না। তিনি সূক্ষ্ম হলে বৃহৎ নন, আবার যদি বৃহৎ হতেন, সূক্ষ্ম নন। এগুলি বিপরীতধর্মী গুণ। এককালে এই বিপরীত ধর্ম আত্মাতে আরোপ করার অর্থ হলো—তিনি এগুলি থেকে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উপমা দিচ্ছেন, বহুরূপী লালও বটে, নীলও বটে, হলদেও বটে, সবুজও বটে। বহু প্রকারের রঙ বহুরূপীর উপরে যে আরোপিত হচ্ছে—তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে—বহুরূপী লাল, নীল, হলুদ, সবুজ—কোনটাই নয়, রঙগুলি তার স্বরূপই নয়। যে ঐ গাছতলায় বসে থাকে সে বলছে—আমি দেখেছি, বহুরূপী ভিন্ন ভিন্ন রঙ ধারণ করে, আবার কখনো দেখি তার কোন রঙই নেই।

কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একাধারে বিভিন্ন রঙ-বিশিষ্ট বহুরূপী অথবা বহুরূপী সময় সময় তার রঙকে বদল করে অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়—শুনে আমাদের বুদ্ধি বলে দেয়—যার এত পরিবর্তন হয় সে নিত্য নয়। যদি অনিত্য এবং প্রতীতির বিষয় হয়, পরিবর্তন যদি তার স্বরূপ হয় তাহলে তার অন্তরালে কোন অপরিবর্তনশীল সত্তাকে স্বীকার না করলে পরিবর্তনের কল্পনা করা যায় না। পরিবর্তন যেখানেই হবে—কোন একটি অপরিবর্তনশীল তত্ত্বের অপেক্ষায় এই পরিবর্তন হচ্ছে বলে ধরতে হবে। আমরা তাকেই বলব নিত্য এবং আত্মা। অণু, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল—যা কিছু দেখছি সেগুলি জড় বলে নিজেরা প্রকাশ পায় না। তাদের প্রকাশের জন্য যে তত্ত্বের অপেক্ষা থাকে সেই তত্ত্ব সমধর্মী, সর্বত্র অনুস্যূত বলে বিভিন্ন পরিবর্তমান বস্তুগুলি প্রকাশ পায়। সেই বস্তুটি, সেই এক অবিনাশী সত্তা—যাঁর জন্য অন্য সমস্ত বস্তুগুলি সত্তাবান—তাঁকেই আমরা পারমার্থিক সত্তা বলে বলব, তাঁকেই আত্মা বলে জানব। শাস্ত্র বলছেন 'আত্মৈবেদং সর্বম্'[১]—এ সমস্তই আত্মা। 'আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্'[২]—আত্মা পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে। তবে মনে রাখতে হবে যে, আত্মা এই বিভিন্ন দিকে বা বিভিন্ন বস্তুতে নন। বিভিন্ন দিক বা বস্তুগুলি আত্মার উপর কল্পিত বলে তারা আমাদের প্রতীতির বিষয় হচ্ছে। আমরা বস্তুগুলিকে যেভাবে দেখি ঠিক তার বিপরীতক্রমে বুঝতে হবে। আমরা বলি অমুক বস্তুটি আছে। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে অমুক বস্তুটি পারমার্থিক সত্তার উপর আরোপিত হয়ে আছে। 'সত্তা' আর

---

১. ছান্দোগ্য—৭/২৫/২

২. তদেব

'আছে' শব্দ দুটি সমার্থক। সত্তা মানেই আছে। সত্তা বস্তুর ধর্ম নয়, স্বরূপ, তার সঙ্গে 'অমুক বস্তু' হলো একটা আগন্তুক ধর্ম। সত্তা এক। তাতে বিভিন্ন প্রকার আগন্তুক গুণ আসছে যাচ্ছে। যেমন লাল, নীল—বিভিন্ন রঙ স্ফটিকের উপর আসছে যাচ্ছে। তেমনি আত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম—এগুলি আগন্তুক ধর্ম। এই ধর্মগুলি এক, স্থির, অপরিবর্তনশীল, আত্মস্বরূপের উপরে আরোপিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সর্ব, অর্থাৎ সর্ব তাঁর উপরে অধ্যস্ত। তিনি বহুপ্রকার হলে বহুপ্রকার বস্তুর বৈচিত্র্যই তাঁর অমরত্বের বা আত্মত্বের ব্যাঘাতের কারণ হতো। অন্তত অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে তাঁতে বৈচিত্র্য আছে একথা বলা হয় না। বৈচিত্র্য তাঁতে নয় কিন্তু বৈচিত্র্যের পিছনে তাঁর সত্তা, তাঁর স্ফুরণ কাজ করছে। সেইজন্য তাঁকে সর্ববস্তুর স্বরূপ বলছি। এ কথাটির তাৎপর্য এখানে।

'আত্মাঽস্য জন্তোঃ নিহিতো গুহায়াম্'—তিনি এই জন্তু বা জীবের আত্মা। আত্মা মানে, আগেই বলা হয়েছে, যিনি সর্ব অবস্থার ভিতরে ওতপ্রোত হয়ে সর্ব অবস্থাকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন। আমার আত্মা মানে আমার সমস্ত সত্তাকে যিনি ব্যেপে থাকেন। আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা—প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছি। এর পশ্চাতে যে সত্তা সর্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আমার সকল পরিবর্তনের ভিতরে অনুস্যূত হয়ে আছেন—তিনিই আত্মা। অনুস্যূত হয়ে আছেন মানে যিনি আছেন বলে বিভিন্ন প্রকাশগুলি আমাদের অনুভবের বিষয় হচ্ছে। যে আমি বালক-যুবক-বৃদ্ধ, সেই আমাকে কে প্রকাশ করছে? শাস্ত্র বলছেন—তিনি আত্মা। 'আত্মাঽস্য জন্তোঃ'—জন্তু বলতে আমাদের ব্যবহারিক সত্তা, ব্যক্তিসত্তা—empirical self—বোঝাচ্ছে। জন্তু অর্থাৎ প্রাণিজাতি। প্রাণবন্ত বলার তাৎপর্য—জড় ও চেতন সকলের ভিতরেই তিনি রয়েছেন, কিন্তু চিন্তা চৈতন্যধর্ম, তাই জড়ের মধ্যে থাকলেও চেতন যারা তারাই তাঁকে অনুভব করতে পারে। কি ভাবে অনুভব করে? না, 'নিহিতো গুহায়াম্'—হৃদয় গুহায় নিহিত, অবস্থিত—এইরূপে। কোথাও যাকে রাখা হয় তাকে নিহিত বলে। এখানে বস্তুকে কেউ রাখেনি—কিন্তু তিনি আছেন। কেবল যে হৃদয়গুহায় আছেন তা নয়, তার বাইরেও আছেন, ভিতরেও আছেন। অথচ তাঁকে আমরা অনুভব করতে, দেখতে পারছি না কেন? তাহলে তাঁকে মানব কী করে? তাই বলছেন—'নিহিতো গুহায়াম্'—সর্বদা স্বপ্রকাশরূপে বর্তমান হলেও তিনি গুহাতে নিহিত। গুহা দুর্গম। তার ভিতরে তিনি ঢাকা পড়ে গিয়েছেন। অথবা হৃদয়রূপ গুহাতে তিনি রয়েছেন, সেখানে খুঁজলে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। 'নিহিতো গুহায়াম্' বলার দুটি তাৎপর্য। এক, তিনি সহজলভ্য নন। অধ্যস্ত বস্তু থেকে তাঁকে পৃথক করে অনুভব করতে পারি না বলে তিনি দুর্জ্ঞেয়। দুই, হৃদয়গুহা তার উপলব্ধির স্থান। তাই বাইরে খোঁজাখুঁজি না করে তাঁকে অন্তরে খুঁজতে চেষ্টা করলে, 'আমি'কে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলে তাঁকে আবিষ্কার করতে পারা যায়।

জীব মাত্রেই চৈতন্য থাকে। সেই চৈতন্যের বা চিন্তার একটি কেন্দ্র বা আধার কল্পনা করা হয়েছে। সেই কেন্দ্রের নাম হৃদয়। এটি স্থূল বস্তু কিছু নয়। যার দ্বারা আমরা অনুভব করি তাকেই বলা হচ্ছে হৃদয়। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে আমরা মনে করি মস্তিষ্ক বুঝি আমাদের চিন্তার কেন্দ্র। এক হিসাবে তা বলা যায়। তার মানে হলো মস্তিষ্কে কতকগুলি জীবকোষ (cell) আছে। তাদের পরিণামে আমাদের একপ্রকার অনুভূতি হয়—তাকে বলি চিন্তা বা ভাব। কিন্তু একটা কথা আগে থেকেই মনে রাখতে হবে যে, জীবদেহের পরিণতি বা cerebral process আর চিন্তা—দুটি এক জিনিস নয়। যে ধারাটি হৃদয়ের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবাহিত হয় সেটাকে আমরা যাই বলি—energy বা electricity বা জীবকোষগুলির একটা বিশেষ বিক্রিয়া—তার সঙ্গে সঙ্গে সমকালে আমাদের মনের ভিতরে কতকগুলি অন্তঃকরণের বৃত্তি ওঠে। সেই বৃত্তিগুলিকে আমরা ভাব বা চিন্তা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করি। কিন্তু ঐ চিন্তা আর ঐ cerebral process, এদের কার্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করতে পারি না। কারণ একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ আমরা এখনো ঠিক বুঝতে পারি না। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ বলা কঠিন। যখন শারীরিক পরিবর্তনগুলির দিক দিয়ে বিচার করি তখন শেষকালে আমাদের পৌঁছাতে হয় মস্তিষ্কের জীবকোষগুলির বিকৃতি বা পরিণামের কাছে। আর যখন মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখি তখন চিত্তবৃত্তিতে গিয়ে শেষ হয়। কাজেই এ দুটির যে কোন সম্বন্ধ আছে তা আমরা জানি না। বর্তমানে বিজ্ঞান বলে psychology-কে তার নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মনস্তত্ত্বকে মনস্তত্ত্বের ভিতরে রেখে বিচার কর। আবার physiology-কেও তার নিজের দিক দিয়ে বিচার কর। দুটির মিশ্রণের চেষ্টা এখন করো না। কারণ, সে চেষ্টা সফল হয়নি।

হৃদয়গুহায় নিহিত বলার তাৎপর্য এই যে, আত্মবস্তু এমন কোন স্থূল বস্তু নন যে, তাঁকে বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারব। সুতরাং আমাদের অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, যার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি—সেই বৃত্তিরই অনুশীলন করব। তারই অনুশীলন করার জন্য বলা হলো তিনি হৃদয়গুহায় নিহিত অর্থাৎ যেখানে আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি উঠছে সেখানেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই হৃদয়গুহা যে একটি বিশেষ cavity in the heart বা হৃদয়-অবকাশ মাত্র নয়—একথা বোঝাবার জন্য উপনিষদই অন্যত্র বলেছেন—'যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ'[১]—আমাদের হৃদয়-আকাশ যে পরিমাণ, বাহ্য আকাশও সেই পরিমাণ। এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে হৃদয়গুহা শরীরের মধ্যে কোন সীমিত স্থান নয়। তাহলে হৃদয়াকাশ আর বহিরাকাশ

১. ছান্দোগ্য—৮/১/৩

সমপরিমাণ হতে পারত না। অর্থাৎ হৃদয়াকাশ মানে শরীরের অংশবিশেষ নয়, যেখানে আমরা আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে অনুভব করি, যাকে অন্তঃকরণ বলছি, ভিতরের ইন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় চোখ কান নাক প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের মতো বাইরের বস্তু নিয়ে ব্যবহার করে না কিন্তু ভিতরে আমাদের বৃত্তিগুলিকে অনুভব করিয়ে দেয়, যার দ্বারা আন্তর অনুভব হয়, সেই অন্তরিন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করে বলছেন—হৃদয়গুহা। আরো বলছেন—'জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্'—প্রাণীদের সেই হৃদয়াকাশে নিহিত যে আত্মা—ইনিই সেই। আত্মা শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক। যখন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে বলি ব্রহ্ম, আর যখন জীব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে বলি আত্মা। আত্মা শব্দটির ব্যাখ্যা এক জায়গায় ভারি সুন্দর করে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—'যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে'।[১] তাঁকে আত্মা বলা হয় কেন? 'যৎ চাপ্নোতি'—যেহেতু তিনি ব্যাপক, সমস্তকে ব্যেপে রয়েছেন, তাঁকে সেইজন্য আত্মা বলে—'আ সমন্তাৎ তনোতি ব্যাপ্নোতি ইতি আত্মা।' 'আ যদ্ আদত্তে'—যিনি বিষয়গুলি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভোক্তা বলে যাঁকে বলি, সমস্ত বিষয়ের ভান যাঁর হয় তিনিই আত্মা। এইজন্য বলছেন—'আদত্তে'। 'আ যদ্ অত্তি বিষয়ানিহ'—যিনি সমস্ত বিষয়সমূহ গ্রাস করেন অর্থাৎ অন্তে যাঁর মধ্যে সমস্ত বিষয়ের লয় হয়। 'যৎ চাস্য সন্ততো ভাবঃ'—তাঁর যে নিরবচ্ছিন্ন ভাব, সত্তার বিদ্যমানতা, যেখানে কোন ব্যবচ্ছেদ হয় না, সর্ব অনুভবের ভিতরে যিনি অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন তাঁকে বলা হয় আত্মা।

সেই আত্মাকে কোথায় জানতে পারি? না—'নিহিতো গুহায়াম্'—হৃদয়গুহাতে। কেন? না, সেখানে তাঁকে অর্থাৎ আমাদের সত্তাকে আমরা অনুভব করি। যেমন, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি—ছোট ছেলেরা বুকে হাত দিয়ে বলে, এই আমি। অর্থাৎ এখানেই আমিত্বের অনুভব হচ্ছে। এটি যেন সেই ছোট ছেলের মুখে দৈববাণীর মতো। হৃদয়ে তিনি প্রচ্ছন্ন রয়েছেন কিন্তু সীমিত নন। যেমন ঘটাকাশ ঘটের ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকলেও সীমিত নয়। কারণ তাকে ঘট বিভক্ত করতে পারে না। কিন্তু তা হলেও যেন আকাশের একটা কল্পিত বিশেষণ দেওয়া যায় ঘটাকাশ বলে। সত্য সত্যই ঘট আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করতে পারে না, তাই কল্পিত। তা সত্ত্বেও ঘট-কে আকাশের একটা বিশেষণ রূপে উল্লেখ করে ঘটাকাশ বলে। 'ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ'—যাকে নৈয়ায়িকের ভাষায় এইভাবে বলতে হয়। বাস্তবিক যে নিরবচ্ছিন্ন, তাকে কেউ অবচ্ছিন্ন করতে পারে না। ঠিক সেইরকম আত্মাকে হৃদয়ে অনুভব করা হয় বলার তাৎপর্য এই নয় যে, হৃদয়ের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। আগেই বলা হয়েছে—এই

১. লিঙ্গপুরাণ—১/৫০/৯৬

অন্তরের আকাশও যে পরিমাণ, বহিরাকাশও সেই পরিমাণ। অর্থাৎ দেশের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। আকাশের দৈশিক অবচ্ছেদ স্বীকার করা হয় না। সেইরকম আত্মারও কোন দৈশিক, কালিক অথবা ভূতান্তর দ্বারা অবচ্ছেদ স্বীকার করা হয় না। তিনি দেশ-কাল-বস্তু-অবচ্ছেদ শূন্য। কোন বস্তুকে যখন আমরা খণ্ডরূপে দেখি তিনরকম ভাবে তা খণ্ডিত হতে পারে—দেশ, কাল, বস্তুর দ্বারা। দেশের দ্বারা খণ্ডিত কোন বস্তু এক স্থানে থাকে অন্য স্থানে থাকে না। কোন এক বিশিষ্ট সময়ের দ্বারা খণ্ডিত হয় যে বস্তু-সত্তা—সেটি হলো কালের দ্বারা খণ্ডিত। আবার বস্তুর দ্বারাও খণ্ডিত হয়। যেমন, বই ছাড়া অন্য জিনিসগুলি বই নয়। সুতরাং পরিচ্ছেদ এখানে বস্তু-পরিচ্ছেদ। দেশ-কাল-বস্তুরূপ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ আত্মা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। উপনিষদ্ এটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—বলে। তারপরে বললেন—আমাদের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই কি? আছে। সমস্ত সম্বন্ধই তাঁকে নিয়ে। এই যে আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছি—এ কেবল একটা সৈদ্ধান্তিক আলোচনা নয়, আমাদের স্বরূপকে জানবার চেষ্টা—যা এই বাহ্য জগৎরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। এই কথা বোঝাবার জন্য বলছেন, ইনি হচ্ছেন আমাদের আত্মা।

এই আত্মাকে কী করে জানা যায়? না, মন যখন সংকল্পবিকল্পরহিত হয়। মনে যখন আর বহুমুখী বৃত্তি ওঠে না, মন নিরুদ্ধ হয়ে থাকে তখন এই আত্মবস্তুর প্রকাশ হতে পারে। তাই বলছেন—'তম্ অক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ'। 'অক্রতুঃ' অর্থাৎ ঐহিক-পারলৌকিক বিষয়সমূহে বীতস্পৃহ ব্যক্তি। 'ক্রতুঃ' মানে সংকল্প, মন। 'অক্রতুঃ'—যিনি মনোধর্মের দ্বারা আবৃত নন, সংকল্প করেন না। মনোধর্ম থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে যিনি সাক্ষীরূপে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি—'পশ্যতি'—দেখেন। কাকে দেখেন? 'তম্'—সর্ব অধ্যাসের অধিষ্ঠান যিনি—সেই আত্মাকে দেখেন। দেখার ফলে কী হয়? 'বীতশোকঃ'—সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হন। কেন? না, কোন বস্তু আমার কাছে আছে তা থেকে বঞ্চিত হওয়া, তার হানি, হলো শোকের কারণ। তিনি যখন সর্ববস্তুর স্বরূপ তখন আর আমার এটা নেই, ওটা নষ্ট হয়ে গেল—এরকম ক্ষোভ হবার কথা নয়। কাজেই তিনি তখন সর্বশোক থেকে মুক্ত হন।

—এই যে অনাত্ম-ধর্ম থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া, নিজের শুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, শোককে অতিক্রম করবার এই উপায়। অন্যত্র বলেছেন 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'[১]—আত্মজ্ঞ শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। কেন? না, তিনি আত্মার স্বরূপকে জেনে বুঝতে পারেন—অন্য ধর্মগুলি তাঁর উপর

---

১. ছান্দোগ্য—৭/১/৩

আরোপিত মাত্র, স্বরূপ নয়। তখন তিনি আর শোকের দ্বারা আক্রান্ত হন না, এইজন্য আত্মাকে না জানা পর্যন্ত শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

'ধাতুপ্রসাদাৎ আত্মনঃ মহিমানং পশ্যতি'—আত্মার মহিমা অর্থাৎ স্বরূপকে তিনি তখন উপলব্ধি করেন। কী করে?—'ধাতুপ্রসাদাৎ'। এই কথাটির দুরকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, ধাতা, বিধাতার কৃপায় অথবা দুই, অন্তঃকরণের নির্মলতার দ্বারা। আত্মার উপরে বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিক্ষেপ না করে, অধ্যস্ত না করে, যে সাধক অন্তঃকরণকে নির্মল করতে পেরেছেন, তিনি আত্মার স্বরূপকে দেখেন, তিনি 'অক্রতুঃ' হন। বিভিন্ন সংকল্পের দ্বারা তিনি চঞ্চল হন না, আত্মার মহিমাকে দেখতে পান, তাঁর স্বরূপকে জানতে পারেন। মহিমাটি কী? না, আরোপিত বৃদ্ধি এবং ক্ষয়রহিতরূপে নিজেকে জানতে পারা। এই জানাই সমস্ত শোকনিবৃত্তির কারণ।

ঈশোপনিষদে আত্মাকে—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥[১]

—এই বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি গতিশীল, তিনি গতিহীন, তিনি দূরে আবার তিনি নিকটে, তিনি সমস্ত জগতের ভিতরে আবার জগতের বাইরে। —এইরকম বিপরীত ধর্ম আরোপ করে কী বোঝাচ্ছেন? না, আত্মা এইসব ধর্মের অতীত। আরোপগুলির কোনটাই তাঁর স্বরূপ নয়। একই আধারে আরোপিত বৈচিত্র্য পরস্পরকে ব্যাহত করে দিচ্ছে। সেই বৈচিত্র্যগুলি থেকে তাঁর অবিকারী স্বরূপ উপলব্ধ হচ্ছে। তিনি যে এইসব পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল উপাধি-ধর্ম থেকে মুক্ত—এটুকু বলাই এখানে বিশেষ উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র আমাদের ভাবতে শেখাচ্ছেন কী করে পৃথককরণ বা analysis করতে হয়। বলছেন 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে'[২]—দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনো লোপ হয় না। আমি নেই—এরকম কখনো হয় না। তা যদি হতো আমি জানতাম কি করে? শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পানা সরিয়ে জল খাওয়ার দৃষ্টান্তটি ভারি চমৎকার। আগন্তুক পানাগুলি চারদিক থেকে এসে জলকে ছেয়ে ফেলেছে। ওগুলো সরালে স্বচ্ছ জল পেতে পারি। পানা সরিয়ে জল খাওয়ার মতো বিশ্লেষণের দ্বারা সমস্ত উপাধি বিযুক্ত করে আত্মস্বরূপকে জানতে হবে। একেই বলেছেন—'তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ' (কঠ ২/৩/১৭)—মুঞ্জ থেকে ঈষীকাকে যেমন পৃথক করে, তেমনি শরীর মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে

১. ঈশোপনিষদ্—৫
২. বৃহদারণ্যক—৪/৩/২৩

আত্মাকে পৃথক করে দেখতে হবে। এই পৃথককরণই হলো কৌশল—যার দ্বারা আত্মস্বরূপকে জানা যায়, পানা সরিয়ে জল খাওয়া যায়। তা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। তাঁকে জানবার অন্য কোন উপকরণ না থাকলেও তাঁর স্বরূপ অপ্রতিহত। তিনি সর্বদা প্রকাশমান, তাঁর প্রকাশকে কেউ ঢেকে দিতে পারে না, এই হলো আর একটি বৈশিষ্ট্য। যে উপাধি দিয়ে আত্মাকে ঢাকব সেই উপাধি-ধর্মেরও তিনি আত্মা। আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মবিশিষ্ট[১]—যাঁর উচ্ছেদ হয় না, যিনি সদা বিদ্যমান, যাঁর বিদ্যমানতায় কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা অনেক সময় হাতড়ে মরছি কোথায় আত্মা, হয়তো যা হাত দিয়ে খুঁজছি, তার মধ্যেও তিনি রয়েছেন। চোখ দিয়ে যা খুঁজছি তার ভিতরেও তিনি। এইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে—'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ'[২]—তিনি কর্ণেরও কর্ণ মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য। এইভাবে যিনি—'পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্'[৩]—দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সর্বদা অবিকারী রূপে রয়েছেন, যাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, যাঁর প্রকাশ কখনো স্তিমিত, বাধিত হয় না—পৃথককরণের সাহায্যে সেই আত্মাকেই আমাদের স্বরূপ বলে বুঝতে পারলে আমরা 'বীতশোকঃ' হতে পারি এবং আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারি। মহিমা কী? তাঁর স্বরূপ, ঐশ্বর্য, glory। তিনি সুখদুঃখ, কর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তাঁর এইরূপ স্বরূপ হলো তাঁর সম্পদ। তা তখন উপলব্ধি করা যায়।

উপনিষদ্—কী করে আত্মাকে জানা যায়—এই কথাই নানাভাবে আমাদের উপদেশ দেন। 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্'[৪]—একমাত্র সেই আত্মাকেই জান আর অন্য কিছু জেনে লাভ নেই। 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'[৫]—যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায় ; 'যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'[৬]—যাঁকে জানলে জ্ঞাতব্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমরা অনেক সময় মনে করি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কি এরোপ্লেন চালাতে পারেন? বিজ্ঞান কত বিদ্যা আবিষ্কার করেছে—তিনি কি তা জানেন? প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর। ব্রহ্মজ্ঞের এতে প্রয়োজন কী? তিনি সামান্যরূপে এই তত্ত্ব জেনেছেন যে, জগতে যা কিছু আছে সকলেরই সত্তা সেই আত্মসত্তা। এই সত্তাকে বাদ দিয়ে আর কী আছে যা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জানতে হবে? এইদিক দিয়ে দেখলে ব্রহ্মজ্ঞের অজ্ঞাত কিছুই রইল না, সকলের পিছনে যে তত্ত্ব তাকে তিনি জেনে ফেলেছেন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[৭]—এ হলো সামান্য জ্ঞান। আর বিভিন্ন বস্তুকে ধরে যদি

---

১. বৃহদারণ্যক—৪/৫/১৪ ; ২. কেনোপনিষদ্—১/২ ; ৩. গীতা—৫/৮ ; ৪. মুণ্ডক—২/২/৫ ; ৫. মুণ্ডক—১/১/৩ ; ৬. গীতা—৭/২ ; ৭. ছান্দোগ্য—৩/১৪/১

প্রশ্ন করি, এটি কী? এটি ব্রহ্ম। ওটি কী? ওটি ব্রহ্ম। এটি হলো বিশেষ জ্ঞান। সামান্য রূপে এবং বিশেষ রূপে যিনি আত্মাকে জেনেছেন তাঁর আর জানতে বাকি কী? আর এমন কী আছে যা তাঁকে জানতে হবে? সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞের অজ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য কিছু আর রইল না। উপাধিগুলি সব নাম মাত্র। নাম বা রূপের অনন্ত প্রকার থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রকার তাঁরই সত্তা এবং স্ফুরণের দ্বারা সত্তাবান এবং প্রকাশিত। শাস্ত্র আমাদের এই কথাই শেখাচ্ছেন এবং বলছেন—বৈচিত্র্যের দিকে নজর দিও না। বৈচিত্র্য অনন্ত রূপ ধরে আমাদের অভিভূত, মোহগ্রস্ত করছে। এসবের পশ্চাতে একমাত্র তিনিই বিরাজিত। 'একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্'[১]—এই একটিকে জানলেই সব জানা হয়ে যায়। 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'[২]—এই বিশ্বে স্থাবর, জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই যা আমি ছাড়া। আমরা বহুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। গাছ দেখতে দেখতে অরণ্যকে হারিয়ে ফেলেছি। বলছি—বন কোথায়? সবই তো গাছ। সেইরকম বলছি—সবই তো বস্তু, আত্মা কোথায়? তিনি সর্বত্র। সর্বকে বিশ্লেষণ করলে তিনি, সর্ব তাঁর উপরে অধ্যস্ত। আমরা যখন সর্বকে দেখছি, তাঁকেই সর্বরূপে দেখছি। এই কথাটি এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে।

বৈরাগ্যবিরহিত, অশুদ্ধচিত্ত, কামনাতাড়িত সাধারণ মানুষের কাছে আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। কারণ, আত্মা এইরকম—

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥২১॥

অন্বয় ঃ—[এই আত্মা] আসীনঃ (অচল হয়েও) দূরম্ (দূরে) ব্রজতি (গমন করেন) শয়ানঃ (শায়িত থেকেও অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত হয়েও) সর্বতঃ (সর্বত্র) যাতি (গমন করেন) [কূটস্থ সাক্ষী হয়েও চেতনরূপে সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বব্যাপী]। তৎ (সেই) মদ-অমদম্ (আনন্দ ও আনন্দহীন অর্থাৎ একাধারে বিপরীত উপাধি সমন্বিত অথচ নিরুপাধিক) দেবম্ (স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে) মৎ-অন্যঃ (আমার মতো বিবেকী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ (জানতে) অর্হতি (সমর্থ)?

'আসীনঃ দূরং ব্রজতি'—আত্মা উপবিষ্ট থেকেও দূরে ভ্রমণ করছেন। 'শয়ানঃ যাতি সর্বতঃ'—শায়িত থেকেও সর্বত্র বিচরণ করেন। 'মদ-অমদং'—তিনি আনন্দ ও নিরানন্দরূপ। বিষয়ের আনন্দকে মদ বলছেন, তার বিপরীত হলো অমদ। এই সুখাকার এবং দুঃখাকার বৃত্তি থেকে ভিন্ন 'দেবং'—প্রকাশমান যে আত্মা

১. মুণ্ডক—১/১/৩ এবং ছান্দোগ্য—৬/১/৬ দ্রষ্টব্য ; ২. গীতা—১০/৩৯

তাঁকে 'মদন্যঃ কঃ জ্ঞাতুমর্হতি'—আমি ছাড়া আর কে জানতে পারে? ভাব হলো—সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই এমন আপাত বিপরীতধর্মী বস্তুকে ধারণা করে। আত্মা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে এইরকম কতকগুলি riddle, হেঁয়ালির দ্বারা বলা হয়, যেমন এখানে বলা হয়েছে। এক জায়গায় অবস্থান করে কেউ দূরে ভ্রমণ করতে পারে না, যে শয়ন করে আছে সে সেখানেই শায়িত থাকে, সে সর্বত্র গমন করতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা আমাদের ধারণাগুলির বিপরীত। সাধারণত ন্যায়শাস্ত্রে বলে, বিরুদ্ধ দুটি বস্তুর দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করা যায়। আমাদের যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় এই—A and not-A—এই দুটি বিভাগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এই দুটির অতিরিক্ত জগতে আর কিছু থাকে না। এখানে সেইরকম তাঁকে সর্বধর্মবিশিষ্ট বলা হলো। তিনি মদ এবং অমদ, তিনি সুখস্বরূপ আবার অ-সুখস্বরূপ। এরকম হলে তাঁর সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণা করতে পারি না। 'আকাশকুসুম' বললে কোন ধারণা হয় না। যেখানে আকাশ সেখানে কুসুম হয় না, আর যদি কুসুম হয় সেখানে আকাশ থাকতে পারে না। আকাশ আর কুসুমের সহ-বৃত্তিত্ব থাকে না। কাজেই এখানে আত্মা এমন একটি বস্তু যা কল্পনার অবিষয়। স্থিতি, গতি, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধধর্ম উপস্থিত থাকায় আত্মা যমের মতো সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়, অন্যের পক্ষে নয়। অর্থাৎ এমন দুর্জ্ঞেয় বস্তুকে কে অনুভব করবে? যমের মতো শুভসংস্কারসম্পন্ন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যদি কেউ থাকেন তবে তিনিই বুঝবেন।

পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্ন উপাধি-ধর্ম সমকালে তাঁর উপরে আরোপিত হওয়ায় তাঁকে দুর্জ্ঞেয় করে তুলেছে। তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, সদা বিরাজিত, আমাদের সেখানে সদা প্রতিষ্ঠা। কেবল উপাধিধর্ম-রহিত রূপে আমরা তাঁকে জানি না। আমাদের ত্রুটি এইখানে—আত্মা সম্বন্ধে এই অজ্ঞতায়। নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে জানে। কিন্তু তাকে 'নিজেকে কিরকম করে জান'—জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারে না। বলে—আমি জানি না। আমি খাই-শুই, চলি-ফিরি, কান দিয়ে শুনি, চোখ দিয়ে দেখি ইত্যাদি। এই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যে আত্মার উপর উপহিত গুণ, আত্মার স্বরূপ নয় তা সে বুঝতে পারে না, বোঝাতে গেলেও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বলে—'আমরা সাধারণ মানুষ, অত বুঝতে পারব না।' তাই যম বললেন যে, আমার মতো লোক ছাড়া আত্মতত্ত্বকে কে বুঝতে পারবে?

কেউ বলবেন—বেদান্তী আত্মাকে যে এমন জলের মতো পরিষ্কার করে বোঝালেন—তাতে এই বোঝা গেল যে আত্মা একটি অলীক বস্তু, আকাশকুসুমের মতো। কেউ যদি বলে, বুদ্ধিকে আরো স্বচ্ছ করে সেই অসম্ভব বস্তুটিকে

বুঝতে চেষ্টা করো। তার উত্তরে বলব, চেষ্টা করে কী ফল হবে? আত্মাকে না জেনেও তো কোনরকম অসুবিধা বোধ করছি না। যেমন জ্ঞানীর, আমারও তেমন সুখাদি ভোগ হচ্ছে, আত্মাকে জানার এত কী দরকার? আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় এই প্রশ্ন করেন যে, ঐরকম অসম্ভব একটি বস্তুর কল্পনা কারো কাছে না হয় বাস্তব, কিন্তু আমার তাতে প্রয়োজন কী? আত্মাকে না জেনে আমার খাওয়া-পরা, জীবনযাত্রানির্বাহ কি ব্যাহত হচ্ছে? অবশ্য দার্শনিক বিচারের সময় এ প্রশ্ন ওঠে। কোন একটি বস্তুকে আগ্রহের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে যখন বিচার করতে যাই, আমাকে জানতে হয় যে, এই বিচারের দ্বারা আমার কী লাভ হবে। 'knowledge for its own sake'— জ্ঞান কেবল জ্ঞানেরই জন্য—অধিকাংশ মানুষেরই এতে প্রবৃত্তি হয় না। না হয় জ্ঞান হবে, তাতে কী হবে?—সাধারণ মনের এই প্রশ্ন। যদি জ্ঞানের দ্বারা কিছু কল্যাণ হয়, লাভবান হই, তখন জ্ঞানে আমার রুচি হয়, সে জ্ঞান বস্তুকে অন্বেষণ করবার জন্য প্ররোচিত করে। যেমন বলছেন—'সোমেন যজেত'[১]—সোমের দ্বারা যাগ করবে। 'কিং কুর্যাৎ, কথং কুর্যাৎ, কেন কুর্যাৎ'—কী করব, কিভাবে করব, কী উপকরণ দিয়ে করব—এইসব প্রশ্ন ওঠে। কেন যাগ করব? 'সুবর্গকামো যজেত'[২]—স্বর্গ কামনা করে যাগ করবে। শুধু 'যজেত' বললে মানুষকে যজ্ঞে প্রেরিত করা যায় না। বোঝাতে হবে—কেন করব? করলে স্বর্গে যাবে। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারি যে হাতে হাতে লাভ হলো।

আত্মাকে জেনে আর কোন্ স্বর্গলাভ হবে? প্রথমত, আত্মা এমন একটি বস্তু যে, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগছে। আবার সেই বস্তুটিকে এত আয়াস করে এত রকম বুদ্ধির কসরত করে জানতে হবে। সুদীর্ঘ একশ এক বৎসর ব্রহ্মচর্য করিয়ে ইন্দ্রকে সে-জ্ঞানটি দেওয়া হলো। এত দীর্ঘদিন আয়াস করে সেই বস্তুর জ্ঞান হলে কী লাভ হবে, এমন বহু প্রশ্ন মনে আসে। যদি কোন লাভই না হয় তবে তাঁকে লাভ করতে প্ররোচিত, প্রেরিত হব কী করে?

তাই আত্মজ্ঞান লাভ করলে ফল কী হবে তা এই মন্ত্রে বলছেন।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২॥

অন্বয় ঃ—অনবস্থেষু (অনিত্য, নশ্বর) শরীরেষু (বিবিধ দেহে) অবস্থিতম্ (বিদ্যমান) অশরীরম্ ([স্বয়ং] শরীরবিহীন, অরূপ) মহান্তম্ (দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অতি মহান) বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা (সাক্ষাৎ করে) ধীর (ধীমান পুরুষ) ন শোচতি (শোক করেন না)।

---

১. কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ—১/৪/১/২
২. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫

এখানেও আত্মাতে বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ। 'অশরীরং শরীরেষু'—বিভিন্ন শরীরের মধ্যে তিনি অশরীরীরূপে বর্তমান। শরীর-আধারে শরীররূপ উপাধির ভিতর দিয়ে তিনি উপলব্ধ হচ্ছেন। শরীরের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হচ্ছেন না। 'অনবস্থেষু অবস্থিতম্'—অস্থির, অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে তিনি স্থির, নিত্য। 'মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্'—সেই সুবিশাল সর্বব্যাপী আত্মাকে—'মত্বা ধীরঃ ন শোচতি'—জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না। মহান বলতে এত মহৎ পরিমাণ যে, তাঁর ভিতরে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। 'বিভু—বিবিধং ভবতি ইতি বিভু'—বহুরূপে যিনি অবস্থিত তিনি বিভু। যেখানে যেখানে কোন বস্তুর অনুভব হচ্ছে তা তাঁরই অনুভব। এইজন্য তাঁকে বিভু বলা হয়। ধীমান্ ব্যক্তি শোক করেন না, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করেন, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বোঝাচ্ছে যে, এই জ্ঞানের ভিতরে একটা প্রেরক আছে। আত্মাকে জানলে শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারব, শাস্ত্র একথা বলে দিচ্ছেন। আত্মজ্ঞানে নিযুক্ত করবার মতো এধরনের প্ররোচক বাক্য শ্রুতিতে রয়েছে। শোকদুঃখকে অতিক্রম করতে সকলেই চায়। মানুষের সব অন্বেষণ, সমস্ত motive-এর পশ্চাতে থাকে সুখের প্রাপ্তি এবং দুঃখের নিবৃত্তি। কেন সুখ চায় বা দুঃখের নিবৃত্তি চায়? 'কেন'—এ প্রশ্ন ওঠে না। শুধু মানুষ নয় মনুষ্যেতর প্রাণীরও এই স্বভাব, সে দুঃখকে পরিহার করে সুখ পেতে চায়। এখানে সুখের প্রাপ্তি না বলে বললেন আত্মাকে জানতে পারলে দুঃখের পরিহার হবে। একথার অর্থ কী? তার কি আর রোগ-শোক হবে না? উত্তর হলো, সে জানবে আত্মা অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি ধর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। যেমন, জবাফুল তার লালরঙ স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর ফেলতে পারে কিন্তু তাকে লাল করতে পারে না। সেইরকম আত্মার অন্তঃকরণাদি উপাধি, তাদের সুখদুঃখাদি ধর্ম আত্মার উপরে আরোপ করে, যে আত্মা অসঙ্গ স্বরূপ, তাকে সুখী বা দুঃখী বলে বোধ করাচ্ছে। আত্মবস্তুকে জানলে এই ভ্রান্তি দুর হবে। দড়িটাকে দড়ি বলে জানলে বুঝবে এটা সাপ নয়। সাপ হলো উপাধি, এই উপাধি-ধর্ম দড়ির উপরে আরোপিত হয়ে তা যেন ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। দড়িকে সাপ বলে ভুল করার পর আলোর সাহায্যে দড়ির জ্ঞান হলেই সাপের ভ্রম যেমন কেটে যায়, তেমনি আত্মার স্বরূপকে জানলে আত্মা সম্বন্ধে যত কিছু মিথ্যা জ্ঞান ছিল, যেমন—আত্মা সুখী, দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি—সব দূর হয়ে যায়। অতএব আত্মজ্ঞানই মানুষের সুখ-দুঃখের তথা বিভিন্ন বিপর্যয়ের প্রকৃত প্রতিষেধক। অতএব আত্মবিৎ প্রিয় বস্তু পেয়ে আনন্দিত হন না, অপ্রিয় বস্তু পেয়ে দুঃখিতও হন না। দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক, যা জন্ম থেকে চিরকাল পোষণ করছি। কোন কারণে যে এই আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়েছে তা নয়। সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই আত্মান্বেষণে মানুষকে প্ররোচিত করে।

মানুষের আর একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে—সে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়, তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক, তা কখনো চায় না। তাঁকে জানলে মানুষ এমন একটি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, এমন একটি তত্ত্বের সঙ্গে সে নিজের তাদাত্ম্য অনুভব করতে পারে, যে তত্ত্বটি অবিনাশী। এই আর একটি প্ররোচনা যার জন্য মানুষ আত্মাকে জানতে চাইবে। অমরত্ব লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যখন শাস্ত্র অন্বেষণ করে, শাস্ত্র তাকে বলে দেন, 'অমৃতস্য এষ সেতুঃ'[১]—অমরত্বলাভের এই উপায়। শাস্ত্র বলেছিলেন যজ্ঞাদি করে অমর হতে, শাস্ত্রই আবার পরে শেখাচ্ছেন এরকম করে অমর হওয়া যায় না। অমরত্ব আত্মার স্বরূপ। আমাদের কাছে তা আচ্ছন্ন, অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। সেই অজ্ঞাত অমরত্ব আমাদের কাছে কী করে প্রকট হবে? উপাধিধর্মবর্জিত রূপে আত্মাকে জানলে। আত্মাকে জানা ছাড়া অমর হবার অন্য কোন পন্থা যে নেই—একথা উপনিষদ্ দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট করে বলছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥২৩॥

অন্বয় ঃ—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বেদাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা) লভ্যঃ (উপলব্ধব্য) ন (হন না) মেধয়া ন (তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা নয়) ন বহুনা শ্রুতেন (অনেক শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা [জ্ঞাত হন] না) এষঃ [আত্মা] (এই [আত্মা]) যম্ এব (কেবল মাত্র যাকে) বৃণুতে (বরণ করেন, অনুগ্রহ করেন) তেন (সেই সাধকের দ্বারা, সেই বরণের দ্বারা) [তিনি] লভ্যঃ (জ্ঞাত হন) ; তস্য (সেই সাধকের কাছে) এষঃ আত্মা (এই পরমাত্মা) স্বাম্ (নিজের) তনূম্ (স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশিত করেন)।

আত্মানুসন্ধান বিনা বেদাধ্যয়নাদি সাধনসমূহ ফলপ্রসূ হয় না। তাই আত্মজ্ঞ আচার্যের কাছে আত্মোপলব্ধির উপায়সমূহ অবগত হবার জন্য মুমুক্ষুর প্রযত্ন করা একান্ত কর্তব্য। এজন্য যম বলছেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—আত্মাকে প্রবচনের দ্বারা লাভ করা যায় না। প্রবচন মানে শাস্ত্রপাঠ, বিশেষ করে বেদপাঠ। বেদই বলে দিচ্ছেন যে, বেদপাঠের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। যদি কেউ মনে করেন, শাস্ত্রার্থ ধারণা করার মতো উপযুক্ত মেধা নেই বলেই বলা হলো—শাস্ত্র পাঠের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। শ্রুতি সে ভ্রমও দূর করে দিচ্ছেন পরবর্তী কথায়—'ন মেধয়া'—মেধার দ্বারাও তাঁকে লাভ করা

১. মুণ্ডক—২/২/৫

যায় না। মেধা মানেই শাস্ত্রার্থ ধারণা করবার শক্তি। তাহলে কি অল্পসল্প পড়লে হয়, না অনেক পড়তে হয়? তার উত্তরও পরে বলছেন 'ন বহুনা শ্রুতেন'—বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও তাঁকে লাভ করা যায় না। কোন বস্তুকে জানবার যেগুলি উপায় বলে আমরা সাধারণভাবে মনে করি, সেই উপায়গুলির এখানে নিষেধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের বিষয় যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট সেই বেদ অধ্যয়ন করে, মেধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থধারণশক্তি কিংবা বুদ্ধিবলে অথবা বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করেও আত্মাকে জানা যায় না।

তাহলে আত্মজ্ঞানের উপায় কি? উপায় খুব সহজ। 'যমেব এষ বৃণুতে'—যে সাধক কেবল আত্মাকেই বরণ অর্থাৎ প্রার্থনা করেন—'তেন এব আত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যঃ'[১] সেই অনন্য আত্মান্বেষী ব্যক্তিই স্বয়ংলভ্য আত্মাকে লাভ করেন। কেন না—'তস্য আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'—এই আত্মা তাঁর কাছে নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। তাহলে এখানে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলা হলো অনন্যচিত্ততা। অনন্যমনা হয়ে যদি কেউ আত্মাকে চায় তাহলেই সে আত্মাকে পেতে পারে।

ভাব হচ্ছে এই—আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত। যে আত্মার প্রকাশে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত, যে আত্মা ছাড়া আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই—সেই আত্মাকে জানতে বা পেতে হলে অন্যান্য বস্তু জানতে বা পেতে যেরকম আয়াস করতে হয় এখানে তার প্রয়োজন নেই। আত্মোপলব্ধির এই হলো বৈশিষ্ট্য যে, তাঁকে কোথাও গিয়ে পেতে হয় না, কোন কর্মের দ্বারা লাভ করতে হয় না, কোন বস্তুর সাহায্যে অর্জন করতে হয় না। এ জ্ঞানে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই, মন বুদ্ধি পর্যন্ত এখানে অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত। আমরা নানা ভোগবাসনার দ্বারা আত্মাকে ঢেকে রাখি। আমরা নানা বস্তু চাই এবং পেয়েও থাকি। কিন্তু ভুলে যাই যে, ঈপ্সিত ও প্রাপ্ত সকল বস্তুর স্বরূপ সেই একই আত্মা। আত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে কোন ভোগ্যবস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব আত্মাকে বাদ দিয়ে কিছু চাওয়া এবং পাওয়াও সম্ভব নয়। যে আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত এবং নিত্যজ্ঞাত, যাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব কখনো হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়—অথচ কি অদ্ভুত মায়ার প্রভাব যে সেই আত্মা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, অলব্ধ হয়ে আছেন। শাস্ত্র এই কথাটি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—আত্মাকে কোথায় খুঁজছ? আত্মাকে খুঁজছ শাস্ত্রে, শুভ কর্মে, নানা আয়াসের দ্বারা। তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা করছ বুদ্ধির প্রখরতা ও তর্কবিচারের দ্বারা। এই চেষ্টা হচ্ছে একেবারে ভিন্ন পথে। যিনি অন্তরের বস্তু তাঁকে বাইরে খুঁজছি। যে বস্তু ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলির কোন কার্যক্ষমতা, কোন ব্যবহার নেই—সেই

---

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—১/২/২৩

বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, মনবুদ্ধির সাহায্যে অন্বেষণ করছি। এই অন্বেষণের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যে কর্তা সে কখনো কর্ম হয় না। যে আমি অন্বেষণ করছি সেই আমার মধ্যে তিনি। 'অন্বেষ্টব্য' আত্মা কখনো অন্বেষণক্রিয়ার ফলরূপে অর্থাৎ কর্মরূপে প্রাপ্ত হবেন না। শাস্ত্রোক্ত কর্তৃ-কর্ম বিরোধ এই। যেহেতু আমাদের চেষ্টা চলছে বিপথে অতএব তার পর্যবসান হচ্ছে নিষ্ফলতায়। তাই শাস্ত্র আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন এই বলে—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

উপায় রূপে যা বলা হলো—'যম্ এব আত্মানং বৃণুতে'—ইত্যাদি, সেখানে 'এব' শব্দটির বিশেষ সার্থকতা আছে। অর্থাৎ নানা বস্তু চাইলে হবে না। কেবল আত্মাকেই চাইতে হবে। 'আত্মানমেব'। এরূপ অধিকারীর কাছে তিনি নিজের তনু বা শরীর অর্থাৎ স্বরূপকে অনাবৃত করেন, প্রকাশ করেন। আত্মা সর্বদা উপাধিধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন বলেই তাঁর নিজ স্বরূপ আবৃত, অপ্রকাশিত রয়েছে।

উপনিষদের এই তত্ত্বটি আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, আত্মা কখনো অপ্রকাশ হন না। আগে বলা হয়েছে সূর্য কখনো অপ্রকাশিত হন না, তিনি সদা প্রকাশিত। সূর্যকে একখণ্ড মেঘ ঢেকে দিলে মনে হলো যে, সূর্য অপ্রকাশ হয়ে গেলেন। বস্তুত মেঘের দ্বারা সূর্য ঢাকা পড়েননি, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে। সেইরকম, ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যখন আত্মাকে জানতে চেষ্টা করি তখন দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আত্মার উপর আরোপিত হওয়ায় আত্মা আবৃত বা আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেন। তাই তাঁকে কর্তারূপে, ভোক্তারূপে, সুখীদুঃখীরূপে, দেহের সঙ্গে অভিন্নরূপে, জন্মান্তরগামী সংসারীরূপে—মনে করি। অর্থাৎ অনাত্মধর্মকে আত্মার ধর্ম বলে মনে করি। সদা প্রকাশমান হয়েও আত্মা আমাদের কাছে অপ্রকাশ। কারণ, আমরা তাঁর উপর অনাত্মধর্ম আরোপ করছি। এখন প্রশ্ন হবে—যদি এক আত্মাই থাকেন তাহলে কে তাঁর উপর অনাত্মধর্ম আরোপ করছে? তিনি বরণীয় হলে বরয়িতা কে? কে তাঁকে অন্বেষণ করছে? ব্যবহারিক জীবনে আমরা কখনো নিজেদের আত্মা বলে বুঝতে পারছি না। আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন আর তিনি সর্বমোহনির্মুক্ত। সুতরাং তিনি আর আমি যে ভিন্ন এ কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না, এটা সর্বদা অনুভূত। শাস্ত্র যদি বলেন যে, তিনি আর আমি এক—সেটা প্রত্যক্ষবিরোধী কথা হবে। তাহলে শাস্ত্রের তাৎপর্য গৃহীত হবে না। অনেকবার এই প্রশ্ন উঠেছে—শাস্ত্র যদি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা বলেন তাহলে সে শাস্ত্র যতই প্রামাণ্য হোক—তার অর্থবোধ হবে না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছি যে, আমি ক্ষুদ্র, অল্পজ্ঞান, অল্পশক্তি, আমি জন্মমৃত্যুর দ্বারা সীমিত, অথচ শাস্ত্র বলছে আমি ব্রহ্ম। কি করে আমি সেই ব্রহ্ম হব, যে ব্রহ্ম এ সমস্তের অতীত?

সুতরাং শাস্ত্রের উক্তির তাৎপর্য গ্রহণে আমরা অক্ষম বলে ব্যাখ্যাতারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[১]—এই বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেছেন—এটা একটা কাজের কথা নয়। আমি ব্রহ্ম কেমন করে হব? তবে যজ্ঞ করবার জন্য নিজের শুদ্ধি দরকার। সেই শুদ্ধির জন্য নিজেকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করতে হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের এই তাৎপর্য। যেমন বলা হয়েছে 'আদিত্যো যূপঃ[২]—এই যূপকাষ্ঠটিকে আদিত্য বলে চিন্তা কর। আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানি যূপকাঠ এবং আদিত্য অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। তবু এই যূপকাষ্ঠটিকেই আদিত্য বলে ভাবতে আদিষ্ট হচ্ছি। যূপকাষ্ঠটিকে আদিত্য রূপে ভাবনা করলে তা সংস্কৃত হয়ে যজ্ঞকার্যের উপযোগী হবে। অনুরূপভাবেই আমরা পূজা করার সময় জলশুদ্ধি করি, জলে সকল তীর্থকে আহ্বান করি—

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।'

—এর ফলে জলের সংস্কারসাধন হয় এবং তা পূজার কাজে ব্যবহার করার যোগ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে যজ্ঞাদিতে সমস্ত বস্তুর শুদ্ধি করে ব্যবহার করার নিয়ম আছে। যজমানও যজ্ঞে ব্যবহৃত উপকরণগুলির অন্যতম। সুতরাং যজমানেরও 'আমি ব্রহ্ম' এরকম চিন্তা করে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের তাৎপর্য এইভাবে গ্রহণ করলে তা প্রত্যক্ষবিরোধী হবে না।

বেদপাঠের দ্বারা যে আমাদের সংশয় যায় না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় একই বেদবাক্যের বিভিন্ন রকম অর্থ ব্যাখ্যায়। এক এক বেদাধ্যায়ী নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বেদের অর্থ করছেন এবং একজনের সঙ্গে আর একজনের অর্থের কোন মিল হচ্ছে না। তাই বেদ পাঠ করলেই যে ব্রহ্মকে জানা যাবে এমন কোন কথা নেই। আর জানা যখন যাচ্ছে না তখন মেধা কী কাজে লাগবে? মেধা মানে যা পড়লাম তা ধারণা করে রাখার শক্তি। যা পড়লাম তা ধারণা করে রাখলেও সন্দেহ থেকেই গেল। সুতরাং মেধার দ্বারাও হবে না। আর 'ন বহুনা শ্রুতেন'—অর্থাৎ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও বুদ্ধি বেশি মার্জিত হবে না। বরং তদ্বিপরীতক্রমে সংশয় আরো বেড়ে যাবে। শাস্ত্রই সে কথা আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন—'নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ?'[৩]—বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে না, তা বুদ্ধিকে মলিন করে দেয়। কেন? না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের কথা আছে। নানা কথা শুনে মনটা সর্বদা সন্দেহাকুল হয়ে থাকে, পণ্ডিত-মূর্খ সৃষ্টি হয়। সাধারণ মূর্খের মূর্খতা দূর হওয়া বরং সহজ,

---

১. বৃহদারণ্যক—১/৪/১০
২. কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২/১/৫/২
৩. বৃহদারণ্যক—৪/৪/২১

পণ্ডিতমূর্খের মূর্খতা দূর হওয়া কঠিন। অনধিকারী শাস্ত্র পড়তে গেলে পরিণামে কতকগুলি কুসংস্কারই অর্জিত হয়ে যাবে। যার দৃষ্টান্ত রয়েছে ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে।[১] অসুররাজ বিরোচন অনধিকারী বলে দেহকেই ব্রহ্ম বুঝে চলে গেল ও তদনুযায়ী দেহের সুখবিধান করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মেনে নিল। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে যদি তত্ত্বকে জানতে চাই তাহলে বিরোচনের মতো দেহকেই আত্মা বলে বোধ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। শাস্ত্র যত পড়ব মন তত সংশয়াকুল হবে।

আত্মজ্ঞানের যে উপায় আছে তা পরের পঙ্‌ক্তিতে বলছেন। আত্মাকে জানবার জন্য যদি আগ্রহী হও তাহলে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অনন্যচিত্ত হও। 'যমেব এষ বৃণুতে'—আত্মাকেই যে সাধক বরণ করেন, গন্তব্য, লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন তিনিই আত্মাকে জানতে পারেন। অর্থাৎ অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করে এক আত্মচিন্তাতে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাহলে তার কাছে আত্মা নিজের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেন। নানা জিনিস চাইলে তিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশিত হবেন না। একনিষ্ঠ ভক্তির পরিণামে তিনি নিজেকে আর প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—মায়াবীর মায়া থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে যাঁর মায়া তাঁকেই ধর। গীতায় ভগবান বলছেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'।[২] যে কেবল আমারই শরণ নেয় সে মায়াকে অতিক্রম করে। সেখানেও—'মাম্ এব,' অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণ যদি নেয়। এখানেও তাই। একমাত্র আত্মাকেই যিনি বরণ করেন আত্মা তাঁর কাছে নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। এই অনন্যতা, নানা দিকে ব্যাপৃত না হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে যাওয়া, তাঁকে চাওয়া এইটি এখানে বিশেষ করে উপায় বলা হলো। যদি এখানে কৃপার অবকাশ থাকে তাহলে বলা যায় যখন কেবল তাঁকেই চাওয়া যায় তখনই তাঁর কৃপা হয়। নানাজনের কাছে ভিক্ষার ঝুলি পাতলে সেই রত্ন পাওয়া যাবে না।

আরো কথা। তাঁকে বরণ করার একটা প্রণালী আছে। সাধারণত যাঁরা অদ্বৈতজ্ঞানবিচারের পথ অবলম্বন করেন তাঁদের আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা প্রভৃতির দিকে একটু উপেক্ষার দৃষ্টি থাকে। আচারনিষ্ঠদের প্রতি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৃপার ভাব দেখা যায়। নিজেদের তাঁরা অন্য সাধকদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। মাণ্ডূক্যকারিকাতে আছে 'স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্। পরস্পরং বিরুদ্ধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুদ্ধ্যতে।।'[৩]—দ্বৈতবাদীরা তাদের নিজ নিজ

---

১. ছান্দোগ্য—৮/৭/১

২. গীতা—৭/১৪

৩. মাণ্ডূক্যকারিকা—৩/১৭

সিদ্ধান্ত এবং দর্শন-প্রণালীতে দৃঢ় বিশ্বাসপরায়ণ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে। একজনের সঙ্গে আর একজনের মেলে না। তাই বিবাদের শেষ নেই। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাদের কারো বিরোধ নেই। কেন নেই? না, ওরা সবাই ভ্রান্ত। সবাইকে ভ্রান্ত বলার মধ্যে সকলের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব নেই একথা বলা যায় না। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহংকার আছে যে, আমরা অসাধারণ, আর বাকি যারা তারা সাধারণ। যেমন ছোট ছেলেরা খেলনা নিয়ে ঝগড়া করে, যে বড় সে দেখে হাসে। এখানে অনেকটা যেন সেই ভাব, আমরা বুঝেছি ওরা ভ্রান্ত। সকল মতবাদগুলিকে সমভাবে মিথ্যা দৃষ্টি করা—অদ্বৈতবাদীদের এই প্রচ্ছন্ন অহংকারকে শাস্ত্র প্রকাশ করে দিচ্ছেন। বলছেন—তোমরা যে অদ্বৈতবাদের অভিমান করছ এর গোড়ার কথা জান? এর গোড়ার কথাই হলো আচার-শুদ্ধি। অতএব পরের মন্ত্রে আচার-শুদ্ধির কথা বিশেষ করে বলা হলো।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

অন্বয় ঃ—দুশ্চরিতাৎ (অশাস্ত্রীয় আচরণ বা কর্ম থেকে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত) অশান্তঃ (অসংযতেন্দ্রিয়) অসমাহিতঃ (ধ্যেয় বস্তুতে যার মন কেন্দ্রিত নয়) বা (অথবা) অশান্ত মানসঃ অপি (বিষয়াসক্তিবশত অস্থিরমতি) [ব্যক্তিও] এনম্ (এই ব্রহ্মকে) প্রজ্ঞানেন (প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা) ন আপ্নুয়াৎ ([এই ব্রহ্মকে] উপলব্ধি করতে পারেন না)।

'দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ'—যারা দুশ্চরিত থেকে বিরত হয়নি ; 'অশান্ত'—যাদের ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য দূর হয়নি ; 'অসমাহিতঃ'—মন যাদের আত্মতত্ত্বে সমাহিত হয়নি ; 'অশান্তমানসঃ বা অপি'—কিংবা সমাধির ফলাকাঙ্ক্ষা যাদের মনকে চাঞ্চল্যরহিত করেনি, তারাও—'প্রজ্ঞানেন এনম্ ন আপ্নুয়াৎ'—বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

আত্মবিচারের পূর্বের প্রস্তুতি ব্যতিরেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি',[১] 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'[২] ইত্যাদি বলে অপরের যুক্তিকে শতখণ্ডিত করে তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করে দিলাম তাতে ফল কিছুই হলো না। তাই প্রথমে দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া অর্থাৎ আচার-শুদ্ধি করার কথা বলছেন। কোন্‌টি শুদ্ধ আচার কোন্‌টি অশুদ্ধ আচার, শাস্ত্র তা নির্দেশ করেছেন। এটি কেবল নিম্ন অধিকারীর জন্য নয়, সকলের জন্য। অধ্যাত্ম পথে যিনি চলবেন, নিজেকে তিনি যেমনই মনে করুন

১. বৃহদারণ্যক—১/৪/১০
২. ঐতরেয়োপনিষদ—৩/১/৩

না কেন তাঁর পদক্ষেপ হবে আচারের শুদ্ধি। নাহলে সমস্ত সাধনাই ভস্মে ঘি ঢালার মতো হবে।

এটি ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় মনে কেমন গর্ব আসে—একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাধুরা ছত্রে ভিক্ষা করতে যান। পরের দিন সূর্যগ্রহণ। ছত্রের কর্মচারীরা বললেন—মহারাজ, কাল গ্রহণ আছে, ভিক্ষা দেরিতে হবে। তখন একজন বেদান্তী সাধু বললেন, 'কেয়া, মহাত্মাকে লিয়ে গ্রহণ কেয়া, আউর ত্যাগ কেয়া?' সত্যই তো! যদি কর্তৃত্ববুদ্ধি না থাকে—তাহলে তার গ্রহণই বা কী আর ত্যাগই বা কী? সেই কর্মচারীটি শাস্ত্রবিশারদ নন। তিনি করজোড়ে বললেন—'মহারাজ, ইয়ে তো ব্যবহার কী বাত হ্যায়।' এটা ব্যবহারের কথা, শাস্ত্রজ্ঞানের কথা নয়। তখন সাধুটি বললেন, 'আরে, ব্যবহার মে রহ্না হ্যায় কি পরমাত্মামে রহ্না হ্যায়?' আমাদের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, আমরা পরমার্থে আছি। ভালমানুষ কর্মচারীটি নিরুত্তর। সে উত্তর দিতে পারত—'পরমার্থে আছেন থাকুন, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আসবার কী দরকার ছিল?' ঝুলিও বাড়াব আবার বলব পরমার্থে আছি! পঞ্চবটীর সেই বেদান্তীর কথা আগেই বলেছি। এ বেদান্ত সাংঘাতিক!

প্রথম কথা হলো, শরীর বা মন দিয়ে কোন প্রকার অশুভ কর্ম করব না। প্রশ্ন ওঠে—কোন্‌টিকে শুভ কোন্‌টিকে অশুভ বলব? এ সম্বন্ধে গীতায় আছে—'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।'[১]—কার্য এবং অকার্যের যে ব্যবস্থিতি, নিশ্চয়তা—সে সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। আধুনিক-কালে আমরা একটা কথা খুব শুনতে পাই যে, conscience, বিবেক যা বলবে তাই করব। যিনি এরকম বলেন তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—তোমার conscience মানে কী? তিনি হয়তো উত্তর দেবেন—আমার ভাল মন্দ বোঝার বুদ্ধি। বুদ্ধি যাকে ভাল বা মন্দ বলে দেয় তাকে তা-ই বলে গ্রহণ করব। প্রশ্ন হচ্ছে—তোমার বুদ্ধি কি নির্মল? তা যে অভ্রান্তরূপে নির্দেশ দেবে এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি? এর উত্তর কেউ দিতে পারে না। যখন বলি, বিবেককে অনুসরণ করব তখন তলিয়ে দেখি না বিবেক কত দুর্বল। বিবেক, মন, সবল ও শুদ্ধ হলে, তা অবশ্যই কোন্‌টি হিতকর কোন্‌টি অহিতকর কাজ সেটি বলে দিতে পারে কিন্তু তা যদি ততটা শুদ্ধ না হয় তাহলে তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? তাই গীতার কথা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান শাস্ত্র থেকে হবে, বুদ্ধি থেকে নয়। কিন্তু শাস্ত্রবচন সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ মনে ওঠে, সংশয় হয়, তখন কী করব? তাঁর উত্তরে শাস্ত্র বলেছেন—যাঁরা অকামহত, লোক-কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন কামনা পোষণ করেন না, যাদের জীবন শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১. গীতা—১৬/২৪

শাস্ত্রের লক্ষণগুলি যাঁদের জীবনে পরিস্ফুট, এমন ব্যক্তিরা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে পারেন—একথা শাস্ত্রই বলে দিয়েছেন। কোন দুই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিয়ে একমত হয় না। যে মনকে বিবেক বলছি সেই মনের উপর নির্ভর করা উচিত নয়—একথা সাধারণ যুক্তি দিয়েই বুঝতে পারি। যাঁরা বলেন বিবেককে অনুসরণ করব, তাঁদের স্বৈরাচারী ছাড়া আর কিছু বলা চলবে না, যদি মাত্র নিজের বিবেকের উপরেই তাঁরা নির্ভর করতে চান। কাজেই এ বিষয়ে শাস্ত্রের দ্বারা যা বিহিত এবং অবিহিত, তাকেই আমরা সুচরিত এবং দুশ্চরিত বলে বুঝতে পারব, অন্যথায় নয়। প্রশ্ন হবে—শাস্ত্র বললেই আমরা মেনে নেব কি না? শাস্ত্রই বলেছেন—শাস্ত্রবাক্য লোককল্যাণকর হলে তবেই আমরা অনুসরণ করব নচেৎ নয়। 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[১]—ধর্ম কী? না, যার পিছনে শাস্ত্রবিধির প্রেরণা থাকে আর যা লোককল্যাণকর।

অনেক সময় কোন একটা কালে কোন একটা লৌকিক আচার খুব প্রচলিত থাকে কিন্তু সেটা শাস্ত্রবিহিত নয়। আবার বিপরীত ক্রমে আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত লোককল্যাণকর কোন কাজের নির্দেশ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তার অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য—যদিও তা সমাজে খুব প্রচলিত নাও হতে পারে। অবশ্য শাস্ত্র বলতে কোন্ শাস্ত্র—এ প্রশ্ন আসে। শাস্ত্র বিভিন্ন এবং তার সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন আছে। তার উত্তরে বলেছেন—ধর্মপ্রমাণ ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রমাণ বেদ, তারপর স্মৃতি, তারপর সদাচার। সবশেষে ব্যক্তির জাগ্রত বিবেক। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি—সবই স্মৃতির মধ্যে পড়ে। আবার শাস্ত্রের বিধান, সকলের জন্য বা সর্ব অবস্থায় নয়। কাজেই কোন্ অবস্থায়, কোন্ অধিকারীর জন্য বিহিত হয়েছে—তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করে তবে শাস্ত্রের বিধান গ্রহণ করতে হয়। context বা প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে, কী পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি বলা হয়েছে তাকে বাদ দিয়ে, শুধু কথাটি যদি উদ্ধার করে দেওয়া হয় তাহলে অনেক অসম্ভব জিনিসকেই শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত করা যায়। সুতরাং কোন সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করবার সময় বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। যজ্ঞে পশুবধের উল্লেখ আছে। অথচ শ্রুতিতে আছে—'অহিংসন্ সর্বভূতানি'[২]—কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। আততায়ীর সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য হলে সমাজ চলে না। সাধারণ মানুষের জন্য বিধান দিতে হলো আততায়ীকে নির্বিচারে বিনাশ করতে পার। আইনেও তার সমর্থন রয়েছে। আইন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রচিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনকে অনুসরণীয় বলে গ্রহণ করেছে সে বলবে, জীবন গেলেও নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য

১. জৈমিনী সূত্র—১/১/২
২. ছান্দোগ্য—৮/১৫/১

আর একজনের প্রাণের হানি করব না। এটি হচ্ছে অধ্যাত্মনীতির কথা। এ নীতি ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির ঊর্ধ্বে। জোর করে এই অধ্যাত্মনীতি সকলের উপর চালিয়ে দিলে কিন্তু সমাজ বিপর্যস্ত হবে। কাজেই সাধারণ অধিকারীর জন্য একরকম এবং তার অপেক্ষা একটু উচ্চ অধিকারীর জন্য আর একরকম ব্যবস্থা করতেই হয়। এই কথাগুলি মনে রেখে অধ্যাত্মবাদী বেদান্তের চর্চা করবেন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত হবেন, ইন্দ্রিয়সংযম করবেন। ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধে সমাজনীতি যথেষ্ট উদার, permissive, ছোট ছোট ত্রুটিগুলিকে সমাজ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। যেমন, যদি কারো মনে অনিষ্ট চিন্তা আসে আইন অনুসারে তা দণ্ডনীয় হয় না। হয়তো কাকেও হত্যার কল্পনা করছি কিন্তু যতক্ষণ না সেই কল্পনা কাজে পরিণত করছি ততক্ষণ আইন তা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে হলে কার্য সম্বন্ধে যেমন, চিন্তা সম্বন্ধেও তেমনি বা ততোধিক সাবধান হওয়া দরকার। অনেক সময় আমরা সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে দুষ্কার্য থেকে বিরত হই কিন্তু মনে মনে দুষ্কার্য করি। অধ্যাত্মপথের পথিকের পক্ষে তা মারাত্মক। এ ধরনের মিথ্যাচার সম্পর্কে শাস্ত্র সাবধান করছেন। ইন্দ্রিয়সংযম না করলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়সংযম মানে কেবল ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়, তার প্রবৃত্তিকেও সংযত করতে হবে, না হলে মন স্থির হবে না।

আবার মনকে ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে বিরত করাই যথেষ্ট নয়, শুদ্ধ মনকে লক্ষ্যে কেন্দ্রিত করতে হবে—যাকে বলছেন সমাহিত করা। না হলে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাকে লাভ করতে পারব না। এই তিনটি কথা পরপর বলা হলো। চতুর্থ কথা হচ্ছে, সমাধি অর্থাৎ লক্ষ্যে মনের একাগ্রতা। এরও পরে হলো, মন যেন কোন ফলাভিলাষী না হয়। প্রতিটি পদক্ষেপ কঠিন থেকে কঠিনতর! পদক্ষেপগুলি সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে তবে বেদান্তচর্চা ফলদায়ী হবে। শাস্ত্র পাঠ করলাম, বুদ্ধির দ্বারা তার মর্মগ্রহণ করলাম কিন্তু জীবন যদি তদনুসারে পরিচালিত না হয় তাহলে সেই শাস্ত্রজ্ঞান লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে সহায়তা করবে না। এই কথাটি যেন সব সময় মনে থাকে। শাস্ত্রচর্চা কেবল পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য নয়।

এখানে ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার কাশীতে গিয়ে বেদান্তচর্চার ইচ্ছা হয়েছিল, উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য অর্জন। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তখন অধ্যক্ষ, তিনি মঠে ছিলেন না। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে গিয়ে আমার অভিপ্রায় জানালাম। তিনি নিজে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে বললেন, 'মহাপুরুষ মহারাজের কাছে লেখ, তিনি যা বলেন তাই করবে।' তাঁকে লিখলে তিনি উত্তর দিলেন—'দেখ, ব্যাকরণ-চচ্চড়ি হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। যদি

বেদান্তচর্চা করতে হয় মঠে তার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু মনে রেখো পাণ্ডিত্য অর্জন আমাদের উদ্দেশ্য নয়।' খুব বড় কথা এবং সময়োপযোগী। যদি তখন ঐ শিক্ষা না পেতাম হয়তো জীবনটা লক্ষ্য থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেত। ঠিক সময়ে খুব সাবধান করে দিলেন। একথা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে, বেদান্ত পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য নয়। বেদান্ত কার জন্য, কার কাছে ফলদায়ী হবে তা পরিষ্কার করে এখানে বলে দিচ্ছেন। বেদান্ত পড়ে পণ্ডিত হলাম, নাম-যশ হলো কিন্তু জীবনে তার দ্বারা কী লাভ হলো? বরং ক্ষতি হলো, অভিমান, অহংকার বাড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[১]—কথাটি বলতে বারণ করতেন। বলতেন—'নাহং, নাহং ; তুঁহু, তুঁহু'[২]। সাধারণ মানুষ—'আমি ব্রহ্ম'—এই বলে যথেচ্ছাচার করলে অনধিকারীর হাতে পড়ে বেদান্তের দুর্দশা হবে। পঞ্চবটীর সেই সাধুর মতো হবে যিনি বলেছিলেন—দুনিয়া তিনকালমে ঝুঠ হ্যায়—তিন কালেই দুনিয়াটা মিথ্যা আর অপবাদটা সত্য হবে? আপাতদৃষ্টিতে কথাটির ভিতরে যুক্তি আছে। এইজন্য যে, সত্যই তো, জগৎ যদি মিথ্যা হয় তাহলে ব্যবহারের দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নির্ণীত হবে কী করে? শাস্ত্রে এর সমর্থনও তো পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ'[৩]—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিরকম আচরণ করবেন? উত্তরে বলছেন—'যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব'[৪]—তিনি যেমন আচরণই করুন না কেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যথা ইচ্ছা আচরণ করলেও তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের কোন হানি হচ্ছে না? সমস্ত ব্যবহার যদি মিথ্যা হয় তো মিথ্যার ভিতর আবার উচ্চাবচ কী থাকবে? কোন্‌টি ভাল মিথ্যা কোন্‌টি মন্দ মিথ্যা—এরকম প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার তাঁর ব্যবহারের দ্বারা করা চলবে না—শাস্ত্র এই কথা বললেন। আর যদি আমাদের মধ্যে কেউ বলেন—আমি ব্রহ্মজ্ঞ, অথচ ব্যবহারে দেখা যায় সে নরাধম তাহলে আমাদের এমন যুক্তি নেই যার দ্বারা বলতে পারি তুমি ব্রহ্মজ্ঞ নও। কারণ শাস্ত্র বলছেন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যথা ইচ্ছা আচরণ হতে পারে। এখানে শাস্ত্রের তাৎপর্য হলো—জ্ঞানী পুরুষের আচরণ যাই হোক, তার দ্বারা তাঁর জ্ঞানের ব্যাঘাত হতে পারে না, অর্থাৎ জ্ঞান তাঁকে এমন একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে যা শুভ-অশুভের ঊর্ধ্বে। সুতরাং তাঁকে তাঁর শুভাশুভ কর্মের দ্বারা বিচার করা যাবে না। কথাটি আমরা ভিন্ন অর্থে নিয়ে যদি এরকম মনে করি যে, তিনি শুভই করুন আর অশুভই করুন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহলে

---

১. বৃহদারণ্যক—১/৪/১০

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

৩. বৃহদারণ্যক—৩/৫/১

৪. তদেব—৩/৫/১

যে কেউ ব্রহ্মজ্ঞানী বলে নিজেকে দাবি করতে পারে। শাস্ত্র আমাদের এ সম্বন্ধে সর্বদা সাবধান করে দিচ্ছেন। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছে কেন? না, এই সব লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে হবে কার প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে। যে মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সর্বদা অসৎ আচরণে লিপ্ত তার ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে কি? শাস্ত্র বলছেন—কখনোই না। তার আচরণ দিয়েই তাকে বিচার করতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞ কিনা জানবার এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তবে আমাদের সেই বিচারে হয়তো কখনো ভুল থাকতে পারে। তাহলেও নির্বিচারে কাউকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে গ্রহণ করার চেয়ে এটাই নিরাপদ। নাহলে সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি—সবেরই উদ্দেশ্য মানুষকে তার চরম সত্তাতে পৌঁছে দেওয়া। এইজন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম। সেই সমাজই প্রকৃষ্ট সমাজ যেখানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে অনুকূলতা বেশি। মানুষ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, এক পা এক পা করে তাকে তার সেই অবস্থা থেকে ক্রমশ উন্নীত করে চরম আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে, এইজন্য শাস্ত্র অধিকারীভেদে নানা ব্যবস্থা রেখেছেন। যে অধিকারী যেখানে আছে সেখান থেকেই সে পদক্ষেপ করতে পারবে—তার বিধান আছে। শাস্ত্রে নিষ্ঠুর কর্মেরও যে বিধান দেখা যায় তা নিষ্ঠুর কর্মে উৎসাহ দেবার জন্য নয় কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতাকে ক্রমশ সংযত করবার জন্য। বাইবেলে আছে—যীশু বলছেন—'প্রাচীন উপদেশে আছে—'An eye for an eye, and a tooth for a tooth'.[১]—ভাব হচ্ছে, কেউ তোমার যতটুকু অপকার করেছে তুমি বড় জোর তার ততটুকু অপকার করতে পার। তার বেশি এগিয়ো না। তারপর যীশু বলছেন "You have heard that it was said, 'you shall love your neighbour and hate your enemy'."[২] 'এটি প্রাচীন ধর্মের কথা।' তিনি বলছেন প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা, বলছেন 'Love your enemies and pray for those who persecute you....'।[৩] কাদের বলেছেন? না, যারা আর একটু উন্নত হয়েছে তাদের। যার পশুজীবন তার জন্য একেবারে 'Love your enemies' বললে বাঘ আর ভেড়ার মধ্যে ভালবাসার মতো হবে। তা বলা হয়নি। হিংস্র প্রকৃতিকে সংযত করবার জন্য তাকে খানিকটা প্রশ্রয় দিতে হয়েছে। একেবারে চরম নীতির কথা বললে সমাজ সে নীতি গ্রহণ করতে পারবে না। সর্বত্যাগের উপদেশ দিলে সমাজ তা গ্রহণ করতে পারে না। শাস্ত্র বলছেন, 'কুসূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা'[৪]—অর্থাৎ এক বছরের মতো খাদ্যশস্য সঞ্চয়

---

১. The Bible, Mathew—5 : 38

২. The Bible, Mathew—5 : 43

৩. Do—5 : 44

৪. মনুসংহিতা—৪/৭

করতে পার, তার বেশি নয়। তারপরে বলেছেন, এক মাসের মতো হাঁড়িতে করে শস্য রাখতে পার। তারও পরে বলেছেন, অত দরকার কী! দিনেরটা দিন হলেই চলে। এর বেশি সঞ্চয় করো না। পরে বলেছেন, সঞ্চয় করবে কেন? উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য কুড়িয়ে নিয়ে এস। তারপর আবার বলছেন, তা করলে পাখিরা আহার থেকে বঞ্চিত হবে—ওরকম করবে না। ফাটলের মধ্যে যে দানাগুলি ঢুকে গিয়েছে, পাখিরা পায় না, সেইগুলি মাত্র সংগ্রহ করতে পার। তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজন যত কমাতে পার ততই ভাল। যত কম পার নেবে। যত বেশি পার দেবে। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু যার পক্ষে যেমন উপযোগী তেমন করে নিতে হবে। একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তারা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলবে বা আদর্শটিকে অবনমিত করে দেবে। এইজন্য শাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবে যিনি চরম লক্ষ্যে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন তাঁকে ছোটখাট বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। তাঁর কোন জায়গায় আপোষ করা চলবে না। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন সেজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বলছেন—তাঁকে অতি সতর্কভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, তাঁর আচারশুদ্ধি কি এতদূর হয়েছে যে, ভুলেও তাঁর দ্বারা কোন অপকর্ম হবে না বা তাঁর বেতালে পা পড়বে না? আচারশুদ্ধির পরের কথা বললেন—ইন্দ্রিয়ের শান্তি। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছি আর মন আছে কোন মলিন স্থানে। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই, সাধকের নিজের কাছে তো ধরা পড়ে। মন অশান্ত হলে জ্ঞান লাভ হবে না। ধরা যাক, কোন উপায়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে অবসন্ন করে দেওয়া গেল। তখন দেখতে হবে মন সমাহিত কি না। অর্থাৎ শুধু ইন্দ্রিয়সংযম যথেষ্ট নয়, মন আত্মতত্ত্বে কেন্দ্রিত কি না। এক একটা ধাপে ধাপে বলছেন। এর পরও আছে। বলছেন—'ন অশান্তমানসঃ'। মনকে আত্মতত্ত্বে কেন্দ্রিত করার অভ্যাস করে কিছু শক্তিলাভ হয়, কিন্তু একটু অভিমানও হতে পারে যে, আমি এতদূর এগিয়েছি। এতদূর অবধি সাধন করলেও আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হবে না। এগুলি খুব বিশ্লেষণ করে দেখবার, ভাববার বিষয়। এ যেন ঠাকুরের সেই কথা—মড়ার খুলির ভিতরে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে। সেখানে একটি ব্যাঙ যাবে। সাপ তাকে ছোবল মারতে গেলে সাপের বিষ সেই খুলিতে পড়বে। তারপর সেটি দিয়ে ওষুধ তৈরি করলে তাতে রোগ ভাল হবে। এতগুলি যোগাযোগ।[১] এতগুলি না করলে হবে না। আগেই বলেছেন—'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। দু পাতা পড়ে মনে করলাম—বেশ জ্ঞান অর্জন হয়েছে। শাস্ত্রের একটু ব্যাখ্যা করে লোককে স্তম্ভিত করে দিলাম। তাতে নিজের কল্যাণ হয় না। অপরকে মোহিত

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০৯

করা যায়, যশ অর্জন করা যায় এবং লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা আসে। কিন্তু দরজাগুলি পার না হলে আত্মজ্ঞান হবে না। এইজন্য শাস্ত্র এখানে একটির পর একটি করে বলছেন।

দুশ্চরিত থেকে বিরত হয়েছি অর্থাৎ চুরি করি না, মিথ্যা বলি না, কায়িক সংযম করা আছে কিন্তু মন ছোটাছুটি করছে। বাইরে থেকে লোকে প্রশংসা করে, সম্মান দেয়, ভিতরে হয়তো আগ্নেয়গিরি। ফলে আরো সর্বনাশ হয়। মনকেও যদি বা কোন ক্রমে শান্ত করা হলো কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। সংযম তো negative, না-বাচক কথা। সংযত মন একটি খুব ধারালো অস্ত্র। মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম মানুষকে ক্ষমতাশালী করে। কিন্তু সেই ক্ষমতা সে কিভাবে ব্যবহার করবে তার উপর সব নির্ভর করছে। তাই বলেছেন, তাকে সমাহিত কর, আত্মবস্তুতে স্থির কর। নাহলে সমস্ত প্রয়াস বৃথা হয়ে গেল। বরং ঐ প্রবল শক্তিশালী মন হয়তো জগতের একটা মহা অনিষ্ট করবে। পুরাণাদিতে এর দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। কেউ কঠোর তপস্যা করছে, ইন্দ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত—এই বুঝি ইন্দ্রত্ব গেল! দুর্বাসা ঋষিকে দেখলে লোকে ভয়ে সন্ত্রস্ত—এই বুঝি কি অভিশাপ দিলেন। ভিতরে শক্তি আছে, সেই শক্তির ব্যবহার কিভাবে করবেন জানা নেই। তাই সংযত মনকে আত্মাতে কেন্দ্রিত না করলে দুর্বার সেই মন দুনিয়াকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরমাণুকে ভাঙা যেমন। তার মধ্যে এমন শক্তি, যে ভাঙছে তাকেও উড়িয়ে দেবে। সে শক্তিকে সংহত করবার জন্য কত যন্ত্র তৈরি করতে হচ্ছে। তেমনি মনকে আত্মাতে কেন্দ্রিত না করলে তার শক্তি সংহত থাকবে না, সর্বনাশ হবে। হয়তো যোগশাস্ত্রে যাকে রসাস্বাদ বলছেন সে দিকে মন চলে গেল। তখন সাধনার গতি সেখানে প্রতিহত হলো। কাজেই তার থেকেও নিবৃত্ত হতে হবে। এতগুলি দরজা পার হলে তবে আত্মজ্ঞান লাভ, শুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব হবে।

বিবেক-বৈরাগ্য-শমদমাদি সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মা যে দুর্বিজ্ঞেয় সে কথাটি এখন বলছেন—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥২৫॥

অন্বয় ঃ—ব্রহ্ম (সর্বধর্মের উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ) চ (এবং) ক্ষত্রম্ (সর্বধর্মের পরিরক্ষক ক্ষত্রিয়) উভে (দুই-ই) চ (এবং) [উপলক্ষণের দ্বারা অপর দুই জাতি তথা সকল প্রাণী বা বিশ্বচরাচর] যস্য (যে পরমাত্মার) ওদনঃ (অন্ন, ভক্ষ্য) ভবতঃ (হয়) [বিশ্বচরাচর প্রলয়ে ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়] মৃত্যুঃ (সর্বসংহারক যম তথা সকল দেববৃন্দ) যস্য (যাঁর) উপসেচনম্ (ব্যঞ্জনসদৃশ) [কল্পান্তে দেবতারাও ব্রহ্মে লীন হন] সঃ (তিনি) যত্র (যেখানে [স্বমহিমায় বিরাজিত]) কঃ (কে) ইত্থা (এইরকম যথার্থভাবে) বেদ (জানতে পারে)?

'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ'—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁর অন্ন, ভক্ষ্য ; 'মৃত্যুঃ যস্য উপসেচনম্'—মৃত্যু যাঁর ব্যঞ্জন মাত্র ; 'ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ'—এমন যে আত্মা তাঁকে এই প্রকার মহিমাবিশিষ্ট রূপে কে জানে? সর্বধর্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁর আহার্যস্বরূপ এবং সর্বসংহারক মৃত্যুও যাঁর শাকব্যঞ্জনাদি উপকরণ মাত্র, তিনি কিরূপ মহিমাশালী—এ কে জানবে? তাৎপর্য হচ্ছে—সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং সর্বসংহারক মৃত্যুও যাঁর কাছে অতি তুচ্ছ সেই মহান আত্মাকে পূর্বোক্ত সাধনশূন্য ও প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি জানতে পারে? সাধনসম্পন্ন শান্তচিত্ত ব্যক্তির মতো ভোগাসক্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে সমর্থ হন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপনিষদের সেই কাহিনী। দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হলেন। তখন দেবতাদের মনে একটু গর্ব এল—'অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমা'[১]—এই বিজয় আমাদেরই, এই গৌরব আমাদেরই। ব্রহ্ম সর্বান্তর্যামী। তিনি দেবতাদের এই মনোভাব বুঝে তাঁদেরই কল্যাণের জন্য, তাঁদের অভিমান দূর করবার জন্য এক অপূর্বরূপে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা তাঁকে চিনতে না পেরে অগ্নিকে পাঠালেন—ইনি কে জেনে আসতে। অগ্নি সেই যক্ষের সমীপে গেলে তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে?' অগ্নি বললেন—'জাতবেদা বা অহমস্মীতি'[২]—'আমি অগ্নি, জাতবেদা।' 'আমি সর্বজ্ঞ।' 'তা তুমি কী করতে পার?' 'আমি বিশ্বসংসারকে ভস্ম করে দিতে পারি।' 'তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি'।[৩]—তাঁকে একটা তৃণ দিয়ে ব্রহ্ম বললেন—'এটি দগ্ধ কর।' অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সেই তৃণটিকে পোড়াতে পারলেন না। লজ্জায় অধোবদন হয়ে দেবতাদের কাছে এসে বললেন—এই পূজনীয়স্বরূপ কে তা জানতে পারলাম না। তখন বায়ু গেলেন। 'তুমি কে?'—'বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা'[৪]—'আমি বায়ু বা মাতরিশ্বা'—অর্থাৎ অন্তরীক্ষচারী। 'তোমার কী শক্তি আছে?' 'আমি বিশ্বসংসারকে উড়িয়ে দিতে পারি।' এবারও সেই তৃণটুকু ফেলে তিনি বললেন—'এটা ওড়াও তো!' বায়ুরও অগ্নির মতো অবস্থা, তৃণখণ্ডকে নড়াতেও পারলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন—এরা ছোট ছোট দেবতা, এরা কি পারে? আমি নিজে যাই। ইন্দ্রকে আরো তীব্র কশাঘাত করবার জন্য সেই পূজ্য আবির্ভাব অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ইন্দ্র এতে ক্ষুব্ধ, অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ফিরে না এসে সেখানে ধ্যানমগ্ন হলেন। তখন, 'তস্মিন্ এব আকাশে'[৫]— সেই আকাশেই আবির্ভূত হলেন হিমবান্-

---

১. কেনোপনিষদ্—৩/১ ; ২. তদেব—৩/৪ ; ৩. তদেব—৩/৬ ;
৪. তদেব—৩/৮ ; ৫. তদেব—৩/১২

কন্যা উমা হৈমবতী, যাঁকে সর্বজ্ঞানের আধার, বেদের প্রতীক বলা হয়। ব্রহ্মবিদ্যারূপে আবির্ভূতা হয়ে তিনি বললেন—'ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই তোমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অসুরদের তিনিই জয় করেছেন। তাঁর এই বিজয়ে তোমরা নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছ।'

আমরাও যখন কোন বিষয়ে কৃতকার্য হই তখন উল্লাসের সঙ্গে ভাবি—এটি আমাদেরই মহিমা, মনে করি না যে তিনি করাচ্ছেন। ঠাকুর বলেছেন—যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি। পুতুলনাচের পুতুলের মতো তিনি দড়ি ধরে ইচ্ছামতো ঘোরাচ্ছেন, ফেরাচ্ছেন। তার ব্যতিক্রম করবার কোন উপায় আমাদের নেই। 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'[১]—এই অক্ষর পুরুষের শাসনাধীন হয়ে সূর্য চন্দ্র বিধৃত, অবস্থিত হয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে চলেন। তার ব্যতিক্রম করার শক্তি তাঁদের নেই। 'আমরা করছি'—বলে আমাদের যে অভিমান তা বৃথা অভিমান। তিনিই সকলের অন্তরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। 'যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যামি অমৃতঃ'[২]—যিনি সর্বভূতের অন্তর্বর্তীরূপে থাকেন, সর্বভূত যাঁকে জানেন না, সর্বভূত যাঁর শরীর, যিনি অন্তর্বর্তীরূপে সর্বভূতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা—অন্তর্যামী ও অমৃত। আমরা আমাদের জানি, আমাদের নিয়ন্তাকে জানি না, সুতরাং মনে করছি যে, আমরা স্বতন্ত্রভাবে চলছি। এই আমরা কারা? যারা নিজেদের সেই পরম তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্ররূপে দেখছি, কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতারূপে ভাবছি, তারা। সেই 'আমি'র এমন কোন সামর্থ্য নেই যে, স্বতন্ত্রভাবে কিছু করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তাঁর ইচ্ছা বই (গাছের) একটি পাতাও নড়বার জো নাই!'[৩]—আমার কর্তৃত্ব বলে কিছু নেই। কর্তৃত্ববিশিষ্ট বলে নিজেদের যে মনে করি তার কারণ তত্ত্বকে না জানা। 'যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ'[৪]—যাঁকে সর্বভূত জানে না। একজন আমাকে প্রাণবান, ক্রিয়াবান করেছেন, সর্ব ব্যাপারে পরিচালিত করছেন, অথচ আমি আমার শক্তিকে স্বতন্ত্র বলে বোধ করছি। এইখানেই আমাদের ভ্রান্তি। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। সেটি বোঝাবার জন্য এখানে বলছেন—'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ'—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যাঁরা এই সংসারের চালক, মহাশক্তিশালী, প্রতাপশালী বলে নিজেদের যাঁরা মনে করেন, তিনি তাঁদের গ্রাস করেন। 'ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ'—তাঁর স্বরূপ যে কিরকম তা কে বলতে পারে? অর্থাৎ

---

১. বৃহদারণ্যক—৩/৮/৯ ; ২. তদেব—৩/৭/১৫ ; ৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭১ ; ৪. বৃহদারণ্যক—৩/৭/১৫

কারো সাধ্য নেই যে, সহজে সেই তত্ত্বকে জানতে পারে। আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান যে সর্বৈব মিথ্যা সে কথাটুকুই বোঝাচ্ছেন। আমরা মনে করছি মৃত্যু সকলকে সংহার করছে। কিন্তু আমরা জানি না মৃত্যুরও মৃত্যু তিনি। 'ভয়াদ্ অস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'।।[১]—এই সর্বনিয়ন্তার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন। এই পরমনিয়ন্তার ভয়ে ইন্দ্র বায়ু স্ব স্ব কর্মের অনুষ্ঠান করেন, আর পঞ্চম যে মৃত্যু সে সকলকে সংহার করে। এই যে সকলে তাঁর ভয়ে পরিচালিত হচ্ছে তার অর্থ তিনিই একমাত্র শক্তি যা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমরা সেই আত্মস্বরূপকে কি করে বুঝব?

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।'[২]

—একটি চুলের ডগাকে একশভাগে ভাগ করে তার একটি ভাগকে নিয়ে আবার একশ ভাগ করলে যে অংশ পাওয়া যায় জীব হচ্ছে সেই রকম। তবে শাস্ত্র বলেছেন— আমাদের এই ক্ষুদ্রত্ব বোধ হচ্ছে ব্যক্তিরূপে অভিমানের জন্য। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে বর্জন করতে পারলে আমরা সেই অনন্ত স্বরূপে পরিণত হতে পারি। ব্যক্তিত্বটিকে তাঁতে বিসর্জন করে দেওয়ার অনুপ্রেরণাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

---

১. কঠোপনিষদ্—২/৩/৩
২. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৫/৯

প্রথম অধ্যায়
তৃতীয় বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥১॥

অন্বয় ঃ—ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) পঞ্চাগ্নয়ঃ (পঞ্চপ্রকার অগ্নির উপাসক গৃহস্থগণ) চ (এবং) যে (যাঁরা) ত্রিণাচিকেতাঃ (তিনবার নাচিকেত অগ্নির আরাধনকারী) [তাঁরা] লোকে (এই দেহমধ্যে) পরমে পরার্ধে (পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির স্থানে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে) গুহাম্ (বুদ্ধিরূপ গুহাতে) প্রবিষ্টৌ (অবস্থিত) সুকৃতস্য (স্বকৃত কর্মের) ঋতম্ (অবশ্যম্ভাবী ফল) পিবন্তৌ (ভোগকারী দুই পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে) ছায়াতপৌ [ইব] (আলোক ও অন্ধকারের মতো পরস্পর বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন) বদন্তি (বলে থাকেন)।

এই তৃতীয় বল্লীতে বিদ্যার স্বরূপ ও ফল এবং অবিদ্যার স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। তৃতীয় বল্লীর সঙ্গে পূর্ব বল্লীর সম্বন্ধ দেখিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন যে, বিদ্যা আর অবিদ্যা পরস্পরবিরোধী। এদের ফলও বিরুদ্ধ একথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে বলা হয়নি, এখানে তা বলা হবে।

যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ এবং যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অনুশীলন করেছেন, যাঁরা তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করেছেন তাঁরা বলেন—দুটি আত্মা আছেন। কোথায় আছেন? 'গুহাং প্রবিষ্টৌ'—হৃদয় গুহায়, হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। একটি আত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, যিনি কর্তা-ভোক্তারূপে সমস্ত কাজ করছেন, ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে বিষয়কে অনুভব করছেন। আর একটি যাঁকে আমরা জানি না, পূর্বোক্তটি থেকে ভিন্নরূপে শাস্ত্র যাঁকে বোঝাচ্ছেন। এই মন্ত্রে উভয়ের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন।

'পরমে' অর্থাৎ বহিরাকাশ এবং স্থূল শরীরাকাশ থেকেও উৎকৃষ্ট, 'পরার্ধে' অর্থ হচ্ছে পরব্রহ্মের স্থান, পরমাত্মার স্থান, শ্রেষ্ঠ স্থান—যেখানে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়। জীবাত্মাকে আমরা বলি হৃদয়ে অবস্থিত। কারণ, হৃদয়েই যেন চৈতন্যের প্রকাশ বেশি, বস্তুর অনুভব, সুখদুঃখাদির অনুভব হৃদয়ে হয়। 'হৃদয়েন হি জানাতি'[১]—হৃদয়ের দ্বারা মানুষ আত্মাকে জানে। মস্তিষ্ককে নয়, হৃদয়কেই অন্তঃকরণের স্থান বলে বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত। হৃদয়ের কথা বলতেই সবাই বুকে হাত দিয়ে বলে এইখানে।

---

১. বৃহদারণ্যক—৩/৯/২৩

এটি যেন মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির স্থান। লৌকিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর কারণ হলো আমাদের যত প্রকারের ভাব, আবেগ, emotion-এর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অনুভব আসে। বিজ্ঞান যে বলে প্রথমে brain-এ, মস্তিষ্কে অনুভব হয় তা ঠিক আমাদের অনুভূত নয়, যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে হয়। কিন্তু অনুভবের সঙ্গে হৃদয়ে যে একটা পরিবর্তন আসে তা যন্ত্র ছাড়াই অনুভবগম্য। এইজন্য মনে হয়, হৃদয়কে আত্মার স্থান বলা হয়েছে।

এখানে বলছেন—'ব্রহ্মবিদো বদন্তি'—ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন এবং যাঁরা কর্মী, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে যাঁদের প্রয়োজনীয় শুদ্ধি লাভ হয়েছে, যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন অথবা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছেন তাঁরাও বলেন দুটি আত্মার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই প্রবল। সেই পার্থক্য বোঝাবার জন্য বললেন 'ছায়াতপৌ'—ছায়া আর আতপ, আলোক এবং অন্ধকারের মতো দুটি আত্মা পরস্পর বিরোধী। দুটি আত্মাই 'সুকৃতস্য ঋতং পিবন্তৌ'—স্বকৃত কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করেন। সুকৃতের ঋতকে পান করেন। 'সুকৃত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে স্বয়ংকৃত কর্ম। 'ঋত' শব্দের অর্থ সেই কর্মের ফল। আমরা জানি 'ঋত' আর 'সত্য' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। 'ঋত' অবশ্যম্ভাবী হলেও অনিত্য, বিনাশী। আর সত্য অবশ্যম্ভাবী হলেও নিত্য, অবিনাশী। এখানে—'ঋতং পিবন্তৌ'—এই বাক্যে দ্বিবচন থাকায় মনে হতে পারে দুটি আত্মাকেই কর্মফলভোক্তা বলে নির্দেশ করা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে তা হলেও বস্তুতপক্ষে যে তা অভিপ্রেত নয় বরং আত্মা দুটি যে বিরুদ্ধধর্মী তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো 'ছায়াতপৌ' এই দ্বিবচনান্ত শব্দের মাধ্যমে।

তাহলে দুটি আত্মাকেই 'ঋতং পিবন্তৌ' বা কর্মফলভোক্তা বলা হলো কেন? ভাষ্যকার শঙ্করের মতে 'ছত্রিন্যায়' অনুসারে এই কথা বলা হয়েছে। কোন রাজা পরিজন-পরিবৃত হয়ে যখন গমন করেন তখন রাজার মাথায়ই কেবল রাজছত্র থাকে। পথচারিগণ তা দেখে বলে থাকেন 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'—ছত্রধারিগণ যাচ্ছেন। এখানে রাজাই ছত্রী অর্থাৎ ছত্রধারী, অন্যেরা নন, তবু রাজার সঙ্গে যাচ্ছেন বলে সবাইকেই ছত্রধর বলা হলো। তেমনই জীবাত্মা ফলভোগ করছেন আর পরমাত্মা সাক্ষীরূপে রয়েছেন তবুও জীবাত্মার সঙ্গে সম্পর্কবশত জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই 'ঋতং পিবন্তৌ' বলা হলো। দুটি আত্মাই চেতন, কারণ অচেতন হলে কর্মফল ভোগ করতে পারে না। কিন্তু কর্মফলের ভোক্তা পরিণামী হয় এবং পরিণামী বলে সে বিনাশী। আর একটি আত্মা অপরিণামী অতএব কর্মফল ভোগ করেন না। মুণ্ডক উপনিষদে যে দুটি পাখির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এখানে যেন তারই উল্লেখ করে বলা হলো। সেখানে আছে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।'[১]

---

১. মুণ্ডক—৩/১/১

—সর্বদা সম্মিলিত, সমান নামধারী দুটি পাখি একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি বিচিত্রস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করে দর্শন করে—সে কোন কিছু খাচ্ছে না এমনি আনন্দে প্রকাশ পাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে দুজনেই ফল ভোগ করছে। ঘটনার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই অথচ যে ঘটনাকে দেখে তাকে বলে সাক্ষী। এখানে সাক্ষী মানে প্রকাশস্বরূপ, অবিকারী, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরমাত্মা। পরমাত্মা যে সত্যসত্যই ভোগ করেন না—এই কথা কারা বুঝেছেন এবং বলেন? যাঁরা ব্রহ্মবিদ্, আত্মতত্ত্বকে জেনেছেন তাঁরা তো বলেনই, আরো বলেন যাঁরা পঞ্চাগ্নির উপাসক এরূপ গৃহস্থগণ এবং ত্রিণাচিকেতগণ। এঁরা সবাই বুঝেছেন, পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর পরস্পর থেকে আলো ও অন্ধকারের মতো পৃথক।

পঞ্চাগ্নি বলতে একটি বিশেষ উপাসনার কথা বোঝানো হতে পারে অথবা যে পাঁচটি অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় সেই পাঁচটি অগ্নির কথাও বলা হতে পারে। এই পাঁচটি যজ্ঞাগ্নির নাম—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য এবং আবসথ্য। গার্হপত্য অগ্নি হলো গৃহের অধীশ্বর বা কুলদেবতারূপ অগ্নি। যতদিন গৃহস্থ গৃহধর্ম অনুসরণ করবেন ততদিন সেই অগ্নি থাকেন। আহবনীয় অগ্নি হলো—যেখানে আহুতি দেওয়া হয়। দক্ষিণাগ্নি আর একটি অগ্নি। দক্ষিণ শব্দের অর্থ প্রসন্ন। তাকে দক্ষিণ দিকে স্থাপন করা হয়। সভ্য অগ্নি সভাতে থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরূপে যাঁকে রাখা হয়, আর আবসথ্য বলতে গৃহ বোঝায়। তাতে যে অগ্নি অবস্থান করেন তিনি আবসথ্য অগ্নি। যাঁরা সাগ্নিক, নিয়মিত ভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন তাঁদের পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট বলা হয়। আর যাঁরা তিনবার নাচিকেত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন—তাঁরা হলেন ত্রিণাচিকেত। আমরা গোড়াতেই দেখে এসেছি নচিকেতার নামে এই যজ্ঞের নামকরণ হয়েছে। তিনবার নাচিকেত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে মৃত্যুর পর হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে ঐক্য লাভ হয় আর ইহজীবনেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। ফলে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার আভাস অনুভব করে থাকেন। এই হৃদয়কেই ব্রহ্মের স্থান বলা হলো। ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বৃত্তি তা হৃদয়েরই বৃত্তি। এইজন্য হৃদয়কে পরমাত্মারও স্থান বলে বলা হয়েছে।

পরের মন্ত্রে বলা হয়েছে নাচিকেত যজ্ঞের দ্বারা যে আত্মস্বরূপকে জানা যায় তাঁকে আমরাও জানতে সমর্থ। বোঝাই যাচ্ছে এটি গৌণভাবে বলা কারণ কোন যজ্ঞের দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায় না, অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভসম্ভূত স্বপ্রকাশ অগ্নিদেবকে জানা যায় এবং জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠানের ফলে বৈরাজ পদ অর্থাৎ বিরাট পুরুষের অধিকার লাভ করা যায়। নচিকেতা যজ্ঞের সাহায্যে যজ্ঞের জ্ঞান লাভ করে তারপর আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এইজন্য দুই-এর ভিতরে একটা গৌণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে। হয়তো এই কারণেই এখানে নাচিকেত যজ্ঞের সঙ্গে আত্মার কথা বলা হয়েছে।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥২॥

অন্বয় ঃ—ঈজানানাম্ (যজমানগণের) যঃ (যেটি) সেতুঃ (দুঃখসাগর পার হওয়ার উপায়) [সেই] নাচিকেতম্ (নাচিকেত অগ্নিকে) [এবং] অভয়ম্ পারম্ (ভয়শূন্য সংসারসমুদ্রের পার) তিতীর্ষতাম্ (অতিক্রম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে) যৎ (যিনি) অক্ষরম্ (অবিনশ্বর) পরম্ ব্রহ্ম (পরমাত্মা) [তাঁকেও] শকেমহি (জানতে সমর্থ হয়েছি)।

'সেতুঃ ঈজানানাম্'—যা যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদের সেতুরূপ। কিসের সেতু? দুঃখ সাগর অতিক্রম করার সেতু অর্থাৎ উপায়। আবার বলা হলো, যিনি 'অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্'—ক্ষয়রহিত, দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম যিনি 'অভয়ম্' অর্থাৎ ভয়শূন্য, 'পারং তিতীর্ষতাম্'—সংসারসাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, জ্ঞানিগণের আশ্রয় স্বরূপ, তাঁকেও 'জ্ঞাতুং শকেমহি'—আমরা জানতে সমর্থ। অপরব্রহ্ম থেকে পৃথক করার জন্য বলা হলো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের 'পর' এবং 'অপর' এই দুটি বিশেষণ আমরা আগেই দেখেছি। এখানে যখন পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় বললেন, তখন বুঝতে হবে অপর-ব্রহ্মকে পাওয়া সহজতর।

কী উপায়ের দ্বারা জানতে পারি? যাগ-যজ্ঞাদির ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলে তবেই সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ দিয়ে পরব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি। এখানে পুনরায় মনে রাখতে হবে পরব্রহ্ম হলে তাঁকে জানা, অপরব্রহ্ম হলে তাঁকে লাভ করা। হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ উচ্চ অবস্থা, জগতের সব ভোগ-ঐশ্বর্যের চরম উৎকর্ষ সেখানে। সেই হিরণ্যগর্ভকে জানার অর্থ তাঁকে লাভ করা। তাঁকে কেবল জানলে হয় না, পেতে হয়। আর পরব্রহ্মকে জানতে হয়, পাওয়ার আর দরকার হয় না। কারণ যখন জানব, তাঁকে আমার স্বরূপ বলেই জানব; এই জানার পরিণাম হবে ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তি অথবা ব্রহ্মস্বরূপতা সম্বন্ধে যে অজ্ঞান ছিল সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি। জানা বলতে জ্ঞানের একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হওয়া নয়, যাঁকে ভুলে ছিলাম সেই ভুলে থাকার নিবৃত্তি। যেন অজ্ঞান তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বাস্তবিক অজ্ঞান তাঁকে ঢাকতে পারে না। সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় মাত্র।

অদ্বৈতবাদীর পক্ষ থেকে বারবার এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, পরব্রহ্মকে আমরা পাই না, পরব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু। তিনি আমাদেরই স্বরূপ, অতএব আমাদের কাছে নিত্যজ্ঞাতও বটে। তবে অন্য আবরণের ভিতর দিয়ে অন্যের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা তাঁকে জানি। যখন তাঁকে উপাধিধর্মবর্জিতরূপে জানব তখন আমাদের করণীয় কিছু থাকবে না, প্রাপ্তব্যও কিছু থাকবে না। অপর-ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য, লব্ধব্য, তাঁকে লাভ করতে হয়। মানুষ, যাগযজ্ঞাদির দ্বারা পুণ্য অর্জন করে, সেই পুণ্যের প্রভাবে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে একত্বলাভ করে। এখানে প্রশ্ন উঠবে—যদি পাঁচজনের হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা হয়ে থাকে তাহলে

পাঁচজনের ভিতরে কে আগে পাবে, কে পরে পাবে? এখানে আগে পরের ব্যাপার নেই। পাঁচজনের শুদ্ধি লাভ হলে একই সঙ্গে পাঁচজনেরই হিরণ্যগর্ভত্বপ্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার ভিতরে ভিতরে বিবাদ হবে না? না। কারণ তাঁদের সকলের আমিত্ব হিরণ্যগর্ভে লীন হয়ে যায়। সুতরাং পাঁচজন কেন পাঁচ লক্ষ হলেও কোন গোলযোগ নেই, কাকেও অপেক্ষা করতে হবে না। সকলের যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের বোধ ছিল সবই হিরণ্যগর্ভে লীন হয়ে যাবে। আবার প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি জীবের সংখ্যা কমে যাবে? আমার মনে একবার এ প্রশ্ন উঠলে আমাদের একজন প্রাচীন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'কত কাল ধরে কত জীব যে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এতে তো জীবের সংখ্যা কমে যাচ্ছে?' তিনি এক কথায় জবাব দিলেন, 'কমে যেত যদি জীবের সংখ্যা সীমিত হতো কিন্তু তাদের সংখ্যাও তো অনন্ত'। অর্থাৎ জীব কোনদিন নিঃশেষ হবে না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—নতুন জীব সৃষ্টি হয় কি? শাস্ত্র অনুসারে তার উত্তর হবে, না। নতুন জীব সৃষ্টি হলে কার কর্মফলে সৃষ্টি হবে? সুতরাং শাস্ত্রে জীবকে 'অনাদি' বলে স্বীকার করতে হয়েছে। গণিতের দৃষ্টিতে দেখে এই কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। গণিতে যে সংখ্যা স্বীকার করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য একটি থেকে আর একটির পৃথকতা দেখানো। একটি সংখ্যা কমে যাওয়ার অর্থ তার লোপ হওয়া। যেমন, একটা শ্লেটে অনেকগুলি বিন্দু এঁকে একটি একটি করে সব মুছতে থাকলে সমস্ত বিন্দুগুলিই মোছা হয়ে যাবে। দার্শনিক দৃষ্টিতে যে জীবকে অনাদি ও অনন্ত বলা হয়েছে, তার আসল উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে, মূল তত্ত্ব এক বই দুই নয়। সেই নিত্য তত্ত্বই অসংখ্য জীব ও জগৎ রূপে প্রকটিত হয়েছেন। নামরূপাত্মক এই জগৎ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা। তার থেকে একত্বের ধারণা করা সহজ নয়। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাবার জন্য কখনো স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, অসংখ্য থেকে একত্বে নিয়ে যাচ্ছেন কখনো এক কিভাবে বহুরূপে বিবর্তিত হলেন তা দেখাচ্ছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।'[১]—এই আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হলো। আত্মা থেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটি ভূত উৎপন্ন হলো। আবার বেদই অন্য জায়গায় বলেছেন[২]—তেজ, অপ্ আর অন্ন, এই তিনটি তিনি সৃষ্টি করলেন। এক জায়গায় বললেন পাঁচটি আর এক জায়গায় বললেন তিনটি। কোন্‌টি ঠিক? ব্যাখ্যাকার বলছেন তিনটি বলা হয়েছে আর যে দুটি বলা হয়নি ওগুলি উপলক্ষণ অর্থাৎ এর দ্বারা

---

১. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২/১/৩

২. ছান্দোগ্য—৬/৩/৩

তাদেরও বোঝাচ্ছে। বিস্তার করে কোথাও পাঁচটা বলা হয়েছে। শাস্ত্র আমাদের বোঝাবার জন্য তিনটি বলেন, পাঁচটি বলেন, আসল কথা একটিও নয়। এই সব বিশ্লেষণ করা হয়েছে কেবল আমাদের বোঝাবার জন্য যে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন'[১]। বিজ্ঞানে নতুন নতুন উপাদান, element আবিষ্কৃত হচ্ছে বা অণুগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন বলা হচ্ছে, অনন্ত সংখ্যা। সবই উপাদান যা সেই এক সৎ বস্তু থেকে এসেছে। এক কারণ থেকেই সমস্ত এসেছে, কার্যের কোন পৃথক সত্তা নেই। জীবরূপেই হোক আর জড় জগৎ রূপেই হোক, তাঁর যে বৈচিত্র্য আমরা কল্পনা করছি এ সকলের কোন অস্তিত্ব তাঁর থেকে পৃথক রূপে, যেভাবে আমরা উপলব্ধি করছি, সেভাবে নেই। জগতের বৈচিত্র্য অনন্ত, তার মধ্যে আমরা মূলকে খুঁজতে চেষ্টা করছি। মূলের সন্ধান করতে গিয়ে বৈচিত্র্যের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে এবং কমতে কমতে মাত্র পাঁচটিতে পর্যবসিত করা হলো। তারপর এই পাঁচটিকেও তাদের কারণে লোপ করা হলো। তখন কেবলমাত্র কারণ রইল। আবার সেই কারণকেও কারণাতীত এমন তত্ত্বে পর্যবসান করতে হবে যা কার্যও নয় কারণও নয় কিন্তু একমাত্র যাঁর সাক্ষীরূপে থাকার জন্য জগতের যত কার্যকারণশৃঙ্খলার প্রতীতি হচ্ছে। সুতরাং একমাত্র সেই সত্যে পৌঁছে দিয়েই আমাদের এই বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি। তত্ত্ব যত রকমের থাকুক বা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হোক সেই বৈচিত্র্যে আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। শাস্ত্র বলেন যে তুলান্বেষণ করতে করতে মূলান্বেষণ হয়। এটি একটি স্থূল দৃষ্টান্ত। তুলো চারিদিকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হলো এত তুলো কোন্ গাছ থেকে এল? গাছটা খুঁজতে হবে। সেই তুলো খুঁজে খুঁজে গাছটা কোথায় তাকে ধরতে পারি। সেইরকম এই জগৎ-বৈচিত্র্যকে অন্বেষণ করতে করতে দেখি কোথায় গিয়ে নিবৃত্তি হবে। যাঁর থেকে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি তাঁকে কোথায় পাব? শাস্ত্র নির্দেশ দিচ্ছেন স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে কারণাতীতে—এই প্রণালীতে যেতে হবে।

মূল অন্বেষণ করতে করতে যেখানে পৌঁছাই শাস্ত্র তাকে বলেছেন সৎ। 'সন্মূল'—সৎ হলো মূল। বিবিধতা বা বৈচিত্র্যকে সরিয়ে নিলে তার পিছনে থাকে সৎ। এই সৎ-এ পৌঁছে দেওয়াই বিশ্লেষণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই constructive thinking বা গঠনমূলক চিন্তা—আমাদের নৈরাত্মবাদী না করে আত্মবাদে পৌঁছে দেয়। নারদ সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি উপদেশ চাই'[২]। সনৎকুমার বললেন—'তুমি কী জান আগে বল'[৩]। তখন নারদ বললেন—'ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং

১. বৃহদারণ্যক—৪/৪/১৯ ; ২. ছান্দোগ্য—৭/১/১ ; ৩. তদেব—৭/১/১

ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি।[১] —সামবেদ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব-উৎপাত রিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধি শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্বশাস্ত্র ইত্যাদি তিনি জানেন বলে বললেন। কিন্তু তিনি আরো বললেন যে—'মন্ত্রবিদ্ এবাস্মি, ন আত্মবিৎ'[২]—আমি মন্ত্রবিদ্ মাত্র, আত্মবিদ্ নই। 'শ্রুতম্ হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ'[৩]—আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কাছ থেকে শুনেছি যে আত্মবিৎ শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। অতএব আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলছেন—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'[৪]— কাকে জানলে এই সমস্ত জানা হয়ে যায়। এই প্রশ্ন আমাদের প্রথম থেকেই। আমরা বহু বৈচিত্র্যের ভিতরে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সীমিত সময়ের মধ্যে মূল তত্ত্বে পৌঁছাতে চাই।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩॥

অন্বয় ঃ— আত্মানম্ (কর্মফলভোক্তা জীবাত্মাকে) রথিনম্ (রথের মালিক) বিদ্ধি (জানবে)। তু (আর) শরীরম্ (জীবদেহকে) রথম্ এব (রথরূপেই) [বিদ্ধি (জানবে)] তু (এবং) বুদ্ধিম্ (বুদ্ধিকে) সারথিম্ (দেহরথের পরিচালকরূপে) চ (এবং) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহমেব (বল্গা বা লাগাম বলেই) বিদ্ধি (জানবে)।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪॥

অন্বয় ঃ— মনীষিণঃ (বিচক্ষণ ব্যক্তিরা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমুহকে) হয়ান্ (অশ্বগণ) আহুঃ (বলেন) বিষয়ান্ (রূপরসাদি ভোগ্য বিষয়সমূহকে) তেষু (অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়সমূহের) গোচরান্ (মার্গ বা বিচরণ পথ) [আহুঃ (বলেন)] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্ [আত্মানম্] (দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমন্বিত আত্মাকে) ভোক্তা (সুখদুঃখ অনুভবকারী) ইতি আহুঃ (এইরূপ বলে থাকেন)।

এই দুটি মন্ত্রে বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে। বলছেন—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাকে রথী বলে কল্পনা কর। 'শরীরং রথমেব তু'—জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলে জান। রথী হলো, যে রথে চড়ে তার গন্তব্য স্থানে যায়। রথী আর রথে যে পার্থক্য আত্মা আর শরীরে সেই পার্থক্য। রথ যেমন কোন ক্রমেই রথী হতে পারে না তেমনি দেহ আত্মা হতে পারে

১. ছান্দোগ্য—৭/১/২ ; ২. তদেব—৭/১/৩ ;
৩. তদেব—৭/১/৩ ; ৪. মুণ্ডক—১/১/৩

না। রথের সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় রথের অন্য অঙ্গগুলির সঙ্গেও তুলনা এসে যাচ্ছে। 'বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি' বুদ্ধিকে সারথি বলে জান। বুদ্ধিকে সারথি বলার কারণ রথীর প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য সারথি রথকে চালায়। দেহকে চালায় কে? বুদ্ধি। তাই বলছেন—বুদ্ধিকে সারথি বলে জান। আর মনকে—'প্রগ্রহম্'—বা লাগাম বলে জানবে। লাগাম দিয়ে ঘোড়াগুলিকে সংযত করে নির্দিষ্ট পথে প্রেরণ করা হয়। ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব অর্থাৎ রথের বাহক—'ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ'। মন সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালায় অর্থাৎ সংযত করে বলে মন লাগাম। 'বিষয়াংস্তেষু গোচরান্'—বিষয়গুলিকে গোচর অর্থাৎ বিচরণভূমি বলা হয়েছে। কারণ, ইন্দ্রিয় আমাদের বিষয়সমূহে বিচরণ করায়। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা ইতি আহুঃ মনীষিণঃ'—মনীষিগণ শরীর-ইন্দ্রিয়-মনবিশিষ্ট যে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে সব নিজের বলে মনে করছে—তাকে ভোক্তা বলে মনে করেন। সাধারণ লোক এটা বোঝে না, জ্ঞানী পুরুষরা বোঝেন।

অতএব আমরা শুধু ইন্দ্রিয় মন নয়, শরীরকে পর্যন্ত আমাদের থেকে অভিন্ন মনে করে নিজেদের ভোক্তা বলছি। আসল কথা, ভোক্তা বলে তত্ত্বত কেউ নেই। স্বরূপত আত্মা ভোক্তা নন। কারণ, তিনি ভোগ করবেন কী করে? ভোক্তার ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি ভোক্তব্য বিষয় থাকা চাই। বিষয়কে এখানে আলাদা করে রাখা হচ্ছে এইজন্য যে, বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সত্তার যেন স্বতঃ ভেদ রয়েছে। এটি আমরা বুঝতে পারি যে, আমি বিষয় নয়, বিষয়ের ভোক্তা। বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কখনো একত্ববোধ হয় না। এরকম ভ্রমও হয় না। ফুলের ঘ্রাণ নিই কিন্তু আমি ফুল হয়ে গিয়েছি বলে মনে করি না। বিষয় থেকে যে ভোক্তা ভিন্ন, সে বোধ যে-কোন ভোক্তার আছে। কিন্তু সাধারণ কোন ভোক্তা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে বা শরীরের সঙ্গে নিজের ভেদ বুঝতে পারে না। এখানে রথ-রূপকের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের মনে শ্রুতি এই কথাই মুদ্রিত করে দিতে চাইছেন, তুমি শরীর নও, ইন্দ্রিয় নও, তুমি মন-বুদ্ধিও নও, তুমি শুদ্ধ আত্মা।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫॥

অন্বয় ঃ—তু (এ অবস্থায়) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) সদা (সর্বদা) অযুক্তেন মনসা (অসংযত চিত্তের ফলে) অবিজ্ঞানবান্ (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বা ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বিচারে অপারদর্শী) ভবতি (হয়) তস্য (তার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (সারথির) দুষ্ট-অশ্বাঃ ইব (অবাধ্য, দুষ্ট অশ্বের মতোই) অবশ্যানি [ভবন্তি।] (নিজের বশীভূত থাকে না)।

রথের ঘোড়াগুলি যদি দুষ্ট হয়, সারথির আজ্ঞানুবর্তী না হয় তাহলে কী হয়? না, রথী গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। অতএব বলছেন, 'যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা'—যে বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে 'অবিজ্ঞানবান্'—

বিবেকহীন, যার মন একাগ্রতাশূন্য—'অযুক্তেন মনসা'—তার ইন্দ্রিয়গুলি দুষ্ট অশ্বের মতোই অ-বশ্য অর্থাৎ বশীভূত নয়। যে সারথির ঘোড়াগুলি বশে নেই তার যে অবস্থা—এইরকম ব্যক্তিরও পরিণাম সেইরকম।

আর তার বিপরীত ক্রমে বলছেন—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৬॥

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) সদা যুক্তেন মনসা (সর্বদা সংযত মনের সাহায্যে বা চিত্ত সংযমের ফলে) বিজ্ঞানবান্ ভবতি (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিচারে নিপুণ হয়) তস্য (তার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ সদশ্বা ইব (ভাল শিক্ষিত অশ্বের মতো) বশ্যানি [ভবন্তি] (বশবর্তী ও আজ্ঞাধীন থাকে)।

যে সারথি পূর্বোক্ত সারথির মতো নন, যিনি 'বিজ্ঞানবান্' অর্থাৎ বিবেক-সম্পন্ন, যাঁর বুদ্ধির দ্বারা সৎ ও অসতের বিবেক, পৃথকতা স্থিরীকৃত হয়েছে, যিনি—'যুক্তেন মনসা'—যাঁর মন সর্বদা নিগৃহীত, বশীভূত, সবসময়ে যেন ঘোড়ার উপর লাগাম কষে আছে—'তস্য ইন্দ্রিয়াণি সদশ্বা ইব বশ্যানি'—তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি শিক্ষিত ঘোড়ার মতো বশে থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়দের পরিচালিত করে মন, মনকে চালায় বুদ্ধি। বুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে নয়, মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। মনরূপ লাগাম বুদ্ধির হাতে শক্ত করে ধরা থাকলে ঘোড়াগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত অবিজ্ঞানবানের পরিণাম কী হয় তা এবার এই মন্ত্রে বলছেন—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৭॥

অন্বয় ঃ—তু (আবার) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) অবিজ্ঞানবান্ (কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেকহীন) অমনস্কঃ (অসংযত চিত্ত) সদা অশুচিঃ ([ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য] সদা অপবিত্র) ভবতি (হয়) সঃ (সেই রথী) তৎ (সেই) পদম্ (পরম ব্রহ্মকে) ন আপ্নোতি (লাভ করতে পারে না) চ (বরং) সংসারম্ (জন্মমৃত্যুপ্রবাহে) অধিগচ্ছতি (পতিত হয়)।

যে এইরূপ বিজ্ঞানবান নয়, অসংযতমনা, মনকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করছে না, 'সদা অশুচিঃ'—সর্বদা অপবিত্র, 'ন স তৎপদম্ আপ্নোতি'—সে সেই স্থানে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। পরন্তু সে—'সংসারং চ অধিগচ্ছতি'—জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। সংসারগতি বলতে বার বার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যাওয়া বোঝায়। বিবেক যদি সারথি রূপে না থাকে, মন যদি শিক্ষিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের উপর লাগাম না কষে—তাহলে সর্বদা অশুচি, অপবিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তি তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে না, বার বার জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে।

আর তার বিপরীতক্রমে—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৮॥

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) যঃ (যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত) **সমনস্কঃ** (সংযতচিত্ত) সদা শুচিঃ (সর্বক্ষণ নির্মল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট) ভবতি (হন) স তু (তিনিই) যস্মাদ্ (যেখান থেকে) ভূয়ঃ (আবার) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) তৎ পদম্ (সেই পরম ব্রহ্মপদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি বিবেকযুক্ত, বুদ্ধিরূপ সারথি যাঁর মনকে যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করছে তিনি 'সমনস্কঃ'। এমন মনবিশিষ্ট সর্বদা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বিষয়ে বলা হচ্ছে—'স তু তৎপদমাপ্নোতি'—তিনিই সেই পরম পদ, সেই অবস্থা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। 'যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে'—যে পদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁকে আর জন্মাতে হয় না। আগের মন্ত্রটিতে বললেন—'সংসারম্ অধিগচ্ছতি'—সে বার বার জন্মায়, আর এই মন্ত্রটিতে বললেন—আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হলে তাকে আর জন্মাতে হয় না।

আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মনরূপ লাগাম দিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। বুদ্ধি হলো বিবেক, সেই বিবেক মনকে বলে দেবে—কি সত্য, কি অসত্য—আমাদের কোথায় এবং কোন্দিকে যেতে হবে। রথকে সেইদিকে পরিচালিত করতে হবে তার জন্য ঘোড়াগুলিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের সাহায্যে সংযত করার কাজ হলো বুদ্ধির। কারণ, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলিকে মনরূপ লাগামের দ্বারা বশে রাখবে। মন আর বুদ্ধির মধ্যে এখানে একটু পার্থক্য করা হয়েছে। সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হলো মনের। ইন্দ্রিয়গুলি তাদের বিষয়ানুভূতিকে মনের কাছে পৌঁছে দেয়।

বিষয়ানুভবের প্রক্রিয়াটি আবার মনে করি। প্রথমে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয়। মন সেই সংস্পর্শ বুদ্ধির কাছে পৌঁছে দেয়। বুদ্ধি তার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। তারপর তা গ্রহণ করে বা ত্যাগ করে। এই হলো বিষয়ানুভূতির প্রক্রিয়া। যেখানে বুদ্ধি বিবেকী, সে যেখানে মনকে, ইন্দ্রিয়গুলিকে তার বশে রাখার জন্য যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করছে সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি শিক্ষিত ঘোড়ার মতো যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। যথাস্থান কোন্টি? না—'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'[১]—সেই বিষ্ণু—অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পরমপদে—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে। যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। আর যদি বিবেক না থাকে অথবা বিবেক যদি মনকে এইভাবে পরিচালিত না করে, মন যদি ইন্দ্রিয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখে, ইন্দ্রিয়গুলি দেহকে যথেচ্ছ টেনে নিয়ে

১. কঠোপনিষদ্—১/৩/৯

যাবে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো যাবে না। 'সংসারং চাধিগচ্ছতি'—পরিণামে হবে সংসার প্রাপ্তি—বার বার এই জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে গতায়াত—একথা শাস্ত্র বলছেন।

এই প্রসঙ্গের উপসংহার করে বলছেন—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯॥

অন্বয় ঃ—তু (অধিকন্তু) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) বিজ্ঞান-সারথিঃ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত) মনঃপ্রগ্রহবান্ (যাঁর মন [ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসমূহের সংযমনকারী] বল্গাস্বরূপ) সঃ (তিনি) অধ্বনঃ পারম্ (এই জন্ম-মৃত্যুরূপ মার্গের পরপারে) বিষ্ণোঃ (সর্বব্যাপক চৈতন্যের) তৎ পরমম্ পদম্ (সেই শ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব) আপ্নোতি (লাভ করেন)।

যে বিজ্ঞানরূপ সারথিবিশিষ্ট অর্থাৎ যার বিবেকবুদ্ধি আছে, 'মনঃপ্রগ্রহবান্'—মনরূপ লাগাম যার আছে, ইন্দ্রিয়গুলিকে যে সংযত করেছে—'সঃ অধ্বনঃ পারমাপ্নোতি'—সে সেই পথের শেষে পৌঁছায়, প্রান্তে পৌঁছায়। প্রান্তটি কোথায়? 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—সেই বিষ্ণুর পরম পদ। বিষ্ণু বলতে সর্বব্যাপক যিনি, সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তাঁর যে পরম পদ, শ্রেষ্ঠ স্থান, তাই হলো সেই পথের প্রান্ত। অর্থাৎ আপেক্ষিক নয়—একেবারে সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ। পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ যে স্থান—সেখানে গেলে বৈচিত্র্য আর থাকে না, গতায়াত করতে হয় না, তাকেই বলছেন বিষ্ণুর পরম পদ।

আমরা আচমনের সময় বলি—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—সেই বিষ্ণুর পরম পদ, এখানেও সেই কথাই বলছেন। বিষ্ণুর পরম পদই হলো জীবের চরম লক্ষ্য—যেখানে পৌঁছলে সকল গতির পরিসমাপ্তি হবে। সেই পদপ্রাপ্তির উপায়গুলি বলা হলো এই যে—এদের পিছনে যে অন্তরাত্মা রয়েছেন, পরম পদকে সেই অন্তরাত্মারূপে বুঝতে হবে এবং সেই বোধেরই উৎপত্তির জন্য স্থূল থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সূক্ষ্মে যেতে হবে। সূক্ষ্ম মানেই কারণ। কার্য থেকে কারণ, তারপরে তার কারণ—এরকম করে করে পরম কারণ যিনি, তাঁর কাছে পৌঁছবার এই উপায় বলে দিলেন।

কথাটি বোঝাবার জন্য এখানে দুটি মন্ত্র বললেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥১০॥

অন্বয় ঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় থেকে) হি (নিশ্চয়ই) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ) পরাঃ (সূক্ষ্মতর, ব্যাপক ও আত্মভূত বলে শ্রেষ্ঠ)। অর্থেভ্যঃ চ (এবং বিষয়সমূহ থেকে) মনঃ (বিষয়সমূহের অববোধক সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন)

পরম্ (শ্রেষ্ঠ)। মনসঃ তু (মনের থেকেও) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। বুদ্ধেঃ (ব্যষ্টিবুদ্ধি অপেক্ষা) মহান্ আত্মা (সমষ্টিবুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব, যিনি অব্যক্তা প্রকৃতি থেকে প্রথম-জাত) পরঃ (সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বলে শ্রেষ্ঠ)।

সর্বাপেক্ষা স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মে নিয়ে যাবার জন্য বলছেন—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা অর্থাঃ'—ইন্দ্রিয়গুলি থেকে বিষয় হলো পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম। 'পর' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম ও কারণ অর্থে 'পর' শব্দের ব্যবহার আছে। এখানে বলা হলো—বিষয় ইন্দ্রিয়ের থেকে সূক্ষ্ম। এ কথাটি মানুষের মনে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে যে, আমরা তো ইন্দ্রিয়কেই সূক্ষ্ম জানি, বিষয়কে জানি স্থূল। এখানে বিষয় মানে স্থূলভূত নয়, সূক্ষ্মভূতের কথা বলা হচ্ছে—যা দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিও তৈরি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের স্থূলরূপকে এখানে বলা হচ্ছে না। কারণ, স্থূলভূত ইন্দ্রিয়ের চেয়ে সূক্ষ্ম নয়। এখানে যে ভূতের কথা বলা হচ্ছে তা ইন্দ্রিয়ের চেয়েও সূক্ষ্ম। সেগুলি ইন্দ্রিয়ের উপাদান, তাদের দিয়ে ইন্দ্রিয়েরা সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই ভূতকে ইন্দ্রিয় থেকেও পর, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম বলা হচ্ছে। 'অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ'—বিষয় অর্থাৎ এই সূক্ষ্মভূতগুলি থেকেও সূক্ষ্ম হলো মন। 'মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ'—আবার মন থেকেও সূক্ষ্ম হলো বুদ্ধি। 'বুদ্ধেঃ আত্মা মহান্ পরঃ'—বুদ্ধি থেকেও সূক্ষ্ম মহান আত্মা অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব। এখানে আত্মা শব্দটি বললেন এইজন্য যে, কারণ কার্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, আত্মার ব্যাপকত্ব সেখানে সার্থক হচ্ছে। আর এগুলি জীবের পরম্পরাক্রমে গৌণ আত্মাও বটে। সুতরাং বুদ্ধির থেকেও মহৎ-তত্ত্ব হচ্ছে সূক্ষ্ম, কারণ বুদ্ধিতত্ত্বেরও উপাদান সেই মহৎ-তত্ত্ব।

আরো এগিয়ে বলছেন—

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥১১॥

অন্বয় ঃ—মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ থেকে) অব্যক্তম্ (সর্বজগদ্‌বীজভূতা অব্যাকৃতা পরমা প্রকৃতি) পরম্ (শ্রেষ্ঠ)। অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত বা সর্বকার্যকারণীভূতা শক্তিতত্ত্ব থেকে) পুরুষঃ (নামরূপাত্মক নিখিল জগতের প্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা) পরঃ (সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বলে শ্রেষ্ঠ)। পুরুষাৎ (সেই পুরুষ অপেক্ষা) কিঞ্চিৎ পরম্ (অপর কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু) ন (নাই)। সা (ঐ পরমাত্মাই) কাষ্ঠা (সকল কার্যকারণের পরমসীমা) সা (তিনিই) পরা গতিঃ (পরম পদ)।

ক্রমশ আরো সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন—'মহতঃ পরমব্যক্তম্'—মহতের পিছনে রয়েছে অব্যক্ত, অনভিব্যক্তস্বরূপ অর্থাৎ যাতে এখনো অবধি কোন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়নি, যাকে এখনো অভিব্যক্ত করা

হয়নি। বলা বাহুল্য, এখানে চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত রূপকে বলা হচ্ছে কারণ। তারপরেই বলছেন—'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'—অব্যক্ত থেকেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন পুরুষ। এখন, জগতের ক্রমাভিব্যক্তি যদি আমরা কল্পনা করি, তাহলে এইভাবে দেখতে হবে—প্রথমে পুরুষ, পুরুষের থেকে অব্যক্ত, অব্যক্ত থেকে মহৎ-তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মন, মন থেকে বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি। এই হলো অবরোহণ-ক্রমে নেমে আসা।

সেই পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়। যখন সৃষ্টির ক্রম কল্পনা করি তখন জগৎকারণ পরমেশ্বরের ভিতর প্রথম যে বীজাকারে সৃষ্টি রয়েছে, যে বীজের তখনো অঙ্কুরোদ্‌গম হয়নি সেই অবস্থাকে অব্যক্ত অবস্থা বলি। সেই অব্যক্ত অবস্থা থেকে উৎপন্ন হলো মহৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ যে উপাদান থেকে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি হবে। অব্যক্ত আর মহৎ-তত্ত্বে পার্থক্য কেন করা হলো? না, মহৎ-তত্ত্ব হলো সেই অব্যক্তের ভিতর থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম, যা সৃষ্টির প্রথম অবস্থা মাত্র। তারপর সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে ক্রমশ বুদ্ধি, মন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়—সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, আরো স্থূল—এরকম করে করে সমস্ত সৃষ্টিকে বোঝানো হচ্ছে। এগুলি বোঝাবার তাৎপর্য হলো শেষ পর্যন্ত পুরুষে পৌঁছে দেওয়া। স্থূলের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাই এই পরিচিত বস্তু থেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুক্রমে এক ধাপ করে নিয়ে গিয়ে আমাদের সেই পরমতত্ত্বে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রুতি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

তারপর বলছেন, পুরুষের থেকেও শ্রেষ্ঠ কী? তার উত্তরে বলছেন—'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ'—পুরুষের থেকে পর, শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তিনিই হলেন অন্ত। 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'—তিনিই হলেন পরম লক্ষ্য, পরম গম্য। সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হতে হবে, তারপর আর কোন গন্তব্য নেই। কেন নেই? তার উত্তর—যখন সমস্ত বিশেষের অবসান হয় তখন কে আর কোথায় যাবে? কিসের সাহায্যেই বা যাবে? পুরুষে পৌঁছে দ্বৈতের অবসান। তখন নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রের জল মাপতে গিয়ে গলে যায় তেমনি জীবের আর পৃথক সত্তা থাকে না।

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।।'[১]

—যেমন শুদ্ধ জলবিন্দু শুদ্ধ জলরাশিতে নিক্ষিপ্ত হলে—'তাদৃগেব ভবতি'—তদ্রূপ হয়ে যায়, যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁদেরও এই অবস্থাই হয়। আর পৃথক সত্তা তাঁদের থাকে না। সুতরাং এখানেই গন্তব্য পথের শেষ, চলার অবসান।

এটাকে যে—'পরা গতিঃ'—চরম goal, লক্ষ্য বলা হলো তার কারণ কী? আর চলার সামর্থ্য বা ইচ্ছা নেই বলেই কি? তার উত্তরে বলছেন—ইচ্ছাও থাকে না সত্য, আবার সামর্থ্যও থাকে না। কারণ যেখানে আমি ছাড়া আর

---

১. কঠোপনিষদ্—২/১/১৫

কিছু নেই, সেখানে আর কোথায় যাবে, কে যাবে, আর কী উপায়েই ব যাবে? সুতরাং, সেখানে আর কিছু করণীয় থাকে না।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥১২॥

অন্বয় ঃ—এষঃ (পূর্বনির্দিষ্ট এই) আত্মা (শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ) সর্বেষু ভূতেষু (আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে) গূঢ়ঃ (অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অবস্থিত) [সেইজন্য] ন প্রকাশতে (সকলের কাছে স্বরূপে প্রকাশিত হন না) তু (পরন্তু) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মতম বস্তুর অবধারণায় নিপুণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্ম-তত্ত্ব গ্রহণযোগ্যা) অগ্র্যয়া (তীক্ষ্ণ ও একাগ্র) বুদ্ধ্যা (নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিদ্বারা) দৃশ্যতে (উপলব্ধ হন)।

এই যে পুরুষ, পূর্ব মন্ত্রে যাঁর কথা বলা হলো, ইনিই আত্মা। পুরুষ শব্দের দ্বারা বোঝায় 'পূর্ণম্ অনেন সর্বম্'[১]—যাঁর দ্বারা সব কিছু পূর্ণ হয়ে আছে। অথবা 'পুরুষঃ পুরিষাদঃ পুরিশয়ঃ পূরয়তের্বা'[২]—যিনি এই দেহরূপ পুরে বা জগৎরূপ পুরে অবস্থান করছেন অথচ যিনি জগৎ থেকে ভিন্ন, যিনি জগতের আদি কারণ। তিনি সকলের ব্যক্তিত্বের ভিতরে ওতপ্রোত, সর্বব্যাপক ও সর্বানুস্যূত তিনিই আত্মা। আত্মা শব্দের এখানে দুটি তাৎপর্য—একটি হচ্ছে প্রত্যক্‌ত্ব অর্থাৎ তিনি অন্তরে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে পরাক্‌ত্ব, তিনি বাইরেও ; তিনি সর্বত্র। যে পুরুষের বর্ণনা করা হলো তিনি আর ব্যক্তি অর্থাৎ সাধক যদি ভিন্ন হন তাহলে সেই পুরুষকে জেনে সাধকের লাভ কি? কাজেই বলছেন, আত্মা সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান হলেও তিনি আমাদের থেকে ভিন্ন নন, দূরে নন বা বাহ্য বস্তু নন। তিনিই আমার স্বরূপ। এখন, আমি যদি আমার স্বরূপ বলে তাঁকে বুঝতে পারি তাহলেই আমার পরম সার্থকতা লাভ, কারণ তাহলেই আমি বুঝতে পারব আমি সেই পরমেশ্বর, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, আমিই সেই পরা কাষ্ঠা, পরা গতি, আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর, সূক্ষ্মতর কিছু নেই। সুতরাং আমার আর গন্তব্য, প্রাপ্তব্য কিছু নেই। অতএব আমার করণীয়ও কিছু নেই।

এই যে পরম তত্ত্ব, তিনি আমার আত্মা হলেও তাঁকে আমরা জানি না, বুঝি না, তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই। যে আমি ভিতরে বাইরে সর্বত্র ওতপ্রোত, পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি সেই মৎস্বরূপকেই আমি জানি না—একথা নির্বোধের কাছেও হাস্যকর বোধ হয়। তাহলেও, এ কথা যে সত্য তা অস্বীকার করি কী করে? 'এষ সর্বেষু ভূতেষু'—এই আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত হলেও—'গূঢ়ঃ'—অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায়—'ন প্রকাশতে'—প্রকাশ পাচ্ছেন না। তাহলে তিনি যে আছেন তার

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/১/১২
২. নিরুক্তম্—২/১/৪

প্রমাণ কী? তাঁর প্রকাশ নেই তবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাঁকে আছেন বলতে হবে? উত্তরে বলছেন, তিনি সকলের কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন না বটে কিন্তু—'দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া'—তীক্ষ্ণ, একাগ্র যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির দ্বারা তিনি পরিদৃশ্যমান হন। 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'—সূক্ষ্মতম বস্তু অবধারণ করতে নিপুণ আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের কাছে ইনি 'দৃশ্যতে'—সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন।

একাগ্রবুদ্ধি কথাটি আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার। বুদ্ধির কোন বিশেষ অবয়ব নেই। তাকে অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়—ক্ষুরধার বুদ্ধি। এগুলি উপমা মাত্র। এর তাৎপর্য হচ্ছে বুদ্ধি সমগ্রভাবে একটি বিষয়ে কেন্দ্রিত হতে পারে। তাকে অগ্র্যাবুদ্ধি বলেছেন। সেই বুদ্ধি কিরকম হবে? না, সূক্ষ্ম। বুদ্ধির স্থূলতা, সূক্ষ্মতা নির্ভর করে বিষয়কে ধারণা করবার শক্তির উপরে। বুদ্ধিকে কেউ দেখে না, তা অনুমানগম্য। বলা বাহুল্য, আমাদের কোন ইন্দ্রিয়কে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। এজন্য সেগুলি কার্যের দ্বারা অনুমেয়। যে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছে—তাকে বলি দর্শনেন্দ্রিয়, যা দিয়ে শুনছি—তাকে বলি শ্রবণেন্দ্রিয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার কাজের দ্বারা অনুমিত হয়। তেমনি যার দ্বারা বোধ হয়—তাকে বুদ্ধি বলি। তাকে না দেখলেও তার কাজ থেকে তাকে অনুমান করি। আর সেই বুদ্ধির ভিতরেও যে তারতম্য করি তাও তার নিজের স্থূলতা, সূক্ষ্মতার জন্য নয়। কিরকম বিষয় ধারণা করতে সমর্থ তার দ্বারা নির্ণীত হবে বুদ্ধি স্থূল না সূক্ষ্ম। এইজন্য আত্মবস্তুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সকলে আত্মবস্তু ধারণা করতে পারে না। যাঁরা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা পারেন। কী করে পারেন? অগ্র্যা অর্থাৎ সূক্ষ্ম, একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আত্মাকে বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া বুঝবার উপায় নেই। জগতের সবকিছুই আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, আত্মাকেও তারই সাহায্যে বুঝতে হবে। এখন, বুদ্ধি যদি আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে তাহলে তো আত্মা স্বপ্রকাশ হলেন না, বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হলেন। অথচ শাস্ত্রও তাঁকে স্বপ্রকাশ বলেছেন। বলা হয়েছে—'যন্মনসা ন মনুতে'[১]—মনের দ্বারা যাঁকে মনন করা যায় না। মন মানে অন্তঃকরণ, বুদ্ধি যার একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র। সুতরাং এখানে আত্মা সূক্ষ্মবুদ্ধির গোচর হন বললে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শাস্ত্র যেন নিজেই নিজের বক্তব্যবিরোধী কথা বলছেন। বস্তুতপক্ষে এখানে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কী—তা সূক্ষ্মকৌশলে ভাষ্যকাররা বুঝিয়েছেন। আমরা যখন বলি—আত্মাকে জানা যায় তখন মন ছাড়া আর কোন যন্ত্র নেই—যার দ্বারা জ্ঞান হতে পারে। ঘটপটাদিকে জানতে হলে যেমন মনের প্রয়োগ হয় সেইরকম আত্মাকে জানতে হলেও মনকেই আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সাধারণ বস্তুকে জানা আর আত্মাকে জানার প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

---

১. কেনোপনিষদ্ —১/৬

কেন হয়? না, জড় বস্তুকে জানতে হলে তাকে চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত করে জানতে হয়। কিন্তু চেতন বস্তুকে জানতে হলে তাকে আর চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত করতে হয় না। সূর্যকে দেখাতে হলে প্রদীপ জ্বেলে দেখাতে হয় না কারণ তিনি স্বপ্রকাশ। তেমনি স্বপ্রকাশ আত্মাকেও বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করতে হয় না। কিন্তু বুদ্ধি যখন বিষয়ের মতো আত্মাকেও প্রকাশ করতে যায় তখন আত্মচৈতন্যের প্রকাশে অভিভূত হয়ে যায়। কাজেই সে আর আত্মাকে ঐভাবে প্রকাশ করে না, যদিও প্রক্রিয়াটা সাধারণ প্রকাশের অনুরূপ হয়। অর্থাৎ কোন একটি বস্তুকে জানতে হলে অন্তঃকরণ তদ্‌বস্তুর আকারে আকারিত হয়। অন্তঃকরণের তদাকারকে বলি বৃত্তি। যেমন ঘটের আকারে অন্তঃকরণকে বলা হয় অন্তঃকরণের ঘটাকারা বৃত্তি। আকার মানে এখানে বুঝতে হবে স্থূল আকার নয়। অন্তঃকরণ সূক্ষ্মবস্তু, সে কখনো স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে না। ঘটাকার অন্তঃকরণ যখন বলছি তখন অন্তঃকরণটি একটি ঘটের মতো আকার নেয়—একথা বললে একেবারে হাস্যকর ব্যাপার হবে। আর যদি কেউ এরকম স্থূল অর্থে আকার বোঝেও তাকেই প্রশ্ন করা হবে—সুখাকার বৃত্তি বলতে তাহলে সে কী বোঝে? সুখের তো কোন আকার নেই। যখন সুখকে অনুভব করি তখন অন্তঃকরণের সুখাকার বৃত্তি হয়, দুঃখ অনুভব করবার সময় অন্তঃকরণের দুঃখাকার বৃত্তি হয়। তাহলে আকার মানে রূপ বোঝাচ্ছে না। আকার মানে স্বরূপ—যার দ্বারা কোন একটি অনুভবকে অন্য অনুভব থেকে পৃথক করা যায়। এই পৃথককরণের সামর্থ্য বা বিশেষ গুণকেই বলা হলো আকার। বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' বলে একটি পদার্থ স্বীকার করা হয় যার কাজ হলো এরূপ পৃথককরণ। ইদম্ অস্মাৎ পৃথক্ ইতি বুদ্ধির্যস্মাৎ জায়তে স বিশেষঃ—যার থেকে এই বুদ্ধি হয় যে একটি বস্তু আর একটি থেকে পৃথক। এখানে আকারের সেই একই কাজ। সুখাকার বৃত্তি মানে মনের সুখের মতো গঠন নয় কিন্তু মনের এমন অবস্থা যাতে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে সুখকে বুঝতে পারছি। এইভাবে প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে বোঝা যায়। জড়বস্তুই হোক বা সূক্ষ্মবস্তুই হোক বা মনের ভিতরে প্রতিভাত বিশেষভাব হোক, সবগুলির সম্বন্ধেই আকার শব্দটি প্রযুক্ত হতে পারে। আত্মা, যাঁকে পুরুষ বলছি, তাঁকেও জানবার সময় তদাকারা একটি বৃত্তি হয়। ঘটজ্ঞানের বেলা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ হয়। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘটাকারে আকারিত হয়। ঘটবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হলো ঘটজ্ঞানের দ্বারা আর ঘটের প্রকাশ হলো আভাসচৈতন্যের দ্বারা—'তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ'[১]। আভাসচৈতন্য কাকে বলে? অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্যের দ্বারা অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত তাকে বলা হয় আভাসচৈতন্য। আভাস কেন? না, সর্বব্যাপী প্রকাশের সর্বব্যাপিত্বের ধারণা করতে না পেরে

১. পঞ্চদশী—৭/৯১

যখন অন্তঃকরণে পরিচ্ছিন্নরূপে তার ধারণা করি তখন তার ভাস অর্থাৎ প্রকাশ যেমন খণ্ডিত, সীমিত হয়—এইজন্য তাকে আভাস বলে, কখনো চিদাভাসও বলে। 'চিদাভাস' শব্দের অর্থ 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্যের যে আভাস অর্থাৎ সীমিত প্রকাশ।

ব্রহ্মকে যখন এইভাবে জ্ঞানের বিষয় করতে যাই তখন আমাদের কাজ ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ করে দেওয়া। তারপর আর ব্রহ্মকে প্রকাশ করার দরকার হয় না। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন। এইরকমভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়াটি বোঝানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এখানে বলা হলো সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্মমন, সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা আত্মা জ্ঞেয় হন মানে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দূর হয়। অজ্ঞান দূর হলেই স্বপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হয়ে পড়েন। কাজেই উপনিষদ্ যখন বলছেন, 'যন্মনসা ন মনুতে'[১]—মন যাঁকে মনন করতে পারে না, বুদ্ধি যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, তখন বুঝতে হবে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বস্তুর প্রকাশের উপর কখনোই নির্ভরশীল নয়। বরং মন-বুদ্ধির প্রকাশ ব্রহ্মের উপরই নির্ভর করে। আবার যখন তাঁকে মন-বুদ্ধি দ্বারা গম্য বলা হচ্ছে—'মনসৈবেদম্ আপ্তব্যং'[২], কিংবা—'দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা'—সেখানে বুঝতে হবে এই বুদ্ধির দ্বারাই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন প্রতিবন্ধক না থাকার জন্য নিত্যপ্রকাশমান আত্মাই প্রকাশিত থাকবেন। তাঁকে নতুন করে প্রকাশ করতে হবে না।

এখানে বলা হলো সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তিনি অনুভবগম্য হন। কারা অনুভব করেন? সূক্ষ্মদর্শিগণ সাধনার বলে সূক্ষ্মবস্তু দেখবার সামর্থ্য অর্জন করেন। আত্মা গোপন, প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন বলে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে অর্থাৎ অনুভব করতে পারে না—একথা সত্য হলেও কেউ অনুভব করতে পারেন না—একথা বলা চলে না। বুদ্ধির নির্মলতার ফলে তাঁরা আত্মবস্তুকে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করেন। দার্শনিকগণের পরিভাষায় প্রত্যক্ষ না বলে বলা হয় অপরোক্ষ অনুভব। প্রত্যক্ষ শব্দের যৌগিক অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হন না বলে দার্শনিকগণকে 'অপরোক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। যাকে আমি সাক্ষাৎ দেখি না তাকে বলি পরোক্ষ। যেমন লণ্ডন বলে একটি জায়গা আছে যা শোনা কথা। শোনা কথা থেকে সে-সম্বন্ধে জ্ঞান হলে তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান কখনো পরোক্ষ হতে পারে না। আবার এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, তাই বলা হলো এ জ্ঞান অপরোক্ষ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে—আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হয় না বলা হলো। বুদ্ধি সূক্ষ্ম না হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্র থেকে জানা যায়—আত্মা সর্বব্যাপী—'অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্' অগোত্রম অবর্ণম্'[৩]। তার দ্বারা যে জ্ঞান হয় সে কী জ্ঞান? এর উত্তর হলো এই

১. কেনোপনিষদ্—১/৬; ২. কঠোপনিষদ্—২/১/১১; ৩. মুণ্ডক—১/১/৬

যে—প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারা মানুষ সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সে জীবন্মুক্ত হয়। জীবন্মুক্তিই প্রকৃত আত্মজ্ঞানের ফল। কিন্তু শাস্ত্র থেকে আত্মা সম্বন্ধে জেনেও আমাদের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হচ্ছে না, আমরা মুক্ত হচ্ছি না। কাজেই শাস্ত্র থেকে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান হচ্ছে তা প্রকৃত আত্মজ্ঞান নয়। তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলতে আমরা বাধ্য।

বলা হলো—অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কেউ কেউ আত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারেন। পূর্বে বলা হয়েছে—বুদ্ধি যে-বিষয়কে ধারণা করতে সক্ষম সেই বিষয়ের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা অনুযায়ী আমরা সাধারণত বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার নিরূপণ করে থাকি। অনেক সময় দেখা যায় লৌকিক বিষয়ে একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারে। আমরা বলি এরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু আবার অনেক সময়ে এক বিষয়ে বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখা গেলেও অন্য বিষয়ে তেমন সূক্ষ্মতা দেখা যায় না। কারণ, সকলে সব বিষয়ের অনুশীলন করেন না বা সব বিষয়ে সকলের রুচি থাকে না। খুব নামী চিকিৎসক তার বিষয়টি খুব ভাল জানেন কিন্তু তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিষয়ে কিছু বোঝেন না। আবার ইঞ্জিনীয়ারিং-এ যিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি তিনি ডাক্তারি বিষয়ে কিছু না-ও বুঝতে পারেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধির অর্থ ভিন্ন। এখানে সূক্ষ্মবুদ্ধি হলো শুদ্ধবুদ্ধি—যে বুদ্ধি রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত!'[১] তাঁর ওসব বিষয়ে মন দেবার ইচ্ছা নেই। যাঁদের মন-প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত তাঁরা সূক্ষ্মতত্ত্ব থেকে মনকে নামিয়ে নিয়ে এসে অন্য বস্তুতে দিতে ইচ্ছা করেন না। এইজন্য অন্য বিষয় তাঁরা বুঝতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে আমরা জানি—তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। এমনকি অনেক জাগতিক বিষয়েও তিনি জানতে চাইতেন। তিনি সার্কাস দেখতে গিয়েছেন, এশিয়াটিক 'সুসাইটি'-তে গিয়ে সব দেখে এসেছেন। আরো অনেক বিষয়ে তাঁর বালকের মতো কৌতূহল ছিল। একদিন একজন ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছে, খালি চোখে যা দেখা যায় না এমন সব ছোট ছোট জিনিস যন্ত্রের সাহায্যে কী করে দেখা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমায় দেখাতে পার?' ভদ্রলোক তাঁর জন্য একটি মাইক্রোস্কোপ নিয়ে এসে set করলেন। বললেন, মশাই এবার দেখুন। তিনি বললেন, 'মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই এখন তাকে নামিয়ে নিচের দিকে দেখতে পারচি না।'[২] মনকে তখন তিনি কিছুতেই তার ঊর্ধ্বগতি থেকে

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, উদ্বোধন, কলকাতা, সংস্করণ (১৩৯৩), পৃঃ ১৪৮

নামিয়ে এনে এই জাগতিক বস্তুটি, তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক, তাকে দেখবার জন্য আনতে পারছেন না। এর দ্বারা আর একটু স্পষ্ট হবে সূক্ষ্ম আর স্থূলের তফাতটা কোন্‌খানে। যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট সূক্ষ্মবস্তু স্থূলবস্তুরই ভগ্নাংশ। কিন্তু আত্মাকে যেখানে সূক্ষ্মবস্তু বলা হচ্ছে তা স্থূলবস্তুর ভগ্নাংশ নয়। স্থূল মানে তার উপাদান স্থূল আর সূক্ষ্ম মানে তার উপাদানই সূক্ষ্ম। কাজেই আত্মার সূক্ষ্মতার সঙ্গে জড়ের সূক্ষ্মতার কোন তুলনাই হতে পারে না। যদি বলা হয়—সূক্ষ্মতম আত্মা থেকে তো এই স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়েছে। আত্মা থেকে আকাশাদি পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত থেকে জগতের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। তাহলে সূক্ষ্ম উপাদান থেকেই তো স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়েছে, এ কী করে ব্যাখ্যা করা যাবে? এর উত্তর হলো এই যে—বেদান্তের দৃষ্টিতে স্থূল হওয়া মানে অন্যরকম ব্যাপার। আরম্ভ করতে হবে এই জগৎ থেকে। ধরা যাক জগৎ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। তাকে বিচার করে করে তার কারণে পৌঁছাই। যা শেষ অবস্থা, যার থেকে জগতের উৎপত্তি, তা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অগোচর। তাকে বলা হচ্ছে সূক্ষ্ম। যদি তাকে magnify করে, বহুগুণ করে দেখবার চেষ্টা করি তবু সূক্ষ্মবস্তু কখনো স্থূল হয় না। যতই শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করি, যতক্ষণ কোন বস্তু তার সীমার ভিতরে, ততক্ষণ বুঝতে হবে তা স্থূলবস্তু, লৌকিক দৃষ্টিতে তা যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধির যে microscopic power রয়েছে—এই অর্থে বলা হচ্ছে না, কিন্তু তার এমন শক্তি আছে যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত, অগোচর বস্তুতেও সে কেন্দ্রিত হতে পারে। শাস্ত্রে মনের এইরকম সূক্ষ্মতা আর শুদ্ধি সমার্থক। রাগদ্বেষাদি থেকে মুক্ত মনকে বলা হয়েছে শুদ্ধ মন, সেই মনই কেবল আত্মবস্তুকে ধারণ করতে পারে। রাগদ্বেষাদি দ্বারা চঞ্চল মন আত্মবস্তুতে স্থির হতে পারে না, একথা এখানে বোঝানো হয়েছে।

স্থূল-সূক্ষ্মের এই পার্থক্যটুকু আমাদের যেন বিশেষ করে মনে থাকে, নাহলে ভুল করব। আমরা মনের অনুশীলন করে তার তীক্ষ্ণতা বাড়াতে পারি, আরো বেশি সূক্ষ্ম অর্থাৎ বস্তুর অভ্যন্তরে বেশি করে প্রবেশ করবার সামর্থ্য বাড়িয়ে দিতে পারি। এমনি করে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুশীলন করতে পারি। এ মনের একরকম সামর্থ্য। মনের শুদ্ধি হলো অন্য দিকের কথা। মন শুদ্ধ করতে হলে তাকে রাগদ্বেষাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। জাগতিক বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করতে গেলে মনকে রাগদ্বেষ হতে মুক্ত না করলেও চলে কিন্তু আত্মজ্ঞানের পক্ষে রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত শুদ্ধ মনই একমাত্র অবলম্বন। গীতায় আছে—

'রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।'[১]

---

১. গীতা—২/৬৪

—যিনি নিজ মনের প্রভু—তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ থেকে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অর্থাৎ চিত্তের সাম্যভাব রক্ষা করেন। অতএব রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত শুদ্ধ, একাগ্র বুদ্ধিকেই বর্তমান মন্ত্রে 'অগ্র্যা বুদ্ধি' বলা হয়েছে। এইরূপ শুদ্ধবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই সূক্ষ্মদর্শী. তাঁরাই আত্মজ্ঞান লাভ করার অধিকারী। বুদ্ধি শুদ্ধ, একাগ্র না হলে এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের ধারণা কখনো সম্ভব নয়। এইজন্য কী প্রকারে বুদ্ধিকে একাগ্র করতে হবে এখানে যমরাজ সেই উপদেশ করছেন।

যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—প্রাজ্ঞ (বিবেকী ব্যক্তি) (বাক্ ইত্যাদি সর্বেন্দ্রিয়কে) মনসি (মনে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করবেন)। তৎ (সেই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপ) আত্মনি (নিশ্চয়াত্মিকা, ব্যষ্টি বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (বিলুপ্ত করবেন)। জ্ঞানম্ (ব্যষ্টি বুদ্ধিকে) মহতি আত্মনি (সমষ্টিবুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভ তত্ত্বে) যচ্ছেৎ (নিবিষ্ট করবেন)। তৎ (সেই সমষ্টিবুদ্ধি তত্ত্বকে শান্তে (সর্ববিকাররহিত) আত্মনি (পরমাত্মায়) যচ্ছেৎ (বিলীন করবেন)।

প্রথমে বললেন, 'প্রাজ্ঞঃ বাক্ মনসি যচ্ছেৎ'—আত্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে নিরুদ্ধ করবেন। 'যচ্ছেৎ' বলতে—সংগৃহীত বা নিরুদ্ধ করা বোঝাচ্ছে। ভাষ্যকার বলছেন—বাগিন্দ্রিয় এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যকে মনে নিরুদ্ধ করার কথা কেন বললেন? কারণ, বাক্য মনেরই স্থূল অভিব্যক্তি। তারপর—'তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি'—সেই মনকে আবার জ্ঞানরূপ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করতে হবে। 'জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি'—বুদ্ধিকে আবার মহৎতত্ত্বে লয় করতে হবে কারণ, তার থেকেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়েছে। 'তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি'—মহৎতত্ত্বকে আবার শান্ত আত্মাতে লয় করতে হবে। অতএব সমগ্র মন্ত্রটির তাৎপর্য হলো—কার্যকে কারণে লয় করতে হবে, যেখান থেকে যে এসেছে অনুলোম প্রক্রিয়ায় তাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এইভাবে বাক্য থেকে ক্রমশ স্থূল, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমে পৌঁছাতে হবে। গতি ফিরিয়ে, মোড় ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ আত্মাতে পৌঁছানো যাবে। যদিও বাক্যের পরবর্তী স্থূলরূপ হলো এই জড়জগৎ, তথাপি এখানে বাক্য থেকে শুরু করা হচ্ছে। মনের তুলনায় বাক্য স্থূল। বাক্যের সূক্ষ্ম উপাদান বা কারণ হলো মন। তাই বললেন—বাক্যকে মনে লয় করা, মনকে জ্ঞানে লয় করা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আত্মা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে কারণ, বাক্য মন প্রভৃতির পিছনে পরম্পরাক্রমে যে তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে—তা-ই হলো আত্মা। বাক্যের অন্তর্নিহিত হলো মন, মনের অন্তর্নিহিত হলো বুদ্ধি, বুদ্ধির অন্তর্নিহিত মহৎতত্ত্ব, আর মহৎতত্ত্বের অন্তর্নিহিত হচ্ছেন আত্মা। এইজন্য আত্মাকে

অন্তরতম বলা হয়েছে। একের পর এক, ক্রমে ক্রমে অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মে প্রবেশ করছে। অবশেষে, শান্ত আত্মাতে গিয়ে নিরুদ্ধ হয়েছে। শান্ত মানে সর্ব বিশেষ যেখানে অস্তমিত অর্থাৎ দূরীভূত হয়ে গিয়েছে—'সর্ববিশেষ প্রত্যস্তমিত'[১]। এই অবস্থাকেই 'পুরুষ' বলা হয়েছে। এই পুরুষে গিয়ে তবে প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হলো। অর্থাৎ কার্য থেকে কারণ, কারণ থেকে তার কারণ, এইভাবে পুরুষে বা পরম কারণে পৌঁছান। এর আগেও যেমন বলা হয়েছে—

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।'[২]

যদিও এখানে অব্যক্ত শব্দটির উল্লেখ করেননি, তাহলেও বুঝতে হবে তাকে এখানে বলা হয়েছে। তারপরে—'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'[৩] অব্যক্ত থেকেও শ্রেষ্ঠ, প্রত্যক্ হলেন সূক্ষ্ম পুরুষ। পুরুষের পর কী আছে? 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ'[৪]—তারপর আর কিছু নেই। 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'[৫]—তিনিই হচ্ছেন শেষ কথা, চরম তত্ত্ব। তিনিই মানুষের পরম গন্তব্যস্থল, পরম আশ্রয়। এখানেও সেই ধারাটির পুনরাবৃত্তি করে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্রমে পরমতত্ত্বে পর্যবসানের প্রক্রিয়াটি বললেন।

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রযত্ন করবার জন্য শ্রুতি উপদেশ করছেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—[হে মুমুক্ষুগণ] উত্তিষ্ঠত (ওঠ, ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য প্রযত্ন কর)। জাগ্রত (মোহনিদ্রা থেকে জাগরিত হও)। বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের কাছে) প্রাপ্য (উপস্থিত হয়ে) নিবোধত (সম্যক জ্ঞান লাভ কর)। ক্ষুরস্য (ক্ষৌরকারের ক্ষুরের) নিশিতা (শাণিত, তীক্ষ্ণ) ধারা (অগ্রভাগ) [যেমন] দুরত্যয়া (দুরতিক্রমণীয়া) [সেইরকম] তৎ পথঃ (সেই আত্মজ্ঞানরূপ মার্গ) দুর্গম্ (অতিক্রম করা অতিশয় দুষ্কর) [এই কথা] কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিগণ) বদন্তি (বলেন)।

এটি উপনিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। অবিদ্যায় প্রসুপ্ত প্রাণিগণকে শ্রুতি বলছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—ওঠ, জাগো। ওঠ অর্থাৎ এরকম মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকো না। আত্মার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে জাগ্রত, সচেতন হও। 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে গমন করে পরম তত্ত্বকে অবগত হও। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'—জেনো, পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, অত্যন্ত দুর্গম। দুর্গমতাকে উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। কেমন দুর্গম? না, যেমন শাণিত

---

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—১/৩/১৩ ; ২. কঠোপনিষদ্—১/৩/১০ ;
৩. তদেব—১/৩/১১ ; ৪. তদেব—১/৩/১১ ; ৫. তদেব

ক্ষুরের অগ্রভাগ। ধারাল ক্ষুরের উপর দিয়ে যেমন পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না তেমনি এ পথে যাওয়াও সহজ নয়। পথ চলতে চলতে পা রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হবে, অশেষ আয়াস করে এ পথে যেতে হবে। কারা একথা বলেন? 'কবয়ঃ'—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ, এই পথে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা তাঁদের সকলের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

শাস্ত্র বলছেন—আত্মবিষয়ে অন্বেষণ করতে হলে বীর হৃদয়ের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অল্পেই ভীত হয়, সেই কাপুরুষের জন্য এ পথ নয়। শাস্ত্র তাই আত্মজ্ঞানলাভের পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলছেন—এ পথের জন্য মোহনিদ্রা ছেড়ে জাগ্রত হবার অর্থ হলো—সকল দুঃখ বরণ করার, সম্ভাব্য সকল বিপদ স্বীকার করার অঙ্গীকার করা। কথাটি নির্মম, সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পথে যে চলবে তাকে নির্ভীক হয়ে বুকে বল নিয়ে চলতে হবে। সাধারণ মানুষের যা দুর্বলতা তাকে নিঃশেষে ত্যাগ করে এই পথে পা বাড়াতে হয়, এই কথা শাস্ত্র বলছেন।

আর যদি না চলতে চাও তাহলে ঘুমিয়ে থাকতে পার। কিন্তু ঘুমিয়েই বা থাকবে কোথায়? আর ঘুমিয়ে থেকে তোমার লাভ কী হবে? জগতে তুমি তো নিরাশ্রয়, পান্থশালায় আছ। পথ চলা অনেক বাকি, কাজেই যেতে তোমাকে হবেই। কবি যেমন বলছেন,

'যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।'[১]

সকল পথ বাকি আছে এবং সেখানে পৌঁছে তবেই বিশ্রাম, তার আগে নয়। মানুষের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা, তিনি তার হৃদয়ে গভীর বেদনা দিয়ে রেখেছেন চরম লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত যার নিবৃত্তি নেই। অথচ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে মানুষ নিশ্চেষ্ট, অবসন্ন, কোথায় যেতে হবে সে বিষয়ে তার কোন ধারণা নেই। একেই শাস্ত্র বলেছেন—প্রমাদ। প্রমাদ মানে কর্তব্য ভুলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা। লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য কোনরকম ব্যাকুলতা অনুভব না করা। নিজের সম্বন্ধে অনবধানবশত জীব মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'আমি' কে একথা সে জানে না, বিচার করে না। তার শুদ্ধ-স্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে সে ঘুমিয়ে আছে। এরই নাম মোহনিদ্রা।

---

১. গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৩, গান নং ২৪, পৃঃ ৪১

শ্রুতি মানুষের প্রমাদ ও মোহনিদ্রা ভঙ্গ করতে চাইছেন—উত্তিষ্ঠত ও জাগ্রত—এই কথা দুটি দিয়ে। উত্তিষ্ঠত মানে ওঠ, চেষ্টা আরম্ভ কর, পুরুষকার প্রয়োগ কর। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বীর্য সহকারে তোমার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত কর। তারপরে মোহনিদ্রা থেকে জেগে ওঠ আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য। 'জেগে ওঠ' কথাটিকে স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন যে, একবার যদি জাগো তাহলে তোমার ভিতরে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে—সেই শক্তির সন্ধান পাবে। নিজেকে দুর্বল, হীন, অনিত্য, পাপময়—এইরকম মনে করছ। এটা দুঃস্বপ্ন—a nightmare—এই দুঃস্বপ্নকে ভেঙে সিংহবিক্রমে তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। তাঁর বলার ভিতরে শ্রুতির প্রেরণা রয়েছে। খুব জোর দিয়ে মনকে জাগাতে হয়, বলতে হয়—হে মন, তুমি ঘুমিয়ে থেকো না, তুমি জাগো। লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সর্বপ্রকারে প্রযত্ন কর।

বীর্যসহকারে জেগে উঠে কী উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভের পথে এগোতে হবে সে বিষয়ে শ্রুতি বলছেন—'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। বর—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আচার্যদের লাভ করে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—কথাটির একটু পরিবর্তন করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—Arise, awake, and stop not till the desired end is reached.[১]—ওঠ, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছাও ততক্ষণ থেমে থেকো না। অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌঁছাতে দীর্ঘ ও অনলস শ্রমের প্রয়োজন, সে পরিশ্রম করতে তুমি যেন কুণ্ঠিত হয়ো না, হতাশ হয়ো না। পথ যে দুর্গম, তা পূর্বাচার্যগণের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রুতিই জানিয়ে দিচ্ছেন—'ক্ষুরস্য ধারা'—ইত্যাদি বলে। পথটি অত্যন্ত কঠিন বলেই জেনে শুনে পথ চলতে হবে, চোখ বুজে নয়। কোন একটা লোভের বশবর্তী হয়ে বা ভাবালু হয়ে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলা যাবে না। জেগে উঠে পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জেনে নিয়ে বীর হৃদয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পথ যে অতি দুর্গম তা যারা এই পথে চলবার জন্য ঈষন্মাত্র প্রয়াস করেছে তাদের প্রত্যেকের জীবনে মর্মে মর্মে অনুভূত হয়েছে। শাস্ত্র বলছেন—পথ একে তো ক্ষুরের ধার, তার উপর তাকে তীক্ষ্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এইরকম ক্ষুরের উপর দিয়ে চলতে গেলে পা যেমন ক্ষতবিক্ষত হয় তেমনি এই আত্মদর্শনের পথে চলতে হলে শুধু পা নয়, সমগ্র হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হবে। কারণ, এ পথে চলতে গেলে দেখা যায় মনকে যতই সূক্ষ্মে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, ততই সে স্থূল বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে। একাধিক প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তু, যা সহস্র বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করে রেখেছে, তাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে হবে—নির্মমভাবে। এইভাবে ছিন্ন করতে গিয়ে অন্তরের কত

---

১. The Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 13th reprint (1984), Vol. III, p. 318

সূক্ষ্ম তন্ত্রী যে কাটা পড়বে, তার ঠিক নেই। তার জন্য অবসন্ন, ভীত হলে চলবে না। সাহসের সঙ্গে সমস্ত বিপদকে স্বীকার করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এর ভিতরে প্রয়োজনীয় কথা হলো, চলতে আমাদের হবেই, কারণ না চলে থেমে থাকার উপায় নেই। কাজেই চলতে গেলে সে পথের যাবতীয় দুঃসহ দুঃখকে বরণ করে নিতেও হবে। পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর বলে ভীত ও অবসন্ন হলে চলবে না। এগিয়ে যেতেই হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সিংহনাদে বলেছেন—ওঠ জাগো, ভয় নেই। শ্রুতি এই শব্দ দিয়ে ঘুমন্ত জগৎকে জাগিয়ে দিচ্ছেন।

মনে সংশয় আসবে—পথে কি চলতে পারব? কত দুঃখ, কষ্ট, ভয়ের কারণ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ ছাড়া কল্যাণের পথ আর নেই—সুতরাং চলতে আমাদের হবেই। আর চলতে যখন হবেই তখন শ্রুতি বলছেন—উপযুক্ত আচার্যের কাছে নির্দেশ নিয়ে বীর হৃদয়ে এ দুর্গম পথে যাত্রা করাই কর্তব্য।

পূর্ববর্তী মন্ত্রে বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ অতি দুর্গম, অতএব উপযুক্ত গুরুর নিকট পথের নির্দেশ নিয়ে ঐকান্তিক দৃঢ়তা সহকারে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্বের স্বরূপের আভাস দেওয়া হচ্ছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—যৎ (যিনি) অশব্দম্ (শব্দগুণরহিত) অস্পর্শম্ (স্পর্শবিহীন) অরূপম্ (রূপহীন) তথা (সেই প্রকার) অরসম্ (রসগুণশূন্য) চ (এবং) অগন্ধবৎ (গন্ধগুণবিবর্জিত) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) নিত্যম্ (অবিনাশী) অনাদি (উৎপত্তিরহিত বা কারণরহিত) অনন্তম্ (অন্তরহিত বা কার্যহীন) মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ বা বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্ব থেকে) পরম্ (বিলক্ষণ) ধ্রুবম্ (শাশ্বত) তৎ (সেই কূটস্থ ব্রহ্মকে) নিচায্য (নিশ্চিতরূপে অবগত হয়ে) [মুমুক্ষু ব্যক্তিরা] মৃত্যুমুখাৎ (জন্মমরণরূপ প্রবাহ থেকে) প্রমুচ্যতে (সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন)।

'যৎ'—যিনি অর্থাৎ সেই আত্মা, 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অরসম্, অগন্ধবৎ চ'—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ-বর্জিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি 'অব্যয়ম্, নিত্যম্, অনাদি, অনন্তম্'—ক্ষয়রহিত, শাশ্বত, কারণহীন, কার্যরহিত। 'মহতঃ পরং ধ্রুবম্'—মহতেরও পারে ধ্রুব। এমন যে আত্মা তাঁকে 'নিচায্য'—নিশ্চয়রূপে জেনে, মুমুক্ষু মানুষ 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—জন্মমৃত্যুরূপ সংসার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

আমাদের উদ্দিষ্ট যে আত্মা—তাঁর স্বরূপ এখানে প্রথমত নিষেধ-মুখে ব্যাখ্যা করছেন। বিভিন্ন ভূতগুণ আত্মাতে নেই। ব্যোম বা আকাশ, মরুৎ বা বায়ু,

তেজ, অপ্ বা জল ও ক্ষিতি—এই পাঁচটি ভূতের পাঁচটি বিশেষ গুণ আছে বলা হয়। ব্যোম বা আকাশের গুণ শব্দ, মরুৎ বা বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, অপ্ বা জলের গুণ রস এবং ক্ষিতির গুণ হলো গন্ধ। 'অশব্দমস্পর্শম্'—ইত্যাদি দ্বারা প্রথমে আকাশের গুণ তারপর বায়ুর গুণ এবং ক্রমশ তেজ ইত্যাদির গুণ বলা হচ্ছে, আত্মাতে এই ভৌতিক গুণগুলির কোনটিই নেই। ভৌতিক দ্রব্য বলতে বোঝায়, পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু, আমাদের স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর। স্থূলশরীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর সূক্ষ্মশরীর বলতে বিশেষ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হচ্ছে। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বগ্-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এদের বিশেষ বিশেষ গ্রহণশক্তি রয়েছে। সেই অনুসারে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একটি বিশিষ্ট বিষয় আছে। চক্ষু রূপকে গ্রহণ করে এবং সেই রূপের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট যে ভূত অর্থাৎ তেজ, এই তেজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। তেমনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ শব্দের এবং শব্দ হলো আকাশের বিশেষ গুণ। নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় বায়ু। ভূতের পাঁচটি গুণ এবং ঐসব গুণের গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সবই ভৌতিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

আত্মা এগুলি থেকে ভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই। কেবল কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নয়, তারপরে প্রাণশক্তির কথাও আছে। এগুলি সব মিলে সূক্ষ্মশরীর। তারও পিছনে রয়েছে মহৎতত্ত্ব—যাঁর ভিতর থেকে এইসব ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, অপেক্ষাকৃত স্থূল তত্ত্বগুলি এসেছে। সেই যে মহৎতত্ত্ব—তাকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। সমস্ত জগতের অব্যাকৃত অর্থাৎ বিশেষরূপে অনভিব্যক্ত যে উপাদান তা মহৎ। সেই মহৎ বা চৈতন্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত জগতের যা উপাদান, আত্মা তারও পারে। সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির গুণের অতীত বলে তিনি ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য। রূপাদি অবয়ব না থাকায় তাঁর বিনাশের কারণ থাকে না। অবয়বের অপচয়ের দ্বারা বস্তুর বিনাশ হয়। তিনি নিরবয়ব বলে তাঁর সেভাবে বিনাশ হতে পারে না, কাজেই তিনি ধ্রুব। তাঁকে জানলে মানুষ মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার পায়।

আত্মাকে কেন অন্বেষণ করব? এত দার্শনিক বিচারের ভিতর দিয়ে গিয়ে আত্মাকে অন্বেষণ করে আমাদের লাভ কী হবে—এই প্রশ্ন মনে উঠতে পারে। তার উত্তর—আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে না জেনে জীবন ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা আমাদের জানি না—একথা ঠিক বলা যায় না, প্রত্যেকেই নিজেকে জানে। কিন্তু সে যা নয় সেইভাবে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্টরূপে, কর্তা-ভোক্তা-রূপে নিজেকে জানে। এইভাবে জানার ফলে তার নানা কর্ম পুঞ্জীভূত হচ্ছে। সেইহেতু অনন্তবার এই জন্মমৃত্যুরূপ পরিণামের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। এটা আমাদের অসহনীয় বোধ হচ্ছে না বরং সর্বপ্রকারে পরিচ্ছিন্ন, গণ্ডিবিশিষ্ট এই জীবনকেই শ্রেয়স্কর মনে করছি। এটি আমাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থার পরিচয়, অস্পৃহণীয়কে স্পৃহণীয় বলে বরণ করছি। তাই শাস্ত্র সচেতন করে দিচ্ছেন যে এ আমাদের

প্রকৃত স্বরূপ নয়। শুনলে মনে হয়, না-ই হোক—আমরা এই নিয়েই বেশ আছি।

যেমন একটি কাহিনী আছে[১]—বন্দীদের গুহার মধ্যে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের মুখগুলি গুহার দেওয়ালের দিকে ফেরানো বলে গুহার প্রবেশ পথ দেখতে পায় না। বাইরের থেকে আলো এসে পড়ায় গুহার দেওয়ালে তাদের ছায়া পড়েছে। বন্দীরা সেই ছায়াগুলিকে নড়াচড়া করতে দেখে মনে করে তারা জীবন্ত। কেউ এসে বলল, 'তোমরা যা দেখছ ওগুলো ছায়া মাত্র। সত্য যদি দেখতে চাও তাহলে তোমাদের মুখ ফেরাতে হবে'—বলে শিকল খুলে গুহার মুখের দিকে ফিরে দেখতে বলল। তারা সেদিকে তাকিয়ে দেখে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তাই বলল—'আগে যা ছিল তাই ভাল'। তারা ছায়ামূর্তিগুলিকে দেখতেই অভ্যস্ত, সূর্যের আলো সহ্য করতে পারল না। আমাদের অবস্থাও সেইরকম। আমাদের যে ভ্রান্ত আত্মা, যে আত্মা নিজেকে কর্তা-ভোক্তা রূপে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করছে, দেহের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে যার জন্ম-মৃত্যুর বোধ হচ্ছে এবং তারই অন্তরালবর্তী ক্ষণস্থায়ী অবস্থাতেই যে তৃপ্ত—সেইরকম আত্মার সঙ্গে আমরা পরিচিত। মনে করি এই ভাল। বিশ্লেষণ করে যে-আত্মাকে খানিকটা ধারণা করা যায়, তাকে ভীতিপ্রদ, হয়তো বা দুঃখপ্রদ মনে হয়। তাঁর নির্বিশেষ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি না, করতে চাইও না। অনভ্যস্ত বলে বন্দীদের মতো আমাদের চোখ যেন ঝলসে যায়।

কাজেই শ্রুতি বহুবার বোঝালেও আমরা যেন সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে অসমর্থ। তাই বারে বারে আমাদের জাগাতে হয়। শ্রুতি বলে দিচ্ছেন—কোথায় পৌঁছাতে হবে তা জান, তোমাদের স্বরূপ সাক্ষী-পাখির মতো, ভোক্তা পাখিটির মতো নয়—যে নানা স্বাদের ফল খাচ্ছে এবং সুখদুঃখাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুভব করছে। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আছে বলেই জীব ক্ষণিক সুখদুঃখের প্রবাহের ভিতর দিয়ে অনাদি অনন্ত কাল ধরে চলছে। শাস্ত্র বলছেন—এ বোধে কল্যাণ নেই। এতে তুমি নিজেকে অনিত্য বলে বোধ কর, কিন্তু তোমরা তো প্রকৃতই অনিত্য নও, এ বোধ দুঃস্বপ্ন মাত্র। তোমরা—'আবৃত্তচক্ষুঃ' হও, চোখকে বাইরের জগৎ থেকে ফিরিয়ে অন্তর্জগৎকে দেখতে শেখ। বন্দীদের যেমন বলা হয়েছিল—গুহার দেওয়ালের দিকে না দেখে যেদিক থেকে আলো আসছে সেদিকে ফিরে তাকাও, তাহলে ছায়ার বদলে ছায়ার যা source, বা উৎপত্তি—তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু মানুষ তা পারে না। শ্রুতি সেজন্যই বারবার আত্মার স্বরূপকে নানাভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন—'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্'—ইত্যাদি বলে।

তাঁর এই স্বরূপ—ধ্রুবস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ। ধ্রুব আর নিত্য দুই-ই বলা হয়েছে এইজন্য যে ধ্রুবকে আপেক্ষিক বলা যায় আর পারমার্থিক তার নিত্যরূপ। সাক্ষাৎরূপে ধ্রুব, নিত্য, গৌণরূপে নয়, দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে নয়। উপনিষদ্

১. The republic—Plato, Penguin Books, 2nd. Edn. (1977) Chap. VII, p.316

বলছেন—তোমার এই স্বরূপকে তুমি দেখ। কেন দেখবে? না, মৃত্যুর হাত থেকে এভাবেই বাঁচবে, অন্য উপায়ে নয়। আমরা সবাই অমর হয়ে থাকতে চাই কিন্তু কি করে তা হওয়া যায় জানি না। বারবার মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছি আর বারবার চেষ্টা করছি—লৌকিক, ভৌতিক উপায়ে কিভাবে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নিরন্তর গবেষণার ফলে জীবন কিছু দীর্ঘ হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছি না, কোনদিন পাব বলে মনেও হচ্ছে না। লৌকিক উপায়ে অমরত্বলাভের চেষ্টা এ পর্যন্ত বিফল হয়েছে। অলৌকিক উপায়েও চেষ্টা হয়েছে। স্বর্গে গিয়ে চিরকাল সুখ ভোগ করব—এই আশায় মানুষ যাগযজ্ঞ করেও অমৃতত্বলাভের চেষ্টা করছে। দেবতারা বলছেন—সোমরস পান করে আমরা অমর হব।[১] মানুষ তাঁদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে ভাবছে এভাবেও তো অমর হওয়া যায়, সুতরাং যাগযজ্ঞাদি করছে। লৌকিক জগতে বলে—অক্ষয় কীর্তি অর্জন করে অমর হও। আমরা যে বলি—মানুষটি অমর হয়ে আছে, তার অর্থ লোকে চিরকাল তাঁর কথা স্মরণ করে। তাতে কি যথার্থই অমরত্বলাভ হবে? সত্যি সত্যি মানুষের প্রশংসায় আমাদের মৃত্যুযন্ত্রণা কি কিছু কম হবে? যখন থাকব না তখন লোকে আমাদের প্রশংসা করুক আর নিন্দা করুক তাতে কী এসে যাবে? পুরাকালে দেবতা এবং অসুর দুই দলই যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন আর দুই পক্ষই ভাবছেন—একমাত্র উপায় হচ্ছে অমরত্বলাভ। যদি অমর হই তাহলে আমরাই জিতব। এই অমরত্বলাভের জন্য দেবতা এবং অসুরগণ প্রজাপতির কাছে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠালেন। দেবতাদের পক্ষ থেকে ইন্দ্র এবং অসুরদের পক্ষ থেকে বিরোচন প্রজাপতির কাছে গিয়ে উপদেশ চাইলেন[২]। প্রজাপতি উভয়কে বললেন, আত্মাই অমৃত। আত্মাকে জেনে অমর হওয়া যায়। কী করে আত্মাকে জানা যাবে? তিনি বললেন একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যা দেখবে তাই আত্মা। ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই তাঁদের প্রতিবিম্বকেই দেখতে পেলেন। দুজনেই ভাবলেন, জলে তো শরীরটাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তাহলে ছায়াই আত্মা। দুজনেই নিয়ে গেলেন এই তত্ত্ব। বিরোচন অসুরদের কাছে গিয়ে বললেন—'বুঝে ফেলেছি। এই শরীরকে সযত্নে রক্ষা কর, ভোগসুখে রাখ, দীর্ঘজীবী কর, এর দ্বারাই পরম কল্যাণ'। কিন্তু ইন্দ্র পরে ভাবলেন যে, শরীর পরিবর্তনশীল, তা কী করে নিত্য অপরিবর্তনশীল আত্মা হতে পারে! সাজসজ্জা করে দেখলে প্রতিবিম্ব একরকম আবার নিরলঙ্কার হয়ে দেখলে আর একরকম দেখাবে। এত পরিবর্তনশীল বস্তু কী করে অমর আত্মা হতে পারে? আবার তিনি ফিরে গেলেন। প্রজাপতি তাঁকে আবার ব্রহ্মচর্য পালন করিয়ে উপদেশ দিলেন। শেষকালে ইন্দ্র আত্মাকে জেনে দেবতাদের মধ্যে ফিরে গেলেন। কিন্তু বিরোচন শরীরকেই আত্মা বলে জেনে অসুরদের মধ্যে সে দেহাত্মবাদ

---

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—৩/২/৫ ; ঋগ্বেদ সংহিতা—৮/৪৮/৩,

২. ছান্দোগ্য —৮/৭/২

প্রচার করল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—পাশ্চাত্য দেশের সবাই বিরোচনের সন্তান। তারা কী করে শরীর রক্ষা করতে হয় তার নানা উপায় উদ্ভাবন করল, বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হলো। নানা দিক দিয়ে তারা ঐহিক জগতের উপর আধিপত্যের পথ করে নিল। তবু এত করেও তারা অমরত্ব পেল না।[১]

বহু চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত দেহকে চিরস্থায়ী করতে পারা যায়নি। দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে কিন্তু চিরস্থায়ী হবে কি? সূচনায় যম নচিকেতাকে প্রলোভন দেখিয়ে বলছেন—'স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি'[২]—যত বৎসর ইচ্ছা তুমি বেঁচে থাক। কিন্তু নচিকেতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে বলছেন—'অপি সর্বঃ জীবিতমল্পমেব'[৩]—যত দীর্ঘ জীবনই হোক অনন্তকালের তুলনায় তা স্বল্পই। সেই অল্প জীবন নিয়ে অমরত্বকে তিনি হারাতে রাজি নন। অমৃতত্বকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার উপায় হলো আত্মাকে জানা। অনাদিকাল থেকে জীবমাত্রেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অহরহ চেষ্টা করে চলেছে। জীবন মানেই মৃত্যুকে প্রতিহত করবার জন্য সংগ্রাম। শাস্ত্রমতে পরিত্রাণের উপায় একটিই আছে—তা হলো নিজেকে জানা। শাস্ত্র তাই উপদেশ দিচ্ছেন—'আত্মানং বিদ্ধি'। বহু বিষয় জানলেও লাভ নেই, বস্তুর জ্ঞান অনিত্য। বিজ্ঞান নতুন নতুন আবিষ্কার করে আমাদের চমৎকৃত করছে বটে কিন্তু সে সমস্ত জ্ঞানও অনিত্যের পর্যায়ে পড়ছে। উপনিষদ্ সর্বত্র এই একটি কথাই বোঝাচ্ছেন যে—মৃত্যুকে অতিক্রম করবার একমাত্র পথ আত্মাকে জানা। আত্মাকে নির্বাধরূপে, নিরস্ত-সমস্ত-বিশেষরূপে আরোপিত ধর্ম থেকে বিমুক্ত করে যদি দেখতে পাও তখন দেখবে—আত্মা 'অনুচ্ছিত্তিধর্মা'[৪]—অবিনাশী, স্থায়িত্বশীল অর্থাৎ আত্মার অমরত্বরূপ ধর্মকে জানলে তবে মানুষ—'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—মৃত্যুর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এই অমরত্ব লাভ করাই সকলের জীবনের উদ্দেশ্য। মানুষ সেই পথে জীবনকে পরিচালিত না করা পর্যন্ত বুঝতে হবে—সে ঘুমিয়ে আছে। গন্তব্যস্থলের দিকে যাওয়ার প্রয়াস এখনো শুরুই হয়নি। অন্য দিকে যতই উদ্যমী হই, প্রভূত অধ্যবসায় নিয়ে প্রকৃতির নতুন নতুন তত্ত্বকে আবিষ্কার করে ঐহিক উন্নতির কাজে লাগাবার চেষ্টা করি, সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ, এর দ্বারা স্বস্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না এবং শেষ পরিণাম হবে মৃত্যু। যেমন কবি টমাস গ্রে বলেছেন—The paths of glory lead but to the grave.[৫]—আমাদের সব মহিমা, খ্যাতি শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ভাগবতে বলা হয়েছে—মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে প্রাণীমাত্রই ভীত। যেখানেই সে যাচ্ছে সর্পরূপ মৃত্যু তার পশ্চাদ্ধাবন করছে—

---

১. পত্রাবলী-স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সং (১৩৮৪); পৃঃ ১৯২ ; ২. কঠোপনিষদ্—১/১/২৩ ; ৩. তদেব—১/৩/২৬ ; ৪. বৃহদারণ্যক—৪/৫/১৪ ; ৫. The Poems of Gray, Collins and Goldsmith—Editor : Roger Lonsdale, Longman, 1980, p. 124.

'মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি'।।[১]

অতএব মৃত্যুমুখ অর্থাৎ অবিদ্যাকর্মরূপ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হলে অন্য সব চিন্তাকে পরিত্যাগ কর, তারপর সেই একমাত্র আত্মাকে জান। এই হলো যেন আত্মতত্ত্বের উপসংহার। উপনিষদের এই conclusion, এই সিদ্ধান্ত।

তারপর ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের প্রশংসা করে যেন উপসংহার করছেন, যাকে ফলশ্রুতি বলে—

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

অন্বয় ঃ—নাচিকেতম্ (নচিকেতার দ্বারা শ্রুত) মৃত্যুপ্রোক্তম্ (মৃত্যুর অধিপতি দ্বারা কথিত) সনাতনম্ (অনাদিকালপ্রবৃত্ত) উপাখ্যানম্ (এই রহস্যবিদ্যা) উক্ত্বা (বর্ণনা করে) চ শ্রুত্বা (এবং শ্রবণ করে) মেধাবী (বিবেকী পুরুষ) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (আত্মস্বরূপে পূজিত হন)।

'নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্'—এই নচিকেতা কর্তৃক লব্ধ এবং যমরাজ কর্তৃক উপদিষ্ট গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে আগত ব্রহ্মবিদ্যা, 'উক্ত্বা শ্রুত্বা চ'—বলে, এবং আচার্যগণের নিকট থেকে শুনে, 'মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'—বিবেকী পুরুষ ব্রহ্মের ন্যায় পূজ্য হন।

আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলে নিজেদের তার বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট বলে মনে করছি অথচ অন্বেষণ করছি অমরত্বের। অমৃতত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ শুনলে আমাদের কল্যাণ। কাজেই এই উপাখ্যানটি বলে এবং শুনে মেধাবী পুরুষ অর্থাৎ বেদার্থধারণে সমর্থ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহিমাপ্রাপ্ত অর্থাৎ উপাস্য হন। ব্রহ্মলোকের ব্যাখ্যা করেছেন—'ব্রহ্ম এব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ'[২]—ব্রহ্মরূপ যে লোক। লোক মানে ভোগস্থান। এখানে ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক, দেবলোক এসব নয়—ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মই হচ্ছেন একমাত্র ভোগস্থান। উপাখ্যানের এই সার কথা।

যে এইকথা শোনে সে-ই যে কেবল মহিমা প্রাপ্ত হচ্ছে তা নয়, যে বলে সে-ও মহিমাপাপ্ত হচ্ছে। বারবার আমাদের এই কথার আবৃত্তি করতে হবে মনকে বোঝাতে হবে। যারা মৃত্যুকে পরিত্যাগ করে অমৃতত্ব চাইছে তাদের সকলকে এইকথা বলতে হবে। ভাষ্যকার বলছেন—কিরকম মহিমা প্রাপ্ত হয়? না—'আত্মভুত উপাস্যো ভবতি'[৩]—আত্মা যেরকম সকলের উপাস্য, তাঁরাও তেমনি আত্মস্বরূপ হয়ে সকলের উপাস্য হন। 'ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'—কথাটির তাৎপর্য অন্য দৃষ্টিতে যাতে না নিই তাই ভাষ্যকার এরূপ ব্যাখ্যা করলেন। আমরা

---

১. শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০/৩/২৪
২. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—১/৩/১৬
৩. তদেব

সাধারণত মনে করি—ঐহিক সুখের বিস্তৃত রূপ স্বর্গে গিয়ে ভোগ করব। মানুষ সাধারণত পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যদি বা বোঝে তাহলে বড়জোর ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন দিয়ে ভোগটুকু মাত্র বোঝে। কিন্তু ভোগমাত্রেই যে অনিত্য—একথা সচরাচর মনে আসে না। ভোগের বস্তু যে ভোগ করতে করতে ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যায়—সে কথাও মনে আসে না। 'তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'[১]—এই জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগ যেমন ক্ষয় হয়ে যায়, পরজগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি ফলও তেমনি ক্ষয় হয়ে যায়, সেও নশ্বর। সুতরাং 'ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'—এই অংশের অর্থ যদি কেউ বোঝে যে, ব্রহ্মলোক বলে একটি লোক অর্থাৎ ভোগস্থান আছে যেখানে গিয়ে মানুষ পূজ্য হবে, সকলের প্রশংসা পাবে—তাহলে সে ভুল করবে। ভাষ্যকার তাই এখানে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছেন যে, এ সেরকম ব্রহ্মলোক নয় আর সেরকম মহিমাও নয়।

বাইবেলে আছে—যীশু স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। লোকে ভাবল এখন আমরা যে রোমানদের অধীন হয়ে রয়েছি সেই অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হব। 'রাজ্য' কথাটি পরাধীন ইহুদি জাতির কাছে স্বভাবতই খুব আকর্ষণীয় ছিল। যীশুকে বারবার এজন্য বলতে হয়েছে আমি যে রাজত্বের কথা বলছি তা এই পৃথিবীর রাজত্ব নয়, তা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নয়। আমি যা বলছি তা হচ্ছে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠা। স্বর্গরাজ্য বলতে তিনি ভাবছেন আত্মিক রাজ্য যেখানে রাজা-প্রজা ভেদ নেই। তিনি রাজ্য বলতে বুঝিয়েছেন একটি অবস্থা যা অন্তরের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি থেকে স্বতন্ত্ররূপে স্থিতি, যে রাজ্যের কথা লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন—'স স্বরাড়্ ভবতি'[২]—তিনি স্বরাট্, স্বতন্ত্র হন। তাঁকে আর ইন্দ্রিয়াদির পরতন্ত্রতা স্বীকার করতে হয় না। তিনি স্বতন্ত্র হয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এখানে 'ব্রহ্মলোকে মহীয়তে' মানে ব্রহ্ম যেমন সকলের উপাস্য সেইরকম বিবেকী ব্যক্তিরা ব্রহ্মীভূত হয়ে সকলের উপাস্য হন। সাধারণত 'লোক' শব্দের অর্থ ভুবন বা জন। কাজেই ইহলোকে মানুষ প্রজাবৃদ্ধি করে, সন্তানসন্ততির প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে। তাতে কুলের সম্পদ বাড়ে, সন্তানের দ্বারা মানুষ স্বর্গাদি লোক লাভ করার সুযোগ পায়। বৈরাগ্যবান ঋষি সেরূপ লোকের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি বলেন—'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি'[৩]—আমরা যারা এই আত্মাকেই লোক অর্থাৎ ভোগস্থান বলে মনে করি, তারা আর প্রজা দিয়ে কী করব? 'পুত্রেণ অয়ং লোকো জয্যঃ'[৪]—পুত্রের দ্বারা ইহলোককে জয় করতে হয়। আত্মলোক জয়

---

১. ছান্দোগ্য—৮/১/৬ ; ২. তদেব—৭/২৫/২ ; ৩. বৃহদারণ্যক—৪/৪/২২ ; ৪. তদেব, শাঙ্করভাষ্য—৪/৪/২২

করতে হলে পুত্র দিয়ে কী করব? তাঁদের পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা নেই—এইকথা তাঁরা বলেছেন। সেখানেও আত্মাকেই লোক বলা হচ্ছে।

জাগতিক ভোগসুখের অন্বেষণ থেকে কাকেও বিরত দেখলে বিষয়াভিমুখী ব্যক্তিরা বলে—এরা কী নির্বোধ! এরা ভোগ্যবস্তু অর্জন করবার চেষ্টা করছে না কেন? এক ঋষি যখন এক রাজার সভায় গেলেন তখন রাজা তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি যুবা, সুরূপ, আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। আপনি কত ভোগ্যসামগ্রী অর্জন করতে পারেন কিন্তু আপনি সেদিকে তো কোন চেষ্টা করছেন না। অথচ কোন ভোগের সামগ্রী না থাকা সত্ত্বেও আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আনন্দ একেবারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোথা থেকে আসে এই আনন্দ?' ঋষি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার আনন্দের কারণ বাইরের কোন জিনিস নয়, আমার আনন্দের উৎস হচ্ছে আত্মা।' যে আত্মা এই আনন্দের উৎস তাঁতে যাঁরা অবস্থিত তাঁরা আনন্দস্বরূপই হয়ে যান।

তারপরে অধ্যায়ের উপসংহার করছেন নিচের মন্ত্রে।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে।
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি ॥১৭॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যিনি) প্রযতঃ (সংযতচিত্ত হয়ে) ইমম্ (এই) পরমম্ (শ্রেষ্ঠ) গুহ্যম্ (গূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা) ব্রহ্মসংসদি (ব্রাহ্মণসভায়) বা (অথবা) শ্রাদ্ধকালে (শ্রদ্ধা-সহকারে পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সময়) শ্রাবয়েৎ (অর্থসহ ব্যাখ্যা করেন) তৎ (সেই অধ্যাপনরূপ কর্ম) আনন্ত্যায় (অনন্তফললাভে) কল্পতে (সমর্থ হয়)। তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে ইতি (অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি)।

'যঃ প্রযতঃ ইমং পরমং গুহ্যং ব্রহ্মসংসদি শ্রাবয়েৎ'—যে কোন ব্যক্তি পবিত্র, সংযতচিত্ত হয়ে এই শ্রেষ্ঠ, গোপনীয় পরম তত্ত্ব ব্রাহ্মণদের সভায় অর্থাৎ সমাজে ব্যাখ্যা করেন—'তদ্ আনন্ত্যায় কল্পতে'—উক্ত শ্রাবণকার্য বা শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল উৎপাদনে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণসভায় অথবা বলছেন শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণভোজনের সময় যদি এই আত্মতত্ত্ব শোনানো হয় তাহলে সেই কার্য অনন্ত ফলদায়ক হয়। কথাটি দুবার বলেছেন অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি বোঝাবার জন্য। এটি হচ্ছে একটি ফলশ্রুতি বা একে বলা হয় 'অর্থবাদ'। 'অর্থবাদ' মানে হচ্ছে, এখানে এই ফলশ্রুতি থাকলে লোকে এই তত্ত্বে আকৃষ্ট হবে, জানবার জন্য প্ররোচিত হবে। এ নয় যে, শ্রাদ্ধকালে পড়তে হবে, বাস্তবিক পক্ষে যা আজকাল হয়েছে। অনেক জায়গায় শ্রাদ্ধের সময় কঠোপনিষদ্ পড়া হয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে 'শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি শ্রাদ্ধকালে বা'—তাই শ্রাদ্ধের সময় পড়া হয়।

আসল কথা মনে রাখতে হবে যে নচিকেতা প্রশ্ন করেছেন—'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে'—যখন মানুষ দেহত্যাগ করে তখন যারা তা দেখে তাদের মনে সংশয় আসে—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'—কেউ বলে পরলোকগামী আত্মা আছে, কেউ বলে নেই। অর্থাৎ দেহত্যাগের পরেও আত্মার অস্তিত্ব কেউ বলে আছে আবার কেউ বলে নেই—এই সংশয়। এটা স্বাভাবিক। মৃত্যুগ্রস্ত হলে মানুষের আত্মা সম্বন্ধে এ প্রশ্ন মনে জাগে যে, এই জীবটি যার সঙ্গে আমরা এত ব্যবহার করছিলাম, এত স্নেহের আদানপ্রদান হচ্ছিল—সে কোথায় গেল? সে কি আছে না নেই? যদি থাকে তো কী রূপে আছে? এই প্রশ্ন সর্ব দেশে সর্বকালের মানুষকে চিন্তায় নিযুক্ত করেছে এবং মানুষ নানাভাবে তার একটা সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে। কেউ কেউ বলে—মরবার পরে আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। এইজন্য তাকে কোথাও কবর দিয়ে রাখা হয় যাতে সেখানে সে ঘুমিয়ে থাকে। তারপর প্রলয়কালে যখন শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে তখন ভগবান তাঁর দূতদের পাঠিয়ে দেবেন যারা কবরে শুয়ে আছে তাদের নিয়ে আসবার জন্য। তারপর তাদের বিচার হবে। বিচারে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে, অনন্ত স্বর্গ অথবা অনন্ত নরক। এই একশ্রেণীর কথা।

অপর শ্রেণী বলে যে মরবার পর জীব আবার একটি ভোগদেহের অন্বেষণ করে কারণ, দেহকে অবলম্বন না করলে ভোগ করা যায় না। সেই ভোগদেহ আশ্রয় করে সে আবার জন্ম নেয় এবং নতুন করে তার কর্মভোগ করতে থাকে অথবা নতুন কর্ম সঞ্চয় করতে থাকে। কেউ বা বলে—ওসব কিছু নয়। শরীরটাকে পুড়িয়ে ফেললেই সব শেষ হয়ে গেল, আর তারপরে কোথায় সে রইল? যাকে আমরা আত্মা বলি—তা একটা মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র। শরীর গেলে আর সে কল্পনা করবার লোক থাকে না। সুতরাং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবস্তুটি নিঃশেষিত হচ্ছে। আবার কারো কারো অভিমত শরীরের সঙ্গে সব নিঃশেষিত হয় না। অনন্তকাল ধরে যে কর্মপুঞ্জ সংগৃহীত হয়েছে সেই কর্মগুলির ভোগ না হলে নিষ্কৃতি হয় না। সুতরাং তাকে দেখতে হবে যে অশুভ কর্ম আর সঞ্চয় না করে এবং শুভ কর্মও যেন আর নতুন করে সঞ্চিত না হয়। তখন কী হবে? ক্রমাগত ভোগের ফলে শুভ এবং অশুভ কর্ম যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন সে মুক্ত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলে ওরকম করে মুক্তি আসতে তো বহুকাল লাগবে, তার চেয়ে বরং সে যত কিছু খারাপ কাজ করেছে, তারজন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করুক এবং যা শুভ কর্ম সঞ্চয় করেছে, স্বর্গাদি লোকে গিয়ে সেই ফল ভোগ করুক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম বল্লী

পূর্ব অধ্যায়ের শেষ বল্লীতে বলা হয়েছে, আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ় আছেন, অজ্ঞান বা মায়ার দ্বারা আবৃত থাকায় সকলের কাছে প্রকাশ পান না। একাগ্রতাসম্পন্ন সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন সুসংস্কৃত বুদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক কি হতে পারে যাতে তার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হন না? আত্মার অদর্শনের কারণ প্রদর্শন করবার নিমিত্ত এই বল্লী আরম্ভ হচ্ছে। কারণ শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি অবগত হলে তা অপনয়ন করার জন্য প্রযত্ন করা যেতে পারে। কারণটি না জানলে প্রয়াস করা যায় না। আমরা যদি জানতে পারি বাধাটি ঠিক কোন্‌খানে তাহলে তা অপসারণ করা সম্ভব হয়। প্রতিবন্ধক অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ লাভ হয় না। এই কারণেই দেখা যায় আমরা বড় বড় তত্ত্ব আলোচনা করি বটে কিন্তু সে তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যে কথা আমরা বলি বা শুনি, তার দ্বারা তেমন ভাবে প্রভাবিত হই না।

আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কারণরূপে যমরাজ এখানে প্রতিবন্ধকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥১॥

অন্বয় ঃ—স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর) খানি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) পরাঞ্চি (বহির্মুখী করে) ব্যতৃণৎ (হিংসা বা বিনাশ করেছেন)। তস্মাৎ (সেইজন্য) [জীব] পরাক্ (শব্দাদি বাহ্যবিষয়সমূহই) পশ্যতি (দর্শন করে) অন্তরাত্মন্ ন (অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না)। কঃ চিৎ (কোনও) ধীরঃ (বিবেকী প্রাজ্ঞ) অমৃতত্বম্ (মুক্তি) ইচ্ছন্ (অভিলাষ করে) আবৃত্তচক্ষুঃ (বিষয়সমূহ হতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করে) প্রত্যক্ (সর্বভূতে অবস্থিত) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে তথা আত্মস্বরূপকে) ঐক্ষৎ (সাক্ষাৎ দর্শন করেন)।

মন্ত্রটি খুব প্রসিদ্ধ। 'স্বয়ম্ভূঃ'—পরমেশ্বর, যিনি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না, স্বয়ং উৎপন্ন হন অর্থাৎ নিত্য। তিনি, 'খানি'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে, 'পরাঞ্চি'—বা বহির্মুখ করে, 'ব্যতৃণৎ'—তাদের হিংসা করেছেন—অর্থাৎ তাদের সর্বনাশ করেছেন। 'খ'—মানে আকাশ, অবকাশ। কর্ণেন্দ্রিয়ে যে গহ্বর বা আকাশ বা অবকাশ রয়েছে তার জন্য—'খ'—শব্দটির অর্থ কর্ণেন্দ্রিয়। 'খানি'—বলায় অর্থাৎ, 'খ' শব্দটিকে বহুবচনে প্রয়োগ করায়—সকল ইন্দ্রিয়গুলিকেই

বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বয়ম্ভু—'পরাঞ্চি'—অর্থাৎ বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। যা বাইরের দিকে যায় তাকে বলে—পরাক্। পরা অঞ্চতি ইতি পরাক্। বহুবচনে—'পরাঞ্চি'। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির গতি বাইরের দিকে। সুতরাং বাইরের জিনিসই দেখে—'পরাক্ পশ্যতি'। ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে জীব যা কিছু অনুভব করে সব বাহ্যবস্তু। 'ন অন্তরাত্মন্'—অন্তরাত্মাকে দেখে না, অন্তরাত্মার দিকে ইন্দ্রিয়দের গতি নেই। তাদের গতি হচ্ছে তদ্-বিপরীত দিকে, বাইরের দিকে 'বাইরের দিকে'—কথাটি স্পষ্ট বুঝতে হবে। অন্তরতম হলেন আত্মা, সেই আত্মার অপেক্ষায় যা কিছু অনাত্ম—সবই বাইরের। এমনকি মন পর্যন্ত আত্মার বাইরে বলে—তার গতি বাইরের দিকে। ভিতরে যিনি রয়েছেন সেই আত্মাকে ছেড়ে বাহ্য বস্তুকেই মানুষ দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। 'অন্তরাত্মা-নম্' হওয়া উচিত কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত বলে 'অন্তরাত্মন্' বলা হয়েছে।

এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি আমাদের বাধা কোন্‌খানে। আগেই বলেছি, বাধা কোথায় জানলে তা অপসারণ করবার চেষ্টা হতে পারে। তাই প্রথমেই উল্লেখ করে দিচ্ছেন বাধা কোথায়। বাধা এইখানে যে, ইন্দ্রিয়গুলি সব বহির্মুখ, বাইরের দিকে তাদের গতি, সেইজন্য জীব অন্তরাত্মাকে দেখে না। তিনি হলেন অন্তরতম। তাঁর থেকে বাহ্য হলো অন্তঃকরণ। তারও থেকে বাহ্য হলো অন্য ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের থেকে বাহ্য হলো বিষয়গুলি। এদের গতি বাইরের দিকে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াভিমুখী, আত্মাভিমুখী নয়। তার জন্য বাহ্যবস্তুর দিকে তাদের গতি বলে জীব বাহ্যবস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না।

তাহলে অন্তরাত্মাকে দেখবার উপায় কী? 'কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ'—বিরল কোন ধীর ব্যক্তি, ধীমান, বিবেকী ব্যক্তি অন্তরাত্মাকে দেখেছিলেন 'ঐক্ষৎ' মানে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন মানে দেখেন—কারণ, বেদ নিত্য বলে বেদে কালের নিয়ম নেই। বর্তমান কাল বোঝাতেও অতীতকালের প্রয়োগ হয় বিবেকী ব্যক্তি প্রত্যগাত্মাকে কিভাবে দেখেন? 'আবৃত্তচক্ষুঃ'—দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে অন্তর্মুখ করে আত্মাভিমুখী করতে হয়। তখন অন্তরাত্মাকে দেখা যায়। লাভ কী তাতে? বলছেন—'অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্'—অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থাৎ যদি অমৃতত্ব চাও, অমর হতে চাও তাহলে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ কর। আত্মাকে না জানার কারণ ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখীনতা, আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক এই। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবিষয় থেকে নিবৃত্ত হলে অন্তঃকরণ শান্ত, তরঙ্গরহিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখ গতিই অন্তঃকরণকে সর্বদা চঞ্চল করে রেখেছে, তাকে তরঙ্গায়িত করছে। অন্তঃকরণ শান্ত, তরঙ্গরহিত হলে আত্মবস্তু স্বতঃ প্রতীত হন। স্বপ্রকাশ আত্মবস্তুকে প্রকাশ করবার জন্য কোন প্রকাশক দরকার হয় না। ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ তাকে প্রকাশ করতে পারে না, অন্তঃকরণ স্থির শান্ত হলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন।

একটি উপমা দেওয়া হয়, অন্তঃকরণ যেন একটি হ্রদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—বিষয়গুলি যেন ঢিল। ইন্দ্রিয়গুলি অন্তঃকরণরূপ হ্রদে ক্রমাগত বিষয়রূপী ঢিল ছুঁড়ছে। তাই অন্তঃকরণে বিষয়াকারা বৃত্তিরূপী তরঙ্গ উঠছে। আত্মা যেন হ্রদের তলদেশে রয়েছেন, ক্রমাগত তরঙ্গ ওঠায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। উপায় কী? একমাত্র উপায় অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করে অন্তঃকরণকে শান্ত করা। নিস্তরঙ্গ অন্তঃকরণরূপ হ্রদে তখন আত্মছবি প্রকাশিত হবে। এ হ্রদটি নিস্তরঙ্গ করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলির ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এগুলি সবই figurative, রূপক মাত্র। এইভাবে কল্পনা করে বিষয়টা বুঝে নিতে হচ্ছে কারণ, বাস্তবিক অন্তঃকরণ বলে একটি হ্রদ নেই আর বিষয়গুলিও কিছু ঢিল পাথর নয়।

এখন উপমা বাদ দিয়ে তত্ত্বটি আবার বুঝবার চেষ্টা করি। আমরা আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি না, তার বদলে নানারকম বিষয়কে দেখছি, অনুভব করছি। সে বিষয়ের সমষ্টি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি হাজার রকমের বৃত্তি আমাদের এত ব্যাপৃত করে রেখেছে যে, সেই বৃত্তিগুলির পিছনে যে বস্তু আছে, শান্তভাবে তাকে দেখবার সামর্থ্য আমাদের নেই। বৃত্তিগুলি যদি শান্ত হয়ে যায় তাহলে এদের পিছনের আত্মবস্তুটিকে অনুভব করব। পিছনে মানে, আত্মা এদের থেকে দূরে আছেন তা নয়। সর্বব্যাপী আত্মা সর্বত্রই আছেন কিন্তু তাঁকে আমরা বোধে বোধ করতে পারছি না। কারণ, আমাদের অন্তঃকরণ অন্য বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছে। আমরা যেমন বলি—'অন্যত্রমনা অভূবম্ নাদর্শম্ ; অন্যত্রমনা অভূবম্ নাশ্রৌষম্'[১]—অন্যমনস্ক ছিলাম তাই দেখিনি, অন্যমনস্ক ছিলাম তাই শুনিনি। মনের এই অন্যদিকে থাকাই আত্মাকে অনুভব করবার প্রতিবন্ধক। আত্মাকে অনুভব করতে হলে মনের এই অন্যাভিমুখী গতিকে নিবৃত্ত করতে হবে। আর তা করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাই ক্রম হচ্ছে এই যে, আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হবে, তারপর অন্তরের তরঙ্গগুলিকেও শান্ত করতে হবে। তার ফলে নিস্তরঙ্গ মনে আত্মবস্তুর স্বরূপ অভিব্যক্ত হবে। আগেই বলেছি—'আবৃত্তচক্ষুঃ' মানে ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখীনতা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা। আমরা একথা বলছি না যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মাতে নিবিষ্ট করতে হবে—কারণ, আত্মা কখনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে পারেন না। কিন্তু বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত না করা হলে অন্তঃকরণের স্থিরতা আসবে না। অন্তঃকরণ স্থির না হলে সেখানে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও উঠবে না। আবার ব্রহ্মাকারা বৃত্তি যদি না হয় তাহলে অজ্ঞানের বিনাশ হবে না। সুতরাং অজ্ঞানের বিনাশের জন্য ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দরকার। অর্থাৎ এককথায় ব্রহ্মকে ধারণা করা দরকার। ব্রহ্মকে ধারণা করতে হলে মনের চঞ্চলতার নিবৃত্তি দরকার।

---

১. বৃহদারণ্যক—১/৫/৩

মনের চঞ্চলতা নিবৃত্ত করতে হলে তার বিষয়াভিমুখী গতিকে রুদ্ধ করতে হবে।

এখন, মনের এই বিষয়াভিমুখী গতি রুদ্ধ করার উপায় কিন্তু এ নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে মেরে ফেলা বা কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ করে দেওয়া। কানে তুলো, চোখে ঠুলি দিয়ে বন্ধ করে যদি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে বর্জন করতে চেষ্টা করি, তাহলে কী হবে? গীতায় ভগবান বলেছেন, 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জম্'[১]—বিষয়গুলি গ্রহণ করছেন না এমন যে ব্যক্তি, তাঁর বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু রসের নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ তাঁর বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকেই যায়। ভূত সরষের ভিতরেই আছে। অন্তঃকরণের ভিতরে কতরকমের বৃত্তি, তরঙ্গ উঠছে, যেগুলির তুলনায় বাহ্যবিষয়ের দ্বারা উপস্থাপিত তরঙ্গগুলি কিছুই নয়। সেখানে যে অনন্ত প্রবাহ চলছে তার নিরোধের উপায় কী? আশ্চর্যের বিষয় আমাদের মন এমন স্থূল বিষয় গ্রহণে অভ্যস্ত যে, শোনা যায় সাধকরাও কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গুলিকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলেন, চেষ্টা করেন তার দ্বারা বিষয়ের নিবৃত্তি করতে। তীব্র বৈরাগ্য না থাকলে এরকম হয় না। তাঁদের চিন্তাটা বিপরীতমুখী। তাঁরা ভাবেন ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের শত্রুতা করছে তাই তাদের বিনাশ করি। বিনাশ করার কথা শাস্ত্র বলেননি। বলেননি এইজন্য যে, তাদের বিনাশ করলেই যে তারা অন্তর্মুখ হবে এমন কোন কথা নেই। অন্তর্মুখ অবস্থা সাধনার দ্বারা লভ্য। বাহ্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে সে চেষ্টা কখনো সফল হবে না। রস অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, বাসনা—যা অন্তঃকরণে ক্রমাগত তরঙ্গ তুলছে, যা থাকার জন্যই বিষয়গুলি আমাদের শত্রু, যা না থাকলে হাজার বিষয় থাকলেও শত্রুতা করবার সামর্থ্য তাদের থাকে না। সুতরাং বাসনার নিবৃত্তিই হলো সবচেয়ে বড় কথা। বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা শরীরকে অক্ষম করে কখনো বস্তুলাভ করা যায় না। শাস্ত্র সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে হত্যা করতে বলেননি—'আবৃত্ত' করতে বলেছেন। এরকম অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের একটা গুহার মধ্যে বন্ধ করে রেখে সম্পূর্ণ বেঁচে গেলাম মনে করেন। কিন্তু তা করেও অন্তরের ভিতরের বিক্রিয়া থেকে তাঁরা তো পরিত্রাণ পান না। একজন সাধকের কথা বলি। তিনি খুব নির্জন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে বিক্ষেপের কোন কারণ থাকবে না। গ্রামে গেলেন, অরণ্যেও গেলেন, সেখানেও নানা রকম বিক্ষেপ রয়েছে। খুঁজে খুঁজে শেষে একটা গুহা বার করলেন। সেখানে ঢুকে ভাবছেন বেশ গুহা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—কিছুই মনকে বিক্ষিপ্ত করবে না, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই ভেবে সেখানে আসন করে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করছেন।

---

১. গীতা—২/৫৯

সেই সময়ে গুহার মুখে কতকগুলি পাখি কিচ্ কিচ্ করছে। 'নাঃ, এখানেও হলো না'—বিরক্ত হয়ে তিনি গুহা থেকে বেরিয়েছেন, সেই সময় একজন সাধুর সঙ্গে দেখা। তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় যাচ্ছ? সাধক বললেন, একটি জায়গা খুঁজছি যেখানে কোন বিক্ষেপ না থাকে। এখানেও দেখি পাখি কিচ্ কিচ্ করছে। সাধুটি বললেন, আগে মনের কচ্কচানি থামাও।

এই মুশকিল আমাদের। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করলেও মনের কচ্কচানির নিবৃত্তি হয় না। জন্ম জন্ম ধরে কতরকমের সংস্কারের পুঁটলি মনে সঞ্চিত রয়েছে, অফুরন্ত ভাণ্ডার। তার থেকে ক্রমাগতই ফুটে উঠছে, তার নিবৃত্তি নেই, এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই। কাজেই বাহ্য উপায়ের দ্বারা তাদের কাজ বন্ধ করাটা পথ নয়। পথ হলো 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়া। এর অন্তিম তাৎপর্য হলো—মনকে আত্মবস্তুতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আসল কৌশল হচ্ছে এইখানে।

এইভাবে যদি আমরা মনের বৃত্তিগুলিকে শান্ত করতে পারি, মনকে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করে যদি আত্মসংস্থ হতে পারি—তাতে লাভ কী হবে? আমরা সবসময় লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখে কাজ করি—তাই লাভের কথা বলা দরকার। বলছেন—অমৃতত্ব লাভ হবে। অমৃতত্বের বিপরীত মৃতত্ব। সেটা কিরকম? না, আত্মাকে ভুলে থাকা। আমরা মরে আছি কারণ আত্মাকে ভুলে আছি। আমাদের স্বরূপ আত্মাকে ভুলে বাহ্যবস্তুকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার নাম মৃত্যু। আত্মা অমৃতস্বরূপ, তাঁতে স্থিতিই হলো অমৃতত্ব। দেবতাদের অমরত্ব এখানে লক্ষ্য নয় কারণ, তা আসল অমরত্ব নয়। দেবতারা হয়তো দীর্ঘজীবী হন কিন্তু তাঁরা অমর নন। যা কিছু আমাদের অনুভবগম্য তার ভিতরে আত্মা ছাড়া আর কেউ বা কিছু অমর নেই। তাই আত্মস্বরূপকে জানলে, তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে মৃত্যু আর আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই শরীরের যে নাশ তা মৃত্যু নয়। আত্মবিস্মৃতিই মৃত্যু, ইহলোকে এবং স্বর্গাদি লোকেও আত্মবিস্মৃতি রয়েছে।

বলা হলো, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা মনের বিক্ষেপ নাশ করতে হবে। মনের বিক্ষেপ নাশ মানে বিক্ষেপের কারণটি নাশ করতে হবে। সুষুপ্তিতে চিত্তের বিক্ষেপ থাকে না কিন্তু বিক্ষেপের কারণ অজ্ঞান থেকে যায় বলে সে অবস্থাতেও আত্মসংস্থ হতে পারি না। অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে ঐ বীজটি নষ্ট হয়। অদ্বৈত-বেদান্তীরা বলেন, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হলে, অজ্ঞান বিনষ্ট হলে তখন যা থাকে তা-ই থাকে। অর্থাৎ এক আত্মাই থাকেন—যিনি সর্বদাই রয়েছেন।

আত্মার স্বরূপকে বোঝাবার জন্য উপনিষদ্ 'প্রত্যগাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরাঞ্চি শব্দটির অর্থ করতে 'পরা' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিপরীত শব্দ হলো 'প্রতি'। 'প্রতি অঞ্চতি ইতি প্রত্যক্'—'অঞ্চতি' মানে 'গচ্ছতি', 'জানাতি', অর্থাৎ জানেন। যা বাইরের দিকে যায় অর্থাৎ অনাত্ম-

বস্তুতে, বিষয়ের দিকে যায়—তা পরাক্। আর যিনি ভিতরের বস্তুকে, আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকেই জানেন—তিনি প্রত্যক্। 'প্রত্যক্' যে আত্মা তিনি প্রত্যগাত্মা। 'পরাক্' আর 'প্রত্যক্' দুটি পরস্পর বিপরীত শব্দ। ইন্দ্রিয়গুলি পরাঞ্চি, আর আত্মা প্রত্যক্। শঙ্কর বলেছেন, আত্মা শব্দটি প্রত্যক্ বস্তুতেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ।

আত্মা শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

'যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানয়ম্।
যচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে।।'[১]

'যদ্ আপ্নোতি'—যা ব্যেপে থাকে, 'যদ্ আদত্তে'—যা আদান করে, গ্রহণ করে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুকে নিজেতে গুটিয়ে আনে। 'যদ্ অত্তি বিষয়ান্ ইহ'—যা এই দেহে থেকে বিষয়সমূহ ভোগ করে, 'যৎ চাস্য সততং ভাবঃ'—আর যার ভাব অর্থাৎ সত্তা অবিচ্ছিন্ন তাকে আত্মা বলে। আত্মা মানে আমি। আমি কিরকম? না, আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আমি নিজের মধ্যে সকলের উপসংহারক, আমি কর্তাভোক্তারূপে বিষয়ভোগ করি, আমি অবিচ্ছিন্ন সত্তা। এখানে আপ্, আঙ্ পূর্বক দা, অদ্ ও অত্, এই চারটি ধাতুর প্রত্যেকের উত্তর মন্ প্রত্যয় করে আত্মন্ শব্দটির ব্যুৎপত্তি চার রকমে দেখানো হয়েছে ঐ চারটি অর্থে। প্রথম তিনটি ধাতুর স্পষ্ট উল্লেখ শ্লোকটিতে আছে। চতুর্থ অত্ ধাতুটির স্পষ্ট উল্লেখ নেই। অততি অর্থ যা সর্বদা গমন করে বা যার সর্বদা প্রাপ্তি হয়। সাধারণ মানুষ যখন আত্মাকে বোঝে—তখন কোন একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করে বোঝে। যেমন, কখনো আত্মধর্ম শরীরে আরোপিত করে শরীরকে আত্মা বলে, চেতন বলে মনে করে। কখনো বা আত্মধর্ম ইন্দ্রিয়গুলিতে আরোপ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মা বলে। কাজেই আত্মস্বরূপের বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত অনুভূতি হচ্ছে। সব অনুভূতিরই পিছনে কিন্তু এই তত্ত্ব অনুস্যূত রয়েছে যে, আত্মা হচ্ছেন 'অনুচ্ছিত্তিধর্মা'[২] বা অবিনাশী। এই অবিনাশী আত্মাই প্রত্যগাত্মা। বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হয়ে বিবেকী পুরুষগণ প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করে থাকেন।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥২॥

অন্বয় ঃ—'বালাঃ' (বালকের মতো অবিবেকী ব্যক্তিরা) পরাচঃ (বাহ্য) কামান্ (ভোগ্য বিষয়সমূহের) অনুযন্তি (অনুসরণ করে) [এর ফলে] তে (তারা) বিততস্য (বহুকালব্যাপী) মৃত্যোঃ (অবিদ্যা-কামনা ও কর্মরূপ মৃত্যুর) পাশম্ (বন্ধন) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। অথ (সেইজন্য)

১. লিঙ্গ-পুরাণ—১/৫০/৯৬
২. বৃহদারণ্যক—৪/৫/১৪

ধীরাঃ (বিবেকী পুরুষগণ) অধ্রুবেষু (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে) অমৃতত্বম্ (অমৃতত্ব বা মোক্ষকেই) ধ্রুবম্ (নিত্য বলে) বিদিত্বা (জেনে) ইহ (এই সংসারে) ন প্রার্থয়ন্তে (কিছুই কামনা করেন না)।

'বালাঃ'—বালকগণ অর্থাৎ বালকের ন্যায় অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তিরা কি করে? 'পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি'—বাহ্য ভোগ্য বিষয়সমূহ অনুসরণ করে, বিষয়ের পিছনে পিছনে ছোটে। ছুটতে ছুটতে কোথায় পৌঁছায়? 'তে মৃত্যোঃ যন্তি বিততস্য পাশম্'—তারা মৃত্যুর যে পাশ, বন্ধন বিস্তৃত হয়ে রয়েছে—তার ভিতরে গিয়ে পড়ে। কামনার বশবর্তী হয়ে বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করলে ফল কী হয় তা সুন্দরভাবে এখানে বলা হলো। মৃত্যু তার চারিদিকে যেন জাল ছড়িয়ে রেখেছে—সেই জালের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। আমরা যখন বিষয়ের অনুসরণ করে চলি তখন ভেবেও দেখিনা যে মৃত্যুর অনুসরণ করছি। অথচ তা-ই হচ্ছে। পুকুরে চার ফেলে ছিপ বা জাল দিয়ে মাছ ধরে। মাছগুলো যখন চারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে ছোটে তখন জানে না যে সেখানে মৃত্যু ওৎ পেতে রয়েছে। না জেনেই তারা মৃত্যুর মুখে ছুটছে। মনে করছে কী আনন্দ, কেমন গন্ধ! কেমন খাদ্য! পরিণাম কী হচ্ছে? জালে আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে। অবিবেকী ব্যক্তিরাও এমনি অবিদ্যাবাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

এ তো বললেন অবিবেকীদের কথা। এখন বিবেকীদের কথা বলছেন—'অথ ধীরাঃ অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবম্ অধ্রুবেষু'—এই হেতু বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ অমৃতত্বই যে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য—একথা জেনে—'ইহ ন প্রার্থয়ন্তে'—এই সংসারে অধ্রুব বা মিথ্যা বস্তুবিষয়ে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি কী করে জাগতিক সুখকে চিরকাল ধরে রাখব। ভুলে যাই যে এই করতে গিয়ে মৃত্যুর পাশের মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছি, মৃত্যু যেখানে অবধারিত। রূপ-রসাদি সুখকে নিত্য বলে মনে করে তার পিছনে ছুটছি, মৃত্যুর কবলে পড়ছি। তাই শ্রুতি আমাদের সাবধান করছেন—যেও না, ও পথে যেও না। ও পথে গেলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আমাদের কানে সেই সতর্কবাণী পৌঁছচ্ছে না অথবা শুনেও বিশ্বাস করছি না। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সাক্ষাৎ সুখ এখানে। এ সুখ আমরা কেন ছাড়ব? মৃত্যু তো আছেই—যতক্ষণ পারি ভোগ করে নিই। কিন্তু বিচার করে দেখলে জাগতিক সুখের অনিত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হয়। প্রশ্ন করলে অনেকেই বলবেন—হ্যাঁ বিষয়সুখ অনিত্য। তাহলে কেন তার পিছনে ছুটছি? সদুত্তর কিছু নেই। ছোটাটাই স্বভাব। স্বভাব কথাটার মানে আগেই বলেছেন যে ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখ করে সৃষ্টি করে ভগবান যেন জীবকে হিংসা করেছেন। 'প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি

ঠারি'।[১] যে মন আমরা পেয়েছি তার স্বভাব হলো—সে বাহ্য বস্তুর দিকেই ছোটে, অন্তরাত্মার দিকে ছোটে না। সুতরাং তাকে দোষ দিলে হবে না। সে বেচারী কী করবে, তার কী দোষ আছে?—বলছেন রামপ্রসাদ। যে ভাবেই হোক, যে কারণেই হোক, ভগবান আমাদের হিংসা করুন বা আমরাই আমাদের হিংসা করি, অবস্থা হলো এই যে—আমরা মনের বিষয়াভিমুখী গতিকে বন্ধ করতে পারছি না। আর এ বিষয়ে চেষ্টাও না করার জন্য আমরা যেন সবেগে ছুটে গিয়ে মৃত্যুর কবলে পড়ছি। গীতায় ভগবান বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, অর্জুন দেখছেন কী করে সকল প্রাণী কালরূপী ভগবানের মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। সেই কালের গ্রাস রূপে সকলে ছুটে গিয়ে পড়ছে। কারো নিষ্কৃতি নেই। এর চেয়ে বাস্তবমুখী বর্ণনা আর হতে পারে না। সমস্ত জগৎ ধ্বংসের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। ভগবান বুদ্ধ এক জায়গায় বলছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে, চারিদিকে আগুন। সে কী বর্ণনা! ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বে আমরা মনে করছি—বেশ আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মাছগুলো জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে, মনে করে আর কোন ভয় নেই, বেশ আছি।[২] অধিকাংশ মানুষেরই এইরকম ভ্রান্ত ধারণা বা বিপরীত বুদ্ধি। এই যে মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে থাকা বা মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, এটি হচ্ছে বহির্মুখ গতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং বাঁচতে হলে বিপরীত দিকে মুখ ফেরাতে হবে, গতির অভিমুখ পরিবর্তন করতে হবে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফেরাতে হবে, দৃষ্টি বদলাতে হবে। এক কথায় 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হতে হবে। বিষয়ের দিকে না ছুটে যা থেকে সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি, যাতে সমস্ত বিষয়ের লয়, যা একমাত্র ধ্রুব সত্য সেই প্রত্যগাত্মার দিকে, আমাদের অন্তরতম আত্মার দিকে ফিরতে হবে। 'মন চল নিজ নিকেতনে'[৩]— সেই নিজ নিকেতনে ফিরে যেতে হবে। তার জন্য দৃষ্টিকে পরিবর্তন করা, জীবনের গতির মোড় ফেরানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ ছাড়া মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্য আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন সবই ব্যর্থ হবে। স্বেচ্ছায় আমরা মৃত্যুকে বরণ করছি, স্বেচ্ছায় তার কবলে পড়ছি আর মুখে হা-হুতাশ করছি, বলছি বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই আমরা ঠিকই কিন্তু এ পথ তো বাঁচার পথ নয়, মৃত্যুর পথ। কারণ, আত্মাকে জানাই হচ্ছে জীবন, ভুলে থাকা মানে মৃত্যু। আমরা আত্মাকে ভুলে সর্বদা অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছি—সুতরাং মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। এ থেকে বাঁচবার উপায় বিপরীতমুখী চেষ্টা, বিষয়াভিমুখী গতিকে ফিরিয়ে আত্মার দিকে যাওয়া, বাহ্যবস্তু ছেড়ে অন্তরে প্রবেশ করা। এই অন্তর্মুখীনতার ফলে

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮
২. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬
৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২২৯

একের পর এক দরজা অতিক্রম করে যখন একেবারে অন্তরের মণিকোঠায় পৌঁছাব, তখন দেখব যে সেখানেই চিরশান্তি, সেখানেই অমৃতত্ব।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ ॥৩॥

অন্বয় ঃ—যেন (যে) এতেন (এই) যেন এতেনৈব (এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর দ্বারাই) [মনুষ্যগণ] রূপম্, রসম্, গন্ধম্, শব্দান্, স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ) মৈথুনান্ চ (এবং পরস্পর মিলনজাত সুখ) বিজানাতি (বিশেষভাবে উপলব্ধি করে)। [সুতরাং] অত্র (এই জগতে) [সেই আত্মার] কিম্ (কোন অবিজ্ঞাত বস্তু) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)। এতৎ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই পরম পদ)।

'যেন এতেনৈব বিজানাতি'—যে আত্মচৈতন্যের দ্বারা বিষয়সমূহের ভোগ হয়—তার দ্বারাই বিষয়ের জ্ঞান হয়, সেই আত্মার অবিজ্ঞেয়—'কিম্ অত্র পরিশিষ্যতে'—এমন কোন্ বস্তু অবশিষ্ট আছে? এমন কোন জ্ঞান নেই যা আত্মার দ্বারা বিজ্ঞেয় নয়। আত্মা ছাড়া কোন জ্ঞান, কোন বস্তুর প্রকাশ সম্ভব নয়—এইভাবে যদি বিচার করি তাহলে বুঝব সর্ববস্তুর প্রকাশক যিনি তিনিই আমার আত্মা, তিনিই নিত্য বস্তু। নচিকেতার প্রশ্ন ছিল—আত্মাকে কী করে জানব? তার উত্তরে যম বলেছেন—নিজের স্বরূপকে বিশ্লেষণ কর। যাকে 'আমি আমি' বলছ, তাকে ভাল করে বিশ্লেষণ করলে তবে তোমার যথার্থ 'আমি' কোন্‌টি তা বোঝা সম্ভব হবে। সোজা উপায় বলে দিলেন—যেটি দার্শনিক বিচার সম্মত। বললেন—সর্ববস্তুকে যে জানে সেই আত্মা। সর্ববস্তুকে জানে বলতে দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, চৈতন্য—সব মিলিয়ে একটা সংঘাত, একটা মিশ্রিত বস্তু, তাকে আমরা 'আমি' বলে জানি। তাকেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা বলে মনে করি। কিন্তু তাতে দোষ হচ্ছে এই যে, সেই জ্ঞাতার যে বিভিন্ন অবস্থা—সেগুলিকে কে জানে? অতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা থাকলে তার দ্বারা অবস্থাগুলিকে জানা যায়। একটি সাধারণ নিয়ম আছে—যে জানে আর যাকে জানে—এরা পৃথক হবে। এখন, বিচার করে দেখতে হবে—যা কিছু অনুভব হচ্ছে, দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাত, তা কি নিত্য বস্তু? না। কারণ, সংঘাত মাত্রই অনিত্য। অনিত্য হলে সে আত্মা নয়, এইজন্য তার প্রকাশের জন্য সে অন্যবস্তুর অপেক্ষা রাখে। কি স্থূল জগৎ, কি আমাদের দেহ—সবের সম্বন্ধে একই কথা। স্থূল জগতের এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এরা কেউই স্বপ্রকাশ নয়। রূপ রসকে, রস শব্দকে জানে না। এরা যেমন পরস্পর পরস্পরকে জানে না তেমনি একটি অন্য সমষ্টিগুলিকেও জানে না। এরা নিজেরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না, অন্যে এদের প্রকাশ করে। কাজেই এরা স্বপ্রকাশ নয়, পরপ্রকাশ। বিষয়গুলি যেমন পরপ্রকাশ তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিও

পরপ্রকাশ। ইন্দ্রিয়াদি নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। কারণ তারা পরিবর্তনশীল। তাদের ক্রিয়ার পিছনে কেউ চেতন আছেন যিনি দেখছেন, বোধ করছেন। দেহ জ্ঞাতা নয়, ইন্দ্রিয়গুলিও জ্ঞাতা নয়। তাহলে কি মন জ্ঞাতা হবে? তাও নয়, যেহেতু মনের বিভিন্ন অবস্থাকে আমরা জানি, অতএব মন জ্ঞেয়। যাকে জানি সে জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞাতা নয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সব এই পর্যায়ে পড়ল। তাহলে বাকি রইল কী? এমন একটি বস্তু বাকি রইল—এই সবগুলি যার বিষয়। এখানে সে কথাই বলেছেন।

বিচারের ধারাটা সংক্ষেপে এই—যে জানে—সে বিষয়ী আর যাকে জানে—সে বিষয়। তাহলে আত্মা কী? আত্মাকে আমরা জানি কি না। যদি না জানি তাহলে আত্মার সম্বন্ধে কিছু আর বলবার থাকে না। আর যদি জানি তাহলে আত্মা বিষয় হয়ে যান। তার উত্তরে বললেন—আত্মস্বরূপ এমনই যে, তাকে ছাড়া কিছু জানতে পারি না, কারণ সে নিত্য জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত, জ্ঞেয়রূপে নয়।

এই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের স্বতঃ একটি অনুভূতি আছে। আত্মাকে জানে না—এমন নির্বোধ পৃথিবীতে নেই, তবে তাঁকে বিশেষ রূপে জানে—এমন ব্যক্তিও বিরল। আমি আছি, কিন্তু আমার স্বরূপ কী তা হয়তো আমি প্রকাশ করে বলতে পারছি না। কারণ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তু দুটি জড়িয়ে আত্মস্বরূপ আমার কাছে মিশ্রিতরূপে উপস্থিত হচ্ছে। এই তথ্যটিকে যদি পরিষ্কার করে ধরতে পারি তাহলে আমি আত্মজ্ঞানের অধিকারী। অধিকারী অর্থ এই নয় যে, কোনরকম করে তত্ত্বটিকে বোঝা। অধিকারী কেবল শব্দের সাহায্যে তত্ত্বকে বুঝবে এমন নয়, সে অসন্দিগ্ধভাবে তত্ত্বটিকে অনুভব করবে। আত্মজ্ঞানে আত্মা বিষয়রূপে নয়, নিত্য সাক্ষীরূপে বর্তমান। এই জ্ঞানে সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। অসন্দিগ্ধ, অবিপর্যস্ত আত্মজ্ঞানই আত্মবিষয়ক সকল অজ্ঞানকে দূর করতে পারে। এইভাবে জ্ঞান না হবার কারণ, যে বুদ্ধির সাহায্যে আমরা জ্ঞানের অন্বেষণ করি সে বুদ্ধির মালিন্য যায়নি।

তাহলে উপায় কী? এইজন্য আগে (পৃঃ ১২৪) বলেছেন—

'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।' (১/২/২৪)

—যে দুরাচার থেকে বিরত নয়, সংযতেন্দ্রিয়, সমাহিতচিত্ত নয় এবং ভোগস্পৃহারহিতও নয়—সে প্রজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানতে পারে না। সুতরাং আবার আমাদের গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে যে, প্রথম ধাপ হলো আচারশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মনের একাগ্রতা এবং যে একাগ্রতার পরিণামে সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যশূন্যতা—যাকে যোগের ভাষায় সমাধি বলি—সেই অবিচ্ছিন্ন আত্মসমাধি না হওয়া পর্যন্ত যতই বিচার করি তা ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

যেখানে আরম্ভ করবার কথা সেখানে করিনি। গাছের পাতায় জল ঢালছি তবু গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ যেখানে জল দিলে গাছে রসের সঞ্চার হবে সেখানে দিচ্ছি না। সাধনের গোড়ার কথাটিকে না ধরে খালি বুদ্ধির জাল বুনছি। মনে হচ্ছে বুদ্ধি আমাদের বহুদূরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের সময় ধরা পড়ে যে—যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি।

আরম্ভ হচ্ছে আচরণ থেকে। তারপর ইন্দ্রিয়সংযম, মনের একাগ্রতা, শেষে সমাধি। কিন্তু যেরকম অকপটভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত সেভাবে করি না। কপটতা এইখানে যে, বড় বড় কথা উচ্চারণ করি কিন্তু যে উপায় অনুসরণ করলে সত্যে পৌঁছান যায়, দুঃসাধ্য বলে তা করি না। এর চেয়ে কথা বলা অনেক সহজ। শাস্ত্রের বা সিদ্ধপুরুষের কতকগুলি কথা মুখস্থ করে রাখি আর বলি আত্মা এইরকম। কিন্তু সেই জ্ঞান সাধনের পথে বা বন্ধনমুক্তির পথে এগিয়ে দেয় না—যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাই। কেবল শব্দবিদ্ হলাম, আত্মবিদ্ হলাম না। আত্মা সম্বন্ধে এমন জ্ঞান হলো না, যার দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়। সাধনের সময় এটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় বড় কথা শুনলে অনেক সময় বিরক্ত হতেন। বলতেন—এতে লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়। 'আমি ব্রহ্ম'[১]—একথা বলা ভাল নয়। যা সত্য তা বলতে নিষেধ করছেন কেন? পাছে আমরা কপটতা করি, কথা দিয়ে অপরকে অভিভূত করবার চেষ্টা করি, অথচ নিজেদের সাধনজীবনের যেখানে সূত্রপাত সেদিকে দৃষ্টি না দিই—তাই সাবধান করে দিচ্ছেন। বলছেন, যদিও এটি শেষ কথা—কিন্তু শেষ কথাকে গোড়ায় টেনে আনলে কোন লাভ হবে না। গোড়ার কথাটি হলো চরিত্রের শুদ্ধি, যে শুদ্ধি না হলে কোন কাজ হয় না। পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, আমরা কথা দিয়ে লোককে ভোলাবার চেষ্টা করি, নিজেরাও ভুলে থাকি। সাধকের জীবনে এর চেয়ে বড় অকল্যাণ আর নেই। তবে কি আমরা এসব তত্ত্ব আলোচনা করব না? করব এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গোড়ার কথাটিও মনে রাখব, যা শাস্ত্রই বলে দিচ্ছেন 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ'[২]—ইত্যাদি মন্ত্রটিতে। মন্ত্রটি সর্বদা আমাদের মনের সামনে যেন ধরা থাকে। তাহলে বুঝতে পারব কথার কচকচি সাধনের পক্ষে খুব বেশি মূল্যবান নয়। শ্রীরামকৃষ্ণও এ সম্বন্ধে বারবার আমাদের সতর্ক করেছেন।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪॥

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯

২. কঠোপনিষদ্—১/২/২৪

অন্বয় ঃ—যেন (যে আত্মার বা সাক্ষীচৈতন্যের দ্বারা) [লোকে] স্বপ্নান্তম্ (স্বপ্নকালীন দৃশ্যসমূহ) জাগরিতান্তম্ চ (এবং জাগ্রৎকালীন দৃশ্যাবলী) উভৌ (উভয় বস্তুই) অনুপশ্যতি (দর্শন করে)[সেই] মহান্তম্ (মহান্) বিভুম্ (সর্বব্যাপী, সর্বাধিষ্ঠান) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) মত্বা (মনন পূর্বক উপলব্ধি করে) ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না)।

আত্মার স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয় বলে শ্রুতি বারবার করে বিষয়টি বলছেন—'স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চ উভৌ যেন অনুপশ্যতি'—স্বপ্নকালে এবং জাগ্রৎকালে লোকে যে বিষয়গুলি দেখে অর্থাৎ অনুভব করে, সেই উভয় অনুভবেরই কর্তা হলেন আত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য। এই সাক্ষীচৈতন্যের সাহায্যেই এই অনুভব সম্ভব হয়। 'ধীরঃ'—ধীমান্ অর্থাৎ বিবেকী, মননশীল ব্যক্তি—'মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা'—সেই অনুভবের সাক্ষী, সর্বব্যাপী বিভুরূপে প্রতীয়মান আত্মাকে মননের দ্বারা সাক্ষাৎ করে—'ন শোচতি'—শোক করেন না। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি—'আমিই সেই পরমাত্মা'—এই রূপে নিজেকে বোঝেন এবং শোকাতীত হন। তাৎপর্য হলো—স্বপ্ন বা জাগ্রৎকাল যাই হোক, সর্বপ্রকার অনুভবের সাক্ষীরূপে নিজেকে জানতে হবে। তাহলেই জীব শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অর্থাৎ শোক-দুঃখের অতীত হবার উপায় হলো সকল অনুভবের কর্তা আত্মাকে, সাক্ষীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ করা।

এই বিষয়েই আরো বলা হচ্ছে—

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ইমম্ (এই) মধ্বদম্ (মধু কর্মফল, অত্তি অর্থাৎ ভক্ষণ করেন অর্থাৎ কর্মফল ভোগকারী) জীবম্ (প্রাণাদির ধারক জীবরূপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) ভূত (অতীত) ভব্যস্য (ভবিষ্যতের অর্থাৎ সর্বকালের, সর্বজগতের) ঈশানম্ (নিয়ন্তারূপে) অন্তিকাৎ (পরমাত্মার সমীপস্থ অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে অভিন্নরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] ততঃ (সেই জ্ঞানের পর) ন বিজুগুপ্সতে (নিজেকে আর গোপন করতে বা রক্ষা করতে অথবা কাউকে ঘৃণা করতে উৎসুক হন না)। এতৎ বৈ (ইনিই সেই) তৎ (ব্রহ্ম)।

'যঃ'—যিনি; অর্থাৎ জীবরূপে প্রতীত যিনি, তিনি এই সকল কর্মফলের ভোক্তাকে নিজের আত্মারূপে জানেন এবং সেই জানা কেবল শাস্ত্রজ্ঞান থেকে পরোক্ষরূপে নয় কিন্তু—'অন্তিকাৎ'—নিকটতমরূপে অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে হওয়া দরকার। তিনিই আবার কালত্রয়ের নিয়ন্তা, অতীত এবং ভবিষ্যতের, সুতরাং বর্তমানেরও নিয়ন্তা। এই জ্ঞানের ফলে তিনি অভয়স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। সেইজন্য নিজেকে গোপন করতে ইচ্ছা করেন না।

এখানে মনে রাখতে হবে, শ্রুতি বলছেন—'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি'[১]—দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয়। অতএব সর্ব দ্বৈতের অতীত সেই তত্ত্বের

---

১. বৃহদারণ্যক—১/৪/২

জ্ঞান হলেই তত্ত্বজ্ঞের অভয়স্বরূপতা প্রাপ্তি হয়। সে আর কার নিকট থেকে কী বস্তু গোপন করবে? কারো থেকে ভয় নেই বলে সে নিজেকে রক্ষা করতেও সচেষ্ট হয় না। সর্ববস্তুর সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বোধ হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তার ঘৃণাও হতে পারে না।

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত এতদ্বৈ তৎ ॥৬॥

অন্বয় ঃ—যঃ (যে হিরণ্যগর্ভ) অদ্ভ্যঃ (অপ্ বা জলের দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূতের) পূর্বম্ (পূর্বে) তপসঃ (জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে) অজায়ত (উদ্ভূত হয়েছিলেন) গুহাম্ (সর্বভূতের হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করে) ভূতেভিঃ (পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে) তিষ্ঠন্তম্ (বিরাজমান আছেন) [সেই] পূর্বম্ জাতম্ (প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে) যঃ (যে সাধক) ব্যপশ্যত (বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন)। [তিনি] এতৎ বৈ তৎ (সেই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করেন]।

পূর্বে যাঁকে প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর বলে নির্দেশ করা হয়েছে তিনিই যে আত্মস্বরূপ এখন তা বলছেন—'যঃ পূর্বং তপসঃ জাতম্'—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে প্রথমজাত পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ—'অদ্ভ্যঃ পূর্বম্ অজায়ত'—অপ্ সৃষ্টির পূর্বে যিনি জন্মলাভ করেছিলেন। এখানে অপ্ শব্দে শুধু জল নয়, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতকেই বোঝাচ্ছে। পঞ্চভূত সৃষ্টির পূর্বে যিনি জন্মেছেন অর্থাৎ নামরূপকে যিনি প্রথম অভিব্যক্ত করেছেন, সেই প্রথম আবির্ভূত তত্ত্বই হলেন হিরণ্যগর্ভ। 'তপসঃ' বলতে জ্ঞানস্বরূপ, সৎ-চিদ্-আনন্দ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁকেই বোঝানো হচ্ছে। 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'[১]—বলে শ্রুতিতে তাঁরই উল্লেখ আছে। তিনি আবার—'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্'—প্রাণিগণের হৃদয়গুহাতে, হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়ে জীবরূপে অবস্থান করছেন এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ করছেন। 'তিষ্ঠন্তং ভূতেভিঃ'—কার্যকারণরূপ ভূতগণের সঙ্গে বর্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভকে—'যঃ ব্যপশ্যত'—যে মুমুক্ষু পুরুষ দর্শন করেন তিনি সেই পূর্বকথিত ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। যদিও প্রকাশের তারতম্য আছে তথাপি হিরণ্যগর্ভ সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কেউ নন। তিনি প্রথম ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এইজন্য ব্রহ্ম থেকে তাঁর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নন। সুবর্ণের অলঙ্কার যেমন সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয়, তেমনি ব্রহ্ম থেকে আবির্ভূত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নন।

অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তে কার্য-কারণের অভেদ স্বীকৃত হয়েছে। কিরকম করে? যদি একেবারে অভেদ হয় তাহলে কার্য এবং কারণ এই দুটি তো বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে অন্তত কিছু পার্থক্য তাহলে স্বীকার করতে হয়। অভেদ বলা হয়েছে তত্ত্বে। কার্য থেকে কারণ স্বরূপত ভিন্ন নয়। কার্যটি

---

১. মুণ্ডক—১/১/৯

বস্তুতপক্ষে কারণে কল্পিত। কার্য আপাত প্রতীত, তার স্বরূপ হলো কারণ। স্থূল থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মে গিয়ে অবশেষে কার্য-কারণাতীত তত্ত্বে পৌঁছান যায়। তাঁকে বলা হয়—সর্বকারণাতীত। তিনি ঈশ্বর। তারও পরে আর একটি তত্ত্ব বেদান্ত শাস্ত্র কল্পনা করেন, যে তত্ত্বটি কার্যও নয়, কারণও নয়। কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত জগৎ তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত, তিনিই পরমতত্ত্ব; তাঁকে অবলম্বন করেই সমস্ত কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবস্থান করছে। তিনিই কার্যকারণাতীত নির্বিশেষ ব্রহ্ম। ইংরেজীতে তাঁকে বলা যায়—Absolute—আর বাকি সবই **relative** অর্থাৎ কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সকল সম্বন্ধের অতীত সেই পরমতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য এখানে এই ক্রমটির অনুসরণ করা হয়েছে।

তারপরেই বলছেন—'এতদ্বৈ তৎ'—এই তিনিই আবার পরমতত্ত্ব। এরকম ভুল যেন কেউ না করেন যে, হিরণ্যগর্ভ আবার একটি নতুন তত্ত্ব। তা নয়। যাঁর থেকে হিরণ্যগর্ভের উদ্ভব তিনি হলেন তাঁর স্বরূপ। অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম আর হিরণ্যগর্ভ দুটি ভিন্ন তত্ত্ব নয়। স্বরূপত এক কিন্তু অভিব্যক্তিতে ভিন্ন। একটিকে বলা যায় পারমার্থিক তত্ত্ব আর একটিকে ব্যবহারিক তত্ত্ব। সেই পারমার্থিক তত্ত্বটিই আত্মা। এই আত্মতত্ত্বই নচিকেতার জিজ্ঞাস্য ছিল। নচিকেতার প্রশ্নের অনুসরণ করে আলোচনা চলেছে। দেখা যাচ্ছে এই জগৎ যাঁর থেকে এসেছে, যেখানে অবস্থিত হয়ে রয়েছে, অন্তে যেখানে লয় হবে অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগতের কারণ তিনিই পারমার্থিক তত্ত্ব। যেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই তাও তিনি। 'এতদ্বৈ তৎ' বলে এই কথাটিই বোঝানো হয়েছে।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত এতদ্বৈ তৎ॥৭॥

অন্বয় ঃ—[পূর্ব শ্লোক থেকে 'যঃ ব্যপশ্যত' অংশটুকুর অনুবৃত্তি হয়েছে] যা (যে) দেবতাময়ী (সর্বদেবস্বরূপা) অদিতিঃ (শব্দাদি যাবতীয় বিষয়ের ভোগকর্ত্রী পরাশক্তি) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপে) সম্ভবতি (অভিব্যক্ত হন), যা (যিনি) ভূতেভিঃ (সর্বভূতসমন্বিত হয়ে) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হয়েছেন) [সেই] গুহাম্ (হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশপূর্বক) তিষ্ঠন্তীম্ (অবস্থিতা) [অদিতিকে] [যিনি দর্শন করেছেন তিনি] এতৎ বৈ তৎ (সেই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করেন]।

'যা অদিতিঃ'—অদিতি শব্দের অর্থ এভাবে করেছেন যে সমস্ত জগৎ যাঁর মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়, লীন হয়, শব্দাদির যিনি গ্রহণকারিণী। 'দেবতাময়ী'—সর্বদেবাত্মিকা সেই অদিতি, 'যা ভূতেভিঃ ব্যজায়ত'—তিনি ভূতগণসমন্বিতা হয়ে, 'প্রাণেন সম্ভবতি'—হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম থেকে আবির্ভূত হন। সেই তিনিই আবার 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং'—হৃদয়রূপ গুহাতে প্রবেশ করে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে যিনি দর্শন করেন তিনি—'এতদ্বৈ তৎ'—ঐ ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।

আগের কথাটি এখানে আর একদিক দিয়ে বিস্তার করে বলা হলো। হিরণ্যগর্ভই পরমতত্ত্ব, যিনি সমস্ত ভূতের লয়স্থান, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়গুহাতে ভূতবিশিষ্টরূপে প্রবেশ করে অবস্থান করছেন, তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নন। তাঁকে যিনি দর্শন করেন তিনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন।

নিচের মন্ত্রে এটি আরো বিস্তার করা হলো।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥৮॥

অন্বয় ঃ—গর্ভিণীভিঃ (অন্তঃসত্ত্বা রমণীগণ দ্বারা) গর্ভঃ ইব (গর্ভস্থ শিশুর মতো) অরণ্যোঃ (উত্তরারণি ও অধরারণি এই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে) নিহিতঃ (অবস্থিত) জাতবেদাঃ (সর্বজ্ঞ) অগ্নিঃ (যজ্ঞীয় ও হৃদয়স্থ বিরাটরূপ অগ্নি) সুভৃতঃ (উত্তমরূপে রক্ষিত হন)। [যিনি] জাগৃবদ্ভিঃ (জাগ্রত অর্থাৎ প্রমাদরহিত) হবিষ্মদ্ভিঃ (হবনকারী ও ধ্যানপরায়ণ) মনুষ্যেভিঃ (যোগী ও যাজ্ঞিকগণ দ্বারা) দিবে দিবে (প্রতিদিন) ঈড্যঃ (স্তুত হন, যাঁকে হৃদয়ে ধ্যান করা হয়) এতৎ বৈ তৎ (এই যজ্ঞীয় অগ্নি ও বিরাট পুরুষরূপ অগ্নিই সেই ব্রহ্ম)।

এখানে অগ্নি সম্বন্ধে বলছেন—'অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাঃ'—দুটি অরণির মধ্যে অবস্থিত যে অগ্নি। অরণি মানে যজ্ঞকাষ্ঠ। যজ্ঞে অগ্নি চয়ন করবার নিয়ম হলো, দুটি যজ্ঞকাষ্ঠ (একটি উপরে থাকে বলে উত্তরারণি অপরটি নিচে থাকে বলে তার নাম অধরারণি) ঘর্ষণ করে করে অগ্নি প্রজ্বালন করা হয়। সেই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হতো। দুটি অরণির মধ্যে অবস্থিত যে অগ্নি তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—'গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ'—অন্তর্বত্নী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সুপথ্য সেবনের দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে সতর্কভাবে পালন করেন সেই রকম এই অরণিদ্বয়ের অন্তরে গর্ভস্থ শিশুর মতো অগ্নি রয়েছেন। মাতৃগর্ভে অবস্থিত শিশুকে যেমন বাইরে দেখা যায় না, অরণিদ্বয়ের অন্তর্লীন অগ্নিকেও তেমনি বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হলে যেমন দৃষ্টিগোচর হয় তেমনই অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণের ফলে প্রকাশিত অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অরণি মধ্যে স্থিত অপ্রকট সেই অগ্নিও পরব্রহ্মই। এখানে অগ্নি বলতে তেজস্ ধাতুরূপ অগ্নিকে বলা হয়নি, প্রকাশধর্মী হিরণ্যগর্ভই এখানে অগ্নিপদবাচ্য, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

আরো বলছেন—

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥৯॥

অন্বয় ঃ—চ (এবং) যতঃ (যে প্রাণকে আশ্রয় করে) সূর্যঃ (সূর্য তথা বিশ্বপ্রপঞ্চ) উদেতি (উদিত হন) যত্র চ (এবং যে প্রাণে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন) তম্ (তাঁকেই)

সর্বে দেবাঃ (সকল দেবতা) অর্পিতাঃ (আশ্রয় করে আছে) কঃ চন (কেউই) তৎ (তাঁকে) ন উ অত্যেতি (কখনো অতিক্রম করে না)। এতৎ বৈ তৎ (ইনি সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম)।

'যতঃ সূর্যঃ উদেতি'—যে প্রাণ থেকে সূর্য উদিত হন এবং—'যত্র চ অস্তং গচ্ছতি'—যাতে অস্ত যান, সেই প্রাণ থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি আবার সমস্ত জগৎ তাতেই লয় পায়। এইকথা বোঝাবার জন্য বলছেন—যেখান থেকে সূর্যের উৎপত্তি সেখানেই তার লয়। 'তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাঃ'—সেই প্রাণরূপ আত্মাতে সমস্ত দেববৃন্দ সম্প্রবেশিত। যেমন রথচক্রের নাভিরূপ কেন্দ্রে অরগুলি অর্থাৎ চক্রের শলাকাগুলি সম্প্রবিষ্ট হয়ে আছে।

অর্থাৎ আমরা জগৎবিস্তারের বাইরের দিকটায় বহুধা বিভক্তরূপে যাদের দেখছি তাদের উৎপত্তি স্থানে গেলে দেখি তারা সব সেই এক ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে রয়েছে। যে তত্ত্বে তাদের অবস্থান তাঁকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। তাঁর থেকেই সমস্ত জগতের বিস্তার। এইজন্য তাঁকে বললেন—'তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাঃ'—তাঁতেই সমস্ত দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি অবস্থিত। 'দেব' শব্দের অর্থ দেবতা বা ইন্দ্রিয়—দুরকমই হতে পারে। হিরণ্যগর্ভেই অধিদৈব অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতি আর অধ্যাত্ম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সব রথের চাকার নাভিতে শলাকাগুলির মতো কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। জগতের যখন প্রকাশ হয় তখন সেই প্রকাশ যেমন, তেমন সেই নাভি অর্থাৎ জগৎকেন্দ্র হিরণ্যগর্ভ—উভয়কেই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র বলে বুঝতে হবে। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মই সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছেন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী মানে—তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তা নয়, বা সমস্ত ছড়িয়ে বিস্তার করে রয়েছেন তাও নয়। ছড়িয়ে থাকা, বিস্তৃত হয়ে থাকা হলো দৈশিক ব্যাপকতা। ব্রহ্মের ব্যাপকতা সেই দৃষ্টিতে নয়। ব্রহ্ম ব্যাপক এই হিসাবে, যেমন কারণ কার্যে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ কার্য যেমন কারণকে ছেড়ে থাকতে পারে না সেইরকম জগৎ ব্রহ্মকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত সত্তা জগতের নেই। এই অর্থে জগতে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। 'ব্যাপক' শব্দের অর্থ এই। ব্যাপক কথার দ্বারা আর একটি অর্থও ভাষ্যকার বলে দিচ্ছেন যে—ব্রহ্ম ছাড়া এ জগৎ আর কিছু নয়। যা দেখছি সবই তিনি।

এই কথাটি বোঝাবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যেরকম করে বলছেন, অদ্বৈতবাদী সেরকম করে বলেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের ভিতরে স্বগতভেদ স্বীকার করেন, বৈচিত্র্য স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের ভিতরে বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ব্রহ্ম জগতে ব্যাপ্ত মানে—ব্রহ্ম ছাড়া জগতের আর কোন সত্তা নেই। দৃশ্যমান জগৎকে আমরা যে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নরূপে মনে করি সেটা আমাদের ভ্রম মাত্র। অর্থাৎ তাঁদের মতে—ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত, যেমন রজ্জুতে সর্প আরোপিত। রজ্জুই আছে সর্প নেই—এই

অর্থেই তার ব্যাপকতা। রজ্জু আছে, সর্পও আছে—এরকম করে বলা নয়, রজ্জু আর সর্প অভিন্ন—এ ভাবেও নয়। জগৎও আছে, ঈশ্বরও আছেন, সেই ঈশ্বর জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন—সেই অর্থ গ্রাহ্য নয়। তত্ত্ব হলো—জগৎ বস্তুতপক্ষে নেই, ঈশ্বরই আছেন।

যে জগৎকে আমরা এত স্পষ্ট করে দেখছি, যার অভিজ্ঞতা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তাকে নেই বলা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। কাজেই ঐ সিদ্ধান্তটি খ্রীস্টানরা নেন না। তাঁরা বড়জোর যাকে বলে baptism, যা অনেকটা আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতের ভাব—সেই ভাবটি স্বীকার করে বুঝতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—মোমের ফল, মোমের ফুল, মোমের গাছ, মোমের বাগান[১]—সেভাবে ব্রহ্মই সব হয়েছেন—এ তত্ত্ব আমরা খানিকটা ভাবতে পারি। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—সব বস্তু যেমন নুনে জরে আছে তেমনি ব্রহ্মবস্তুর দ্বারা এই জগৎ জরে আছে। জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্রহ্মবস্তু অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন—এটিও খানিকটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নেই—এ কথাটি ধারণা করা বড় কঠিন।

বেদান্তে সেইজন্য রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। যখন 'এতদ্বৈ তৎ' বলছেন তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, অধিষ্ঠান ব্রহ্ম এবং আরোপ্য এই জগৎ, দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নাকি! ভিন্ন ভিন্ন হলে 'এতদ্বৈ তৎ'—এই সেই—একথা বলা যেত না।

ভিন্ন, পরিচ্ছিন্ন, নামরূপাত্মক জগতের কল্পনা যে আমাদের হচ্ছে সেই ভ্রমকল্পনা যেন না হয়—এই উদ্দেশ্যে আত্মচৈতন্যের সার্বকালিক একত্ব প্রদর্শন করে বলছেন—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১০॥

অন্বয় ঃ—ইহ (এখানে, এই দেহে) যৎ (যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সংসারীর মতো অবিবেকীর কাছে প্রতিভাত) তৎ (তিনিই) অমুত্র (সেখানে, বিবেকবানের দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম) যৎ অমুত্র (যিনি বিবেকীর কাছে নিত্যচৈতন্যস্বরূপ) ইহ তৎ অনু (এখানে তিনিই বিভিন্ন উপাধির জন্য বহুরূপে প্রকাশিত) যঃ (যিনি) ইহ (অখণ্ডৈকরস আত্মাতে) নানা ইব (পরস্পর যেন ভিন্ন এইরকম) পশ্যতি (অনুভব করেন) সঃ (তিনি) মৃত্যোঃ (মৃত্যু থেকে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন, সংসারপ্রবাহে আবর্তিত হতে থাকেন)।

'যদ্ এব ইহ তদ্ অমুত্র'—যা এখানে তা-ই ওখানে। যে এখানে ভিন্নরূপতা দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে গমন করে। ভাব হচ্ছে, এখানে এই যে

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০, ৮৬২ ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২৩

সংসারী জীবকে আমরা ব্রহ্ম থেকে পৃথক রূপে যে কল্পনা করছি তা ভ্রান্তিমাত্র। আসলে আমাদের সমস্ত অনুভূতির অগোচর, ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমাদের ব্যবহারের অতীত পরব্রহ্মই এখানে জীবরূপে অবস্থান করছেন। 'যঃ ইহ নানেব পশ্যতি'—যে এর ভিতর ভেদ দর্শন করে সে—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি'—সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে গমন করে।

আসল কথা হচ্ছে ভেদদৃষ্টি থেকেই মৃত্যু। আমরা এক দেহ পরিত্যাগ করে আর একটি দেহে যাচ্ছি, এরকম করে শরীরের পরম্পরাকে গ্রহণ করছি। কে সেই আমরা? যদি জীব বলে নিজেদের পৃথক রূপে ভাবি, কর্তা-ভোক্তা-রূপে আলাদা করে কল্পনা করি, তাহলে এই জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যাওয়া কোনদিন বন্ধ হবে না। যদি মৃত্যুর অতীত হয়ে যেতে চাই, অমরত্ব লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবভাবকে পরিত্যাগ করতে হবে। জানতে হবে—এই ক্ষুদ্রত্ব এক অসীম সত্তার উপর কল্পিত মাত্র। যিনি স্বরূপত ভূমা তিনিই জীবরূপে, অবচ্ছিন্ন রূপে প্রতীত হচ্ছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে—আমরা বেদান্তের আলোচনা কেন করছি, উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে—আমাদের এই যে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন সত্তা, এতে আমাদের তৃপ্তি নেই। মর্তজীব হয়ে, মরণশীল অবস্থায় মানুষ অসুখী বলেই অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করছে। 'ভূমা এব সুখং'[১], 'যদল্পং তন্মর্ত্যং'[২]—যা সীমিত, ক্ষুদ্র তা-ই ক্ষয়শীল, যা ভূমা, বৃহৎ, তা-ই সুখস্বরূপ। যত কিছু শাস্ত্র আলোচনা তার পিছনে কিন্তু এই একটিই উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমর হতে চায়—'অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্'[৩]—সেই অমৃতত্বকে লাভ করার জন্যই মানুষ বহুবিধ চেষ্টা করছে। আমরা এমন এক সত্তার অন্বেষণ করছি যার কোন কালে বিনাশ হবে না।

এখানে বললেন—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—যেখানে সে নিজেকে ভিন্নরূপে দেখে, অর্থাৎ মনে করে—জগতে সে একটি আর পরমেশ্বর একটি। সেইজন্য তাকে পরম্পরাক্রমে জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। আসা-যাওয়া বন্ধ করার উপায় একত্বের উপলব্ধি—যা এখানে তা-ই সেখানে, যাঁকে জীবরূপে দেখছি তিনিই অমৃতধর্মী পরমেশ্বর। যাঁকে পরমেশ্বর বলছি তিনিই এই দেহে অভিমানী হয়ে জীবরূপে রয়েছেন। জীব এবং ঈশ্বর—বিশেষণ, পরিচ্ছেদযুক্ত আত্মা এবং অপরিচ্ছিন্ন আত্মা উভয়ে অভিন্ন। এদের ভিতরে কোন পার্থক্য নেই। যাঁরা পার্থক্য দেখেন তাঁরা মৃত্যুগ্রস্ত হন। পার্থক্য যে আমরা ইচ্ছা করে দেখি তা নয়। আমাদের মধ্যে এটি

১. ছান্দোগ্য—৭/২৩/১
২. তদেব—৭/২৪/১
৩. কঠোপনিষদ্—২/২/১

একেবারে দৃঢ়ভাবে আরূঢ় হয়ে রয়েছে, এর থেকে ভিন্নরূপে আত্মাকে ভাবতে পারি না। এখানে এই মন্ত্রে বলতে চান, যেহেতু কার্যমাত্রই কারণাতিরিক্ত নয় সুতরাং, স্থূলদেহাদিকে ক্রমশ বিশ্লেষণ করে কার্যকে কারণে লয় করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যেটিকে কারণ বলছি সেটিকে বিশ্লেষণ করেও দেখা যেতে পারে যে, সেটিও কার্য, তারও কারণ আছে, সেই কারণে ঐ কার্যটিও কল্পিত। এইভাবে ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে দেখা যাবে জগৎটি হিরণ্যগর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। হিরণ্যগর্ভ আপাতত জগৎকারণ হলেও তিনি শুদ্ধব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নন। অতএব হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মে কল্পিত। কাজেই জগৎকারণ হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মের কার্য মাত্র। কাজেই সর্বশেষ কারণ শুদ্ধব্রহ্ম। পরম্পরাক্রমে সমগ্র জগৎ সেই শুদ্ধব্রহ্মে কল্পিত। তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা যদি জগতে না থাকে তাহলে মৃত্যু কার হবে? আত্মার মৃত্যু হয় না, আর কল্পিত বস্তুর তো অস্তিত্বই নেই, তার মৃত্যু কী করে হবে? অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আমরা যদি নিজেদের ক্ষণভঙ্গুর দেহাদিবিশিষ্ট জীব বলে মনে করি তাহলে মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আর যদি সেই পরমাত্মার স্বরূপে নিজেদের দেখতে পারি তাহলে আমাদের কোনদিন মৃত্যু নেই। আমাদের এই অমর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শাস্ত্রের সকল প্রয়াস।

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করলে তবেই আমরা অমৃত হতে পারি। শাস্ত্রে বলা হলো, ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি।[1] এমন যে বস্তু—তাঁকে ধারণা করব কী করে? বিষয়কে উপলব্ধি করবার জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু নির্বিষয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার যোগ্যতা তো কোন ইন্দ্রিয়ের নেই।

পরবর্তী মন্ত্রে উপনিষদ্ নির্দেশ দিচ্ছেন মনের দ্বারাই সেই ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করার চেষ্টা করতে হবে।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১১॥

অন্বয় ঃ—মনসা এব (শুদ্ধ মনের দ্বারাই) ইদম্ (এই ব্রহ্মকে) আপ্তব্যম্ (উপলব্ধি করা যায়) ইহ (এই ব্রহ্মে) কিঞ্চন (কোন প্রকার) নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই)। যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (ভেদ বা বহুত্ব) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ (মৃত্যু থেকে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুতে) গচ্ছতি (গমন করে)।

'মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যং'—আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সুসংস্কৃত, নির্মল মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য। অন্যত্র বলেছেন—'যন্মনসা ন মনুতে'[2]

১. কঠোপনিষদ্—১/৩/১৫, মুক্তিকোপনিষদ্—২/৭২

২. কেনোপনিষদ্—১/৬

—যাঁকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। এখানে আবার বলছেন—মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করতে হয়। এই আপাত-বিরোধী কথার সামঞ্জস্য হবে কী করে? এর উত্তর হলো—এই মনের দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার ধারণা করা যায় না বটে কিন্তু শুদ্ধমনের দ্বারা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি এই মনের অগোচর কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর।[১] কাজেই যখন উপনিষদ্ বলছেন মনের দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না তখন অশুদ্ধ মনের কথা বলছেন। আবার এখানে যখন বলছেন ব্রহ্মকে মনের দ্বারা ধারণা করতে হবে তখন সুসংস্কৃত পবিত্র মনের কথাই বোঝাচ্ছেন। শাস্ত্রের উপদেশ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নির্দেশ অনুসারে অধিকারী শিষ্য মনের সংস্কার সাধন করবেন। বাসনাদুষ্ট মলিন মন দিয়ে শুদ্ধ বস্তুকে ধারণা করা যায় না। কিন্তু শাস্ত্র এবং আচার্যের সহায়তায় মনকে নির্মল করতে পারলে ব্রহ্মবস্তু ধারণা করবার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা এক'।[২] যে-কোন বস্তুর শুদ্ধস্বরূপ আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়। স্বচ্ছ অন্তঃকরণ জগতের সকল বস্তুর চেয়ে আরো সূক্ষ্ম, সুতরাং সে মন আরো সহজে নির্মল করা যায়। যে মনকে মলিন, খণ্ড বলে দেখছি ; বিনাশী, পরিণামী বলে ভাবছি সেই মনই ক্রমশ শুদ্ধ হলে শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ হয়ে যায় এবং তারপর সেই মনের দ্বারা 'বোধে বোধ'[৩] করা সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথাই বলেছেন। বোধ আর বোদ্ধব্য যিনি, দুই-ই তখন অভিন্ন হয়ে যায়। মনকে যত শুদ্ধ করছি তত মন ক্রমশ তার স্থূলরূপকে পরিত্যাগ করে শুদ্ধ স্বরূপের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং হতে হতে যখন সে পূর্ণশুদ্ধি লাভ করে তখন ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একেই বলে—মনের দ্বারা তাঁকে লাভ করা। একটি বাহ্যবস্তু হিসাবে তাঁকে লাভ করা নয়। মনকে ক্রমশ শুদ্ধ করতে করতে, যে মন তাঁকে অন্বেষণ করছে সেই মন দেখবে যে, আমি তিনি ছাড়া আর কিছু নই। দুটি পাখির দৃষ্টান্তের কথা এখানেও মনে করতে হবে।[৪] নিচের পাখি নানারকম ফল খাচ্ছে ও তার জন্য সুখদুঃখ বোধ করছে, আর উপরের পাখি কিছুই খাচ্ছে না, নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে রয়েছে। এখন, নিচের পাখিটি ঐ উপরের পাখিটির দিকে ক্রমশ এগিয়ে গিয়ে দেখল আমিও তো এ-ছাড়া আর কেউ নই। তখন সে তারই স্বরূপ প্রাপ্ত হলো। এইরকম, যাকে জীবাত্মা বা মন বলছি সে তার স্বরূপের বিশ্লেষণ করতে করতে, নিজের শুদ্ধি করতে করতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাল যখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেল।

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৭
২. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪২
৩. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩৭
৪. মুণ্ডক—৩/১/১

এই হলো মনের দ্বারা তাঁর প্রাপ্তির ক্রম। আমরা বিচার করে তাঁকে অন্যভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। সুতরাং মনের শুদ্ধিই একমাত্র পথ।

মনের শুদ্ধির সহায়ক হিসাবে শাস্ত্র ও আচার্য উভয়ের নাম করা হলো কেন? একটি বললেই তো হতো! এর উত্তর হলো—যদি কেউ স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্র অন্বেষণ করতে যায় তাহলে স্বভাবতই সে তার নিজের বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা করবে। বস্তুত এইরকম প্রচেষ্টার ফলেই আমরা শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা পাই। অতএব কেবল শাস্ত্র মানুষের নির্দেশক হতে পারে না। তাই নির্দেশক হবেন—আচার্য। তাহলে তো সেই একই সমস্যা। আচার্য এ-ও বলেন, ও-ও বলেন। অনেকেই স্বয়ম্-আচার্য হচ্ছেন। তাহলে আচার্যের আচার্যত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হবার উপায় কী? সেখানে শাস্ত্রের সাহায্য ছাড়া আচার্যের আচার্যত্ব নির্ণীত হয় না। এইজন্য আচার্যকে বুঝতে হলে শাস্ত্রের প্রয়োজন, আবার শাস্ত্রকে বুঝতে হলে আচার্যের প্রয়োজন। তাই ভাষ্যকার দুটির কথাই বলেছেন—শাস্ত্র ও আচার্যের সাহায্যে মনকে সংস্কৃত করতে হবে। দুটিকে অবলম্বন না করলে ভ্রান্তির, প্রমাদের সম্ভাবনা রয়েছে। শাস্ত্র এবং আচার্যের সাহায্যে মন সংস্কৃত হয়, শুদ্ধ হয়, মলিনতা থেকে মুক্ত হয়। তখন সেই শুদ্ধমন নিজেকে ব্রহ্ম বলেই বোধ করবে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥১২॥

অন্বয় ঃ—ভূত ভব্যস্য (সর্বকালের) ঈশানঃ (প্রভু) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) পুরুষঃ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) মধ্যে আত্মনি (শরীরমধ্যে হৃদ্দেশে) তিষ্ঠতি (বিরাজ করেন)। ততঃ (সেই জ্ঞানের পর) [জ্ঞানী] ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয় না)। এতৎ বৈ তৎ (এই সেই ব্রহ্ম)।

যে আত্মাকে শুদ্ধমনের দ্বারা জানা যায় সেই আত্মা সম্বন্ধে এই মন্ত্রটিতে আরো বলছেন—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি'—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ শরীরের মধ্যভাগে অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থান করেন। অথচ সেই পুরুষই—'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য'—অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিনকালের নিয়ন্তা ঈশ্বর। 'ন ততঃ বিজুগুপ্সতে'—এইরূপে তাঁকে জানলে কেউ আর কিছু গোপন করে না। 'জুগুপ্সা' বলতে গোপন করার ইচ্ছা অথবা 'বিজুগুপ্সা' বলতে ঘৃণাও বোঝায়। তিনি কোন কিছুকে ঘৃণা করেন না বা কোন বস্তুকে লুকোতে চেষ্টা করেন না বা নিজেকে গোপন করতে বা রক্ষা করতে চেষ্টা করেন না। মানুষ কোন কিছু গোপন করে ভয়ের জন্য। যেহেতু তিনি অভয়স্বরূপ হয়ে যান সেজন্য নিজেকে আর কারো কাছ থেকে লুকোবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সর্বভূতে একমাত্র আত্মাকে অনুভব করেন বলে কাউকে ভয় করেন না।

আত্মাকে কেন 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ' বললেন? যে আত্মা সর্বব্যাপক তিনি আবার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ কী করে হন? তার উত্তরে বলেন—এটি বলা হয়েছে ধ্যান করবার জন্য। হৃদয়ান্তর্বর্তী আকাশ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলে কথিত আছে।[১] সেই আকাশে তাঁকে চিন্তা করতে হয় বলে তাঁকেও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হয়েছে। এভাবে তাঁকে ধ্যান করতে হয়। অন্যত্র তাঁকে দশাঙ্গুলিপরিমাণও বলা হয়েছে। 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্'[২]—যিনি এই সমস্ত ভূমিকে পরিব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলপরিমাণ হয়ে অবস্থান করছেন। মনে রাখতে হবে এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ যে বলা হলো, এটা তাঁকে চিন্তা করবার জন্য। আবার উপনিষদ্ এ-ও বলেছেন, 'যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ'[৩]—বহিরাকাশ যে পরিমাণ অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ। একথার তাৎপর্য কী? হৃদয়কে একটি ক্ষুদ্র সীমিত স্থান বলে বলা হয়। তা বাহ্য আকাশের সমপরিমাণ কেমন করে হবে? তার উত্তর, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনের দ্বারা সীমিত। সেই মনের স্থান হলো হৃদয়ে, সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেখানে ধরে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই হৃদয়ান্তর্বর্তিত্বকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, সেই বিশ্বের যিনি আদি বা উদ্ভব—তিনিও হৃদয়-পরিমিত, এইভাবে তাঁকে ধ্যান করতে হয়। হৃদয়াকাশে ধ্যান করলে তাঁকে বিশ্বব্যাপীরূপে চিন্তা করা যায় না। এইজন্য প্রথম অবস্থায় তাঁকে হৃদয়াকাশপরিমিতরূপে ভাবতে বলেছেন। তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বা দশাঙ্গুলমাত্র—যাই হন না কেন—তাতে কী এসে যায়? পরিমাণের কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই, যেখানে তাঁকে চিন্তা করছি সেখানকার সমগ্র আয়তন জুড়েই তাঁকে চিন্তা করতে হয়। যেমন, গঙ্গাজলকে একটা ঘটিতে রাখলে সে জল ঘটিপরিমাণ হয়ে থাকবে। সেখানে গঙ্গাকে ঘটিপরিমাণ বলতে পারি। কিন্তু গঙ্গা কি সত্যিই ঘটিপরিমাণ? তা তো নয়। ঘটির ভিতরে যতটুকু গঙ্গা ধরে সেইটুকুকে আমরা গঙ্গা বলে বলছি। যখন ঘটির গঙ্গাজল স্পর্শ করে বলি গঙ্গা স্পর্শ করছি তখন কি ভাবি যে সীমিতপরিমাণ গঙ্গা স্পর্শ করছি? ঘটিতে গঙ্গা সীমিত হলেও পরিপূর্ণ গঙ্গাকেই সেখানে চিন্তা করতে হচ্ছে। সেইরকম অখণ্ড ব্রহ্মকে হৃদয়ে চিন্তা করলেও তিনি আমাদের হৃদয়সীমা দ্বারা খণ্ডিত হতে পারেন না। তিনি অবিভাজ্য, তাঁকে কোন বিভাগের দ্বারা সীমিত করা যায় না। প্রথমে হৃদয়াকাশ জুড়েই তাঁকে ভাবতে হয়। ক্রমশ ধ্যান পরিপক্ক হলে তাঁর সর্বব্যাপিত্ব আমরা ধারণা করতে পারব। আরো কথা এই যে—যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে আপাতত হৃদয়াকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষুদ্রপরিমাণ বলে যেমন একদিকে ধ্যান করতে বলা হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁর সর্বব্যাপিত্বের কথা ভেবে হৃদয়াকাশকেও বাহ্য আকাশের মতো অসীম বলা হয়েছে। কারণ হৃদয়াকাশ ক্ষুদ্র হলেও সে বাহ্য আকাশের ধারণা করতে

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—১/৩/২৫

২. ঋগ্বেদ-সংহিতা—১০/৯০/১

৩. ছান্দোগ্য—৮/১/৩

সক্ষম। আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাকে যত ছোট বলে কল্পনা করি ধারণাশক্তিতে তার পরিমাণ সত্যিই তো তত ছোট নয়। আবার যিনি হৃদয়াকাশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ তিনি তো কেবল ক্ষুদ্ররূপ নন। তিনি ভূত ও ভব্যের ঈশান অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। যিনি ক্ষুদ্র তিনিই ভূমা। যিনি এই দেহান্তর্বর্তী জীবাত্মা, তিনিই সর্বভূতে বিরাজিত পরমাত্মা।

এই যে ধ্যানের জন্য অসীমকে সীমিতরূপে চিন্তা করা—এটি হচ্ছে একটি কৌশল। আমরা অসীমকে অসীমরূপে ভাবতে পারি না, এইজন্য তাঁকে সীমিত করে ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু তার পরে বুঝতে চেষ্টা করি যাঁকে সসীম বলে মনে করছি তিনি অসীম। যেমন, খড়মাটি দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে সেখানে জগতের অধীশ্বরীকে পূজা করা হয়। ওঙ্কাররূপ অক্ষরপ্রতীকে জগদ্‌ব্যাপী ব্রহ্মের আরোপ করা হয়। জগদ্-ব্যাপিত্বের এই আরোপটি কিন্তু মিথ্যা নয়, কারণ সত্যই তিনি জগদ্‌ব্যাপী, তিনি ঐ ওঙ্কারপ্রতীকেও ব্যাপ্ত। তাই প্রতিমাতে জগদীশ্বরীকে চিন্তা করলে বা ওঙ্কার শব্দকে ব্রহ্মের বাচক ভাবলে পরাশক্তি বা পরব্রহ্মকে খর্ব করা হয় না। অসীম অনন্তকে এই সসীম সান্ত মনে চিন্তা করার প্রয়াস করতে গেলে সীমিত, ক্ষুদ্র করেই ভাবতে হবে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও স্পষ্ট রাখতে হবে যে, যিনি অসীম তিনিই সীমিত হয়েছেন। তাই উপনিষদ্ ধারণা স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত রাখার উদ্দেশ্যে বলছেন—'এতদ্ বৈ তৎ'—যিনি জীবের হৃদয়বর্তী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ তিনিই সর্বজীবের ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। জীবরূপে নচিকেতা যাঁকে জানতে চাইছিলেন সেই দেহাভিমানী আত্মাই সর্বকারণের অতীত সত্তা। বলছেন যে, এই একরূপে তাঁকে ভাবছ আর একরূপে যদি দেখ, প্রাতিভাসিকরূপে—যেটিকে তোমরা দেখছ বা অনুভব করছ—সেই রূপটি হলো তোমাদের কাছে ব্যবহারিক রূপ। তিনিই আবার সর্বব্যাপী, অব্যবহার্য, যিনি নাগালের বাইরে। 'এতদ্ বৈ তৎ'—কথাটির সার্থকতা এইখানে। উপনিষদ্ বারবার এই কথাটি আবৃত্তি করছেন। বলছেন, এমন ভেবো না যে, ক্ষুদ্র জীব আবার অনন্ত কেমন করে হবে। 'বৈ' শব্দটির দ্বারা যেন জোর, emphasis দেওয়া হলো—ইনিই সেই পরম তত্ত্ব। আমরা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ দেখে ভাবি যে, আমি কী করে ব্রহ্ম হতে পারি? শাস্ত্র যেন এই ক্ষুদ্রত্ব, ব্যষ্টিরূপ থেকে আমাদের জোর করে তাঁকে সেই অনন্ত, অব্যক্তরূপে দেখাচ্ছেন যে, তুমিই সেই। বারবার জোর করে এই কথাটি বলছেন যাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রত্ব-বুদ্ধি থেকে মুক্ত হই।

স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, এক সিংহশাবক ভেড়ার পালের মধ্যে পড়ে নিজেকে সিংহ বলে কিছুতেই ভাবতে পারছে না, ভেড়া বলেই ভাবছে। তাকে সিংহ বললে সে ভয়ে সন্ত্রস্ত হচ্ছে—আমি সিংহ কী করে হব? একটা সিংহ তখন তাকে জোর করে জলের ধারে ধরে নিয়ে গিয়ে,

জলে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলল—দেখ্, আমিও যা তুইও তাই। তাকে তার খাদ্য মাংস দিয়ে বলল—খেয়ে দেখ্। সিংহশাবক মাংসের স্বাদ পেল।[১] সেইরকম জীবকে যেন জোর করে তার অসীম, অনন্ত স্বরূপে স্থিত করবার জন্য শ্রুতি বারবার বলছেন—তুমিই সেই। নিজেকে ভিন্ন মনে করলেও তুমি ভিন্ন নও, তুমিই সেই পরম তত্ত্ব।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—ভূতভব্যস্য (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) পুরুষঃ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) অধূমকঃ (নির্ধূম, নির্মল) জ্যোতিঃ ইব (প্রভার মতো) [বিরাজিত] ; সঃ এব (তিনিই) অদ্য (ইদানীং সর্বপ্রাণীতে বর্তমান), সঃ উ (তিনিই আবার) শ্বঃ (কালও অর্থাৎ ভবিষ্যতেও থাকবেন)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

যিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ'—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ। 'পুরুষ' শব্দের ব্যাখ্যা এর আগে পেয়েছি, দেহ-পুরীর সর্ব অংশে জীব পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, এইজন্য তাঁকে পুরুষ বলা হয়। সেই পুরুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরে রয়েছেন, তিনিই আবার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। সেই পুরুষ আর কিরকম? 'অধূমকঃ জ্যোতিরিব'—নির্ধূম, নির্মল, জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল। প্রদীপের শিখায় ধোঁয়া থাকে অর্থাৎ তার প্রকাশের সঙ্গে মলিনতা মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তিনি কেবলই জ্যোতি, ধূমহীন, মালিন্যশূন্য। স্বপ্রকাশ শুদ্ধজ্যোতিরূপ যেন।

আত্মাকে ধ্যান করবার একটি উপায় এখানে বলে দেওয়া হলো। যাঁরা নিরাকার ধ্যান করেন শাস্ত্র তাঁদের বলছেন, স্থির, নিষ্কম্প, অধূমক, দীপশিখার মতো আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করতে হয়। শাস্ত্রে নানারকম ধ্যানের উপায় বলা হয়েছে। সেজন্য আমরা আবার যেন প্রতিটি উপায়কে পরখ করতে না যাই। হয়তো ভাবব উপনিষদে যখন বলা আছে তখন একটু এরই ধ্যান করে দেখি না। এর ফলে কিন্তু বিভ্রান্ত হব। একটা ধারা অনুসরণ করে চলতে হয়। যাঁরা নিরাকার ধ্যানে জ্যোতিঃশিখা চিন্তা করেন তাঁদের জন্য এখানে এই প্রণালী বলেছেন। এই বোধ রাখতে হবে যে যিনি অধূমক, নিষ্কম্প, জ্যোতিঃশিখা রূপে হৃদাকাশ উদ্ভাসিত করে আছেন, তিনিই আবার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের নিয়ন্তা অথচ তিনিই আজ, তিনিই কাল—'স এবাদ্য স উ শ্বঃ'। তিনিই আজ মানে—বর্তমান। কাল মানে ভবিষ্যৎ। কাল বলতে যা বুঝি তা বস্তুত তিনিই। তাৎপর্য এই যে, তিনি নিত্য, তাঁর ক্ষয় এবং বিনাশ নেই, কালের দ্বারা তিনি সীমিত হন না। তাঁর সমান বা তাঁর থেকে পৃথক কিছু

১. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯৩১) পৃঃ ৩৮-৩৯

জন্মাবে না। 'এতদ্বৈ তৎ'—তিনিই সেই আত্মা। যে আত্মাকে আমরা এখানে ধ্যান করবার উপদেশ পাচ্ছি, যে আত্মা মানুষ দেহে অবস্থিত হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, সেই আত্মাই পরমাত্মা।

আবার জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপত কোন ভেদ নেই। যিনি এই অভেদে ভেদ দর্শন করেন তাঁর যে অনর্থময় ফলপ্রাপ্তি হয় সেই কথা বলছেন পরের মন্ত্রে।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—দুর্গে (দুর্গম, উচ্চস্থানে) বৃষ্টম্ (বর্ষিত, পতিত) উদকম্ (জলরাশি) যথা (যেমন) পর্বতেষু (পার্বত্য নিম্নভূমিতে) বিধাবতি (বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে বিনষ্ট হয়) এবম্ (এইরকম) ধর্মান্ (জীবসমূহকে) পৃথক্ (প্রতি শরীরে আত্মারূপে না দেখে ভিন্ন ভিন্ন রূপে) পশ্যান্ (দেখে) [ভেদদর্শনকারী] তান্ এব [ধর্মান্] (সেই ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বরূপকেই) অনুবিধাবতি (অনুগমন করে, অর্থাৎ তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়)।

'যথা উদকং দুর্গে বৃষ্টম্'—পর্বতের দুর্গম উচ্চভূমিতে বর্ষিত জল যেমন—'পর্বতেষু বিধাবতি'—পর্বতের নিম্নপ্রদেশসমূহে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে যেখানে গহ্বর সেখানে লুপ্ত হয়, সেইরকম যে ব্যক্তি, 'এবং ধর্মান্'—এইপ্রকার জীবদের, 'আত্মনঃ পৃথক্ পশ্যন্'—আত্মা থেকে পৃথক দর্শন করে, ভেদদর্শনকারী সেই ব্যক্তি, 'তান্ এব অনুবিধাবতি'—নানা শরীরের অনুসরণ করে। ধর্ম বলতে এখানে জীবকে বোঝানো হচ্ছে।

একই আত্মা বিভিন্ন জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন এজন্য নানা জীব নানা আত্মারূপে প্রতীত হচ্ছে। সে জীবগুলি যে সেই একই আত্মার বিভিন্ন প্রতীতি—এ তত্ত্ব যারা ধারণা করতে পারে না তারা স্বভাবতই নানা জীবকে নানা আত্মা বলে মনে করছে। এইরকম ব্যক্তি বহুর মধ্যে এক দেখতে না পাওয়ার জন্য বহু জীবকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে বোধ করে। কখনো আর আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করে মুক্ত হতে পারে না। ফলে সে যেন চিরদিনের মতো নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজের স্বরূপ কোনদিন জানতে পারে না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার মৃত্যু হয়েছে। এইরকম লোকের অবস্থা বোঝাবার জন্য দুর্গম পর্বতে পতিত জলধারার সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়েছে। উচ্চ পর্বতের শিখরে পতিত বৃষ্টিধারা যেমন নিম্নতর প্রদেশে দ্রুত ধাবমান হয়ে গুহাকন্দরে হারিয়ে যায়, বিনষ্ট হয় তেমনি ভেদদর্শনকারী ব্যক্তিও প্রতি জীবে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখতে দেখতে আত্মস্বরূপকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যদি কেউ সর্বজীবে এক আত্মদৃষ্টি করে তাহলে সে চিরকাল অভয়স্বরূপ হয়ে অমর হয়ে থাকে। শ্রুতি বৃষ্টিধারার দৃষ্টান্তটি দিয়ে এই তত্ত্বই বোঝালেন।

আবার আত্মজ্ঞ মানুষ উপলব্ধি করেন যে, জীবে জীবে ভেদ কেবল উপাধিকৃত, স্বরূপত নয়। তিনি সর্বত্র বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন—এরকম অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন বলে আত্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন। তাঁর আর পৃথক সত্তা থাকে না। আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই পুরুষের কথা এখন বলছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—গৌতম (হে নচিকেতা) যথা (যেমন) শুদ্ধম্ (নির্মল) উদকম্ (জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তম্ (নিক্ষিপ্ত হয়ে) তাদৃক্ এব (সেইরকম নির্মলই) ভবতি (হয়) [তেমনি] বিজানতঃ (একত্বদর্শী বা তত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মননশীল ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) এবম্ ভবতি (এইরূপ একত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যান)।

'যথা শুদ্ধং উদকং শুদ্ধে আসিক্তম্'—নির্মল জলবিন্দু শুদ্ধ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হলে যেমন—'তাদৃগেব ভবতি'—তাদৃশই অর্থাৎ শুদ্ধ জলাশয়ই হয়ে যায় তেমন—'এবং মুনেঃ বিজানত আত্মা ভবতি'—আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী মননশীল তত্ত্বদর্শীর আত্মাও সেইরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মই হয়।

এই দৃষ্টান্তটি আমরা বহুক্ষেত্রে উল্লেখ করি যে আত্মা উপাধি অর্থাৎ আবরণমুক্ত হলে পরমাত্মার স্বরূপতাই প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতই যা ছিলেন সেই রূপেই প্রকাশ পান, তাঁর আর পৃথকতা থাকে না। ঠিক যেমন নির্মল শুদ্ধ জলরাশিতে একবিন্দু শুদ্ধ জল ফেললে জলবিন্দুটি বিশাল জলরাশির সঙ্গে মিলে গিয়ে একাকার হয়ে বিশালতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ জলে মলিন জলবিন্দু ফেললে কিন্তু এমনভাবে মেশে না। পরিষ্কার জলে এক ফোঁটা কালি ফেললে বেশ কিছু সময় কালিমা দেখা যায়। বিষাক্ত জলের ফোঁটা ফেললে সমগ্র জলটিই বিষাক্ত হয়ে যায়।

আমরা অবিবেকী ব্যক্তিরা উপাধিযুক্ত হয়ে যেন মলিন জলবিন্দুর মতো হয়ে আছি। দেহ-ইন্দ্রিয়াদির আবরণের ভিতরে আত্মা যেন আবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। ফলে আমার আত্মা, তোমার আত্মা ইত্যাদি এইরকম পার্থক্য দেখা যায়। দেহেন্দ্রিয়াদিকে সেখান থেকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, লোপ করে দেওয়া হয়, তাহলে যেমন জলবিন্দুর ভিতরের সমস্ত মলিনতারূপ পরিচ্ছেদ দূর হয়ে তা শুদ্ধ জলরাশির সঙ্গে এক হয়ে যায়, সেইরকম সমস্ত উপাধিনির্মুক্ত জীব তখন সমষ্টির সঙ্গে অভিন্ন, অখণ্ড যে সত্তা, তার সঙ্গে এক হয়ে যাবে। কোন পার্থক্য আর থাকবে না।

আমাদের পৃথকত্বের কারণ হলো উপাধি, যার দ্বারা আত্মাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। যা আমার স্বরূপ নয় অথচ তার ধর্ম আমার উপরে আরোপ করছে, তাকে বলা হয় উপাধি। যেমন, জবা ফুলের ধর্ম লাল বর্ণটি স্ফটিকে আরোপিত

হলে স্ফটিককে লাল দেখায় তেমনি দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি আত্মার উপরে আরোপিত হয়ে আত্মার স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে। বাস্তবিক আত্মাতে এই দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম নেই। শুদ্ধ জলবিন্দুর শুদ্ধ জলরাশিতে পতিত হওয়ার মতো আত্মা যদি সমস্ত উপাধি-ধর্ম থেকে মুক্ত হয়, তাহলে তার পৃথকতা কিছু আর থাকে না, সে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। 'মুনেঃ'—মননশীল যিনি, যিনি নিজের স্বরূপকে বিশেষরূপে জানেন, নিজেকে শুদ্ধ, নির্মল, সর্ব-ধর্মের অতীতরূপে জানেন। তাঁর কী অবস্থা হয়? তিনি অর্থাৎ তাঁর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। এই অভিন্নতা প্রাপ্তির ফলে তাঁর কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু তাঁর প্রকৃত স্বরূপ তখন প্রকাশিত হয়। স্ফটিকের কাছ থেকে জবাফুলকে সরিয়ে নিলে স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অন্বয় ঃ—একাদশদ্বারম্ (একাদশ দ্বারযুক্ত) পুরম্ (এই দেহরূপ নগরটি) অবক্রচেতসঃ (অকুটিল অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল, নিত্য প্রকাশস্বরূপ যাঁর চৈতন্য) অজস্য (জন্মাদি ষড়্বিধ-বিকাররহিত ব্রহ্মের) [অধীনস্থ]। অনুষ্ঠায় (এই তত্ত্ব অবধারণ করে) [বিবেকী ব্যক্তি] ন শোচতি (শোক করেন না) বিমুক্তঃ চ (এবং অবিদ্যাদি বন্ধন ক্ষয় হওয়ায়) বিমুচ্যতে (বিশেষভাবে মুক্ত হন বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই ব্রহ্ম)।

'অবক্রচেতসঃ'—অকুটিল, সরলদৃষ্টিসম্পন্ন, সূর্যপ্রকাশবৎ সর্বদা প্রকাশশীল, সর্বত্র অপ্রতিহত, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ যাঁর দৃষ্টি, 'অজস্য'—সেই জন্মরহিত ব্রহ্মের—'একাদশদ্বারম্ পুরম্'—একাদশ দ্বারবিশিষ্ট শরীর, জীবদেহের ইন্দ্রিয়গহ্বরগুলিকে এক-একটি দ্বার বলা হয়েছে। মাথায় সাতটি—অর্থাৎ দুই কান, দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র ও মুখ, আর লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি নিয়ে দশটি এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই একাদশ দ্বার, যদিও ব্রহ্মরন্ধ্রটি রন্ধ্র হিসাবে দেখা যায় না। দ্বার কেন বলা হলো? না, এদের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মে প্রবেশ করা যায় বা ব্রহ্ম এদের মধ্য দিয়ে নির্গত হতে পারেন। যেমন বাড়িতে প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য দরজা থাকে তেমন। আত্মার একাদশ দ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ পুরী আছে। বিবেকী ব্যক্তি চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে, নগরের স্বামীকে 'অনুষ্ঠায়'—চিন্তা করে, তাঁর সম্বন্ধে ধ্যান বা মনন-পূর্বক আত্মরূপে তাঁকে উপলব্ধি করে—'ন শোচতি'—শোক করেন না অর্থাৎ শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান এবং 'বিমুক্তঃ চ'— দেহে অবস্থান কালেই অবিদ্যা-কামকর্মরূপ সংসারবন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে দেহাবসানের পর 'বিমুচ্যতে'—পুনরায় শরীর গ্রহণ করেন না।

যখন এই দেহে বর্তমান থাকতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যখন দেহরূপ উপাধিই সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়—এই দুই অবস্থাকেই বিমুক্তি বলা হচ্ছে। 'বিমুক্তঃ' আর 'বিমুচ্যতে' এই শব্দ দুটি দিয়ে এই দুই অবস্থাকে বোঝানো হলো। জ্ঞানের পর মুক্তিকে জীবন্মুক্তি, জ্ঞানীব্যক্তির মৃত্যুর পর দেহমুক্তিকে বিদেহমুক্তি বলা হয়। এখন, দেহীকে পৃথক করে বলা হলো কেন? নগরস্বামী যেমন নগর থেকে ভিন্ন তেমনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুর বা নগররূপ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি থেকে ভিন্ন। সাংখ্যের সেই সুসজ্জিত বাড়ির দৃষ্টান্তটি আগেও বলা হয়েছে যেটিকে দেখলে মনে হবে এগুলির মালিক কেউ একজন আছে, যার ভোগের জন্যই সব উপকরণ।

এইরকম এই শরীর-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কত বৈচিত্র্য, কত সুষ্ঠুভাবে না এগুলি সাজানো, যার প্রশংসায় বিজ্ঞান পঞ্চমুখ, যার সম্যক পরিচয় পাওয়ার জন্য

বিজ্ঞান এখনো অন্বেষণ চালাচ্ছে। সেই সুন্দর শরীরটির মালিক কে?—এই প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে। উপনিষদ্ সেই মালিকেরই খোঁজ করেন। শরীরের প্রত্যেকটি অংশ বিবেচনা করলে দেখব এগুলির কোনটিই চেতন নয় এবং চেতন নয় বলে ভোক্তা নয়। এখন, শরীরের কোন অংশ যদি ভোক্তা না হয় তাহলে শরীরটা শরীরের ভোগের জন্য নিশ্চয় নির্মিত হয়নি। কোন চেতন-ভোক্তার জন্য এগুলি সমবেত হয়েছে, সাধারণ অনুমানের দ্বারাই এটা বোঝা যায়। কে সেই চেতন-ভোক্তা যাঁর বাড়ি ঘরদুয়ার এই দেহ? ভোক্তার ভোগায়তন অর্থাৎ বাড়ির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্রে। এই দেহ-গেহটির এগারটি দরজা। বাড়ির যিনি মালিক তিনি প্রথমত জড়-বাড়ির থেকে ভিন্নধর্মী অর্থাৎ তিনি চেতন। দ্বিতীয় কথা, দেহাদির সঙ্গে তাঁর জন্ম হয়নি। কারণ আগে মালিক তারপরে তো তার মালিকানা সম্পত্তি। আগে থেকেই ভোক্তার অস্তিত্ব, তারপর তাঁর ভোগ্য উপকরণগুলির নির্মাণ। যিনি এই দেহের অধীশ্বর, দেহের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে তিনি উৎপন্ন বা বিনষ্ট হন না। এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে—যিনি মালিক তিনি বস্তুত জন্মরহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। কেন? না, দেহাদির পরিচ্ছেদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। 'অবক্রচেতসঃ' শব্দের তাৎপর্য হলো যাঁর চৈতন্য অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, এক অপরিণামীরূপে যিনি অবস্থান করছেন। দেহের অধীশ্বরকে দেহরূপ সম্পত্তির ভিতর দিয়ে কল্পনা করতে হয়।

যুক্তির ধারাটা বুঝতে পারলেও মালিকের স্বরূপ বুঝতে পারা সহজ নয়। মালিক কিরকম তা শরীরটি দেখে বোঝা সম্ভব নয়। দেহের জড়ত্ব, সীমা, পরিচ্ছেদ ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি দেহধর্মগুলিকে যদি পৃথক করে রাখি তাহলে অবশিষ্ট যা থাকবে মালিক তা-ই। এখন আমরা নিজেদের শরীরের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করছি। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং তাদের ধর্মগুলিকে পৃথক করে ফেললে অবশিষ্ট থাকবে এক শুদ্ধচৈতন্য। এটি আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পারি। বুদ্ধি আমাদের বলে দেবে যে, শরীরাদি তো বটেই মন অথবা অন্তঃকরণ যাকে বলি তার থেকেও তিনি ভিন্ন, কারণ অন্তঃকরণও জড়। অন্তঃকরণ জড় কেন? না তার ভিতরে বহুত্ব, পরিচ্ছেদ, ভেদ, এসব রয়েছে। এই বহুর পিছনে যদি একটি সত্তাকে স্বীকার করতে পারা যায় তাহলে বহু সত্তা মানবার দরকার হয় না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এতগুলিকে চেতন না মেনে যদি একটি চেতনকে মানি, যে চৈতন্য মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদিতে পরিব্যাপ্ত—তাহলে এদের চৈতন্যের ব্যাখ্যা হয়। সুতরাং বহু চৈতন্য স্বীকার করতে হয় না। বহু চৈতন্য স্বীকার করলে 'গৌরব' দোষ হয়। একটি চৈতন্য মানলে 'লাঘব' হয়। তর্কশাস্ত্রের এই হলো একটি প্রণালী, গৌরব-লাঘব বিচার। আমরা ভাবতে পারি যে, পৃথিবী একটি শক্তিতে চলছে, সূর্য আর একটি শক্তিতে। গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পৃথক পৃথক শক্তিতে চলছে, মানুষ চলছে আর একটি

শক্তিতে। এই সমস্ত গতিগুলিকে যদি একটি শক্তিতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে অনেক শক্তি মানবার প্রয়োজন থাকে না, একই শক্তির বিচিত্র প্রকাশ ভাবলেই চলে। সেইরকম একটি চেতন মানলেই যদি সর্বত্র সেই চৈতন্যের ক্রিয়া ব্যাখ্যাত হয়ে যায় তাহলে আর বহু চৈতন্য স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দেহাদিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য একটিই। সমস্ত বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্যকে লোপ করা হলে যা রইল, তা হলো শুদ্ধচৈতন্য। এক-একটি শরীর বিশ্লেষণ করে যে এক একটি শুদ্ধচৈতন্য পেলাম তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। একই চৈতন্য সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত। দেহ ভেদে যে চৈতন্য দেহের সর্ব অংশে ব্যাপ্ত, সেই চৈতন্যই সর্বদেহে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ক্রমশ এইভাবে গিয়ে এক অপরিণামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বে পৌঁছাচ্ছি যাঁকে এখানে অজ এবং অবক্রচেতা বলছেন।

উপসংহারে বললেন, 'এতদ্বৈ তৎ'—ইনিই হলেন সেই শুদ্ধস্বরূপ। যাঁর এই শরীররূপ পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে যিনি অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধ্যান করেন তিনি আর কখনো শোক করেন না। তিনি অজ্ঞান থেকে বিমুক্ত হন, পুনর্বার আর শরীর গ্রহণ করেন না।

এখানে আমরা আবার শাস্ত্রের একটি কঠিন প্রশ্নে পৌঁছে যাচ্ছি যা আগেও আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু বেদান্তের তত্ত্বগুলি নানা জায়গায় নানাভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় সুতরাং পুনরুক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রশ্ন এই—মানুষের এই জীবন্মুক্ত আর বিদেহমুক্ত অবস্থায় কিছু তফাত আছে কি না। আপাতত দেখা যায় কিছু পার্থক্য আছে। জ্ঞানী পুরুষের কোন অজ্ঞানের আবরণ থাকে না, তিনি মুক্ত। কিন্তু অন্যান্য বদ্ধ, অজ্ঞ প্রাণিগণ যেমন তিনিও তেমন দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করে থাকেন। তাহলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এইখানে যে, জীবন্মুক্ত বলে দেহেন্দ্রিয়াদি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানী মুক্ত। এই মুক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে বুঝি যে তিনি দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'অহং' অভিমান করছেন না। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি চলছে কী করে? চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত না হলে দেহেন্দ্রিয়াদি তো কাজ করে না? উত্তর হলো, মূল কথা অভিমান নিয়ে। জ্ঞানী দেহে 'আমি' 'আমার' অভিমান করছেন না। তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকলে জ্ঞানের উপদেশ করবে কে? শাস্ত্র থাকবে, কিন্তু শাস্ত্র কোথায় থাকবে? শাস্ত্র তো শূন্যে থাকে না, কারো মনে তা প্রতিভাত হয়। জ্ঞানীর মনে শাস্ত্র প্রতিভাত হবে। জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞানীর মন নেই, তাহলে জ্ঞানের প্রকাশ কোথায় হবে? তাই স্বীকার করা হয় যে, জীবন্মুক্তের অজ্ঞান দূর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে দেহ ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার সম্ভব হয়।

তবে বেদান্তের সিদ্ধান্তকে যদি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা যায় তাহলে জ্ঞানীর এ অবস্থাকে জানা যায় না। কারণ জ্ঞান যাঁর হয়েছে অজ্ঞান কোন প্রকারেই তাঁর কাছে আসতে পারে না। অজ্ঞান নিঃশেষে দূর হয়ে গেলে জগৎ তথা

দেহেন্দ্রিয়াদি থাকবে কী করে? সুতরাং বলতে হয় জ্ঞান হয়নি, আর না হলে বলতে হয় জ্ঞানীর দেহাদি কিছু থাকে না। ফলে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় না। গীতায় আছে,

'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' ॥[১]

—হে অর্জুন, প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে তেমনি আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মই ভস্মসাৎ করে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য জীবন্মুক্তি সিদ্ধ করার প্রেরণায় বলেছেন, জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ ছাড়া আর সব কর্মকে ভস্মসাৎ করে। প্রারব্ধ যদি না থাকে তাহলে জ্ঞানীর পক্ষে লোকব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কাজেই জ্ঞানীর লোকব্যবহার যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য তাঁর প্রারব্ধকে স্বীকার করতে হয়। যৎসামান্য প্রারব্ধ মানতে হলে সেটাও তো কর্মফল, সুতরাং বলা হয় জ্ঞানীর একটু অহংবোধ থাকে। শঙ্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করছেন বলে জ্ঞানীর পক্ষে লেশ অবিদ্যাকে মেনেছেন। কিন্তু কিছু উগ্র অদ্বৈতবাদী এটুকুও স্বীকার করতে নারাজ। তাই তাঁদের মত অনুসরণ করে শঙ্কর বলছেন—'প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ। দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ। প্রারব্ধং ত্যজতামতঃ'।।[২] প্রারব্ধ তখনই সিদ্ধ হয় যখন দেহে আমিত্ববোধ থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে দেহাত্মবোধ অভিপ্রেত নয়, সুতরাং প্রারব্ধকে মানা চলে না। এই প্রারব্ধবিরোধী মত দৃঢ়ভাবে ধরলে আচার্য কেউ থাকতে পারেন না। প্রারব্ধবাদের সপক্ষে শঙ্করাচার্যের যুক্তি হলো—প্রত্যক্ষ প্রবল, অনুমান দুর্বল। জ্ঞানী ব্যবহার করছে এটি প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড়াতে পারে না। এজন্য লেশ অবিদ্যার স্বীকৃতি দিতে হয় যা ছিন্নমূল লতার মতো কিছুকাল বেঁচে থাকে বা একবার বিঘূর্ণিত চক্রের মতো কিছু সময় ঘোরে। আমরা সত্যের অপলাপ করতে পারি না। ব্যবহার হচ্ছে দেখলে বলতে পারি না যে ব্যবহার হয় না, তাহলে 'দৃষ্টি-বিরোধ' হবে। শঙ্করও আপ্তবাক্য এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারের ভিত্তিতে জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকার করেছেন। সুতরাং প্রারব্ধ এবং জ্ঞান যে বিরোধী, যুক্তির দ্বারা একথা স্বীকার করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ একে 'বিদ্যার আমি' নাম দিয়ে বলেছেন—'শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার "আমি" রেখেছিলেন'[৩]। জ্ঞানের পরেও তাঁদের এই 'আমি' ছিল, এজন্য তাঁরা লোককল্যাণ করে গিয়েছেন। তাহলে এইরকম 'আমি' সম্ভব, যে 'আমি' ভ্রান্ত নয়, যে 'আমি' নিজের স্বরূপকে জেনেছে অথচ লোকব্যবহার করছে। এখানে 'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে' কথাটি প্রারব্ধবাদ অবলম্বন করে বলা যায়। কারো জ্ঞান

---

১. গীতা—৪/৩৭
২. বিবেকচূড়ামণি—৪৬০
৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩

হলে সে অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্ত হলো, তবে প্রারব্ধের জন্য তখনো দেহ রয়েছে। দেহাবসানের পর আর দেহান্তর গ্রহণ হয় না। কারণ যে বাসনার দ্বারা শরীরগ্রহণ হয় সেই বাসনা নির্মূল হয়ে যাওয়ায় দেহান্তর সৃষ্টি হয় না। এইজন্য তার মুক্তিকে বিদেহমুক্তি বলা হয়।

আগে বলেছেন, তিনি শোকগ্রস্ত হন না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন থেকে বিমুক্তরূপে নিজেকে বুঝেছেন, অতএব তাঁর আর শোকের কারণ কিছু রইল না। নিজের সম্পত্তির বা অঙ্গের কোন হানি ইত্যাদি হলে আমাদের শোক হয়। বিষয় বা দেহেন্দ্রিয়াদির হানিতে নিজে ক্ষয়গ্রস্ত হলো বলে যিনি মনে করেন না তাঁর শোকের কারণ কিছু থাকে না। সেই অবস্থায় মুক্ত থেকে শরীরপাতের পর আর দেহধারণ করেন না—'পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতি'[১]—বিদেহমুক্তি কথার তাৎপর্য এইখানে।

এখন একটি শরীরকে বিশ্লেষণ করে আমরা তার ভিতরে দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে ভিন্ন একটি চৈতন্যকে আবিষ্কার করলাম। এখন বিচার্য—সেই চৈতন্য কি কেবল ঐ শরীরেই আছেন? পরের মন্ত্রে বলছেন—না, এক আত্মা সর্বশরীরেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এখানে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বময়ত্ব প্রদর্শিত হচ্ছে।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥২॥

অন্বয় ঃ—[সেই আত্মা] হংসঃ (সর্বত্র গমনকারী, সর্বব্যাপী) শুচিষৎ (শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্যরূপে অবস্থিত) বসুঃ (সকলের স্থিতিকর্তা) অন্তরিক্ষসৎ (বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে অবস্থানকারী) হোতা (অগ্নিস্বরূপ) বেদিষৎ (পৃথিবীতে অবস্থিত) অতিথিঃ (সোমরসরূপে বা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে) দুরোণসৎ (কলসে অথবা গৃহে অবস্থিত) নৃষৎ (মানুষের মধ্যে স্থিত) বরসৎ (সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থ-মধ্যে স্থিত) ঋতসৎ (যজ্ঞে বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত) ব্যোমসৎ (আকাশে অবস্থিত) অব্জাঃ (জলজাত শঙ্খ মৎস প্রভৃতি) গোজাঃ (ধান্যাদি) ঋতজা (যজ্ঞোদ্ভূত কর্মফল) অদ্রিজাঃ (পর্বত থেকে উৎপন্ন নদ্যাদি) ঋতম্ (স্বয়ং সত্যস্বরূপ) বৃহৎ (সর্বকারণরূপে মহান)।

'হংসঃ—হন্তি গচ্ছতি'[২]—সর্বদেহেষু একরূপতয়া বিরাজতে ব্যাপ্নোতি—যিনি গমন করেন তিনি হংস অর্থাৎ সর্বদেহে চৈতন্যরূপে বিরাজমান আত্মা, গতিমান সূর্য। তিনি আবার—'শুচিষৎ'—শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে আকাশে অবস্থিত আদিত্য জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন। 'বসুঃ'—নিখিল জগতের আশ্রয়, স্থিতিসাধক বায়ুরূপে তিনি 'অন্তরিক্ষসৎ'—অন্তরীক্ষে বাস করেন, 'হোতা বেদিষৎ'— অগ্নিরূপে সেই

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/২/১
২. তদেব—২/২/২

আত্মা যজ্ঞবেদীতে বিদ্যমান। শ্রুতি বলেন, 'অগ্নিঃ হোতা'[১]—অগ্নি হোতা। 'অতিথিঃ দুরোণসৎ'—সোমরস রূপে যজ্ঞাঙ্গরূপে দুরোণ অর্থাৎ কলসিতে অবস্থান করে কিংবা ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন বলে— 'দুরোণসৎ'। তিনিই আবার মনুষ্যে অবস্থান করায়—'নৃষৎ'—এবং দেবগণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিসমূহে অবস্থান করেন বলে—'বরসৎ'। ঋত অর্থাৎ সত্য অথবা যজ্ঞ, আত্মা তাতে অবস্থান করেন বলে—'ঋতসৎ'। শূন্যে, আকাশে অবস্থান করছেন বলে—'ব্যোমসৎ'। শঙ্খ, শুক্তি, মকরাদিরূপে জলে জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি—'অব্জা'। ব্রীহিযবাদি শস্যরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন বলে তিনি—'গোজা'। যজ্ঞের অঙ্গরূপ উপকরণরূপে উৎপন্ন হন বলে—'ঋতজা'। নদ্যাদিরূপে পর্বত থেকে উৎপন্ন হন বলে তিনি—'অদ্রিজা'। পরিশেষে বলছেন, তিনি—'ঋতং বৃহৎ'—নিত্যস্বরূপ, সর্বাত্মা হয়েও অব্যভিচারীরূপে থাকেন এবং তিনি সর্ব জগতের কারণ এজন্য তিনি বৃহৎ, মহান। আত্মার একত্ব, সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বময়ত্ব প্রতিপাদন করাই এই মন্ত্রের অভিপ্রায়।

সুবর্ণনির্মিত দ্রব্যাদি যেমন সুবর্ণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, মৃত্তিকানির্মিত তাবৎ বস্তুতে মৃত্তিকা যেমন পরিব্যাপ্ত তেমনি এক আত্মাই জগতে পরিব্যাপ্ত, সমস্ত তাঁরই কার্য। আত্মা একই, বিভিন্ন পদার্থে তিনি বিভিন্ন নন। সর্বাত্মক ও সর্বময় হয়েও আত্মা দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্বভেদরহিত, মহান।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সাংখ্যমতে পুরুষকে সকল জড়ধর্মবর্জিত বলা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ প্রায় ব্রহ্মেরই মতো। পার্থক্য একটু আছে এই যে, তাঁকে ভোক্তা বলা হয়, কর্তা বলা হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ ভোক্তা হলেও তিনি পরিণামী নন, বিভিন্ন দেহে যে বিভিন্ন পুরুষ অভিমান করছেন মুক্তির পরেও তাদের সেই ভেদ দূর হয় না। কারণ দেখা যাচ্ছে, যেহেতু একজন মুক্ত হলে আর একজন মুক্ত হয় না সুতরাং সাংখ্যমতে বহু পুরুষ স্বীকৃত। তাঁরা প্রত্যেকেই অপরিণামী।

এখন প্রশ্ন হলো, তাঁদের পার্থক্য কী দিয়ে হবে? তখন বলা হয় যে, তাঁদের সমস্ত গুণ চলে গেলেও একটি গুণ থাকে সেটি হলো সংখ্যা। সংখ্যার দ্বারাই তাঁদের পার্থক্য হবে। বেদান্তী বলেন, সব গুণ চলে গেলে সংখ্যা বলে একটি নতুন গুণ কল্পনা করে তার দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পার না। বস্তুতপক্ষে, একটি পুরুষ থেকে আর একটি পুরুষের পার্থক্য কল্পনা করা নিরর্থক। শুদ্ধ জলবিন্দু শুদ্ধ জলাশয়ে পড়লে যেমন হয় তেমনি মুক্তপুরুষ আত্মসাক্ষাৎকার করলে আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যান। বেদান্তমতে আত্মাকে একও বলা যায় না। এক বললে সংখ্যা বোঝায়, তাই অদ্বিতীয়, অদ্বৈত বলা হয়, যাকে ইংরেজীতে Monism বলা হয়, তা নয়। বলা হয় Non-

১. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২২/৩/৮

dualism, অদ্বৈত। কেননা, এক বললেও সংখ্যাটিই একটি গুণ হয়ে গেল। আত্মা নির্গুণ অতএব তাঁর একত্বরূপ গুণও থাকতে পারে না। তাঁকে যে অদ্বৈত বলা হয় সেটা কি গুণ হবে না? বলছেন, অদ্বৈত গুণ নয়, গুণের নিষেধ। দ্বৈত নয়, এটুকুই বলা হয়েছে। এসব বড় কূটকচালে বিচার, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এগুলো খুব কাজে লাগে না। এক আর অদ্বৈতের মধ্যে পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচার করতে গেলে প্রতিটি কথাই বড় ওজন করে বলতে হয়। এখানে সার কথা, সংখ্যারূপ উপাধিও সেখানে নেই সেইজন্য অদ্বৈত।

মূল কথা হলো, বিচার করে শাস্ত্রের সাহায্যে এই তত্ত্বে পৌঁছান যায় যে, সর্বদেহ-অভিমানী জীব যাদের বলছি, তাদের স্বরূপ হচ্ছে এক অদ্বয় তত্ত্ব, যাতে কোন জড়ধর্ম আরোপিত হতে পারে না। আমরা যতক্ষণ ব্যবহারের রাজ্যে আছি ততক্ষণই দেহাদির ধর্ম আত্মায় আরোপিত হয়। ব্যবহারের সীমাকে অতিক্রম করে গেলে সেখানে আর আরোপ নেই। কোন বিচারও সেখানে স্থান পায় না। বেদ পর্যন্ত সেখানে নীরব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার একথা বলছেন যে সেই অবস্থায় সব মৌন হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। 'উপশান্তোঽয়মাত্মা'[১]—এই আত্মা শান্ত, আত্মোপলব্ধিতে সব চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি। সেই অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। এইজন্য তাঁকে কেবল 'নিষেধ-মুখে' বলা হয়। 'নেতি নেতি'[২]—এ নয়, এ নয়, বলতে বলতে যেখানে মানুষ চুপ হয়ে যায় অর্থাৎ যখন আর এমন কোন ধর্ম কল্পনা করতে পারে না যা আত্মার উপরে আরোপ করা যাবে, তখন বাকি যা রইল তাই আত্মা। সেই আত্মা সম্বন্ধে আবার যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আত্মা কিরকম? তার উত্তরে বলছেন আত্মা যেমন তেমনই। সে আত্মা কোথায় থাকে? 'স্বে মহিম্নি যদি বা ন'[৩]— বলতে চাও তো বল তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আবার এ বললে মনে যদি সংশয় আসে তাহলে তিনি আর তাঁর মহিমা দুটি পৃথক বস্তু কি? তাই আবার বলছেন, তাও হয়তো বলা যায় না, শব্দের অগম্য সেই তত্ত্ব। শব্দের অগম্য হলে সেই শব্দ দিয়েই আবার তাঁকে বলছি কেন? না, শব্দটা ইতি-পর নয় নেতি-পর। সেইজন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেও ব্রহ্মকে শব্দের অতীত রূপে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলছেন, এইসব শব্দের প্রয়োগে কোন দোষ হচ্ছে না।

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৩॥

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—৩/২/১৭

২. বৃহদারণ্যক—৩/৯/২৬

৩. ছান্দোগ্য—৭/২৪/১

অন্বয় ঃ—[যিনি] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) ঊর্ধ্বম্ উন্নয়তি (ঊর্ধ্বদিকে প্রেরণ করেন) অপানম্ (অপান বায়ুকে) প্রত্যক্ (নিম্নদিকে) অস্যতি (নিক্ষেপ বা সঞ্চালিত করেন) [সেই] মধ্যে (হৃদয়ে) আসীনম্ (অবস্থিত) বামনম্ (উপাস্য আত্মাকে) বিশ্বে (সমস্ত) দেবাঃ (চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ) উপাসতে (উপাসনা করে অর্থাৎ তাঁরই প্রেরণায় স্ব স্ব কার্যে রত হয়)।

যিনি—'প্রাণম্ ঊর্ধ্বং উন্নয়তি'—প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বদিকে প্রেরণ করেন এবং—'অপানং প্রত্যগ্ অস্যতি'—অপান বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন—'মধ্যে বামনম্ আসীনম্'—হৃদয়পদ্ম মধ্যে অবস্থিত সেই উপাস্য আত্মাকে—'বিশ্বে দেবা উপাসতে'—সকল ইন্দ্রিয় তাঁর উপাসনা করে অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে বা তাঁরই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য করে থাকে। এখানে—'দেবাঃ'—বলতে ইন্দ্রিয়গণকে বোঝানো হয়েছে। প্রাণ এবং অপান বিপরীতমুখী হচ্ছে হৃদয় থেকে। এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থানকারী উপাস্য আত্মাকে 'বামনম্' বা সম্মানিত অস্তিত্ব বলা হচ্ছে।

আত্মা হৃদয়মধ্যে অবস্থান করছেন বলার তাৎপর্য এই যে, হৃদয়ে তাঁকে ধ্যান করতে হয়। হৃদয়ের দ্বারাই মানুষ সব জানে। সমস্ত জ্ঞানের, ভাবের উৎপত্তি যেখান থেকে তাকে বলা হচ্ছে হৃদয়। সাধারণত শরীর-মধ্যবর্তী অপূপাকার যে মাংসপিণ্ড আছে, যাকে ইংরেজীতে heart বলে—হৃদয় বলতে তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে হৃদয় বলতে heart বোঝাচ্ছে না। যে করণের দ্বারা আমরা সমস্ত কিছু জানি সেই করণ বা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের স্থান হলো হৃদয়। যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্থান হলো চক্ষুগোলক, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থান কর্ণকুহর, এইরকম যে অন্তঃকরণ থেকে সর্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে সেই অন্তঃকরণকে দেহের যে বিশেষ স্থানের সঙ্গে সম্বদ্ধ করা হয় তাকে বলে হৃদয়। সকলেরই সাধারণ ধারণা যে হৃদয় বলতে যেখানে heart অবস্থান করছে সেই জায়গাটিকেই লক্ষ্য করা হয়। আমরা বুকে হাত দিয়ে বলি, হৃদয়ে উপলব্ধি করছি। আগেই বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মবস্তুর কোন স্থূল স্থান থাকে না, সে ব্যাপক নয়, তবুও যখন তার কোন স্থান নির্দেশ করে দিই তখন তার মানে হলো, সে সর্বগামী হলেও সেই জায়গার সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করে বলছি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যে বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করছি সেই স্থানগুলি যেন ইন্দ্রিয়ের centre of operation, সেখান থেকে যেন সে ক্রিয়া করছে এইরকম বোঝায়। বাস্তবিক চোখের সঙ্গে দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। একটি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যাপক আর একটি ব্যাপক, দুটির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। সংযোগ-সম্বন্ধ না থাকলেও বিশেষ ইন্দ্রিয়ের জন্য একটা আধারকে নির্দেশ করি। এই হিসাবে এক-একটি ইন্দ্রিয়ের এক-একটা আধার আছে। করণ মানে ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ মানে ভিতরের ইন্দ্রিয়—যা দিয়ে অন্তরের বস্তুকে উপলব্ধি করি। বহিরিন্দ্রিয়গুলি বাইরের বস্তু আর অন্তঃকরণ অন্তরের বস্তু নিয়ে ব্যাপৃত। অন্তরের করণ, যেখান থেকে সমস্ত idea-র,

ভাবের উদ্ভব, তাকে তিনি সক্রিয়, সচেতন করেন তাঁর নিজের অস্তিত্বের প্রকাশ দ্বারা। এইজন্য অন্তঃকরণকে আত্মার স্থান বলা হয়েছে। 'মধ্যে বামনমাসীনম্'—হৃদয়মধ্যে সেই 'বামন' অবস্থান করছেন আর সেখানে আত্মার ধ্যানের নির্দেশ আছে।

একজন জিজ্ঞাসা করছেন, কোথায় ধ্যান করব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—হৃদয় তো বেশ ডঙ্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান করো।[১] হৃদয় ডঙ্কামারা জায়গা কী হিসাবে? প্রথমত, সর্ব জ্ঞানের অধিষ্ঠান সেখানে। দ্বিতীয়ত, হৃদয় সর্বভাবের উৎস। তাই যখন তাঁকে ভাবরূপে ভজনা করছি তখন হৃদয়ই হলো তার প্রকৃষ্ট স্থান। হৃদয়মধ্যে অবস্থানকারী সেই বামন অর্থাৎ ভজনীয় তত্ত্বকে—'বিশ্বে দেবা উপাসতে'—ইন্দ্রিয়েরা প্রভুরূপে উপাসনা করে। উপনিষদে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—রাজা-মধুকর যখন উৎক্রমণ করে তখন সমস্ত মধুকররা তার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করে। আবার যখন রাজা অবস্থান করে তখন সমস্ত মধুকররাও অবস্থান করে।[২] আমরা এখন যাকে বলি queen-bee, মক্ষিকারানী, তখন বলা হতো মক্ষিকারাজা। তখন রাজারানীর লিঙ্গভেদ অত বিচার করা হতো না। যে প্রধান সে-ই রাজা, সেই হিসাবে মক্ষিকারাজা বলা হয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্য করে তাঁরা বলতেন যে, মৌমাছির রাজা চাক ছেড়ে চলে গেলে অন্য মৌমাছিরাও চলে যায়। সেইরকম এই দেহের ভিতরে যিনি আছেন তিনি যখন চলে যান তখন আর সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। একে শাস্ত্রে 'মুখ্যপ্রাণ' বলা হয়। মুখ্য মানে প্রধান, প্রাণ মানে ইন্দ্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যিনি প্রধান। এর সম্বন্ধে উপনিষদে[৩] গল্পচ্ছলে বলা আছে—ইন্দ্রিয়েরা একসময় পরস্পরের উপর প্রাধান্য স্থাপন করবার চেষ্টা করছে। চোখ বলে আমি বড়, কান বলে আমি বড়, নাক বলে আমি বড়, প্রত্যেকেই নিজেকে বড় বলছে। এখন কী করে নিষ্পত্তি হবে? সকলে গিয়ে তাদের যে রাজা তাকে বলল, আমরা ঠিক করতে পারছি না কে বড়। তখন তিনি একটা প্রণালী বললেন, তোমরা এক-একজন করে চলে যাও, দেখি কী হয়। তারা এক-একজন করে দেহ ছেড়ে চলে গেল। চোখ চলে যেতে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি যেমন কাজ করছিল করতে লাগল কেবল চোখ নেই বলে দেখতে পাচ্ছে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় ফিরে এসে দেখল যেমন চলছিল তেমনি সব চলছে। তারপর কান চলে গেল। দেখা গেল সব কাজই যেমন চলছিল চলল, শুধু শোনা যায় না। এইরকম এক একটি করে ইন্দ্রিয় চলে যায় কিন্তু বাকিগুলি কাজ করতে থাকে। তারপর মুখ্যপ্রাণ বলল এবার আমি চলে গিয়ে দেখি। সে যখন যাচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে সকলের টান পড়ল, আর কেউ থাকতে পারছে না। বোঝা গেল মুখ্যপ্রাণই প্রধান, সে চলে গেলে সকলেই চলে যায়। সেই

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩

২. প্রশ্নোপনিষদ্ —২/৪

৩. ছান্দোগ্য—৫/১/৬-১৫

মুখ্যপ্রাণকেই এখানে রাজা বলা হয়েছে। যে প্রাণকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয়, সজীব থাকে তারা মুখ্যপ্রাণকেই উপাসনা করে। এছাড়া কাকে করবে? এই মুখ্যপ্রাণই যে প্রাণন ক্রিয়ার প্রধান তা কিন্তু বলেননি, মুখ্যপ্রাণে যিনি প্রাণসঞ্চার করেন তিনি আত্মা, তাঁকেই লক্ষ্য করছেন। আত্মা না থাকলে কোন প্রাণ, ইন্দ্রিয় কাজ করে না। সুতরাং 'সর্বে দেবাঃ'—সকল ইন্দ্রিয় আত্মার উপাসনা করে।

ভাব হলো যে, জীবদেহে বাহ্যেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং চৈতন্য সবগুলি এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে যে, আমরা তাদের পরস্পরকে পৃথক করতে পারি না। তারা একসঙ্গে আমাদের অনুভূতির বিষয় হয়। সকলকে একত্র অনুভব করি। পৃথককরণের প্রচেষ্টায় দেখা গেল একটি ইন্দ্রিয় না থাকলে অপর সব ইন্দ্রিয়গুলি অচল হয় না। যে প্রধান তার অধীনে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি থাকে। এদের অস্তিত্বেরও এই অধীনতা, সুতরাং এদের সকলেরই গৌণ সত্তা। একমাত্র একটি বস্তুরই মুখ্য সত্তা। সেই বস্তু কী? তাকে আমরা কখনো বলছি অন্তঃকরণ, কখনো বলছি মুখ্যপ্রাণ। এই মুখ্যপ্রাণও আবার নির্ভর করে চৈতন্যের উপর। সেই চৈতন্যের শক্তিতে এরা ক্রিয়াশীল, প্রকাশমান। সুতরাং এর ভিতর দিয়ে আমরা সেই চৈতন্যকে বোঝার চেষ্টা করছি। যাঁর চৈতন্যে সমস্ত বস্তু চেতন এবং ক্রিয়াশীল তিনিই আমাদের প্রকৃত সত্তা—প্রকৃত শক্তি সেখানে। বাকিগুলি হচ্ছে তাঁর আশ্রিত বা তাঁর সত্তা দ্বারা সত্তাবান। এইভাবে দেখতে চেষ্টা করলে শুদ্ধচৈতন্যকে খানিকটা বুঝতে পারি, অসংবদ্ধ, অসংশ্লিষ্টরূপে তাঁকে ভাবতেও পারি না। কোন্ ইন্দ্রিয়, কোন্ করণ দিয়ে ভাবব? এমন যন্ত্র হাতে নেই যা দিয়ে তাঁকে ভাবব। সুতরাং তিনি 'চক্ষুষা পশ্যতি, কর্ণেন শৃণোতি'—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনিই ক্রিয়া করছেন এইভাবে বুঝতে পারি। এইগুলি থেকে তাঁকে যখন পৃথক করে ফেলি তখন তিনি শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতীত হন। তাঁকে জানবার উপায় হিসাবে এগুলি বলা হয়েছে। এইসব উপাধির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রতীত হচ্ছেন বলে আত্মা আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। বিভিন্নরূপে যাঁর প্রতীতি হচ্ছে তাঁকে বিভিন্ন রূপ থেকে পৃথক করে ভাবতে পারলে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। শাস্ত্র আমাদের সেই উপায়ই এখানে বলে দিচ্ছেন।

শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, সেই হৃদয়াকাশস্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয় প্রকাশরূপ নিজ নিজ ব্যাপার থেকে উপরত হয় না। যাঁর উদ্দেশে এবং যাঁর প্রেরণায় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন হয়, তিনি প্রাণাদি থেকে পৃথক এটাই প্রমাণিত হয়। দেহেন্দ্রিয়, মনবুদ্ধ্যাদি থেকে আত্মা ভিন্ন, এটাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥৪॥

অন্বয় ঃ—অস্য (এই) শরীরস্থস্য (দেহস্থ) দেহিনঃ (আত্মার) দেহাৎ (দেহ থেকে) বিমুচ্যমানস্য (বিমুক্ত হওয়ার পর) বিস্রংসমানস্য (স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর) অত্র (এই দেহে) কিম্ (কী) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে?) [অর্থাৎ কিছুই থাকে না]। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

'অস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ'—শরীরে অবস্থিত দেহাভিমানী আত্মা 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য বিস্রংসমানস্য'—দেহ থেকে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হলে 'কিম্ অত্র পরিশিষ্যতে'—দেহাদি সংঘাতের কী অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ জীবরূপী আত্মা দেহ পরিত্যাগ করলে কার্যকারণাত্মক এই দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। 'এতৎ বৈ তৎ'—শরীর থেকে যার অপগমে শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, এই সেই আত্মা।

শ্রুতি নিজেই বলছেন, আত্মা 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে'—দেহ থেকে বিমুক্ত হলে তখন সেখানে আর কী অবশিষ্ট থাকে? আগের মন্ত্রটিকে অনুসরণ করে এখানে বুঝতে হবে যে, শরীর, ইন্দ্রিয় আর আত্মবস্তু আমাদের কাছে যেন একটা তাল পাকিয়ে পিণ্ডীভূত হয়ে বোধ হচ্ছে। এগুলি থেকে আত্মাকে পৃথক করলে 'ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে'[১]—আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পুরস্বামীর পলায়নে পুরবাসিগণের ন্যায় এই দেহরূপ পুর থেকে আত্মার বহির্গমনে কার্যকারণাত্মক প্রাণাদিসমূহ মুহূর্তে বলহীন হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন এটাই সিদ্ধ হলো।

দেখা যাচ্ছে শ্রুতি একই জিনিসকে বিভিন্ন প্রকারে বোঝাচ্ছেন। ইন্দ্রিয় চেতন, মন চেতন—এইভাবে প্রত্যেকটিকেই চেতনরূপে দেখছি। যেমন, লোহার খণ্ডটার একটা অংশ গরম, অপর অংশও গরম, অগ্নিকে সর্বত্রই অনুভব করছি, কিন্তু অগ্নিকে লৌহখণ্ড থেকে পৃথক করে দেখতে পাচ্ছিনা। সেইরকম আত্মচৈতন্য আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সর্বত্র অনুভূত বস্তু হলেও তাঁকে দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখতে পারব না। কারণ সেভাবে দেখতে গেলে তাঁকে আর একটি বিষয় করে ফেলতে হবে, কিন্তু বিষয় তিনি হবেন না। একটি বিষয়কে অনুভব করতে বিষয়ান্তরের প্রয়োজন। চেতন ছাড়া অনুভব করবে কে? চৈতন্যকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে দেখা যদি সম্ভব হয় তাহলে সে জড়, আর যে তাকে দেখছে সে চেতন হবে। আমাদের বুদ্ধির বিভ্রম ঘটবার এই একটি প্রধান কারণ। আমাদের অনুভবের ধারা হচ্ছে বিষয়রূপে সব বস্তুকে অনুভব করা, যে অনুভব করছে বিষয়টি তার থেকে ভিন্ন হবে। এই দেহেন্দ্রিয়াদিকে যখন আমি অনুভব করতে যাই সেগুলি বিষয়, কিন্তু তার থেকে পৃথক করে যখন আমি আমাকে ভাবতে যাই তখন সেই আমাকেও আর একটি বিষয়ে পরিণত করি। সুতরাং সেই বিষয়টিও চেতন হতে পারে না। এইভাবে যতই তাঁকে আমরা বিষয় করতে যাচ্ছি তিনি ততই তার পিছনে চলে যাচ্ছেন। কাজেই এই উপায়ে তাঁকে

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/২/৪

আমরা ধরতে পারব না। সেইজন্য শাস্ত্র এখানে কেবল যে উপায়ে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব তাই বলছেন। বলছেন, যদি এগুলি বিষয় হয় তাহলে এগুলিকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই বিষয়ী, কিন্তু সেই অবশিষ্টকে আর একরকম করে জানতে চেষ্টা করো না, তা কখনো পারবে না। বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানের বিষয় করতে পারা যায় না। দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না।

আর একটি কথা বলছেন, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে যিনি রয়েছেন তাঁর দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি কাজ করছে, দেহযাত্রা চলছে, অনুভবও চলছে। জড়বাদী দৃষ্টিতে চৈতন্য যেন আনুষঙ্গিক একটি নূতন উদ্ভব, by-product। এটি উৎপন্ন হচ্ছে দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রিয়ার দ্বারা। ওসম্বন্ধে আর আলাদা করে চিন্তা করার কিছু দরকার নেই। দেহ-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগুলিকে ভাল করে জানলেই কাজ হবে। Behaviourist Psychology বা ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্বে এইভাবে বলে, মনকে আলাদা করে ভাববার কী দরকার? দেহের যে নানারকমের প্রক্রিয়া হচ্ছে তার খুব সূক্ষ্মতত্ত্বেও যদি চলে যাও তো বড় জোর brain বা মস্তিষ্ক, তার ভিতরে যে নানারকম আলোড়ন, নানারকম তড়িৎপ্রবাহের গতায়াত হচ্ছে, এইগুলিকেও যদি ভাল করে জান তাহলেই তোমার কাজ হয়ে গেল। এর পিছনে চিন্তা বলে আর কোন বস্তু নেই, থাকলেও সেটা তোমার কোন কাজে লাগছে না। সুতরাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য এই দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে আয়ত্ত করলেই যথেষ্ট হবে, একেই জান। এই হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা করিও তাই। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা ধরা যাক। একজন hallucination দেখে, অর্থাৎ মনঃকল্পিত বস্তুকে তদ্‌বাহ্য সত্য রূপে দেখে। ব্যক্তিটিকে একটা ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে তার hallucination দেখা বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তার উপরে আলাদা করে প্রভুত্ব আনবার কোন দরকাই নেই। সূক্ষ্ম এবং স্থূলশরীরের অবয়বগুলিকে ভাল করে জেনে এদের বশে রাখবার চেষ্টা করলেই কাজ হবে, আর কিছু ভাবতে হবে না।

সমস্যা হচ্ছে, মাত্র এইরকম প্রভুত্ব করে আমরা সন্তুষ্ট নই, আমরা তত্ত্বকে জানতে চাই। আমার প্রশ্ন, যে 'আমি' জানছে সে 'আমি'-টি কে? Behaviourist Psychology-র দিক দিয়ে বিষয়টিকে বিচার করে দেখলে এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। আমরা বলব, এই প্রশ্নের মতো অতি আবশ্যক প্রশ্ন আর দ্বিতীয় নেই। আমরা নিজেদের জানব না, অজ্ঞ হয়ে থাকব এ কেমন কথা! আমরা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, শরীরের পরিবর্তন এগুলি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যে 'আমি' দেখছি সেই 'আমি' কে, তা জানতে হবে। 'আমি' নিষ্প্রয়োজন এ বলার কোন তাৎপর্য নেই। 'আমি'-কে না জেনে অন্য যত কিছু জানা সবই অর্থহীন। 'আমি'-কে অস্বীকার করে তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত স্থূল করে রাখছ। আমরা এই স্থূলে সন্তুষ্ট নই, 'আমি'-কে জানতে চাই।

অপর পক্ষ থেকে এর কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। সুতরাং, যে 'আমি' স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ববস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাকে কী করে জানব? শাস্ত্র সেই উপায়গুলিকে বলে দিচ্ছেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে তাকে পৃথক করে দেখতে হবে! পৃথক করার পর কী বস্তু আছে তা হয়তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। সেইজন্য বলছেন যা অবশিষ্ট থাকে—'এতৎ বৈ তৎ'। যদিও সেই অবশিষ্ট বস্তুটিকে আমরা জ্ঞানের বিষয় করতে পারি না তবুও বস্তুটি যে নেই—এ কথাও বলতে পারা যায় না, কারণ তার অস্তিত্বের উপরে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সকলের অস্তিত্ব যাঁর অস্তিত্বের অধীন তাঁকে অস্বীকার করা চলে না। আবার সেই বস্তুকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও করতে পারছি না। এটি এমন সমস্যা যার সমাধান কোন দিক দিয়ে করতে পারা যায় না।

শাস্ত্র বলছেন, তাঁকে বিষয় যখন করতে পার না সুতরাং নিত্যবিষয়ীরূপে, শুদ্ধচৈতন্যরূপে তাঁকে ভাব। বেদান্তের যে আত্মধ্যান সেটি এই প্রকারের। আত্মধ্যান মানে নিত্য অবিষয়রূপে আত্মার ধ্যান। এটি খুব কঠিন, আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। চেষ্টা করলেও দেখি যে, আমাদের চিন্তা সর্বদাই গতানুগতিক প্রবাহে চলে। বিষয়রূপে নয়, বিষয় থেকে পৃথক করে তাঁকে জানতে হবে, সেটিই হলো আসল জানা। কোন একটি ভাবকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার মৌলিক স্বরূপে গিয়ে আর ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি 'ভালবাসা' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে যাই, পারব না। যতই চেষ্টা করি তার কতকগুলি দৃষ্টান্তমাত্র দেওয়া যাবে, তার স্বরূপকে বলতে পারব না। এইরকম যে কোন মৌলিক বৃত্তির ব্যাখ্যা হয় না। করতে গেলে সেটি কী নয় তা বলতে পারি, কিন্তু সেটি কী তা বলতে পারব না। সাধারণ বস্তু সম্বন্ধেই যখন এই কথা তখন সর্ব বস্তুর পশ্চাতে যে অবিভাজ্য সত্তা বা শুদ্ধচৈতন্য তাঁকে কী করে বোঝাব? যেখানে 'নিরস্তসর্ববিশেষম্'[১]—অর্থাৎ, সমস্ত বিশেষ লুপ্ত।

বর্ণনা করা মানে বৈচিত্র্য আবিষ্কার করা, রূপ-গুণ-স্বরূপ কী তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু যে বস্তুর ভিতরে বিশেষ নেই তা ব্যাখ্যার অতীত, এইজন্য আত্মাকে নির্বিশেষ বলা হয়েছে। নির্বিশেষকে কী করে বিশিষ্ট করব? আমাদের সমস্ত জ্ঞানই বিশেষযুক্ত। কোন একটি বস্তুকে যে বিশেষরূপে জানা বলি তার অর্থ অন্যান্য বস্তু থেকে তাকে পৃথকরূপে জানা। টেবিলকে জানতে হলে যা যা টেবিল নয় এমন সব বস্তু থেকে পৃথক করে টেবিলকে জানা হলো বিশিষ্টরূপে জানা। আত্মার ভিতরে কোন বিশেষ নেই, তাই তাঁকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে, এভাবে ভাবা যে, তিনি হলেন সেই স্বরূপ যাঁকে ছাড়া বৈচিত্র্যের অনুভব হয় না। তিনি না থাকলে জগতের কোন বস্তু থাকতে পারে না। অস্তিত্বের, প্রকাশের শেষ কথা তিনি, অনুভবেরও শেষ কথা।

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য—১/১/২০

এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে যে, প্রাণ বা অপানের দ্বারা এই ক্রিয়া চলছে। হৃদয় থেকে যে শক্তিপ্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয় তাকে বলে 'প্রাণ' আর যা অধোগামী হয় তাকে বলে 'অপান'। আমরা বায়ু বলি, তার তাৎপর্য হচ্ছে প্রাণ বা শক্তি, বাতাস নয়। গীতায় বলেছেন, 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা'[১]—প্রাণ এবং অপানকে সমান করে। এ কথার মানে কী? দুটি শক্তি, একটি ঊর্ধ্বগামী অপরটি অধোগামী। যার দ্বারা দেহ ক্রিয়াশীল, প্রাণন ক্রিয়া যার দ্বারা হচ্ছে তাকে সম করতে হবে। অর্থাৎ তাদের বিক্ষোভ বা বিরুদ্ধমুখী গতিকে রুদ্ধ করতে হবে। করলে কী হবে? না, প্রাণাপানাদি গতি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আবার আমাদের প্রাণায়ামের কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। প্রাণ মানে প্রাণশক্তি, তার আয়াম অর্থাৎ সংযম, এই হলো প্রাণায়াম। প্রাণের সংযম কথাটি ভুলে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির নিয়ন্ত্রণকে আমরা প্রাণায়াম বলে মনে করি। সেটা প্রাণায়াম নয়, প্রাণায়ামের একটা উপায় মাত্র। প্রাণশক্তিকে ধরতে পারছি না কিন্তু প্রাণ এবং অপান বায়ু অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে সংযত করে আমরা তার পিছনে যে শক্তি রয়েছে তার উপরে প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছি।

যদি কেউ মনে করেন প্রাণবায়ু নির্গত হলে শরীর নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং প্রাণাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, সেইজন্য যমরাজ এরপর বলছেন—

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৫॥

অন্বয় ঃ—কঃ চন (কোন) মর্ত্যঃ (প্রাণীই) ন প্রাণেন (না প্রাণের দ্বারা) ন অপানেন (না অপানের দ্বারা) জীবতি (জীবিত থাকে)। তু (পরন্তু) এতৌ (এই প্রাণ ও অপান) যস্মিন্ (যাঁকে) উপাশ্রিতৌ (আশ্রয় করে আছে) [তেন] ইতরেণ ([সেই] প্রাণাপানবিলক্ষণ আত্মার সাহায্যেই) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে)।

প্রাণ এবং অপান, এই শক্তি দুটি দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল। আমরা আগেই দেখেছি হৃদয় হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী স্থান যেখান থেকে এই দুটি শক্তির স্রোত দুদিকে যাচ্ছে, একটি ঊর্ধ্বগামী ও অপরটি অধোগামী হচ্ছে। এদের দ্বারা সমস্ত দেহ প্রাণনক্রিয়াবিশিষ্ট হচ্ছে, প্রাণবান হচ্ছে, শক্তি-প্রবাহ দুদিকে দিয়ে সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

আমরা বলি প্রাণ এবং অপান মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শ্রুতি বলছেন, ভুল বুঝেছ। দেহবান, মরণশীল কোন মানুষই প্রাণ বা অপানের দ্বারা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে জীবনধারণ করে না। তাহলে কিসের দ্বারা বাঁচে? না, এদের থেকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু রয়েছে, তার দ্বারা বাঁচে। সে বস্তুটি হচ্ছে প্রাণ এবং অপানের আশ্রয়, যাকে অবলম্বন করে প্রাণশক্তি এবং অপানশক্তি

১. গীতা—৫/২৭

ক্রিয়া করছে। বলছেন, সেই প্রাণ বস্তুটিকে আমরা একটা শক্তি বলে ধরে নিই। শক্তি কর্মের দ্বারা অনুমেয়। যেমন, স্থূলদৃষ্টিতে ধরা যাক, বিদ্যুৎশক্তিকে আমরা দেখি না কিন্তু কাজ দেখে তার শক্তিকে কল্পনা করি। সেইরকম প্রাণ-অপান শক্তিকে দেখি না কিন্তু তাদের ক্রিয়া থেকে তাদের সত্তার অনুমান করি। আমরা বলি, এই প্রাণন এবং অপানন ক্রিয়ার দ্বারাই মানুষ বেঁচে থাকে। কিন্তু এরাও স্বপ্রধান নয়। কেন নয়? না, যেহেতু তারা একটি সংঘাতের অন্তর্গত। আমাদের সেই পুরোনো কথায় ফিরে যেতে হবে। যা সংঘাত অর্থাৎ কতকগুলি বস্তুর সমষ্টি, তা স্বপ্রধান হয় না, এই বস্তুগুলিও পরস্পরকে চালায় না। তাদের পিছনে আর একটি কোন সত্তা থাকে যা তাদের চালায়। যেমন, একটা বাড়ির আসবাবপত্রগুলি নিজেদের নির্মাণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না, সকলে মিলে সকলকে করে তা-ও না। এদের পিছনে কোন প্রভু, স্বামী আছেন যাঁর দ্বারা এগুলি নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত। তিনি যাকে যেখানে রেখেছেন সে সেখানে থাকছে, যাকে যেদিকে সরাচ্ছেন সে সেইভাবে সরে যাচ্ছে। সেই স্বামীকে কেউ যদি দেখতে না পায় সে মনে করবে এই জিনিসগুলি বুঝি স্বপ্রধান। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা বলবে এগুলির পিছনে মালিক আছে যার ইচ্ছায় এগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সংঘাতের প্রত্যেকটি অঙ্গ এইরকম, তা আর একটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে, যিনি এই সংঘাতের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ নন। সেইরকম এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির যে সংঘাত, তার অন্তর্নিহিত যে প্রাণ তা চলে অপরের নিয়ন্ত্রণে। যাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে, যাঁর অধীন হয়ে থাকে তিনিই সেই পরমতত্ত্ব, আর এগুলি হলো তাঁর আশ্রিত। বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলি তাঁর উপরে আরোপিত, তাঁর সত্তায় এরা সত্তাবান, তাঁর প্রকাশে প্রকাশমান। দেহেন্দ্রিয়াদি একান্ত পরনির্ভরশীল। সেই পর যিনি, তিনিই প্রকৃষ্ট সত্তা বা পরম তত্ত্ব, তিনিই দেহেন্দ্রিয়াদির পর যা অবশিষ্ট থাকে সেই আত্মা।

এখন, সেই যে নচিকেতার প্রশ্ন ছিল, শরীর গেলে তারপর কী হয়? কিছু থাকে কি না? এককথায় তার উত্তর হলো, থাকে। কী থাকে? আত্মা থাকেন। কেন তাঁকে 'থাকেন' বলব? কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির বিনাশের দ্বারা তাঁর বিনাশ হতে পারে না, দেহেন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব তাঁর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তার বিপরীতক্রমে তিনি এদের উপর নির্ভরশীল নন। অতএব তিনিই একমাত্র সত্তা, বাকি সব তাঁর অধীন। এইভাবে তাঁকে বুঝতে হবে।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৬॥

অন্বয় ঃ—গৌতম (হে নচিকেতা) হন্ত (অবহিত হও—এই অর্থবোধক অব্যয়) ইদম্ গুহ্যম্ (এই গূঢ়) সনাতনম্ (নিত্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ) চ (এবং) [ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে] মরণম্ প্রাপ্য (মৃত্যুর পর) আত্মা যথা ভবতি (আত্মা যা হন, জীবাত্মার গতি) [তা-ও] তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলব)।

যম নচিকেতার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছেন, হে গৌতম, 'হন্ত তে ইদম্'—আমি তোমাকে এই 'গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্'—গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয় এবং অনধিকারীর কাছে অপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব বলছি। 'যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি'—আত্মা অর্থ এখানে জীব। জীব ব্রহ্মকে না জেনে মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাও বলছি। দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব সকলে জানতে পারে না। না জেনে মৃত্যুমুখে পতিত হলে যে প্রকারে জীব জন্ম-মৃত্যুর অনুসরণ করে তা বলা হচ্ছে।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥৭॥

অন্বয় ঃ—[মৃত্যুর পর] অন্যে (অবিদ্যাবান্ কোন কোন) দেহিনঃ (দেহধারী জীব) যথা কর্ম (নিজ নিজ কর্ম) যথাশ্রুতম্ (নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে) শরীরত্বায় (শরীর গ্রহণের জন্য) যোনিম্ (মাতৃগর্ভ) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করে), অন্যে (অপর কোন কোন জীব) স্থাণুম্ (বৃক্ষপ্রস্তরাদি স্থাবর দেহ) অনুসংযন্তি (লাভ করে)।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে পরজন্ম গ্রহণ করে। তদপেক্ষা অধম জীবগণ যাদের অবিদ্যার আবরণ অত্যন্ত বেশি তারা মৃত্যুর পরে বৃক্ষাদি স্থাবর দেহ লাভ করে। যারা 'আমি এই শরীরবিশিষ্ট, আমার এই শরীর'—এইরকম অভিমান করে তাদের দেহী বলা হয়। দেহ আছে এই অর্থে দেহী। দেহের সঙ্গে কী সম্বন্ধ? 'আমার দেহ' কথাটা গৌণভাবে বলা হয়। অনেক সময় 'আমিই দেহ'—এই প্রকার বলা হয়। দেহটা আমার অথবা দেহই আমি এইরকম বুদ্ধি মানুষের হয়। কখন হয়? না, যখন দেহের নাশে আত্মাকে মৃত বলে মনে করি। দেহের সঙ্গে আত্মার অভিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা করে দেহে 'আমি' অভিমান করি। এই সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলা যায়। দেহ যেন একটি সম্পত্তি, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ। এইরকম সম্বন্ধকে 'স্বস্বামিত্ব' সম্বন্ধ বলে। দেহে এইরকম অভিমানবিশিষ্ট আত্মাকে দেহী বলে।

সাধারণ বুদ্ধিতে দেহী আর আত্মা, এই দুই-এ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই বলে মনে হয়। কারণ আত্মাকে দেহাদি ব্যতিরিক্তরূপে, দেহাদি থেকে ভিন্নরূপে কল্পনা করতে পারি না। যখন দেহকে বলি চেতন সেটি মুখের কথা, সমস্ত উপাধিবর্জিত চৈতন্যের সেখানে অনুভব হয় না। অনুভব হচ্ছে চৈতন্যের এবং চৈতন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সংঘাতের, তাকেই 'আমি চেতন' বলে বলি। আমি চেতন, আমার দেহটা চৈতন্যবিশিষ্ট—এরকমের কল্পনা হয়। শুদ্ধ আত্মার অনুভব হলে মুক্তি হয়ে যেত, অজ্ঞানের নাশ হয়ে যেত। শুদ্ধ আত্মার অনুভব হলে তার সঙ্গে আর অবিদ্যা, অজ্ঞান থাকতে পারে না।

বহুবার বলা হয়েছে, জ্ঞান ও অজ্ঞান যেন আলো আর অন্ধকার। এদের সহ-অবস্থান হতে পারে না। আমরা দেহী বলতে আত্মাকে শুদ্ধরূপে বুঝি না, দেহের সঙ্গে সংবদ্ধরূপে, উপহিতরূপে বুঝি। এখানে 'দেহিনঃ' এই বহুবচন থাকায় বুঝতে হবে দেহী একটি নয়, অনেক। আত্মাকে যদি দেহবিযুক্তরূপে কল্পনা করি তার বহুত্ব থাকে না। কারণ একটি আত্মা থেকে আর একটিকে পৃথককরণের কোন বিশেষ সেখানে নেই। সাধারণত, আমরা দেখি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, ভিন্ন ভিন্ন মন বিদ্যমান। কাজেই দেহীর পার্থক্য এসে পড়ে।

সর্বত্রই এক ব্রহ্ম—এরকম কল্পনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হবে তা কী করে সম্ভব? সবাই এক হলে একজনের মুক্তি হয়ে গেলে সকলেরই মুক্তি হয়ে যেত, একজনের জ্ঞান হলে সবার জ্ঞান হয়ে যেত। তা তো হয় না। এখানে বহুত্ব স্বীকার করতে হয়। দেহাদি অভিমান এলে বহুত্বও এসে পড়ে। অনেক দেহী বলে বহুবচনে উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, আত্মা দেহাভিমানবিশিষ্ট হয়ে বহু হয়েছেন সেইজন্য এখানে বহুবচনে 'দেহিনঃ' বলা হচ্ছে।

এই যে বহুবচনবিশিষ্ট দেহাভিমানিগণ শরীর ধারণ করে এবং শরীর ধারণ করবার জন্য বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করে—এ হলো একটু উচ্চস্তরের জীবের কথা। তার চেয়ে নিম্নস্তরের জীব আছে, যারা স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, অচল হয়ে থাকে। স্থাণু অর্থাৎ যা গতিশীল নয়, স্থিতিশীল। কর্ম অনুসারে জীবের বিভিন্ন গতি হয়। এখানে আর কিছু বিস্তার করে বলা নেই। অন্য জায়গায় যা বলা আছে সেগুলিকে এখানে সংকলিত করলে মনে হয় যে, আমাদের প্রত্যেকের সংগৃহীত কর্মের একটি করে বড় পুঁটুলি আছে, যে বোঝা সকলেই বহন করে বেড়াচ্ছি। সেই প্রকাণ্ড বোঝার ভিতর থেকে কতকগুলি কর্ম যেন পৃথক হয়ে এসে এক-একটি শরীর ধারণ করায়। একটিমাত্র দেহে সমস্ত কর্মের ভোগ একসঙ্গে হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, আমার কিছু ভাল কর্ম করা আছে যার জন্য রাজৈশ্বর্য ভোগ করতে হবে, আবার কিছু মন্দ কর্ম করা আছে যার জন্য দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে। সমকালে একই শরীরে দুটি ভোগ সম্ভব নয়। কাজেই কতকগুলি কর্ম যাদের ফল একসঙ্গে ভোগ করা যায় তারা দেহধারণ করায়। বাকিরা যেন তৈরি হয়ে আছে, এই ভোগটুকু হয়ে গেলেই আবার একটি দেহকে সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ কর্ম দেহ ধারণ করাবে আর কোন্ কর্ম করাবে না তা আলাদা করব কেমন করে? কর্ম হিসাবে তো সবগুলিই সমান। শাস্ত্র তার উত্তরে বলেন যে, ভাবী যে কর্মগুলি শরীরধারণ করাবে, যাকে প্রারব্ধ বলে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান জীবনের দ্বারা। অর্থাৎ এই জীবন যদি সৎভাবে কাটে, যদি শুভ সংস্কার অর্জন করা যায় তাহলে তারই প্রভাবে

অনুরূপ কতকগুলি কর্ম আবার পরবর্তী জীবন তৈরি করবার জন্য এগিয়ে আসে এবং সেগুলিকে আবার আমরা তখন প্রারব্ধ বলি। সেই শুভ প্রারব্ধ আবার পরবর্তী জীবন তৈরি করে। শৈশব থেকে কারো ভাল সংস্কার দেখলে বলি এর প্রারব্ধ খুব ভাল। মন্দ কর্মও আছে কিন্তু সেগুলি এখন অপেক্ষা করবে যেহেতু পূর্ব জীবনের কর্ম একটা বেগ, momentum সৃষ্টি করছে, সেই অনুসারে সে পূর্বকর্মসমূহ থেকে অনুকূল কর্মগুলি বেছে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করবে।

আবার প্রশ্ন হবে, কে বেছে নেয়? আমি? আমার সে সামর্থ্য নেই কারণ, সেসব কর্মগুলি স্মৃতিরূপে আমার কাছে উপস্থিত নেই। সেগুলিকে আমি বাছতে পারি না, সেগুলি সম্বন্ধে জানিই না। এইজন্য পশ্চাতে কোন চেতন নিয়ন্তা কল্পনা করতে হয় যিনি আমার সমস্ত কর্ম জানেন এবং আমার বর্তমান জীবনের অনুরূপ শুভকর্মগুলি সংগ্রহ করে পরবর্তী জীবনকে সৃষ্টি করেন, প্রেরণ করেন। নির্বাচন তাঁর হাতে, আমার হাতে নয়। তবে সেই নির্বাচনের জন্য আমার বর্তমান জীবনের অপেক্ষা থাকে। বর্তমান জীবনকে যদি সৎভাবে চালাতে পারি তাহলে পূর্বজন্মের শুভ অশুভ যেরকম কর্মই সঞ্চিত থাকুক না কেন, বর্তমানের শুভকর্মের ফলে পরবর্তী প্রারব্ধ শুভ হবে। আর তা যদি না করি তাহলে যে অশুভ কর্ম সঞ্চিত আছে সেগুলি এগিয়ে এসে পরবর্তী জীবনকে তৈরি করবে। এইজন্য সবচেয়ে প্রয়োজন বর্তমান জীবনটিকে খুব ভালভাবে চালানো যাতে পরবর্তী জীবনও অনুরূপ হয়। গীতাতেও বলেছেন—

> 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥'[১]

—যে যে চিন্তাগুলিকে অনুসরণ করে একজন দেহত্যাগ করে, মৃত্যুকালের সেই প্রবল চিন্তাগুলি তার পরবর্তী জীবন গঠনে সাহায্য করে। 'তং তমেবৈতি কৌন্তেয়'—সেই সেই অবস্থা সে পরবর্তী জীবনে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরবর্তী জীবন গঠনে যে বর্তমান জীবনের একটা বড় অবদান আছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। অনন্ত কর্ম পিছনে রয়েছে, ভাল মন্দ দুই-ই। তাদের ভিতর থেকে কোন্গুলিকে বেছে নেব অর্থাৎ কোন্গুলি সক্রিয় হয়ে আমার পরবর্তী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগিয়ে আসবে তা নির্ভর করছে আমার বর্তমান জীবনের কার্যাবলীর উপরে। সেইজন্য গীতাতে সংক্ষেপ করে বলা হয়েছে—যদি ভগবানকে চিন্তা করতে করতে কেউ দেহত্যাগ করে তাহলে সে ভগবানকেই লাভ করে। যদি অসৎ চিন্তা করে দেহত্যাগ হয় তাহলে অসৎ-যোনি প্রাপ্ত হয়। এখানে সে-কথাই বলছেন, 'যথাকর্ম যথাশ্রুতম্'—নিজ নিজ কর্ম অনুসারে তার পরবর্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের করণীয়ও

---

১. গীতা—৮/৬

অনেকখানি থাকে। ভগবন্নিয়ন্ত্রণও মানতে হয় আবার স্বতন্ত্রতাও খানিকটা স্বীকার করতে হয়। অবশ্য ভগবদ্ অধীনতা বলতে আমাদের স্বাধীনতাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলছি না, কারণ যেখানে নিজেদের কর্তা বলে মনে করছি সেই ভূমি থেকেই আমাদের আলোচনা হচ্ছে। কাজেই সেক্ষেত্রে সমস্তই ভগবান করছেন একথা বলা যথার্থ নয়, সুসমঞ্জস নয়। গীতায় মৃত্যুকালের চিন্তাকে পরজন্মের রূপায়ণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ মৃত্যুকালে মন নিয়ন্ত্রিত হয় জীবনব্যাপী কর্ম অনুসারে। বলা বাহুল্য মৃত্যুকালে ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, পূর্ব অভ্যাস অনুসারেই মন চিন্তা করে। তাকে দিয়ে জোর করে নতুন আর কিছু যেন করানো যায় না। শরীর যেমন অবশ হয়ে আসে মনও তেমনি বিকল হয়ে আসে। ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'[১]—সবসময় আমার চিন্তা কর যাতে মৃত্যুকালেও সেই একই চিন্তা মনে আসে। চলতি কথায় বলে 'জপতপ কর কী, মরণে হুঁশিয়ার'—জপতপ কী করছ, মৃত্যু সম্বন্ধে সাবধান থেকো। কী সাবধান থাকব? না, যাতে মৃত্যুসময়ে বিষয়চিন্তা না আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মরবার সময়—'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা—বলে চেঁচিয়ে উঠল'।[২] কারণ সেই চিন্তাগুলি মনের ভিতরে জট পাকাচ্ছিল, মরবার সময় তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি মনে আর নেই। চিন্তাস্রোত যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সেইভাবেই বলে ফেলছে। নিয়ন্ত্রণের অতীত এই চিন্তাস্রোত আমাদের যে কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে জানি না। এইজন্য জীবনব্যাপী অভ্যাসের দরকার যাতে মৃত্যুকালেও মনের গতি শুভঙ্কর ও কল্যাণমুখী হয়।

মৃত্যুকালে ভগবান ছাড়া অন্য চিন্তা হলে কী হয়? অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—কেউ যোগ অভ্যাস করছে অথচ সিদ্ধিলাভ করেনি এই অবস্থায় মৃত্যু হলে তার কী গতি হয়—'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'।[৩] সেই ব্যক্তি কি উভয়-বিভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন মেঘের মতো বিনষ্ট হয়? 'কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি'[৪]। 'উভয়বিভ্রষ্ট' শব্দের অর্থ ইহকাল ও পরকাল উভয় থেকেই ভ্রষ্ট। ইহকালে তিনি কিছু ভোগ করেননি, সাধকের জীবন যাপন করেছেন, আবার পরকালের সিদ্ধিও তাঁর হলো না। এখন তিনি কি বিনষ্ট হন? ছিন্ন মেঘের সঙ্গে যে উপমা দেওয়া হলো তা ভারি সুন্দর। পাহাড়ে মেঘের খেলা দেখে আমাদের এই শ্লোকটি বার বার মনে পড়ত। মেঘলোক থেকে একটা অংশ ছিন্ন হয়ে এসে পাহাড়ের গায়ে লেগেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে সেই মেঘটা শূন্যে বিলীন হয়ে গেল, তার আর কোন অস্তিত্ব রইল না। তার স্থান পৃথিবীলোকেও হলো না আবার মেঘলোকেও হলো না। এই ছিন্ন মেঘ উভয় লোক থেকে ভ্রষ্ট। প্রশ্ন হলো—ব্রহ্মে অপ্রতিষ্ঠ

---

১. গীতা—৮/৭

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮০

৩. গীতা—৬/৩৭, ৪. গীতা—৬/৩৮

অথচ সাধনা করতে করতে মৃত্যু হলে জীবের কি এই ছিন্ন মেঘের মতো দশা হবে? সব সাধনাই কি তার ব্যর্থ হয়ে যাবে? সেখানে ভগবান অর্জুনকে সাহস দিয়ে বললেন—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।[১]—শুভকর্মকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না। সখাকে কেউ 'তাত' বলে সম্বোধন করে না। এখানে অর্জুন যেন সখা নয়, আর্ত, শরণাগত শিষ্য, তাই তাঁকে স্নেহের সুরে 'তাত' বলে সম্বোধন করেছেন। চলতি বাংলায় যেমন 'বাছা' বলে। বলছেন, যোগভ্রষ্ট সাধক ইহকালে পতিত হন না, পরকালেও তাঁর বিনাশ নেই। তাঁর কিছুই নষ্ট হয় না। তিনি যে সাধনা করেছেন তা সমস্তই সঞ্চিত থাকে, বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর সেই যোগভ্রষ্ট, 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে'—সদাচারসম্পন্ন, পুণ্যাত্মা শ্রীসম্পন্নদের গৃহে, 'অভিজায়তে'—জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যোগের ফল যথাযথ থাকে।

কিন্তু তারপর? সদাচারসম্পন্ন পবিত্র শ্রীসম্পন্ন গৃহে জন্মাল, ইহজগতের দিক দিয়ে দেখলে তার কোন ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে যে যোগী ছিল! ভগবান বলছেন, তার জন্যও ভয় নেই। যদি সে সত্যি সত্যিই যোগী হয়, যোগসাধনায় একনিষ্ঠ হয়ে থাকে, তাহলে কী হয়? গীতায় আছে—

'অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥'[২]

—এরকম জন্ম আরো দুর্লভ, তা হলো জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্ম। যোগিকুল অর্থে পিতা-মাতা যোগী হতে পারেন। তার চেয়ে বড় কথা, 'কুল' মানে পরম্পরা। যোগিরূপে সিদ্ধিলাভের উপযোগী শরীর নিয়ে যোগীদের পরম্পরার ভিতরে জন্মায়। একথা কেন বলছেন? না, পূর্ব অভ্যাস অনুসারে আবার সে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সিদ্ধির পথেই এগিয়ে যায়। অর্থাৎ যা সে করে এসেছিল, যে সঞ্চিত ধন নিয়ে এসেছিল আবার তাই নিয়েই এ জন্ম আরম্ভ করে।

ভগবান বুদ্ধকে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ কুলে জন্মেছেন? তিনি বললেন, আমি বুদ্ধকুলে জন্মেছি। বললেন না, আমি গৌতম বংশে বা শাক্যকুলে জন্মেছি। একেই বলে যোগীর কুল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যোগী যে বংশে জন্মান সে বংশেরও খানিকটা বৈশিষ্ট্য থাকে, পিতামাতারও থাকে। তবে তার চেয়েও বড় কথা এই যে, যোগীর জন্ম যে যোগীর পরম্পরার ভিতরে হয় তাতে এক-একজন করে যোগী আসেন, এসে যোগসাধনা করেন এবং অবশেষে যোগের সার্থকতা পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। এটি আরো দুর্লভ। শ্রীমানের ঘরে জন্মানো ভাল। কিন্তু এমন ঘরে জন্ম হলেও যোগের পথে

---

১. গীতা—৬/৪০,
২. গীতা—৬/৪২

অগ্রসর হবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়তো থাকবে না। পবিত্র বংশে জন্মালে শুদ্ধচিত্ত হলো কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়, যোগী হতে হবে। ভগবান তাই বললেন, যোগীর কুলে জন্ম আরো দুর্লভ, কঠিন। উভয়বিভ্রষ্ট হয়ে অপ্রতিষ্ঠ যোগী ছিন্ন মেঘের মতো নাশ হয়ে যায় না, সাধনার নাশ হয় না। আমরা যা কিছু করেছি এখনো হয়তো তার ফল দেখতে পেলাম না, পরে সব ফল পাব। কিন্তু সেজন্য যেন মনে না করি যে সব নষ্ট হয়ে গেল। সাধনার ধন কিছুই ফেলা যায় না। ভাল-মন্দ কোন কর্মই নষ্ট হয় না। মন্দকেও ভোগ করে নাশ করতে হয় ভালও তার ফল একদিন দেয়।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরো বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশ আছে যেগুলি এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শাস্ত্র বলছেন, আমাদের দেহান্তরগমনের তিনটি পন্থা আছে। দেবযান, পিতৃযান আর তৃতীয় হলো—'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'[১]-র পন্থা। যারা শুভকর্ম, শাস্ত্রীয় কর্ম করেছে তাদের ভিতরেও দুটি থাক আছে। যারা সকামভাবে কর্ম করেছে তারা পিতৃলোকে গমন করে বিবিধ সুখসমৃদ্ধি ভোগ করে এবং ভোগের ক্ষয় হলে আবার পৃথিবীতে জন্মায়। সেই ভোগ সীমিত। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দেবযান, দেবতাদের পথ, যা ঊর্ধ্বতর লোক, আরো বেশি ভোগের স্থান। এই স্থানে যাঁরা যান তাঁদের ভিতর কেউ ভোগের শেষে পুণ্যের দ্বারা অর্জিত দেবত্ব ক্ষয় হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন অথবা আর একদল থাকেন যাঁদের মনের শুদ্ধি এত বেশি প্রবল যে, তাঁদের আর ফিরতে হয় না। তাঁরা এই পথে গিয়ে ক্রমশ মুক্তিলাভ করেন। একে ক্রমমুক্তির পথ বলে। অর্থাৎ দেবযানের পথে কেউ কেউ পুনরাবর্তী হন, কেউ বা ক্রমমুক্তির পথে চলে মুক্তিলাভ করেন। আর যারা পিতৃযানের পথে যায় তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন থেকেই কিছু সকাম শুভ কর্ম করেছে এবং তার ফল ভোগের পর তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে।

গীতায় যে কেবল দেবযান পিতৃযানের কথাই আছে তা নয়, মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়গুলিও খুব বিস্তৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুর পর চিতা জ্বললে যখন ধোঁয়া ওঠে তখন দেহী যেন সেই ধোঁয়াকে অবলম্বন করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে রাত্রির অন্ধকারে, তারপর কৃষ্ণপক্ষের ভিতর দিয়ে দক্ষিণায়নে যায়। দক্ষিণায়নে রাতই বড়। এমন জায়গায় ছয়মাস থাকে, শেষে চন্দ্রলোকে পৌঁছায়। সেখান থেকে ভোগ শেষ হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসে—

'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥'[২]

---

১. ছান্দোগ্য—৫/১০/৮
২. গীতা—৮/২৫

এপথে অন্ধকারেরই প্রাবল্য। অন্ধকারের অর্থ অজ্ঞান। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীব কর্মফল ভোগ করে আবার ফিরে আসে। বিপরীতক্রমে যারা ক্রমমুক্তির পথে যায় তাদের পথ আলোর পথ, জ্ঞানের পথ। সে সম্বন্ধে গীতায় আছে—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥'[১]

—অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণে ছয়মাস কাটিয়ে ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এঁদের পথ আগাগোড়াই আলোকের পথ, জ্ঞানের পথ। এঁরা আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন না। অগ্নি, জ্যোতি, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের তাৎপর্য স্থূলরূপে নয়। এদের পশ্চাতে তৎ তৎ অভিমানী দেবতা লক্ষিত হয়েছেন। প্রথমে অগ্নি অভিমানী দেবতা, তারপর দিবসাভিমানী দেবতা, তারপর শুক্লপক্ষের অভিমানী দেবতা, শেষে উত্তরায়ণের অভিমানী দেবতা—এইরকম করে বুঝতে হবে। দেবতারা সূক্ষ্ম শরীরকে বহন করে যখন ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান, উপনিষদে বর্ণনা আছে, তখন তাঁকে 'এস, এস, এই তোমার সুকৃত ব্রহ্মলোক, তুমি এই লোকের উপযোগী শুভকর্ম করেছ, এখন তুমি এই শুভ পুণ্যলোকে এস'[২]—এই বলে স্বাগত জানানো হয়।

আর বিপরীতক্রমে দুষ্কৃতকারী যারা, তারা কোথায় যায়, কী শাস্তি ভোগ করে তা বলা বাহুল্য। নরকের বর্ণনা পুরাণে বিস্তার করে বলা আছে যা শুনে মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বেদে ঐরকম উৎকট বর্ণনা নেই। শুধু আমাদের দেশেই নয়, নরকের বীভৎস বর্ণনা সর্বত্রই আছে। খ্রীস্টানদের গ্রন্থে আছে, গন্ধক পুড়ছে জীবের শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে, যমদূতেরা নানারকম যন্ত্রণা দিচ্ছে। সেই বর্ণনা শুনে একজন পাগল হয়ে গিয়েছে শুনে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন, 'তার সালফারের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে।' হিন্দুশাস্ত্রেও নরকের যে চিত্র আছে তা ভয়ঙ্কর। মানুষের কর্মফল ভোগ করবার জন্য যে বিভিন্ন প্রকারের গতি হয় তার কথা বলা হলো। 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানম্'[৩] বলে বলা হয়েছে। যাদের বিশেষ কোন শুভকর্ম করা নেই আবার অশুভ কর্মও যারা তেমন কিছু করেনি তারা এই তৃতীয় পর্যায়ের। এই জন্মাচ্ছে, এই মরছে, কোন লোকে যাবার মতো কিছু কাজ করেনি বলে বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হচ্ছে। যমরাজ যেমন বলেছেন—'পুনঃ পুনঃ বশমাপদ্যতে মে'[৪]।

---

১. গীতা—৮/২৪
২. মুণ্ডক—১/২/৬
৩. ছান্দোগ্য—৫/১০/৮,
৪. কঠোপনিষদ্—১/২/৬

আমাদের তাহলে লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? অবশ্যই মুক্তির পথে যাওয়া উচিত এবং সে পথে যেতে হলে এই জীবনে কিরকম কর্ম করতে হবে তা এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে, যে বিরাট কর্মের স্তূপ আমরা অনন্তকাল ধরে সঞ্চয় করেছি তার কী হবে। 'মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি'[১]—সঞ্চিত কর্মফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত শতকোটি কল্পেও ক্ষয় হয় না। আরো মুস্কিল হচ্ছে, এই ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্মও সঞ্চিত হচ্ছে। তা হলে উপায় কী? অনন্ত কর্ম! সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়মান মিলে যে বিপুল কর্মভার! মীমাংসক বলেন, কেন? উপায় তো সোজা। নতুন কর্ম আর সঞ্চয় করো না ; যেগুলি সঞ্চিত আছে সেগুলি ভোগ করে শেষ করে ফেল—তাহলেই তো হলো। কথাটা বলা যত সোজা, করা তত সোজা নয়। প্রথম কথা, আর সঞ্চয় করো না বললেই যে আমরা সঞ্চয় করা ছাড়তে পারি তা নয়। সঞ্চয় করা কখন বন্ধ হয়? মনে যখন কোন বাসনা থাকে না। এ তো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আর যেগুলি সঞ্চিত আছে সেগুলি ভোগের দ্বারা ক্ষয় করতে হলে অনন্ত জীবন দরকার হবে। তাহলে কবে আর এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব? সুতরাং এ উপায়ে আমাদের সকলের সুবিধা হবে না।

ভক্তির ভিতর দিয়েও উপায় হতে পারে। ভাগবতে[২] আছে, গোপীরা ভগবানের বিরহে যে তীব্র যাতনা ভোগ করেছিলেন তাতে তাঁদের সঞ্চিত অশুভ কর্মগুলি ক্ষয় হয়ে গেল, আর ভগবানকে লাভ করে যে তীব্র আনন্দ তাঁরা অনুভব করেছিলেন তাতে তাঁদের অনন্তকাল ধরে সঞ্চিত পুণ্যকর্মেরও ভোগ হয়ে গেল। এইভাবে গোপীরা শুভ অশুভ সকল কর্ম থেকেই মুক্ত হয়ে গেলেন। ভগবান কৃপা করে এ সমস্ত থেকে মানুষকে মুক্ত করে দিতে পারেন। ভক্তির দিকের পথ হলো এইটি। আর একটি পথও আছে, তা হলো জ্ঞানের পথ। যদি আমরা জানি যে, আমরা কর্তা নই তাহলে কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না। একজন খুন করেছে, তার জন্য কি আমার শাস্তি হবে? এক্ষেত্রে উপায় হলো নিজেকে অকর্তা বলে ভাবা, অনুভব করা। তাহলে কর্মফল আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কথামৃতে[৩] আছে—গোপীরা যমুনা নদী পার হতে পারছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব এলেন। গোপীরা তাঁর কাছে উপায় চাইলেন নদী পার হবার জন্য। ব্যাসদেব বললেন, উপায় বলতে পারি কিন্তু এখন আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পার? গোপীরা তাঁদের কাছে দুধ ননী মাখন যা ছিল সব দিলেন।

---

১. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড—২৬/৭১,

২. শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০/২৯/১০

৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮১

ব্যাসদেব খেয়ে মুখটি মুছে বললেন, হে যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাও, আমরা পার হই। যমুনা দুভাগ হয়ে গেল, গোপীদের নিয়ে তিনি পার হয়ে গেলেন। গোপীরা ভাবলেন, এ কী ব্যাপার! এত খেয়েও বললেন কিছুই খাননি! এই হচ্ছে কথা যে, এত খেয়েও বলা যায় কিছু খাননি। সমস্ত কর্ম আপাতদৃষ্টিতে আমাদের দ্বারা হচ্ছে তবু ভাবতে হবে যে আমরা কিছুই করছি না। 'হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'[১]— এই সমস্ত লোকের বিনাশ করেও তিনি বিনাশকারী হন না। অর্থাৎ আমি কর্তা নই এই দৃঢ়বুদ্ধি যদি থাকে তাহলে কর্ম আর বন্ধনের কারণ হতে পারে না। সুতরাং কর্মের হাত থেকে বাঁচবার এই আর একটি উপায়। কিন্তু এইভাবে বোধ করাও তো সহজ নয়। মুক্তি অমন সহজে মিলবে না।

পূর্বের মন্ত্রে যমরাজ বলেছিলেন সনাতন ব্রহ্মের কথা বলবেন, যে সনাতন ব্রহ্মকে জানলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা এখানে আবার বলছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, দুটি কথা এখানে বলবেন। এক, মৃত্যুর পরে কী হয়, আর দুই, ব্রহ্মবস্তুটি কী। মৃত্যুর পরের কথাটি বলা হলো, এখন ব্রহ্মবস্তুর কথা বলবেন। আমাদের মনে হতে পারে, ব্রহ্মবস্তুর কথা তো গোড়া থেকেই শুনে আসছি, উপনিষদে এ ছাড়া আর আছে কী? তার উত্তর, এই কথা বলবার জন্যই তো উপনিষদ্। তবে বার বার বলবার কারণ এই যে, তাতে জিজ্ঞাসুর সংস্কার দৃঢ় হয়। সংস্কার দৃঢ় হওয়া সহজ নয়, বার বার শুনেও মানুষের মনের সংশয় যায় না। চিত্ত চঞ্চল থাকার জন্য বস্তু সেখানে প্রতিভাত হয় না। এইজন্য শ্রুতি একই কথা বহুভাবে বহুবার বলেছেন। বলা হয়, 'ন মন্ত্রাণাং জামিতা অস্তি'[২]—মন্ত্রের পুনরুক্তিদোষ হয় না। এ বিষয়ে শাস্ত্রেরও আলস্য নেই। শাস্ত্র অনলসভাবে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন যাতে আমাদের মনে ভাবটি দৃঢ়মূল হয়ে বসে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বার বার শুনতে হবে, বার বার মনে মনে আলোচনা করতে হবে এবং তারপর ধ্যান অর্থাৎ চিত্তকে এই তত্ত্বে স্থির রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এই হলো উপায়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥৮॥

অন্বয় ঃ—যঃ এষঃ পুরুষঃ (যিনি এই পুরুষ) সুপ্তেষু (ইন্দ্রিয়সমূহ নিদ্রিত বা স্ব স্ব কার্য থেকে বিরত হলেও) কামম্ (ইচ্ছানুসারে) কামম্ (ভোগ্যবিষয়সমূহ) নির্মিমাণঃ (নির্মাণ

১. গীতা—১৮/১৭
২. ঈশোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—৫

করতে করতে) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) তৎ এব (তিনিই) শুক্রম্ (শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ), তৎ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্ম) তৎ এব অমৃতম্ (তিনিই অবিনশ্বর) উচ্যতে (এই বলা হয়)। সর্বে লোকাঃ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) তস্মিন্ (সেই কারণরূপ ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত)। কঃ চন উ (কেউ-ই) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করতে পারে না)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

'যঃ এষঃ পুরুষঃ সুপ্তেষু'—ইন্দ্রিয়াদি তাদের কাজ থেকে বিরত হয়ে ঘুমিয়ে থাকলে এই পুরুষ 'কামং কামং নির্মিমাণঃ'—বাসনা অনুসারে বিভিন্ন ভোগ্যবস্তুকে মনের মধ্যে নির্মাণ করতে করতে, 'জাগর্তি'—জাগ্রত থাকেন। ইন্দ্রিয়াদি যখন ঘুমিয়ে থাকে, ব্যাপারহীন হয়, তখন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু দেখে। যিনি স্বপ্নকালে বিভিন্ন স্বাপ্নদ্রব্য সৃষ্টি করেন, তিনিই শুদ্ধব্রহ্ম, তিনিই নিত্য আনন্দস্বরূপ—'তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেব অমৃতম্'। 'তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে'—সমস্ত লোকে তাঁকে আশ্রয় করে, তাঁতে অবস্থিত হয়ে থাকে। 'তদ্ উ নাত্যেতি কশ্চন'—কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। 'এতদ্ বৈ তৎ'—এই সেই আত্মা যাঁর সম্বন্ধে নচিকেতা জানতে চেয়েছিলেন।

স্বপ্নে আমরা যে বিভিন্ন বস্তু দেখি সেই বস্তুগুলি কী বা তাদের উৎপত্তি কোথা থেকে? স্বপ্ন সম্বন্ধে মানুষের নানারকম উদ্ভট ধারণা থাকে। সাধারণ মানুষ মনে করে স্বপ্নের সময় আত্মা বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বস্তু ভোগ করে, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ করে আবার স্বপ্নের পর ফিরে আসে, এসে সেসব ভুলে যায়। এটি একটি অদ্ভুত ধারণা। দেখা যাচ্ছে চোখ বন্ধ, মানুষ কথা বলছে। পাশ থেকে তা শোনা যাচ্ছে না, দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, শব্দ শোনা যাচ্ছে না, স্পর্শেরও অনুভব হচ্ছে না। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—সমস্ত বিষয়গ্রহণকারী ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কর্ম থেকে বিরত। তাহলে স্বপ্ন কী করে অনুভূত হয়? আত্মা বেরিয়ে গিয়ে অনুভব করেন, এ কথাটি খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কারণ আত্মা কী করে যান, কোথায় যান? যার সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলছি জেগে দেখছি সে কিছু জানে না। সুতরাং আত্মার বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি অসঙ্গত। যেখানে আছি সেখান থেকেই স্বপ্ন দেখছি কিন্তু মনে হচ্ছে দূরদূরান্তরে কোথাও চলে গিয়েছি। আবার জেগে দেখি সেখানেই আছি। তাহলে অনুভবটি কোথায় হয়? মনের ভিতরে হয়। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে'[১]—যেখানে রথ নেই, অশ্ব নেই, পথ নেই সেখানে রথ, অশ্ব, পথ সব সৃষ্টি করে। কে করে? অন্তঃকরণই করে। মনের ভিতরে যে বিভিন্ন চিন্তা রয়েছে সেই চিন্তাগুলি যেন সেই সেই রূপ নিয়ে মানুষের কাছে আসে। জাগ্রতে আমরা সকল বস্তু অনুভব করি, স্বপ্নেও অনুরূপ অনুভূতি হয়ে থাকে।

---

১. বৃহদারণ্যক—৪/৩/১০

তবে জাগ্রতের সঙ্গে বিচার করে দেখলে মনে হয়, জাগ্রতে অনুভূত বস্তুগুলির ভিতরে যেমন একটা শৃঙ্খলা থাকে স্বপ্নে তা থাকে না। তবে জাগ্রতে যেটা শৃঙ্খলা বলি, স্বপ্নে তা নেই এমন বলা যায় না। স্বপ্নে যখন অনুভব করি তখন মনে হয় সেই অনুভবগুলি তেমন কিছু অসংবদ্ধ নয়। জাগ্রতে ফিরে এসে সে স্মৃতিগুলিকে শৃঙ্খলাহীন অসংবদ্ধ মনে হয়। এটা যেন অন্য রাজ্যের ব্যাপার, যে রাজ্যে জাগ্রতের চিন্তাপ্রণালী, ধারা, কাজে লাগে না। তা বলে সেখানে যে কোন ধারা নেই এমন কথা বলতে পারি না। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই স্বপ্নে দেখি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বপ্নে হয় না। জাগ্রতে যা অনুভব করিনি এমন কোন বস্তু স্বপ্নে অনুভূত হয় না। যে সংস্কারগুলি জাগ্রতের অনুভব থেকে হয় সেগুলিই স্বপ্নের ভিতরে বিভিন্নরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। অবশ্য তার নানারকম সংমিশ্রণ হয়ে যায়। যেমন দৃষ্টান্ত—আমি সোনাও দেখেছি পাহাড়ও দেখেছি, স্বপ্নে হয়তো সোনার পাহাড় দেখলাম, যা জাগ্রতে কখনো দেখিনি। এইরকম সম্বন্ধগুলি সব গুলিয়ে যায়। কিন্তু জাগ্রতের যা সংস্কার থাকে সেগুলি সেখানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

স্বপ্ন আর স্মৃতিতে পার্থক্য আছে। স্মৃতিতে বস্তুগুলিকে আন্তর বলে বুঝতে পারি। যেমন, আমি এখন একটা গাছের স্মৃতি অনুভব করছি অর্থাৎ অনেক আগে দেখা গাছটার কথা মনে মনে ভাবছি। কিন্তু সেই গাছের স্বপ্ন যখন দেখছি তখন সেটা স্মৃতি নয় কারণ তার অন্তরত্বের বোধ স্বপ্নে হচ্ছে না। জাগ্রতে বাহ্যজগৎকে যেমন বোধ করি স্বপ্নেও তেমনি বোধ হচ্ছে। সুতরাং এটাকে স্মৃতির পর্যায়ে ফেলা যায় না। যা আমাদের অনুভব হয়েছে তা সংস্কাররূপে ভিতরে পড়ে আছে, সেই সংস্কারগুলির উপর বাহ্যত্ব আরোপিত হয়ে আমাদের সামনে আসছে। স্বাপ্নবস্তু এইরকম। বাহ্যবস্তুর যেভাবে প্রকাশ আন্তরবস্তুর ঠিক সেভাবে প্রকাশ হচ্ছে না, অথচ তার প্রকাশধর্ম রয়েছে। তা না থাকলে অনুভব হতো না।

এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে যে, আত্মাই তাদের প্রকাশ করছেন। অন্তঃকরণের যে বিভিন্ন সংস্কার বৃত্তি উৎপন্ন করছে, অর্থাৎ সংস্কারগুলি অন্তঃকরণকে বিভিন্ন আকারে আকারিত করছে, যাকে আমরা idea বলছি, সেগুলি আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। আত্মা না থাকলে, চৈতন্য না থাকলে বস্তুর প্রকাশ হতো না। ইন্দ্রিয়াদি ঘুমিয়ে থাকলেও যিনি এই বস্তুগুলিকে প্রকাশ করছেন তিনিই আত্মা। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হচ্ছে। চোখ রূপকে প্রকাশ করে বলে দেখি, কান শব্দকে প্রকাশ করছে বলে শুনি ইত্যাদি। কিন্তু স্বপ্নে এইসব প্রকাশক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় থাকে অথচ বস্তুর অনুভব হয়। কে তাদের প্রকাশ করছে? এখানে স্পষ্ট বলছেন যে, তারা আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। স্বপ্নাবস্থায় যাঁর দ্বারা অন্তঃকরণের

বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হচ্ছে তিনি আত্মা। স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়ে কেবল এইটুকু বোঝা গেল যে, সেখানে ইন্দ্রিয়াদি-প্রকাশক নেই অথচ বিষয়ের প্রকাশ হচ্ছে। সুতরাং সাক্ষাৎভাবে এখানে অন্তঃকরণকে প্রকাশ করছেন আত্মচৈতন্য, জাগ্রতে পরোক্ষভাবে করছেন।

. তারপর বলছেন—'তদেব শুক্রং'—তিনিই শুদ্ধ। শুদ্ধ মানে অনাত্মধর্ম বা কোন বৈচিত্র্য তাঁতে নেই। তিনি কেবল প্রকাশক মাত্র। যে সকল বস্তু তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের ধর্মের দ্বারা তিনি সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন না। তিনি প্রকাশস্বরূপ মাত্র, প্রকাশিত বস্তুর পরিবর্তনের দ্বারা তাঁর পরিবর্তন ঘটছে না। এইটুকু বোঝাবার জন্য বললেন শুদ্ধ। 'তদ্ ব্রহ্ম'—তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপী। বিভিন্ন প্রকারে যে পরিণাম ঘটছে সে সবের ভিতরে তিনি পরিব্যাপ্ত, এইজন্য তাঁকে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। 'তদেব অমৃতম্'—তিনি অমরণধর্মী, অমৃত। কেন? না, যে বস্তুগুলি তিনি প্রকাশ করছেন সেগুলির উৎপত্তি-বিনাশ আছে কিন্তু প্রকাশক যিনি তাঁর উৎপত্তি-বিনাশ, আবির্ভাব-তিরোভাব নেই। এইজন্য তাঁকে নিত্য, অমরণধর্মী বলা হচ্ছে। 'সর্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ'—সমস্ত লোক, বস্তুজগৎ তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে, প্রকাশিত সকল বস্তু সেই প্রকাশকে আশ্রয় করে অবস্থান করছে। যদি সেই প্রকাশ, আশ্রয় না থাকে তাহলে কোন বস্তু প্রকাশিত হতো না। যা না থাকলে অন্য কোন বস্তু থাকে না তাকে আধার বলা হয়। তিনি এই সমস্ত বস্তুর আধার। তারপর বলছেন—'তদু নাত্যেতি কশ্চন'—কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। ভাব হচ্ছে—জগতে যত বস্তু আছে, যত বস্তু অনুভূত হয় সমস্ত বস্তুরই প্রকাশ হলো সেই ব্রহ্ম-প্রকাশ। কাজেই তাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না। যদি তা হতো তাহলে সেই বস্তুর প্রকাশ হতো না। বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ হলো তার প্রকাশ। প্রকাশ-ব্যতিরিক্ত হয়ে কোন বস্তু থাকতে পারে না। 'এতৎ বৈ তৎ'—ইনিই সেই আত্মা।

আত্মতত্ত্ববিষয়ক ভ্রম দূর করে পরবর্তী মন্ত্রে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন। একই আত্মা যে বিচিত্ররূপ ধারণ করেছেন তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯॥

অন্বয় ঃ—[দেহ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আত্মা এক, পরবর্তী দুটি মন্ত্রে তাই প্রতিপাদিত হয়েছে]। যথা (যেমন) একঃ অগ্নিঃ (একই অগ্নি) ভুবনম্ (জগতে) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ পূর্বক) রূপম্ রূপম্ (কাষ্ঠাদি ভিন্ন ভিন্ন দাহ্য পদার্থ অনুসারে) প্রতিরূপঃ (সেই সেই আকারযুক্ত)

বভূব (হয়েছে) তথা (সেরকম) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত পরমাত্মা) রূপম্ রূপম্ (বিভিন্ন দেহ অনুসারে) প্রতিরূপঃ (তদাকারে আকারিত হয়েছেন) চ (অথচ) বহিঃ (সমস্ত উপাধি থেকে পৃথক বা অবিকৃতরূপে [বিরাজিত])।

একই অগ্নি যেমন সমস্ত বিশ্বে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরকম—'সর্বভূতান্তরাত্মা'—সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে বর্তমান আত্মা, 'একঃ'—এক হয়েও, 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'—প্রতি প্রাণিশরীররূপ উপাধি অনুসারে সেই সেই শরীরাকারে প্রতীত হচ্ছেন। আবার, 'বহিশ্চ'—তার বাইরেও আছেন। অগ্নি দাহ্য পদার্থে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। যেমন, একটি তপ্ত লোহার টুকরোর ভিতরে সর্বত্রই অগ্নি ওতপ্রোত থাকে অর্থাৎ অগ্নি সেখানে লোহার টুকরোর আকার নিয়েছে বলা যায়। এইরকম দাহ্য পদার্থের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আকারবান হয়ে অগ্নি বহুবিধ হয়ে থাকে। সর্বত্র একই অগ্নি এবং এদের বাইরেও তা আছে। এরা কেবল অগ্নির অভিব্যক্তির সহায়ক। সেইরকম সকল ভূতের অন্তরাত্মা এক হয়েও সূক্ষ্মতাবশত বিভিন্ন দেহের আকারে আকারিত হয়ে বহুরূপে প্রতীত হন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং তার বাইরেও আছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতরে যে চৈতন্য ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন তাঁকে পৃথক করছি নানাপ্রকার আকার দিয়ে যা প্রকৃত আত্মার নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন করে নিয়ে চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকার বলে বলছি। যেমন, রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নতা কোথায়? দেহে, ইন্দ্রিয়ে, তাদের পার্থক্য আছে, মনে আছে। এইগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিলে কিসের সাহায্যে পৃথককরণ করব? সর্বত্র পরিব্যাপ্ত চৈতন্যকে আলাদা করব কী করে? যে উপাধিধর্মের দ্বারা ভেদ হয়, সেই ভেদকে যখন সরিয়ে দেওয়া হলো তখন আর কী রইল? কিছুই রইল না। এক আত্মাই যে সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন এই বোঝা যায়। আর যখন তা বোঝা গেল তখন ঐ বস্তুগুলির দ্বারাই আত্মা যে সীমিত হলেন তা নয়। 'বহিশ্চ'—আত্মা তার বাইরেও আছেন। স্ব-স্ব-ধর্মের দ্বারা বস্তুগুলি আত্মাকে তৎ-তদ্-ধর্মী রূপে প্রতীত করছে। তেমনি, নিজের নিজের আত্মার দ্বারা নিজেকে সীমিতরূপে দেখাচ্ছে। যখন এইগুলি সব মিথ্যা প্রমাণিত হলো, জানা গেল এগুলি আত্মার উপরে প্রযোজ্য নয়, তখন আত্মাতে আর বিভেদ সৃষ্টি হবে না। জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আত্মচৈতন্য বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন না। এই কারণে আত্মাকে অবিভাজ্য অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী বলছি। এর দৃষ্টান্ত একমাত্র আকাশের দ্বারা খানিকটা বোঝা যায়। ঘট, মঠ, পট প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে আকাশ আছে, তার দ্বারা আকাশ যেন খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, ঘটাকাশ, মঠাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। এরা প্রকৃতই আকাশকে বিভিন্ন করতে পারে না, আকাশ অবিভাজ্য। এই

বস্তুগুলির ধর্ম যখন আকাশকে স্পর্শ করে না তখন বস্তুগুলির খণ্ডতাও আকাশকে স্পর্শ করে না। বস্তুগুলির গুণসকল যেমন আকাশের উপরে প্রযোজ্য হয় না তেমনি এদের পরিচ্ছিন্নত্বও আকাশে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং এক অখণ্ড অবিভাজ্য আকাশ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর দ্বারা যেন খণ্ডিত বলে মনে হয়, সেই কারণেই আমরা ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি বলি।

সেইরকম আত্মা সম্বন্ধে আমরা বিভেদ সৃষ্টি করি। রামের আত্মা, শ্যামের আত্মা, যদুর আত্মা ইত্যাদি। রাম, শ্যাম, যদু, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে আত্মতত্ত্বও পৃথক বলে মনে করি। কিন্তু রাম, শ্যাম, যদুর ধর্মগুলি আত্মাতে আরোপিত হয়। আত্মা তাদের আশ্রয় মাত্র, তারা আত্মাকে পরিবর্তিত করে না। আত্মা এদের সকলের বাইরেও, যা অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন। আত্মা সমস্ত দেহ-ধর্মবর্জিত। অতএব আত্মা অবিভাজ্য অখণ্ডরূপেই থাকলেন। যখন দেহের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখছি তখন বহু বলে বলছি আর যখন দেহের থেকে ভিন্নরূপে দেখছি তাঁর নিজের স্বরূপে, তখন বৈচিত্র্যরহিত অদ্বিতীয়রূপে দেখছি। এটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন।

এইরকমই আর একটি দৃষ্টান্ত পরের মন্ত্রে দিলেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১০॥

অন্বয় ঃ—যথা একঃ বায়ুঃ (যেমন প্রাণাদিরূপে একই বায়ু) ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ (জগতে প্রবেশপূর্বক) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব (প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়েছে) তথা (তেমনি) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ [বভূব] (সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা এক হয়েও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন) বহিঃচ (এবং তার বাইরেও স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বর্তমান আছেন)।

একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে আত্মচৈতন্য তত্ত্বটি আমাদের বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন প্রশ্ন এই, যদি এক আত্মা সর্বত্র থাকেন তাহলে সংসারধর্ম সুখ-দুঃখাদির দ্বারা তিনি লিপ্ত হবেন কি না। যেমন, আমি সুখী-দুঃখী আর আমি-তে যদি আত্মা পরিব্যাপ্ত হন তাহলে তিনিও সুখী-দুঃখী হলেন। অতএব আত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। আমি যদি বা কোনরকম করে মুক্ত হতে পারি আর পাঁচজন তো বদ্ধ রয়েছে। একই আত্মা এক স্থানে মুক্ত আর অন্য স্থানে যদি বদ্ধ হন তাহলে বন্ধন তো তাঁর রইলই। তবে আত্মার মুক্তি কেমন করে সম্ভব হবে? এই প্রশ্নটি সর্বদা আমাদের মনে ওঠে। আমরা দেখছি অমুক ব্যক্তি সাধন করে মুক্ত হলেন, কিন্তু এক জায়গায় মুক্তি আর

হাজার জায়গায় বন্ধন। কত ব্যক্তি মুক্ত হয়ে গিয়েছেন তার দ্বারা কি আমি মুক্ত হয়েছি? আত্মা যদি একই হন তাহলে একজনের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয়ে যাওয়ার কথা। তা তো হয় না। উত্তর হচ্ছে—দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আত্মাকে স্পর্শ করে না, এই সিদ্ধান্তে যদি দৃঢ় হয়ে থাকি তাহলে আর ভিন্ন দেহে আত্মা বদ্ধ হয়ে আছেন—এ প্রশ্ন উঠবে না। কারণ আত্মার সঙ্গে বিভিন্ন দেহের সম্বন্ধ, সংযোগাদি নেই। আত্মা সুখী-দুঃখী ইত্যাদি হবেন বা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হবেন—এ আমাদের কল্পনা মাত্র। অখণ্ড আত্মা সুখী-দুঃখী হবেন কিসের জন্য? অনাত্মধর্ম আত্মার উপর আরোপিত হতে পারে না, এইজন্য আত্মা সুখী-দুঃখী হন না।

এই পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরাত্মা হলে সংসার-দুঃখ তাঁরই হবে—এমন সংশয় হতে পারে বলে আরো দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১॥

অন্বয় ঃ—যথা (যেমন) সূর্যঃ (প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান আকাশস্থিত সূর্য) সর্বলোকস্য (সকল প্রাণীর) চক্ষুঃ (দর্শনের হেতুস্বরূপ) [হয়েও] চাক্ষুষৈঃ (নয়নেন্দ্রিয়সম্বন্ধযুক্ত) বাহ্যদোষৈঃ (অশুচিবস্তুদর্শনজনিত পাপের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (সেইরকম) সর্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত পরমাত্মা) একঃ (এক হয়েও) লোকদুঃখেন (পার্থিব সুখ-দুঃখাদির দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) [যতঃ (যেহেতু) সঃ (তিনি)] বাহ্যঃ (বহিঃস্থিত)।

চক্ষুকে অনুগৃহীত করে সর্বরূপকে প্রকাশ করছেন বলে সূর্যকে সর্বলোকের চক্ষু বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সূর্যই জীবমাত্রের দর্শনের হেতু। সেই সূর্য—'ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ'—চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য বাহ্যবস্তুতে আশ্রিত অশুচি পদার্থের দ্বারা যেমন লিপ্ত হন না, তেমন—'তথা সর্বভূতান্তরাত্মা একঃ'—সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা এক হয়েও—'ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ'—জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না। কেন? না, তিনি এসবের অতীত। সূর্য শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় বস্তুকেই প্রকাশ করছেন। অপবিত্র বস্তুর প্রকাশের দ্বারা সূর্য অপবিত্র হয়ে যাচ্ছেন না, কারণ সূর্য বস্তুধর্মের দ্বারা লিপ্ত হচ্ছেন না। তাই তারা সূর্যকে অশুদ্ধ করে দিতে পারে না। সেইরকম সর্বভূতের অন্তরাত্মা লোকদুঃখের দ্বারা সংবদ্ধ হন না, কারণ তিনি সুখ-দুঃখাদির অতীত।

মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, আত্মা যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে তো জগতের লোকের যত দুঃখ সব তাঁর উপরে এসে পড়ল। কিন্তু মনে রাখতে হবে আত্মা অনাত্মধর্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। আকাশ যেমন ধোঁয়ার সংস্পর্শে মলিনতা

প্রাপ্ত হয় না সেইরকম আত্মাও অনাত্মধর্মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে দুঃখাদি অনুভব করেন না, তার অর্থ সুখও বোধ করেন না। সুখ-দুঃখাদি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র। দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আত্মাতে আরোপ না করা গেলে আত্মা সুখী-দুঃখী হবেন কেমন করে? এক্ষেত্রে আকাশের উপমা বারে বারে আসে। আকাশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অথবা সকল বস্তু আকাশে থাকে কিন্তু সেই বস্তুগুলি তাদের ধর্ম আকাশে আরোপ করতে পারে না। আকাশের রঙ নেই, রূপ নেই। শব্দ ব্যতীত আর কোন গুণ আকাশে নেই। তেমনি আত্মা চৈতন্যরূপে সকল বস্তুকে প্রকাশ করলেও বস্তুধর্মের দ্বারা নিজে সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন না। অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কর্তৃত্বভোক্তৃত্বজনিত দুঃখে লিপ্ত হন না।

এরপর আত্মার অপরোক্ষ-অনুভূতির ফল বলছেন—

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥১২॥

অন্বয় ঃ—[পরবর্তী দুটি মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার ফল বলছেন] যঃ (যিনি) বশী (সর্বনিয়ন্তা) সর্বভূতান্তরাত্মা (সকলের অন্তরাত্মা) একঃ (এক হয়েও) একম্ রূপম্ (একই অদ্বিতীয় আত্মাকে) বহুধা (দেবতা, মানুষ, তির্যক্‌প্রাণী ইত্যাদি উপাধিভেদে অনেক প্রকার) করোতি (করেন), আত্মস্থম্ (নিজ হৃদয়ে বিরাজমান) তম্ (সেই আত্মাকে) যে ধীরাঃ (যে সকল বিবেকিব্যক্তিগণ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) তেষাম্ (তাঁদের) শাশ্বতম্ সুখম্ (চিরন্তন আনন্দ) [লাভ হয়], ন ইতরেষাম্ (অনাত্মদর্শীদের তা হয় না)।

'বশী' মানে যিনি সমস্তকে নিজের বশে রেখেছেন। কেন? না, তিনি থাকলে জগৎ থাকে, না থাকলে জগৎ থাকে না। জগৎ প্রকাশের জন্য আত্মার উপর নির্ভরশীল। তাই বশী আত্মা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই আত্মা সকল ভূতের অন্তরে অবস্থান করে এক সত্তাকে বহুপ্রকারে বিভক্ত করেন; বহুপ্রকারে লোকের অনুভবের বিষয় হন। নামরূপাদিযুক্ত হয়ে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। প্রশ্ন হবে, যিনি এক তিনি বহু হলেন কেমন করে? এক বহু হননি। তবে যা বহুরূপে দেখা যাচ্ছে তা প্রকাশিত হচ্ছে এক আত্মবস্তুর দ্বারা। বলা হয়, চৈতন্য বহুরূপে যেন নিজেকে বিভক্ত করছেন। সত্য-সত্যই তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন না, বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে কেবলমাত্র প্রকাশ করে দেন। তাঁকে যাঁরা দূরে না দেখে আত্মস্থরূপে দেখেন, পরমতত্ত্ব আমারই স্বরূপ—এই অনুভব করেন তাঁরাই ধীর, জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁদেরই নিত্যসুখ, অপর কারো নয়। অনাত্মদৃষ্টি যারা, তাদের এই নিত্যসুখ, শাশ্বত আনন্দ লাভ হয় না।

জগতের ধর্ম আত্মার উপরে আরোপিত হয়ে প্রতীত হলেও সত্যই তা আত্মার ধর্ম নয়। নিজ নিজ ধর্মের দ্বারা কোন জড়বস্তু আত্মাকে লিপ্ত করতে পারে না। অর্থাৎ আমরা যদি ব্রহ্মকে এইরূপ জানি যে তিনি সর্বদা সংশ্লেষশূন্য, তাতে আমাদের কী লাভ হবে? যদি তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও না জানি— যে ব্রহ্ম সর্বসংশ্লেষশূন্য, তিনিই আমার স্বরূপ, তাহলে কোন লাভ হয় না। এইজন্য বলছেন, যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে আত্মস্থ, নিজের ভিতরে অবস্থিতরূপে জানেন, তাঁদেরই কেবল অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়। সে সুখের ব্যাঘাত হয় না, কাল-পরিচ্ছেদ হয় না। আয়নাতে প্রতিবিম্বিত মুখকে যেমন দর্পণস্থ বলা হয় সেইরকম বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত আত্মাকে শরীরস্থ বলা হয়ে থাকে। বাহ্যবিষয় থেকে উপরতচিত্ত যেসব মুমুক্ষু বিবেকিগণ আচার্য ও বেদের উপদেশ পালন করে আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তাঁদের আত্মানন্দরূপ সুখ লাভ হয়। আর তার বিপরীতধর্মী যারা তাদের এই সুখ হয় না।

ভোগ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত অবিবেকী মনুষ্যগণ অবিদ্যারূপ ব্যবধান থাকায় পরমতত্ত্বকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে না, সুতরাং তাদের নিত্যসুখও লাভ হয় না। অর্থাৎ যে আত্মা সংসার-ধর্মবর্জিত, তিনিই আমাদের স্বরূপ, এইভাবে যদি তাঁকে জানা যায় তাহলে আমরাও সংসার-ধর্মবর্জিত হই। সংসার-ধর্মবর্জিত একটি তত্ত্ব আছে—এই পুঁথিগত জ্ঞানের দ্বারা কোন লাভ হবে না। নিজেদের সেই স্বরূপের সঙ্গে অভেদ বলে জানতে হবে। যিনি জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তিনিই ব্রহ্ম—একথা জানলাম। তাতে কী হলো? জানতে হবে—যে ব্রহ্ম সমস্ত দুঃখাদির অতীত, সেই ব্রহ্ম আমি নিজে। তাঁকে আত্মস্বরূপে না জানলে হবে না। এইজন্য বললেন, যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইভাবে ব্রহ্মকে জানেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়।

উপনিষদ্ যতই আমরা পড়ছি ততই দেখতে পাচ্ছি যে এইটুকুই বোঝানো হচ্ছে—যে আত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখাদির অতীত তিনি আমার নিজেরও স্বরূপ। আমি যদি সুখ-দুঃখাদির অতীত না হই তাহলে আত্মা সুখ-দুঃখাদির অতীত, কেবল এইকথা জেনে কোন ফল আমার লাভ হবে না। এইরকম অপুরুষার্থ-প্রদ কোন প্রচেষ্টা শাস্ত্র সমর্থন করেন না। প্রয়োজন সিদ্ধ হবে এমন জ্ঞান দরকার। নিজেদের যে জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা আছে তার সমাধান হবে কি না এই বিচার করে তবে শাস্ত্রের অনুশীলন করতে হয়। শাস্ত্র যদি আমাদের কল্যাণসাধন না করেন তাহলে শাস্ত্রের কোন সার্থকতা নেই।

আমাদের জন্ম-মৃত্যুর সমাধান করে দিচ্ছেন বলেই বেদান্তশাস্ত্র সার্থক।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—অনিত্যানাম্ (নশ্বর পদার্থসমূহের মধ্যে) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি), চেতনানাম্ (আব্রহ্ম সমস্ত চেতনশীলদের মধ্যে) চেতনঃ (চৈতন্যসম্পাদক), একঃ (এক হয়েও) বহূনাম্ (সংসারী প্রাণীদের) কামান্ (অভীষ্ট ফল) যঃ বিদধাতি (যিনি প্রদান করেন) তম্ আত্মস্থম্ (নিজ হৃদয়ে বিরাজমান সেই আত্মাকে) যে ধীরাঃ (যে প্রাজ্ঞ বিবেকী ব্যক্তিগণ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) তেষাম্ (তাঁদেরই) শাশ্বতী শান্তিঃ (চিরন্তন শান্তি) [লাভ হয়] ন ইতরেষাম্ (অপরদের নয়)।

এক পরমেশ্বরই সকল ভূতের আত্মা। এক হয়েও তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন। সেই শুদ্ধস্বরূপ পরমতত্ত্বকে যাঁরা আত্মার স্বরূপরূপে বা আত্মাতে অবস্থিত রূপে দেখেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখলাভ হয়, একথা পূর্বের মন্ত্রে বলা হয়েছে। পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে এখানে বলছেন, বিনাশশীল বস্তুসমূহের মধ্যে তিনি নিত্য অবিনাশী, জড়বস্তুর মধ্যে তিনি এক নিত্য চেতন। তিনি এক হয়েও সকলকে তাদের নিজের নিজের কর্মফল, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন। যে ধীর, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে আত্মাতে অবস্থিতরূপে দেখেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখ, অপরের নয়।

তাঁদেরই শাশ্বত সুখ—শুধু এই বলে যেন তৃপ্তি হলো না তাই শ্রুতি বিশেষ করে বলে দিলেন যে, আর কারো শাশ্বত সুখ হতে পারে না। আমরা যে নিত্যসুখ চাইছি আত্মাকে না জানলে তা পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র তাঁকে জানলেই তা পাওয়া সম্ভব। কেন? না, তখন তাঁকে শুধু বাইরের বস্তু হিসাবে দেখা যায় না, অন্তরাত্মারূপে দেখা যায়। আত্মার স্বরূপকে যিনি নিজের স্বরূপরূপে বোঝেন স্বভাবতই তাঁর যে শান্তি, সুখ, তার আর বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, কারণ তিনি সেই সুখস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ। এইজন্য বললেন, তাঁকে জানা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে শাশ্বত সুখ লাভ হয় না। এর একটা সূক্ষ্ম কারণ হলো এই যে, যতক্ষণ সুখটি আমার ধর্ম বা গুণ ততক্ষণ সেই ধর্মের বা সেই গুণের ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি আমি স্বয়ং সুখস্বরূপ হই তাহলে সেই সুখস্বরূপতা থেকে আমার পক্ষে কখনো বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয়। যা আমার স্বরূপ সেই সুখই শাশ্বত সুখ। অতএব সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সুখ, আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে না। নিজে জ্ঞানস্বরূপ না হলে যে জ্ঞান তার হয় সে জ্ঞান অনিত্যজ্ঞান। সাধারণ সুখ ক্ষণকালের জন্য মনকে উল্লসিত করে আবার নিরাশায় মগ্ন করে অন্তর্হিত হয়। এইরকম ক্ষণিক সুখই সাধারণ মানুষ পেয়ে থাকে। যেখানে সুখ ক্ষণিক নয়, তাকে অনেক সময় আনন্দ বলা হয়। আনন্দকে আবার বিশেষিত করা হয় নিত্য আনন্দ অর্থাৎ আমাদের স্বরূপভূত আনন্দ বলে। সেই স্বরূপভূত আনন্দ থেকে আমরা বিযুক্ত হতে পারি না কারণ আমার থেকে আমি কখনো বিযুক্ত হই না। ঐ আনন্দ বা সুখ সর্বদাই আমাতে থাকবে। আমি নিজেকে সেই আনন্দস্বরূপ বা সুখস্বরূপ

বলে জানি। তাই বলছেন—'তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী'—একমাত্র তাঁদেরই শান্তি শাশ্বত, নিত্য। 'নেতরেষাম্'—অপরের নয়, অপরের শান্তি ক্ষণিক।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—অনির্দেশ্যম্ (ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাঁকে বিশেষরূপে নির্দেশ করা যায় না) তৎ এতৎ ইতি (এই সেই) পরম্ সুখম্ (পরমানন্দ রূপে) মন্যন্তে (অনুভব করা হয়) তৎ (তাঁকে) কথম্ (কী প্রকারে) নু (বিতর্কবোধক অব্যয়) বিজানীয়াম্ (জানব)? কিম্ উ ভাতি (তিনি কি প্রকাশিত হন)? বা বিভাতি (স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন অথবা [হন না])?

'তদ্ অনির্দেশ্যম্ পরম্ সুখম্'—সেই বাক্যের অগোচর সর্বোত্তম আত্মানন্দকে নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা—'এতদ্ ইতি মন্যন্তে'—অপরোক্ষ বলে মনে করেন। 'তৎ কথং নু বিজানীয়াম্'—কী প্রকারে আমি সেই আত্মানন্দকে অনুভব করতে পারি? 'কিমু ভাতি বিভাতি বা'—তিনি কি স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সামান্যরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন? কিংবা সেই আত্মতত্ত্ব 'আমি'—এই বুদ্ধির বিষয় হয়ে সুস্পষ্টভাবে আত্মরূপে অনুভূত হয়ে প্রকাশ পান?

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞানরূপ পরমানন্দকে বলেন 'তদ্ এতদ্ ইতি'—প্রত্যক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভূত বস্তু। জ্ঞানী ব্যক্তি—অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে অনুভব করেন। এই সুখটি অনুমানের বিষয় নয়, অপরের কাছে শোনা কথা নয়। যাঁরা সুখস্বরূপ হয়েছেন তাঁরাই এঁকে অনুভব করেন। যদি কেউ বলে, বর্ণনা করে বলুন তো সুখটি কিরকম? উত্তর হলো, তা সাধারণ সুখ নয় যে বর্ণনা করা যায়। একটা সুন্দর দৃশ্য দেখে বা সুমধুর সঙ্গীত শুনে যে আনন্দ হয়, ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করে যে আনন্দ হয় তার কতকটা বর্ণনা করা সম্ভব। কিন্তু এই সুখ অনির্দেশ্য, যার নির্বচন, ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। একমাত্র যিনি অনুভব করেন তাঁকেই বোঝানো যেতে পারে, অন্যকে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে'[১] যে কখনো অনুভব করেনি তাকে কী করে বোঝানো যাবে? এটিকে পরমসুখ বলে বলা হচ্ছে। যতরকমের সুখ আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বড় জোর এইটুকু বলা যায়। আর অন্য কোন উপায়ে তার নির্বচন করা যায় না।

সেই সুখটিকে আমরা বুদ্ধিগোচর, অনুভবগম্য করব কী করে? অনুভব যিনি করেন তিনিই একে অনির্দেশ্য বলে বোঝেন। কারা অনুভব করেন? জ্ঞানী ব্যক্তিরা। আমরা কী করে অনুভব করব? সুখটি আমাদের অভিপ্রেত, আকাঙ্ক্ষিত। তাকে আমরা চাই কিন্তু কী করে পাওয়া যাবে তা জানি না।

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩

অথবা যে উপায়ে পাওয়া যাবে সেই উপায় অবলম্বন কি আমাদের দ্বারা সম্ভব? এইরকম মনে আশঙ্কা হয়। ঐটি সুখের দুর্লভতা বোঝানোর জন্য বলছেন। সাধারণ সুখের মতো নয় যে, যে কোনরকম করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়টিকে ভোগ করে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পেয়ে যাব। প্রশ্ন হচ্ছে, এ কি আমাদের দ্বারা সম্ভব? ভাষ্যকার এখানে বলছেন, 'নিবৃত্তবিষয়ৈষণা যতয়ঃ'[১]---বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ যতিগণ যেমন করে এই আত্মসুখ অনুভব করেন, সেরকম করে অনুভব করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

প্রশ্ন তুলছেন, সেই আত্মানন্দ বা পরমসুখ কি স্বপ্রকাশ? যিনি প্রকাশস্বরূপ তাঁর প্রকাশ পাওয়ারই কথা। তিনি প্রকাশস্বরূপ হলেও আমাদের বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝা যাবে কি? যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মসুখ অনুভব করেন সেটি তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় কি না—এই জিজ্ঞাস্য। যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য না হয় তাহলে বস্তুটির অনুভব হবে না। আর যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় তাহলে বস্তুটি সীমিত হয়ে যায়। এই উভয়সঙ্কট উপস্থিত। এর সমাধানে শাস্ত্রকার বলেন, বুদ্ধিগ্রাহ্যও বলা যায়, নয়ও বলা যায়। কেমন করে? আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করে করে কারো অন্তঃকরণে একটি বৃত্তি উপস্থিত হলে আত্মা বুদ্ধিগ্রাহ্য নন একথা বলা চলে না। আমরা কোন বস্তুকে যখন গ্রহণ করি তখন অন্তঃকরণে 'তদাকারা বৃত্তি' হয়। যখন ঘটকে জানি তখন অন্তঃকরণে 'ঘটাকারা বৃত্তি' হয়। ঘটাকারা বৃত্তিকে এইভাবে বুঝতে হবে—মন নিরবয়ব বস্তু, তার ঘটের মতো আকার হওয়া মানে একটা ঘটের রূপ ধারণ করবে। তাহলে তো মন নিরবয়ব হলো না, সাকার হলো। তার উত্তর, শুধু ঘটের নয় সুখেরও তো কোন আকার নেই। আকার বলতে যা বুঝি three-dimensional অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক বস্তু, সুখ কি সেইরকম হয়? সুখ ঐরকম আকারবিশিষ্ট বস্তু নয় কিন্তু অন্তঃকরণে 'সুখাকারা বৃত্তি' হয়। সুখের অনুভব হয় কি না তার উত্তরে এমন কোন নির্বোধ নেই যে বলবে, হয় না। তাহলে সুখ কি অন্তঃকরণের দ্বারা অনুভূত হয়? হয়। কিন্তু আকার মানে সবসময় রূপই নয়, তাহলে সুখাকার হতো না। আকার শব্দের অর্থ আগেই বলা হয়েছে, যার দ্বারা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে পৃথক করা যায়। ঘটের আকারের দ্বারা ঘটকে, সুখের আকারের দ্বারা সুখকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা যায়। আকার মানেই যে তাকে একটা স্থূল, সাবয়ব রূপ গ্রহণ করতে হবে এমন কথা নয়।

সুতরাং অন্তঃকরণে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আকার শব্দটি না হয় প্রত্যাহার করা গেল কিন্তু বৃত্তির দ্বারা গ্রাহ্যবস্তু যে সীমিত হয়ে গেল সে বিষয়ে কী করা হবে? সুখস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধিকালে অন্তঃকরণের 'ব্রহ্মাকারা বৃত্তি' হলো। কিন্তু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলে সেই প্রকাশের দ্বারাই বৃত্তিও

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/২/১৪

প্রকাশিত হলো। অন্তঃকরণের ঘটাকার বৃত্তি হলেই ঘটের প্রকাশ হয় না কারণ ঘট স্বপ্রকাশ নয়, পরপ্রকাশ। সুতরাং ঘটাকারে আকারিত অন্তঃকরণে চৈতন্য প্রতিফলিত হলে তবেই ঘটের প্রকাশ হয় বা আমাদের ঘটের জ্ঞান হয়। এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অন্তঃকরণে চৈতন্যের প্রতিফলনের আর দরকার নেই; কারণ, চৈতন্য নিজেই সেখানে বৃত্তির বিষয়। সুতরাং এখানে বৃত্তির দ্বারা যে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত হলেন তা নয় বা বৃত্তি যে চৈতন্যের দ্বারা ভাসিত, প্রকাশিত হচ্ছে তাও নয়। স্বরূপে, স্বধর্মে, স্বপ্রকাশ চৈতন্য নিজেই প্রকাশিত হন। এখানে ব্রহ্ম বিষয় হওয়ায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তির প্রকাশ অন্য কোন প্রকাশমান বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্নও করতে হয় না, বৃত্তি তাঁর দ্বারা অভিভূত হয়ে যায়। বিষয়টি এইভাবে একটু অভিনিবেশ সহকারে বোঝা প্রয়োজন।

আত্মাকে জানা মানে বিশিষ্টরূপে জানা। এই বিশিষ্টরূপে জানার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বলে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে আত্মা প্রকাশিত হন, কি হন না? আমরা আমাদের ক্ষুদ্র, সীমিত বুদ্ধি দিয়ে অসীমকে কী করে ধরব? জড় বুদ্ধির দ্বারা চৈতন্যকে কী করে প্রকাশ করব? সুতরাং আমাদের সন্দেহ—'কিমু ভাতি বিভাতি বা'[১]—সে বস্তু প্রকাশ পাচ্ছেন কি না, স্পষ্টরূপে তাঁর প্রতীতি হচ্ছে কি না। উত্তরে বলছেন, প্রকাশ স্পষ্টই হচ্ছে তবে জড়বস্তু যে-প্রণালীতে প্রকাশিত হয় সেই প্রণালী অনুযায়ী হচ্ছে না, এই যা তফাত। স্বপ্রকাশ বস্তুকে প্রকাশ করবার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে প্রকাশ করবার জন্য আর প্রদীপের দরকার হয় না কারণ সূর্য নিজেই প্রকাশধর্মী। তবে স্বপ্রকাশ আত্মবস্তুকে আমরা সবসময় অনুভব করছি না বলে তিনি আমাদের কাছে যেন অপ্রকাশ। 'যেন অপ্রকাশ' বলা হচ্ছে এই কারণে যে, নিত্য প্রকাশমান বস্তু কোন অবস্থায় প্রকাশিত আবার কোন অবস্থায় অপ্রকাশিত হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম আমার কাছে কোথায় প্রকাশিত—এই প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর দিতে একটু বিব্রত হতে হয়। যদি বলি, ব্রহ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত নন তাহলে ব্রহ্মের প্রকাশ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিত্য প্রকাশমান—এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে। তার উত্তর কী? না, স্বপ্রকাশ বস্তুকে কেউ অপ্রকাশ করতে পারে না। যদি বল, কই আমার কাছে ব্রহ্মের প্রকাশ তো উপলব্ধ নয়! তার উত্তর এই যে, আমরা দেখেও দেখছি না। যা কিছু প্রকাশ দেখছি সব ব্রহ্ম, এ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এইজন্যই ভাবছি ব্রহ্ম অপ্রকাশ। আমরা ঘরবাড়ি জীবজন্তু সব দেখছি, আমাদের কাছে এদের প্রকাশ আছে, কিন্তু এদের এই প্রকাশ ব্রহ্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের উপরে এইসব বস্তুগুলি আরোপিত

---

১. কঠোপনিষদ্—২/২/১৪

হয়ে প্রকাশের ভিতরে যেন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আরোপিত বস্তুকেই কেবল দেখছি, যাঁতে আরোপ হচ্ছে সেই অধিষ্ঠানকে দেখছি না। ঘট, মঠ, পট আছে, বলছি এরা সত্তাবান। তা না বলে বলা উচিত ছিল, সত্তার উপরে ঘট, মঠ, পট আরোপিত। আরোপিত বস্তুকে সত্য মনে করছি, সত্যকে মনে করছি আরোপিত বস্তুর ধর্ম। এই বিপরীত জ্ঞান হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে বলছেন—'আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম। এমন কল্লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্লে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই'?[১] ভাব্বার কথা। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' তাঁর ভাঃ বা জ্যোতির দ্বারা এই সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে। তাহলে যত প্রকাশ দেখছি সব তিনিই। সুতরাং আমরা যে আগে ভাবছিলাম, যদি ব্রহ্ম থাকেন তাহলে তিনি কোথায়? আমার অনুভবের বিষয় তো তিনি নন। তার উত্তর হলো, তাঁকে বাদ দিলে আমার অনুভব কী করে সম্ভব হয়?

আবার সেই প্রশ্নে ফিরে যাই, 'কিমু ভাতি বিভাতি বা'—তিনি 'ভাতি' এবং 'বিভাতি'-ও। সন্দেহের কোন কারণ নেই। যা কিছু দেখছি তা তাঁরই প্রকাশ এবং বিশিষ্টরূপে প্রকাশ। আমার কাছে প্রকাশ স্পষ্ট না থাকলে তা বস্তুর দোষ নয়, আমারই বুদ্ধির দোষ। তিনি অন্তরে বাইরে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। আমরা তাঁকে ভুলে খেই হারিয়ে ফেলেছি। স্ফটিকে আরোপিত লাল নীল হলদে সাদা রঙ দেখছি, স্ফটিককে তার স্বরূপে দেখছি না। বৈচিত্র্যের প্রকাশ যে তাঁরই প্রকাশ—এই দৃষ্টিতে যদি জগৎকে দেখতে শিখি তাহলে সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে তাঁর নির্বাধ সত্তাকে, অখণ্ড অস্তিত্বকে দেখতে পাব। সেই অস্তিত্ব কালের দ্বারা সীমিত নয়। এইরকম দেখার জন্য বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ করতে হবে। শুদ্ধ বুদ্ধির কাছে আরোপিত বস্তু ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে না। আরোপিত বস্তুর পশ্চাতে অধিষ্ঠানকে দেখতে হবে। অধিষ্ঠানের জ্ঞান ছাড়া আরোপিতের জ্ঞান হয় না। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্'[২]—আমি এই জগতের আধার। তাহলে আধেয় কী? তাও তিনিই। কিন্তু সেই আধেয়কে আমরা তদ্রূপে না দেখে বৈচিত্র্যরূপে দেখছি। ব্যাখ্যার জন্য যাকে বলি মায়া, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া।

তিনি এক হয়েও বহু, নিত্য হয়েও অনিত্য, চেতন হয়েও জড়। তিনি জড়বস্তু হলে তাঁর প্রকাশ হতো না, এই ব্যাপারটিকে খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তবেই 'কিমু ভাতি বিভাতি বা'—এই সংশয়ের নিরসন হবে। শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ স্পষ্টরূপে, পরিপূর্ণ অনাবৃত রূপে প্রকাশ হন। কখন হন? যখন আমাদের বুদ্ধি মলিনতামুক্ত হয়, তখন। আরোপিত উপাধির অপবাদ

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯০

২. গীতা—৭/৭

করলে যা থাকে তা-ই হলেন ব্রহ্ম। তাঁকে কি ব্যাখ্যা করা যায়? সাধারণত ব্যাখ্যা করতে হলে আমরা বিভিন্ন ধর্মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। সর্বধর্মবর্জিত যিনি তাঁকে ব্যাখ্যা করব কী করে? জাতির দ্বারা বস্তুকে নির্দেশ করি, যেমন গোত্বজাতিবিশিষ্ট হলো গো বা গরু। যা বহুর ভিতরে সামান্যধর্মরূপে থাকে তা জাতি। তিনি এক, তাই তাঁর ভিতরে জাতি থাকবে না। তাঁর গুণও নেই। নৈয়ায়িকেরা চব্বিশটি গুণের ব্যাখ্যা করেন—

'...অথ গুণা রূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরম্ ॥৩॥
স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ পরম্।
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বঞ্চাপরত্বকম্ ॥৪॥
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেযো যত্নো গুরুত্বকম্।
দ্রবত্বং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ ॥৫॥'*

—এই গুণগুলির একটিও নির্গুণ ব্রহ্মে নেই। তাই গুণ দিয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

বস্তুনির্দেশের অন্যতম উপায় হচ্ছে ক্রিয়া। যেমন, যে পাক করে সে পাচক, যে গান করে সে গায়ক, যে সৃষ্টি করে সে স্রষ্টা, যে সংহার করে সে সংহর্তা। এইভাবে ব্রহ্মকে কি নির্দিষ্ট করা চলে? তিনি সর্বক্রিয়াশূন্য। তাই ক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে নির্দেশ করা যায় না। জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া—যে তিনটির দ্বারা মানুষ কোন বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে, এর কোনটিই ব্রহ্মে না থাকায় ব্রহ্ম অনির্দেশ্য। অনির্দেশ্য বলেই আমরা সন্দেহ করি—'কিমু ভাতি'—তিনি কি তাহলে প্রকাশ পাচ্ছেন? তাঁকে কি আমরা জানতে পারি? আর তার বিপরীতক্রমে বলব—তাঁকে জানতে সর্বদাই পারছি কিন্তু উপাধিধর্ম-বর্জিত রূপে নয়। এই পার্থক্য। যখন জাগ্রতে, তখন তাঁর প্রকাশ যেমন, যখন স্বপ্ন দেখি তখনো তাঁর প্রকাশ তেমনই, আবার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন থাকা কালেও তাঁর প্রকাশ বিলুপ্ত হয় না।

একথা শুনলে মনে হবে তাহলে তো আমরা সর্বদাই ব্রহ্ম দেখছি। ব্রহ্মজ্ঞ হতে তবে আর বাকি কী? ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গে আমার তফাতই বা কী? ঐজন্য বললেন, ভাতি আর বিভাতি। তফাত একটু আছে। ব্রহ্ম প্রকাশ পাচ্ছেন কিন্তু বিভাতি নন, স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন না। তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন উপাধিধর্মসংশ্লিষ্ট-রূপে, যার জন্য আমরা সাধারণ মানুষেরা নিজেদের সুখী-দুঃখী, উৎপত্তিবিনাশশীল বলে মনে করছি, আর ব্রহ্মজ্ঞ তাঁর নিত্য অপরিণামী নিরুপাধি স্বরূপের উপলব্ধি করছেন, উপাধিধর্মবর্জিতরূপে তাঁকে জানছেন।

সাধারণ মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানে সংসারকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। যদি সংসার অতিক্রম করতে চাই তাহলে সর্ব-উপাধিধর্ম-বর্জিত রূপে তাঁকে উপলব্ধি

---

* ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রত্যক্ষখণ্ড, ৩-৫

করতে হবে। উপসংহারে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করি, 'জো কুছ হ্যায় সব্ তুঁহি হ্যায়'[১]—তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই। 'ঐতদাত্মম্ ইদং সর্বম্'[২]—যা দেখছি সবই ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ছাড়া এ জগতে আর কিছু নেই—'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন'[৩]। আমরা মোহগ্রস্ত, অজ্ঞ, ভেদদর্শী বলেই অভেদতত্ত্বে ভেদ-দৃষ্টি করছি। আর ব্রহ্মজ্ঞ অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন। আমাদের উভয়ের তফাত দৃষ্টিভঙ্গিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য অনুসারে চোখ বন্ধ করলেও যিনি, চোখ খুললেও তিনি। সর্বদা একত্বের বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ব্রহ্মজ্ঞ। উপনিষদ্ তাঁকে 'সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ'[৪] বলেছেন। আমরা সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি না বলেই আমাদের বিভ্রান্তি, দুঃখ ও মোহ থেকেই যায়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—[পূর্ব শ্লোকের সংশয়ের উত্তরে আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্ব বলা হচ্ছে]। তত্র (স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে) সূর্যঃ (সূর্য) ন ভাতি (প্রকাশ করে না) ন চন্দ্র তারকম্ (চন্দ্র তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না) ন ইমা বিদ্যুতঃ ভান্তি (এই বিদ্যুৎসমূহও তাঁকে প্রকাশ করতে অসমর্থ) অয়ম্ অগ্নিঃ (এই পার্থিব অগ্নি) কুতঃ (কিভাবে) [তাঁকে প্রকাশ করবে]? তম্ ভান্তম্ এব (তিনি প্রকাশমান বলেই) সর্বম্ (সূর্যাদি সমস্ত বস্তু) অনুভাতি (তদনুযায়ী প্রকাশ পায়)। ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) তস্য (সেই ব্রহ্মজ্যোতির) ভাসা (দীপ্তিতেই) বিভাতি (বিবিধ রূপে প্রকাশিত হয়)।

পূর্ব শ্লোকের 'কিমু ভাতি বিভাতি বা'—এই সংশয়ের উত্তরে আলোচ্য বল্লীর উপসংহারে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলছেন। 'ন তত্র সূর্যঃ ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি'—সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র-তারকাগণ, বিদ্যুৎও তাঁকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ধরে না। আর 'অয়মগ্নিঃ কুতঃ'—আমাদের প্রত্যক্ষগোচর অগ্নি যে তাঁকে প্রকাশ করতে পারবে না এ আর বলবার কী আছে! 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং'—সর্বদা প্রকাশমান সেই আত্মাকেই আশ্রয় করে সূর্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহ অনুগতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—এই চরাচর জগৎ সেই আত্মার চৈতন্যজ্যোতিতে দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পায়।

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬৭, ২. ছান্দোগ্য—৬/৮/৭
৩. বৃহদারণ্যক—৪/৪/১৯, ৪. ছান্দোগ্য—৩/১৪/২

পূর্ব মন্ত্রের সংশয়ের উত্তর এই—ব্রহ্ম সামান্যরূপে এবং বিশেষরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গেলে নানান রকমের কুহেলিকায় মন আচ্ছন্ন হয়। আত্মাকে কী করে প্রকাশ করব? এখানে সংক্ষেপে আবার বলি, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বস্তুকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। জ্ঞেয় বস্তুকে মন, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জানতে পারি কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জানতে হলে তিনি আর জ্ঞাত থাকেন না, জ্ঞেয় হয়ে যান। তাছাড়া তাঁকে জ্ঞানের বিষয় করা যায় না। এইজন্য আত্মা সম্বন্ধে আমাদের এত অজ্ঞান। তিনি নিকটতম হয়েও অজ্ঞাত রয়েছেন কারণ, আমরা যে উপায়ে সকল বস্তুকে জানি, সে উপায়টি এখানে অচল।

প্রশ্ন ছিল—জ্ঞানী যখন ব্রহ্মকে জানেন তখন কি ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হন? তার উত্তর—হন এবং হন না। কেন? না, বিষয় অর্থে যা বোঝায়, সেভাবে তিনি বিষয় হন না। বিষয় মানে জ্ঞেয়, তা জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন কোন্ করণের দ্বারা তাঁকে জানে? ঠিক সেই প্রকারে আত্মাকে জানা যায় না, তবে তিনি নিত্যবিষয়ীরূপে পরিস্ফুট রয়েছেন। কে তাঁকে জানছে? সেই আত্মাই। এইজন্য তাঁকে বিজ্ঞাতা বলা হচ্ছে। জ্ঞানীর যখন ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হয় তখন সেই বৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে বিনাশ করে। কিন্তু অজ্ঞানকে বিনাশ করা এক আর বস্তুকে প্রকাশ করা আর এক। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু তাঁর প্রকাশের দ্বারা সে অভিভূত হয়ে যায়। কারণ এখানে তথাকথিত বিষয়, বিষয়ী এবং যে করণের দ্বারা বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে সব ব্রহ্মজ্যোতিতে একাকার হয়ে যায়। এই প্রকাশের সঙ্গে বিষয়াকারে প্রকাশের কোন সাদৃশ্য থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম প্রকাশ্য হলেন না কিন্তু তাঁর স্বরূপ যে প্রকাশ সেই প্রকাশ তখন নির্বাধ হয়ে রইল। প্রকাশে যে বাধা ছিল, বৃত্তি তার অপসারণ করল। বিষয়টি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করলে বুঝতে পারব কেন এখানে বলছেন—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্'—ইত্যাদি।

যারা সকল বস্তুকে প্রকাশ করে তাদের কেউই যদি ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে ব্রহ্ম কি অপ্রকাশ থেকে যাবেন? তার উত্তর বলছেন—তা তো নয়-ই বরং ঐসব প্রকাশক বস্তুসমূহকেও প্রকাশ করছে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্'। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্রাদি জড়বস্তু, তাদের নিজেদের প্রকাশ নেই। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। তাঁর জ্যোতির দ্বারা—'ইদং'—অর্থাৎ সমস্ত অনুভবের বিষয়, সমস্ত ব্যবহারিক জগৎ—empirical world, যাদের আমরা অনুভব করছি—এ সমস্তই প্রকাশিত। জড়বস্তু নিজেকেও প্রকাশ করতে পারে না, অপরকেও পারে না। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি তো বটেই এমনকি অন্তঃকরণ পর্যন্ত জড়বস্তু।

এরা সকলেই অপ্রকাশক। তাদের যে প্রকাশ দেখছি তা আত্মচৈতন্যেরই দ্বারা হচ্ছে। জগতে প্রকাশ একটিই আছে, তা ব্রহ্মের প্রকাশ। সেই ব্রহ্মের প্রকাশকে যখন বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখি তখন বিষয়কে প্রকাশ পেতে দেখি। আরোপিত বস্তুগুলি অধিষ্ঠানের প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত। 'অধিষ্ঠানের প্রকাশ'—এই ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের অর্থ অধিষ্ঠানরূপ প্রকাশ, প্রকাশই সেখানে অধিষ্ঠান। আত্মা প্রকাশস্বরূপ বা চিদ্‌বস্তু, তাঁর প্রকাশ অনুসরণ করে আর সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রহ্ম নির্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ, এই চরাচর জগৎ সেই আত্মার চৈতন্যজ্যোতিতে দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অন্বয় ঃ—[জগৎকারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে এই অন্তিম বল্লীতে] এষঃ (এই সংসার) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ নশ্বর) ঊর্ধ্বমূলঃ (ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত) অবাক্ শাখঃ (অধঃপ্রসারী শাখাবিশিষ্ট) সনাতনঃ (অনাদি প্রবাহরূপ)। তদেব (তিনিই) শুক্রম্ (শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ) তৎ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্ম) তৎ এব অমৃতম্ (তিনিই অবিনশ্বর) উচ্যতে (এইরূপ বলা হয়) সর্বে লোকাঃ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) তস্মিন্ (সেই কারণরূপ পরম ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত)। কঃ চন উ (কেউই) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করতে পারে না)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই পরম ব্রহ্ম)।

আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় বলে বিভিন্নরূপে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হচ্ছে। কার্য দেখে কারণের অনুমান করা হয়। কার্যভূত সংসারবৃক্ষের নিশ্চয় দ্বারা সংসারের মূল কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় করবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় বল্লীর আরম্ভ হচ্ছে।

'এষঃ সনাতনঃ অশ্বত্থঃ ঊর্ধ্বমূলঃ অবাক্‌শাখঃ'—এই সংসাররূপ অনাদি অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সর্বোত্তম পরমাত্মা এর কারণ, শাখাসমূহ অধোগামী অব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট ইত্যাদি পর্যন্ত বিস্তৃত। 'তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম'—সেই মূলস্বরূপই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, 'তদেব অমৃতম্ উচ্যতে'—তিনিই আবার অবিনাশী বলে উক্ত হন। 'তস্মিন্ সর্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ'—তাঁতে সমুদয় জগৎ আশ্রিত রয়েছে। 'কশ্চন তৎ ন অত্যেতি'—কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। 'এতৎ বৈ তৎ'—এই সেই নচিকেতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

এই সংসারবৃক্ষকে সকলের অনুভবগম্য বলা হয়েছে। সেই সংসারটি কি রকম? না, অশ্বত্থগাছের মতো। তার নানা ডালপালা, মূল। 'অশ্বত্থ' শব্দের আর একটি অর্থ হলো নশ্বর, সতত পরিবর্তনশীল। অথচ এটি সনাতন। ব্যষ্টি হিসাবে জগতের প্রতিটি বস্তুই নশ্বর অথচ সামগ্রিকভাবে এই জগৎ সনাতন, অনাদিকাল থেকে রয়েছে। অশ্বত্থগাছের মূল নিচের দিকে, শাখা প্রশাখা উপরের দিকে থাকে। এই সংসারবৃক্ষটি বিপরীতধর্মী। এর মূল ঊর্ধ্বে এবং শাখা নিচের দিকে। ঊর্ধ্বমূল কেন বললেন? না, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম হলেন সংসারবৃক্ষের মূল, তাঁর থেকে এই সংসারের উৎপত্তি। যেমন মূল থেকে সঞ্চারিত রস বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখে তেমনই এই সংসারবৃক্ষও ব্রহ্মমূল থেকে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান। এইরূপ যে সংসারবৃক্ষ, এর স্বরূপ শুদ্ধ। যদিও সংসারে আমরা মলিনতা দেখছি কিন্তু এর স্বরূপ শুদ্ধ। যে ব্রহ্ম থেকে এই সংসার এসেছে বা যা এর মূল তাঁকে অমরণধর্মী বলা হয়। সেই ব্রহ্মকেই সমস্ত লোক আশ্রয় করে রয়েছে অথবা ওই সংসারবৃক্ষকে আশ্রয় করে রয়েছে। কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

আচার্য শঙ্কর এই সংসার বৃক্ষকে নানারকম করে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি সুন্দর তাই তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টে এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ হলো—'জন্ম-জরা-মরণশোকাদি-অনেকানর্থাত্মকঃ'[১]—জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থসঙ্কুল। 'প্রতিক্ষণম্ অন্যথাস্বভাবঃ'[২]—বিপরীত স্বভাবাত্মক এই সংসার প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। 'মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্বনগরাদিবদ্ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদ্ অবসানে চ বৃক্ষবদ্ অভাবাত্মকঃ'[৩]—যাদুকরের দ্বারা সৃষ্ট মায়াজালের মতো, মরীচিকার জলের মতো, আকাশে যে কাল্পনিক নগর দেখা যায় সেই গন্ধর্বনগরের মতো অলীক সংসার। জগতের অবস্থা এত পরিবর্তনশীল যে, 'দৃষ্টনষ্টস্বরূপ' দেখতে দেখতে তার স্বরূপ হারিয়ে অবশেষে বৃক্ষের মতোই বিনষ্ট হয়।

এই জগৎ নেই, কিন্তু তাকে আমরা আছে বলে মনে করছি। এটি প্রত্যেকের অনুভূত বস্তু। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো, ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজালের দ্বারা যে বস্তু সৃষ্টি করে, আমরা জানি তা নেই কিন্তু তবু দেখছি আছে। পরক্ষণে মায়া কেটে গেলে আর তার চিহ্ন দেখতে পাই না। প্রাতিভাসিক বস্তুমাত্রেরই এই স্বভাব। যেমন, মরীচিকা দেখলে সেখানে জল আছে বলে মনে হয়। যারা মৃগতৃষ্ণিকা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন। আমরা অনেক মৃগতৃষ্ণিকা দেখেছি। তৃণতরুলতাহীন ঊষর ভূমিতে বালির উপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় জল আছে বলে ভ্রম হয়। জলাশয় বলে স্পষ্ট দেখা যায়। আবার সেই জলে উপরে গাছপালা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে—এও দেখা যায়। তৃষ্ণার্ত মানুষ বা আরণ্যক প্রাণী মরীচিকাকে জলাশয় মনে করে ছুটে যায়, গিয়ে ভ্রম বুঝতে পারে। মানুষও তেমনি জগতের বস্তুগুলিকে সত্য বলে মনে করে তার থেকে সুখ সংগ্রহ করতে ছোটে কিন্তু সুখ পায় না। মৃগতৃষ্ণিকার জলে যেমন পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, সংসারের সুখে প্রলুব্ধ হয়ে ছুটে গেলেও তেমনই আমরা সুখ পাই না। গন্ধর্বনগরের স্বরূপও এমনই—এই দেখছি এই নেই। 'বৃক্ষবদ্ অভাবাত্মকঃ'—বৃক্ষের মতোই সে অভাবাত্মক, শেষ কালে থাকবে না। আরো বলছেন, এই সংসারবৃক্ষ 'কদলীস্তম্ভবৎ নিঃসারঃ'[৪]—কলাগাছের মতো ভিতরে সার পদার্থ নেই। সার মানে যা থাকবে। নিত্যবস্তু। 'অনেকশতপাষণ্ডবুদ্ধিবিকল্প-আস্পদঃ'[৫]—অনেক প্রকারের অজ্ঞ ব্যক্তির, যাদের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয়, তাদের বিভিন্ন রকমের কল্পনার আশ্রয় এই সংসার।

সংসারটা কী, মানুষ যখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে এই বিচার করতে যায় তখন তাদের মনে যে নানারকম কল্পনা আসে, সংসার সেই বিবিধ কল্পনার আশ্রয়। কল্পনাগুলির কোনটাই স্বরূপের সঙ্গে মেলে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিরা বিশ্লেষণ করে জেনেছেন যে, ব্রহ্মই জগতের অর্থাৎ সংসারের স্বরূপ। সূর্যকিরণই

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/৩/১ ; ২. তদেব—২/৩/১ ;
৩. তদেব—২/৩/১ ; ৪. তদেব—২/৩/১ ; ৫. তদেব—

মায়া মরীচিকার আসল রূপ। শুক্তিতে যে রজতভ্রম হচ্ছে আসলে তা শুক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের আসল রূপ রজ্জু। এইরকম, জগতের আসল রূপ ব্রহ্ম। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ জগতের ব্রহ্মস্বরূপকে জানতে পারেন। 'বেদান্তনির্ধারিতপরব্রহ্মমূলসারঃ'[১]—বেদান্তশাস্ত্রে সুনির্ণীত পরব্রহ্মই এই সংসারের মূল। 'অবিদ্যাকামকর্ম-অব্যক্তবীজপ্রভবঃ'[২]—এখানে সংসার-বৃক্ষের বীজ কী? বলছেন, অবিদ্যাজনিত বাসনা এবং বাসনাজনিত কর্ম থেকে এবং তার থেকে বড় অব্যক্ত অর্থাৎ জগতের আদি অনভিব্যক্ত রূপ, সেই অব্যক্তই এই জগদ্‌বৃক্ষের বীজ। এই বীজ থেকে উৎপন্ন অঙ্কুরটি হলেন হিরণ্যগর্ভ যাঁকে বলা হয় অপরব্রহ্ম। তিনি বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির সমন্বিত রূপ—'অপরব্রহ্মবিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়াত্মক-হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ'[৩]। এই গাছের কাণ্ড কী? না, 'সর্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্কন্ধঃ'[৪]—সর্বপ্রাণীর বিভিন্ন সূক্ষ্মশরীর হলো এই সংসারবৃক্ষের স্কন্ধ। 'তৃষ্ণাজলাসেকোদ্ভূতদর্পঃ'[৫]—ভোগতৃষ্ণারূপ জলসিঞ্চনে তা বর্ধিত। 'বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়প্রবালাঙ্কুরঃ'[৬]—বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি সংসারবৃক্ষের প্রবাল ও অঙ্কুর। প্রবাল মানে শাখার অগ্রভাগ যার থেকে ডাল বেরুচ্ছে। অঙ্কুর হলো প্রবাল থেকে উদ্‌গত কচি ডাল। 'শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিদ্যাপদেশপলাশঃ'[৭]—শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-রূপ বিদ্যার উপদেশগুলি সব সংসারবৃক্ষের পলাশ বা পত্র। 'যজ্ঞদানতপআদ্যনেক-ক্রিয়াসুপুষ্পঃ'[৮]—যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রীয় ক্রিয়া যেন এর সুন্দর পুষ্পস্বরূপ। 'সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ'[৯]—সুখ-দুঃখের অনুভব হলো এ গাছের নানা রস। 'প্রাণী-উপজীব্য-অনন্তফলঃ'[১০]—প্রাণিগণের উপজীব্য বা ভোগ্য স্বর্গাদি হলো এই সংসারবৃক্ষের ফল। 'তৃষ্ণাসলিলাবসেকপ্ররূঢ়জটিলীকৃতদৃঢ়বদ্ধমূলঃ'[১১]—তৃষ্ণাবাসনাদি বিষয়ে আকর্ষণ যেন জল, সেই জলসিঞ্চনে এই সংসারবৃক্ষের মূল বর্ধিত এবং দৃঢ়বদ্ধ। 'সত্যনামাদিসপ্তলোকব্রহ্মাদিভূতপক্ষিকৃতনীড়ঃ'[১২]—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ থেকে সপ্তলোক পর্যন্ত নিবাসী ভূতসমূহ পাখির মতো সংসারবৃক্ষের নীড়ে বাস করে। 'প্রাণিসুখদুঃখোদ্ভূতহর্ষশোকজাতঃ নৃত্যগীতবাদিত্রক্ষ্বেলিতাস্ফোটিতহসিতাক্রুষ্টরুদিতহাহামুঞ্চমুঞ্চেত্যাদিঅনেকশব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ'[১৩]—গাছে পাখিরা যেমন কলরব করে, এ বৃক্ষেও সংসার-নিবাসিগণের অবিশ্রান্ত কলরব হচ্ছে। তাদের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক, নৃত্য-গীতবাদ্য, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির দ্বারা তারা খেলছে, আনন্দ করছে, কলহ, আস্ফালন করছে, হাসছে, কাঁদছে। কেউ 'ছাড় ছাড় আর পারি না' বলে আর্তচিৎকার করছে, সব মিলিয়ে এক তুমুল শব্দ উত্থিত হচ্ছে। 'বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মাত্মদর্শনাসঙ্গ-শস্ত্রকৃতোচ্ছেদঃ'[১৪]—এই

১. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/৩/১ ; ২. তদেব—২/৩/১ ; ৩. তদেব—২/৩/১; ৪. তদেব—২/৩/১ ; ৫. তদেব—২/৩/১ ; ৬. তদেব—২/৩/১ ; ৭. তদেব—২/৩/১ ; ৮. তদেব—২/৩/১ ; ৯. তদেব—২/৩/১ ; ১০. তদেব—২/৩/১ ; ১১. তদেব—২/৩/১ ; ১২. তদেব—২/৩/১ ; ১৩. তদেব—২/৩/১ ; ১৪. তদেব—২/৩/১ ;

সংসারবৃক্ষ উৎপাটিত হবে কী করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদজ্ঞান যা বেদান্তশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই জ্ঞান থেকে উৎপন্ন অনাসক্তির দ্বারাই এই সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদ করা যায়। গীতায় আছে, 'অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'[১]—অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা একে কাটা যায়। আরো বলছেন, 'কামকর্মবাতেরিতনিত্য-প্রচলিতস্বভাবঃ'[২]—কামনাজনিত কর্ম বায়ুর মতো সংসারবৃক্ষকে সর্বদা আন্দোলিত করে রাখছে। ফলে চঞ্চলতাই হলো এর স্বভাব। 'স্বর্গনরকতির্যক্প্রেতাদিভিঃ শাখাভিরবাক্শাখঃ'[৩]—এর শাখাগুলি কী? স্বর্গ, নরক, প্রেতাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী, এসব হচ্ছে বৃক্ষের অধোগামী শাখা। এরা ব্রহ্মের অবনত অবস্থা বলে বলা হলো 'অবাক্শাখঃ'—নিচের দিকের শাখা। 'সনাতনোঽনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ'[৪]—এর আরম্ভ কোথায় কেউ জানে না, সেই দৃষ্টিতে সনাতন। যদিও এর শেষ আছে তবু অনাদি সনাতন বলা হয়। 'যদস্য সংসার-বৃক্ষস্য মূলম্, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মচ্চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃস্বভাবম্'[৫] —মূলটি হলো সেই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিঃস্বভাব। 'তদেব ব্রহ্ম সর্বমহত্ত্বাৎ তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে'[৬]—তিনি হলেন ব্রহ্ম, সর্বাপেক্ষা মহৎ, সর্বব্যাপক পরমাত্মা। অবিনাশী নিত্যস্বভাব বলে তিনি অমৃত।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে জগৎকে মিথ্যা বলা হলো। জগৎ মিথ্যা বলতে কিন্তু এ বোঝায় না যে এর পিছনে তত্ত্ব নেই। মিথ্যা মানে অলীক নয়। দার্শনিক পরিভাষায় 'অলীক' শব্দের মানে নিরর্থক। শব্দ একটা প্রতীক মাত্র। শব্দ উচ্চারণ করলে একটি বস্তুর বোধ হয়। অলীক বস্তুর অস্তিত্বই নেই যে তার বোধ হবে। উদাহরণ দেওয়া হয়, আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি। আকাশে ফুল ফোটে না, খরগোশের শিং হয় না। মিথ্যা মানে যাকে ঠিক স্বরূপে জানছি না, ভুল জানছি। জগৎ মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যা যখন বলছি তখন কিন্তু এটা জানছি যে মিথ্যারও কোন একটা অধিষ্ঠান থাকে। সেই অধিষ্ঠানরূপে প্রতীত না হয়ে যখন অন্যরূপে প্রতীত হচ্ছে তখন তাকে বলছি মিথ্যা। রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে রজ্জুর সর্প বলে প্রতীতিটা মিথ্যা প্রতীতি। সর্প নেই ঠিকই কিন্তু রজ্জু তো আছেই। তেমনই ব্রহ্মে যখন জগতের আরোপ হচ্ছে তখন ব্রহ্ম অধিষ্ঠান, জগৎ আরোপ্য। জগৎকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করতে পারলে তত্ত্ব বা সত্যজ্ঞান হতো। জগদ্রূপে প্রতীতি হওয়াতেই মিথ্যা জ্ঞান হচ্ছে। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে আরোপিত জগতের বোধটা যেন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সর্পরূপ আরোপ্যের বোধের মতো ভ্রম মাত্র। জগৎ বস্তুত ব্রহ্মস্বরূপ, সেরূপে সেটি কিন্তু অনুভূত হচ্ছে না। আমরা একে পরিবর্তনশীল বিকারী বস্তু বলে দেখছি। বাস্তবিক এটি নিত্য অপরিবর্তনশীল অপরিণামী তত্ত্ব, যাঁকে আমরা

---

১. গীতা—১৫/৩ ; ২. কঠোপনিষদ্, শাঙ্করভাষ্য—২/৩/১ ; ৩. তদেব—২/৩/১
৪. তদেব—২/৩/১ ; ৫. তদেব—২/৩/১ ; ৬. তদেব—২/৩/১ ;

ব্রহ্ম বলি। ব্রহ্মরূপে না দেখে অন্যরূপে দেখছি বলে জগৎকে মিথ্যা বলা হচ্ছে।

অনেকে শঙ্করকে ধরেন মায়াবাদী। মায়াবাদ নয়, শঙ্করের প্রতিপাদ্য হলো ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ মায়াকে তিনি তত্ত্ব বলেন না, তত্ত্ব বলেন ব্রহ্মকে। যাকে তত্ত্ব বলা হয় তাকে নির্দেশ করে যদি কোন মতবাদ গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় বাদ। যেমন অদ্বৈতবাদ, যা শঙ্করের সিদ্ধান্ত। শঙ্কর ব্রহ্মকে তত্ত্ব বলেন, মায়াকে নয়। আবার মায়াকে শঙ্কর অলীক বলেননি, মিথ্যা বলেছেন। জগৎ অলীক হলে জগতের প্রতীতি হতো না, যেমন আকাশকুসুমের প্রতীতি হয় না। এর মূল অন্বেষণ করারও কোন দরকার ছিল না। মূলে সত্য রয়েছে বলে জগতের প্রতীতি হচ্ছে আবার তার মূল অন্বেষণেরও প্রয়োজন হচ্ছে। অতএব বলা হয়, 'সচ্চেন্ন বাধ্যেত অসচ্চেন্ন প্রতীয়েত'[১]—অসৎ হলে জগতের প্রতীতি হতো না, আবার সৎ হলে তার বোধ বাধিত হতো না। বাধিত হওয়া মানে বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা আপাতজ্ঞান প্রতিহত হওয়া। যেমন, রজ্জুসর্পের ক্ষেত্রে রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা আরোপ্যের অর্থাৎ সর্পের জ্ঞান বাধিত হয়। অধিষ্ঠান রজ্জুকে জানলে সেখানে আর সর্পের জ্ঞান থাকতে পারে না। সুতরাং সর্পের জ্ঞান মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। ব্রহ্মকে জানলে জগৎ বাধিত হয়ে যায়। আমরা কথায় কথায় বলি জগৎ মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগতের মিথ্যাত্ববোধ আসে না। যুক্তির সাহায্যে মিথ্যা কল্পনা করতে পারি কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান না হলে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় হয় না।

শঙ্করের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এটি বিশেষ করে মনে রাখবার। শঙ্কর তত্ত্বকে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। প্রাতিভাসিক মানে প্রতীতিকালমাত্র স্থায়ী। তারও একটা অস্তিত্ব, সত্তা মানতে হয়। কিন্তু সেই প্রাতিভাসিক বস্তু অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়ে যায়। বাধিত হলে তখন আর জ্ঞান থাকে না। রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা যেমন প্রাতিভাসিক সর্পজ্ঞান বাধিত হচ্ছে। আবার যে রজ্জুকে ব্যবহারিক মনে হচ্ছে তার অতিরিক্ত যে পারমার্থিক সত্তা, যা বস্তুমাত্রের নিত্যসত্তা, ব্রাহ্মীসত্তা, যার উপরে রজ্জু আরোপিত, সেই পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান হলে রজ্জুজ্ঞানও বাধিত হয়ে যায়। সুতরাং রজ্জুজ্ঞানকে বলা হয়েছে ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্যবহারিক বস্তুর সত্তা ব্যবহারকালমাত্র স্থায়ী। যে সত্তা কখনো বাধিত হয় না তার সত্তাকে বলা হয় পারমার্থিক সত্তা। এই তিনটি সত্তাকেই শঙ্কর মেনেছেন এবং মানার প্রয়োজন আছে।

যেখানে contradiction আছে সেখানে বলি বিজ্ঞানের সাহায্যে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করছি। জগৎ যেমন আছে তেমনই বলে যদি ধরে নেওয়া

---

১. অদ্বৈতসিদ্ধি—মধুসূদন সরস্বতী। সম্পাদক ঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, পরিমল পাব্‌লিকেশনস্‌, দিল্লী, সংস্করণ (১৯৮২) পৃঃ ৬৩০

যেত তাহলে এ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন হতো না। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের জ্ঞানের ভিতরে কোন পারস্পরিক বিরোধ, conflict থাকবে না। এই বিরোধ না থাকাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছি এবং জ্ঞানের বিচার করছি। যেখানে বুঝতে পারছি না সেখানে অন্বেষণ করছি। এই অন্বেষণের পরিণামেই বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের অনুভূত বস্তুর উপরে আধারিত হয়। তাদের অবলম্বন করেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। তার থেকে অতীত, জগদতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে যাই না। এই জগতে অনুভূত বস্তুগুলির তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করার সময় যেন action-এর মতো আমাদের ভিতর থেকে সেই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। অন্তঃপ্রসূত সেই লক্ষণগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে আমরা ধরে নিই। সেইগুলিকে অবলম্বন করে গবেষণা করে যেখানে সেই লক্ষণ উপযুক্ত হয় না, সেখানে বলি এই বিষয়টা বুঝতে পারছি না। তখন অন্বেষণ করে তত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করি। জগতের সম্বন্ধে এই বিচারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, এটি জগৎ-অনুভবের উপরে আধারিত। তার দ্বারা আমরা জগৎ-অতীত তত্ত্বে কখনোই পৌঁছাতে পারব না, এ কথা যেন মনে রাখি।

অনেক সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত হবে বলে কল্পনা করা হয়। এ কল্পনা সুসঙ্গত নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্ভর করে অনুভূত সত্যের উপর। সেই সত্য আমাদের ব্রহ্মে পৌঁছে দিচ্ছে না। তাহলে ব্রহ্মে পৌঁছবার উপায় কী আছে? শাস্ত্র দুটি উপায় বলছেন। একটি, শাস্ত্র নিজে; আর একটিকে বলা হয় intution বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। সাধারণ ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নেই কিন্তু, ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বস্তু থাকতে পারে, যাকে এখন অনুভব করতে পারছি না, শাস্ত্রের সাহায্যে তার যেন কতকটা আভাস পাই। শাস্ত্র বলছেন—তুমি ব্রহ্ম। আমি নিজেকে ব্রহ্ম বললে তার বিরুদ্ধে যুক্তি আসবে, তাহলে তো আমি সর্বব্যাপক সর্বজ্ঞ হতাম, নিত্য হতাম। কিন্তু আমার তার বিপরীত অনুভূতি রয়েছে। আমি দেহাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমিত, অল্পজ্ঞ, অনিত্য। দেশকালের, নিমিত্তের দ্বারা সীমিত। সুতরাং, 'আমি ব্রহ্ম' কথাটিতে বিরোধ রয়েছে। একে বলে শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের বিরোধ। শাস্ত্র বা বিচারশীল দার্শনিকেরা দেখিয়ে দেবেন যে, এ বিরোধ আপাতবিরোধ, বাস্তবিক নয়। 'আমি ব্রহ্ম'—এটা প্রথমেই যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় না। যতই যুক্তির অবতারণা করি, বুদ্ধি মায়ার আবরণ ভেদ করতে, ব্যবহারিক সত্তাকে অতিক্রম করতে পারে না। যেমন দৃষ্টান্ত, আমি আমার থেকে লাফিয়ে বেরোতে পারি না, যতই লাফাই আমার শরীরের সঙ্গেই লাফাচ্ছি। সেইরকম আমাদের এই বুদ্ধি দিয়ে জগতের অতীত তত্ত্বে পৌঁছাতে পারি না। তবে শাস্ত্র থেকে জগদ্-অতীত তত্ত্বের নির্দেশ পাই। শাস্ত্র কী? না, যাঁরা আপ্ত অর্থাৎ অনুভব করেছেন, তাঁদের অনুভূতির record, যেগুলি তুচ্ছ নয়। কেন নয়? না,

তার দ্বারা আমরা জগদতীত তত্ত্বের সন্ধান পাচ্ছি। প্রশ্ন হবে, intuition বা immediate experience বা সাক্ষাৎ অনুভবে ভুল হতে পারে তো? ভুল কিনা তা দর্শনের দ্বারা বিচার করে কতকটা জানতে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যদি কারো কাছ থেকে অনুভবটি না পাই, তা সে শাস্ত্র বা সিদ্ধব্যক্তি যার কাছ থেকেই হোক, তাহলে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে তাকে আবিষ্কার করতে পারি না। এইজন্য শঙ্কর শাস্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

আধুনিক ভাষায় যাকে intuition বলে, সেই অলৌকিক অনুভূতি বা দিব্যানুভূতির সত্যতা, যাথার্থ্য সম্বন্ধে কী করে নিশ্চিত হতে পারব? সত্যের যে লক্ষণ আমাদের জানা আছে তা যদি প্রযোজ্য হয় তাহলেই সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রথমে অতীন্দ্রিয় সত্য বলে পাই, তারপর বুঝবার জন্য সেগুলিকে বিচার করি, করে তত্ত্বে পৌঁছাই। এইজন্যই শাস্ত্র বলেছেন—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[১]—আত্মাকে জানতে হবে, দেখতে হবে, শুনতে, মনন করতে ও নিদিধ্যাসন করতে হবে। শুনতে অদ্ভুত হলেও এটি পরম সত্য কথা যে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি নিজে চেষ্টা করে অজ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। লৌকিক, বৈদিক—সব ব্যবহারই সত্য এবং মিথ্যার মিশ্রণ। তার থেকে সত্যকে অসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারছি না। কিন্তু শাস্ত্র যেন আমাদের কতকগুলি hints বা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন যা সত্য সম্বন্ধে যেন একটা আভাস, একটা কল্পনা মনে জাগিয়ে দেয়। পরে সেটা বিচার করে নিতে পারি। কিন্তু কেবল তর্কবিচারের দ্বারা তত্ত্বলাভ হয় না। তর্কের দ্বারা সত্যকে যাচাই করে নেওয়া যায়। এটি একটি ভাববার মতো সুন্দর বিষয়। নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করতে শাস্ত্রও বলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগত জনৈক ব্যক্তি অপর একজনকে বললেন—'যা বলছেন মেনে নেন না!'[২] শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বিরক্ত হয়ে বললেন—'তুমি কিরকম লোক! কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া! কপটতা! তুমি ঢঙ কাচ দেখছি!'[৩]—বিচার করে দেখ সিদ্ধান্তটি সত্য কি না। যাচাই করে বাজিয়ে দেখে নাও। তা না করলে মনের সন্দেহ যাবে না। কাজেই অনেকবার বলা কথার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। প্রথমে শোনা, শোনবার পর মনন, তর্কবিচার, তারপরে সন্দেহের নিরসন হয়ে যে তত্ত্বটি জানা হলো তার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করতে হয়। নিদিধ্যাসন হলো মনে সেই তত্ত্বটি দৃঢ় করবার জন্য তাতে মনকে স্থির করে রাখা। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

তবে একথাও অনেকবার বলা হয়েছে, কেবল তর্কের দ্বারা বস্তু লাভ হবে না। কারণ একজন একভাবে তর্ক করে একটা সিদ্ধান্ত করলেন, আর

১. বৃহদারণ্যক—৪/৫/৬ ; ২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৪
৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৪

একজন তর্ক করে সেই সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দিয়ে আর একটি সিদ্ধান্ত করলেন। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে আর একটি মতকে কেউ দাঁড় করালেন। স্থির কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। এ সংশয় চলবেই। বেদান্তবাক্যগুলির সম্বন্ধেই কি সন্দেহ দূর হয়েছে? হয়নি। কারণ মনকে শুদ্ধ না করে বিচার করতে গেলে সে বিচার শুষ্ক তর্কে পর্যবসিত হয়, এর দ্বারা সিদ্ধান্তে স্থিতি হয় না। ঐকমত্য সম্ভব সেইখানে যেখানে বস্তুকে পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করতে পারি, যেমন বৈজ্ঞানিক সত্যের ক্ষেত্রে হয়। তাও প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ লোক বৈজ্ঞানিক সত্যকে পরীক্ষা করে নিতে পারে কি? একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত, এই স্থূল জগৎ কতগুলি পরমাণুর সমষ্টি যাদের মধ্যে বিশাল ফাঁক রয়েছে। আমরা যারা বৈজ্ঞানিক নই তারা ভাবব তাহলে তো আমরা ফাঁক দিয়ে পড়ে যাব! সাধারণ মানুষ এগুলি ধারণা করতে পারবে না, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দিলে সে এর ধারণা করতে পারবে। বৈজ্ঞানিক মতে আমরা বিশ্বাস করছি কারণ বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিমত্তা এবং সততার উপর আমাদের আস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করার প্রণালী সময়সাধ্য হলেও কয়েক বছরের চেষ্টায় সাধারণ মানুষ তা আয়ত্ত করতে পারে। কারণ এটা একরকম সর্ববাদিসম্মত সত্য।

কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানকে সর্ববাদিসম্মত বলে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হয়ে, যে প্রণালী অনুসরণ করে এই তত্ত্বের সত্যতা বোঝা যাবে, তা দুরূহ এবং দৈবাৎ এক-আধজন তাতে পৌঁছাতে পারে। যতই চেষ্টা করি, মনকে সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষমুক্ত করে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় তাহলে বলি—আমার দ্বারা হবে না। তবে বলা যায় যে, শাস্ত্রীয় সত্য বা অনুভূত তত্ত্বগুলিকে এই প্রণালী অনুসরণ করে গেলে জানা যাবে। যুক্তির সাহায্যে দেখানো যায় যে, এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের বিরোধ কিছু নেই। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে দেখে বলি প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ আছে। বুদ্ধিকে আর একটু মার্জিত করলে এই প্রত্যক্ষ বিরোধের অবসান হয়।

এই প্রণালীই হলো মনন। অতএব মনন নেতিবাচক হলে হবে না। ঋষিদের বাক্যকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে মনন বা বিচারকে প্রয়োগ করলে হবে না, তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর একটু জোর দিতে হবে, অন্তত সেটিকে একটি প্রকল্প, hypothesis হিসাবে গ্রহণ করে বিচারকে পরিচালিত করতে হবে। শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করলেই মনন সম্ভব। এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন আস্তিক প্রণালী অনুসারে বিচার করতে হয়, নাস্তিক প্রণালী অনুসারে নয়। শাস্ত্রীয় প্রণালীতে বিচার, মনন করতে হবে। 'মনন' শব্দকে এই বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। তারপর মননের দ্বারা শাস্ত্রীয় সত্য এবং অনুভূত তত্ত্বের বা আপ্তবাক্যের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়ে গেলে সেটাকে অবিরুদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করতে মাঝে

মাঝে যে স্বাভাবিক সংশয় মনে ওঠে তা দূর করার জন্য নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। নিদিধ্যাসনের দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে মনের স্থিতিলাভ হবে।

উপসংহার হলো—বেদের তত্ত্বকে বেদ থেকেই পেতে হয়। উপনিষন্মাত্রৈকগম্য —একমাত্র উপনিষদ্ থেকেই তত্ত্বকে জানা যায়। নিজের বুদ্ধির সাহায্যে জানা যায় না। কারণ বুদ্ধি তার সীমার ভিতরেই ঘোরে, বাইরে যাবার সামর্থ্য তার নেই। বিচারের পর প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে স্থিতির জন্য প্রয়োজন নিদিধ্যাসনের। 'শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ'[১]—শর, তীরের মতো লক্ষ্যে লগ্ন, তন্ময় হয়ে থাকবে, আর সেখান থেকে বিচলিত হবে না। এক কথায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ছাড়া তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ হয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২॥

অন্বয় ঃ—ইদম্ (এই) যৎ কিম্ চ (যা কিছুই) জগৎ (সচল বস্তু) [উপলক্ষণের দ্বারা স্থাবর বস্তুও অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় বস্তু] সর্বম্ (সেই সমস্ত) প্রাণে (মহাপ্রাণ বা পরব্রহ্ম আছেন বলেই) নিঃসৃতম্ (তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়ে) এজতি ([প্রাণসত্তায়] স্পন্দিত হয়)। এতৎ (এই সমস্ত জগৎকরণ ব্রহ্মকে) যে (যাঁরা) মহৎ ভয়ম্ (অত্যন্ত ভয়ঙ্কর) উদ্যতম্ (সমুত্থিত) বজ্রম্ (বজ্রের ন্যায়) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁরা) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমর বা মুক্ত হন)।

যে ব্রহ্মকে জানলে জীব অমৃত হয়, জগতের মূল কারণ সেই ব্রহ্মই নেই, অ-সৎ থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে—কেউ যদি এরকম শঙ্কা করেন, সে শঙ্কার নিরসনের জন্য এই মন্ত্রটি বলা হচ্ছে।

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্'—এই যা কিছু সচল বস্তু, 'প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—সে সমস্তই পরব্রহ্ম আছেন বলে সেই পরব্রহ্ম থেকে নির্গত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম—'উদ্যতং বজ্রং মহদ্ভয়ম্'—উদ্যত বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক। 'যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি'—যাঁরা এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তাঁরা অমর হন অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন।

এই চরাচর বস্তু যা কিছু দৃষ্ট হয় সে সমস্তই পরব্রহ্ম আছেন বলেই নিয়ম অনুসারে চলছে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ যে ব্রহ্ম তিনি মহৎ ভয়স্বরূপ, উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। সেই ঈশ্বরের শাসনে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদিসমন্বিত জগৎ ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে তাঁর নিয়মাধীন হয়ে বর্তমান আছে এইরূপ বলা হয়। যাঁরা এই স্বপ্রকাশ, সমস্ত জগতের আশ্রয়, পরমাত্মাকে আত্মারূপে উপলব্ধি করেন তাঁরা মৃত্যুরহিত হন। কারণ

---

১. মুণ্ডকোপনিষদ্—২/২/৪

একমাত্র তিনিই সত্তাবান হওয়ায় ভয় আর কোথা থেকে আসবে? যেমন হিরণ্যগর্ভ দেখলেন যে একমাত্র তিনিই আছেন, তখন তাঁর ভয় চলে গেল। তিনি যেন বিচার করলেন—'যৎ মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি'[১]—যদি আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ না থাকে তাহলে কোথা থেকে আমার ভয় আসবে? যাঁরা সেই পরব্রহ্মকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন তাঁরা দ্বিতীয় আর কিছুই দেখেন না। অতএব তাঁরা ভয়রহিত, মৃত্যুরহিত হয়ে মুক্ত হন। আত্মার স্বরূপ যে অমরত্ব তা-ই লাভ করে তাঁরাও অমর হন।

উদ্যত বজ্রসদৃশ ভয়ানক যে ব্রহ্ম তাঁর ভয়ে জগৎ কি প্রকারে বর্তমান রয়েছে তা পরবর্তী মন্ত্রে বিস্তার করে বলা হচ্ছে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩॥

অন্বয় ঃ—অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে বা নিয়ন্ত্রণের ফলে) অগ্নিঃ তপতি (অগ্নি তাপ দেন), ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ (এঁরই ভয়ে সূর্য তাপ ও আলো প্রদান করেন) ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ (এই পরমেশ্বরের ভয়ে ইন্দ্র এবং বায়ু) পঞ্চমঃ ([পূর্বে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও বায়ুর উল্লেখ থাকায়] পঞ্চম স্থানীয়) মৃত্যুঃ (যম) ধাবতি (স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন)।

'অস্য ভয়াৎ অগ্নিঃ তপতি'—এই পরমেশ্বরের ভয়ে অর্থাৎ তাঁর শাসন মেনে অগ্নি তাপ প্রদান করেন, 'ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ'—তাঁরই ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছেন, 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ ধাবতি'—তাঁর ভয়েই ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যুও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করছেন।

অগ্নি, সূর্য, বায়ু, এদের জড়বস্তু বলা হয়। কিন্তু এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা চেতন। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কিন্তু স্বতন্ত্র নন, তাঁরা ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব জড় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার চৈতন্যময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা, আবার সেই দেবতার নিয়ন্ত্রক হলেন সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্ম। ইনিই জীবাত্মারূপে সর্বজীবে বিরাজিত।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥৪॥

অন্বয় ঃ—ইহ (এই জীবদ্দশাতেই) চেৎ (যদি) [কেউ] বোদ্ধুম্ (ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে) অশকৎ (সমর্থ হন) [তবে তিনি] শরীরস্য (দেহের) বিস্রসঃ (পতনের) প্রাক্ (পূর্বেই—অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই) [মুক্ত হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন]। ততঃ (তা নাহলে) সর্গেষু (কর্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট পৃথিব্যাদি) লোকেষু (লোকসমূহে) শরীরত্বায় কল্পতে (দেহবিশেষ লাভ করেন)।

---

১. বৃহদারণ্যক—১/৪/২

'ইহ শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্'—শরীরত্যাগের পূর্বে জীবিত অবস্থাতেই যদি কেউ—'চেৎ অশকৎ বোদ্ধুম্'—আত্মতত্ত্বকে জানতে সমর্থ হন তাহলে তিনি এই জন্মেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন। আর যিনি তা পারেন না তাঁর কী গতি হয়? তার উত্তরে বলছেন—'ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে'—তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হেতু কর্মফল ভোগের জন্য স্বর্গাদি বিভিন্ন লোকে শরীরধারণের যোগ্যতা লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁদের পুনরায় দেহধারণ করতে হয়। আত্মতত্ত্বকে জানলে দেহবন্ধন থাকে না, জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়ে যেতে হয় না। 'সর্গেষু লোকেষু' বলেছেন। 'সর্গ' মানে জীব তার কর্মফল ভোগ করবার জন্য যেখানে জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লোকই সর্গলোক। সেইসব সর্গলোকে অর্থাৎ জীবলোকে দেহধারণ করতে হয়। অতএব এই শরীরপাতের পূর্বেই আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াস করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, এখন যেমন করে হোক চালাই তারপর মৃত্যুর পর স্বর্গে যাব। এ কল্পনা মানুষের আলস্যের পরিচায়ক মাত্র। এই জীবনে কিছু করতে চাই না অথচ মরবার পর স্বর্গলাভ হবে, এ কী করে হয়? এর আগেও কেনোপনিষদে বলা আছে—

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।'[১]

—এই শরীর থাকতে থাকতে যদি আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তবেই বুঝলাম আমার একটা কিছু লাভ হলো। আর তা না হলে—'মহতী বিনষ্টিঃ'—মহান বিনাশ। অর্থাৎ এর পরে কী হবে, কিভাবে নতুন জন্ম হবে, সেই জন্মে আত্মজ্ঞান অনুসরণ করবার সুযোগ কতটুকু থাকবে কিছুই জানি না। অনন্ত কর্মের বোঝা সঞ্চিত রয়েছে ফলদানের জন্য উৎসুক হয়ে। সেসব কর্ম যে কী ফল উৎপাদন করবে জানি না। ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব অর্থাৎ ঘাস পর্যন্ত কত কিছু হতে পারে। জড় শরীর হতে পারে যেখানে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টার কোন সম্ভাবনা নেই। সকল প্রকার জন্মের মধ্যে শাস্ত্র বলেছেন মনুষ্যজন্ম সবচেয়ে দুর্লভ— 'জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভম্'[২]—দেবতা-জন্মের চেয়েও নরজন্ম ভাল। দেবতাদের জীবন প্রচুর ভোগে কেটে যায়, আত্মজ্ঞান লাভের কোন চেষ্টা সেখানে আসে না। অধোযোনিও ভোগদেহ, যেখানে আত্মজ্ঞানের স্পৃহাই জাগে না। কাজেই এই মনুষ্যজন্ম, যেখানে সুখ-দুঃখের খানিকটা সমতা আছে, সেই জন্মই আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। কিন্তু তার পরের কথাগুলি হয়তো এত রুচিকর হবে না—'ততঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা তস্মাদ্‌বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্'।[৩] নরজন্মের মধ্যে আবার পুরুষদেহ দুর্লভ। প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষদেহে কি আত্মজ্ঞানের অধিকার বেশি? শাস্ত্র বলেন,

১. কেনোপনিষদ্—২/৫ ২. বিবেকচূড়ামণি—২ ৩. তদেব—২

তাদের সুবিধা বেশি। আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই দুর্লভ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তবে সমাজের পরিস্থিতি বা অন্য যে কারণেই হোক পুরুষজাতির অনেক সুবিধা আছে যা স্ত্রীজাতির নেই। তারপর বলছেন ব্রাহ্মণ জন্ম চাই। বর্ণকে এত উচ্চ অধিকার দেওয়া কেন? না, ব্রাহ্মণের যেন একটা সহজাত সংস্কার থাকে। অন্তত প্রাচীনকালে সমাজব্যবস্থা যেরকম ছিল তাতে ব্রাহ্মণের জীবন-পরিবেশ সাধকজীবনের বেশি অনুকূল ছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণশরীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য অধিকতর উপযোগী বলে গণ্য করা হয়েছে। হয়তো এ সবই হলো—মনুষ্যজন্ম, পুরুষশরীর এবং ব্রাহ্মণবর্ণ, সবই লাভ হলো কিন্তু তারপরেও বলছেন—'তস্মাদ্ বৈদিকধর্মমার্গপরতা'—সে জীবনকে শাস্ত্রানুযায়ী হতে হবে, নাহলে সবই বৃথা। কেবল অনুকূল পরিবেশ কোন কাজে লাগে না। যা আত্মজ্ঞানের অনুকূল সেই বৈদিকধর্মমার্গপরতা দরকার। তবে সেই ধর্ম অনুসরণ করে সকলেই যে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবেন তা নয়। তাঁদের ভিতরে বিরল কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞ হন। 'বিদ্বত্ত্বম্ অস্মাৎ পরম্'—এই বিদ্বত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানই হলো শ্রেষ্ঠ, অনুসরণীয়। তার জন্য এগুলি সব উপায়। উপায় অনেক কিন্তু অনুসরণের চেষ্টা, আগ্রহ না থাকলে সবই বৃথা। কাজেই এখানে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, এ শরীরটি থাকতে থাকতে যা করবার করে নিতে হবে। এইজন্য দেহটি আমাদের শত্রু নয়, মিত্র। আমরা সবসময় শরীরকে তুচ্ছ করি কিন্তু এই শরীরকেই যদি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করি তাহলে এই দেহই আবার আত্মজ্ঞান লাভের বা মুক্তির কারণ হয়। যা আমাদের বেঁধে রেখেছে তা-ই মুক্তির কারণ হয়ে যায়। ব্যাধি-আদি সাধনার প্রতিকূল। সুতরাং দেহকে যত্ন করে রাখতে হয় যাতে তা ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, তার যাতে কোন হানি না হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছিলেন, সাধকের শরীর অতিশয় যত্ন করে রাখতে হয়। এটি একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র যাকে ব্যবহার করে ভগবানলাভ পর্যন্ত হতে পারে। এতদূর অবধি শরীরের উপযোগিতা আছে। মহারাজ এই কথাটি ব্যবহার করতেন, বেশ্যার শরীরের মতো এই সাধুশরীরকে সযত্নে রক্ষা করবে। দেহ যার জীবিকার একমাত্র উপায় সেই বারবনিতা যেমন তার দেহকে যত্ন করে রাখে, সাধকের শরীরকে সেইরকম যত্নে রাখতে হয়। ভোগের জন্য নয়, বস্তুলাভের জন্য। বস্তুলাভের সহায়ক হচ্ছে সুস্থ নীরোগ শরীর। ভোগের উপযোগী নয়, সাধনের উপযোগী শরীর। এইজন্য শরীরকে বিশেষ প্রকারে তৈরি করতে, পরিচর্যা করতে হয়। ভোগের শরীর রজোগুণী, সাধনের শরীর সত্ত্বগুণী। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণ তিনটিকে আমরা বাইরে থেকে বুঝি না কিন্তু কাজ দেখে, ফল দিয়ে চিনতে হয়। জড়ত্বপ্রধান শরীরে তমোগুণের আধিক্য থাকে। কর্মপ্রধান, ভোগপ্রধান শরীর, যা অধিক আয়াসে সুখে থাকে, সে হলো রজোগুণী শরীর। আর যে শরীর মনকে নির্মল করে, মনকে সমতার দ্বারা রক্ষা করে, ভগবানলাভের পথে যে শরীর অনুকূল, তাকে সত্ত্বগুণী শরীর বলেছেন।

শরীর ধারণ করতে গেলে এই গুণগুলিকে অবলম্বন করতে হয়। ভগবান যখন দেহধারণ করেন তখন তাঁর দেহকে শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ বলা হয়। সেখানে রজঃ বা তমোগুণ সত্ত্বকে অভিভূত করে না, তাদের সংস্পর্শ পর্যন্ত সেখানে নেই। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, নির্মল, তা অন্যান্য গুণের মতো জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে না। এইজন্য ভগবানের ব্যক্তিত্ব থাকলেও তা তাঁর জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে না। সাধকদের শরীরও ধীরে ধীরে অনুরূপ হয়। অন্যান্য গুণ অপসারিত হয়ে সেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—ভক্তের দেহ চিন্ময়।[১] সেখানে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ থাকায় তা চৈতন্যকে আবৃত করে না। এই যে শরীর, যা আমাদের একটা অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে, এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে, সেই শরীর থাকতে থাকতে তার সদুপযোগ করা দরকার। না হলে আবার দেহধারণ করতে হবে।

পরের মন্ত্রে বলছেন এই কথাই যে, এই মনুষ্যলোকে আত্মদর্শন যেমন স্পষ্ট হয় অন্য লোকে তেমন হয় না। অবশ্য একথা শাস্ত্রের কথা বলে গ্রহণ করতে হবে, প্রমাণ করবার কোন উপায় নেই। নরদেহে আত্মজ্ঞান যে অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় এ বিষয়ে তাঁদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে যাঁরা সেই উপলব্ধি করেছেন। অন্যান্য লোকে কিরকম উপলব্ধি হয় সেটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে জানতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখবার অবকাশ নেই। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এগোতে হয়। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্য কোন লোকে আত্মজ্ঞান সম্ভব নয় এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কঠোর সাধনসাধ্য বলে দুর্লভ হওয়ায় এই জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভে প্রযত্ন করা উচিত। সেইজন্য পরের মন্ত্রে বলছেন অন্যান্য লোকে আত্মজ্ঞান অস্পষ্ট, নরলোকে স্পষ্ট।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫॥

অন্বয় ঃ—আদর্শে (স্বচ্ছ দর্পণে) যথা (যেমন) [নিজের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়] তথা (সেইরকম) আত্মনি (শুদ্ধ বুদ্ধিতে) [পরমাত্মার দর্শন বা উপলব্ধি হয়]; স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) যথা (যেমন সবই অস্পষ্ট বোধ হয়) তথা পিতৃলোকে (সেইরকম পিতৃলোকেও) [আত্মদর্শন অস্পষ্ট] অপ্সু (জলে) যথা (যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝা যায় না) তথা গন্ধর্ব লোকে ইব (সেইরকম গন্ধর্বলোকে আত্মাকে দেহাদির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলেই) পরিদদৃশে (দেখা যায়) [একমাত্র] ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) ছায়া আতপয়োরিব (অন্ধকার ও আলোকের মতো) [অত্যন্ত বিলক্ষণ ভাবে আত্মা ও অনাত্মার ভেদের দ্বারা সম্যক আত্মদর্শন হয়]।

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯

'যথা আদর্শে তথা আত্মনি'—সুনির্মল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব যেমন সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় সেইরকম মনুষ্যলোকে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট হয়। 'যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে'—স্বপ্নে যেমন দৃশ্যবস্তু অস্পষ্টরূপে দেখা যায় পিতৃলোকে আত্মার দর্শন সেইরকম হয়। স্বপ্নে স্বাপ্নবস্তুগুলির অনুভব জাগ্রতের অনুভবের মতো স্পষ্ট নয়। স্বাপ্নবস্তুর স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারি কিরকম একটা অস্পষ্টতা সেখানে থেকে যায়। স্বপ্নের মধ্যে দৃশ্যবস্তুকে ঠিক ভাল করে বুঝি না। অনুভবগুলি অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, পরস্পর-সঙ্গতিহীন। পিতৃলোকে আত্মজ্ঞানের ঐরকম অস্পষ্ট অনুভব হয়। 'যথা অপ্‌সু পরিদদৃশে ইব তথা গন্ধর্বলোকে'—জলের উপরে ছায়া যেমন অস্পষ্ট দেখা যায় গন্ধর্বলোকে আত্মজ্ঞান সেইরকম হয়। জলে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব আয়নার প্রতিবিম্বের মতো স্পষ্ট হয় না। জল যেখানে স্থির, স্বচ্ছ, সেখানেই এরকম, আর চঞ্চল জল হলে প্রতিবিম্ব তো দেখাই যাবে না। স্পষ্ট অনুভূতি হয় ব্রহ্মলোকে। 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'—ছায়া এবং আতপ, অন্ধকার এবং আলোকের যেমন পৃথক পৃথক প্রতীতি হয় সেইরকম অনাত্মবস্তু থেকে বিবিক্ত, অত্যন্ত পৃথককৃত রূপে আত্মার অনুভব হয় ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোকের মতো স্পষ্ট অনুভব আর কোথাও হয় না। কেন না, ব্রহ্মলোক হলো মুক্তির অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা।

ক্রমমুক্তির পথে যারা ব্রহ্মলোকে যায় এখানে তাদের কথা বলা হলো। জ্ঞানের পথে চললে সেটা চরম অবস্থা, সিঁড়ির শেষ ধাপ। কাজেই সেখানে আত্মজ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তুলনা দিয়ে বলছেন, ছায়া এবং আতপের মতো, অন্ধকার এবং আলোকের মতো অত্যন্ত ভিন্ন রূপে সেখানে আত্মজ্ঞানের অনুভব হয়। আলো এবং অন্ধকারের মিশ্রণ হয় না, একটি অপরটির বিপরীত, একটি অপরটির negation, নিষেধবাচক। যেখানে এইরকম স্পষ্টরূপে আত্মার অনুভব হয় তা হলো ব্রহ্মলোক। ভাষ্যকার বলছেন, ব্রহ্মলোক অতিশয় দুর্লভ কারণ অশ্বমেধাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম এবং জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ চরম শুদ্ধির ফলে ব্রহ্মলোক লাভ হতে পারে। একথা বলার তাৎপর্য কী? না, মনুষ্যলোকে এসেছ, তার উপযোগ কর। এই জন্মে, এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা কর। এমন সুযোগকে হেলায় হারিও না। শ্রুতি এখানে এই কথাই বলছেন।

তারপর বলছেন, এই আত্মাকে কি করে জানতে হয় এবং জেনে লাভ কি? কি লাভ হবে না বললে, জানবার রুচি হবে না। যদি নিশ্চিত লাভ কিছু না হয় কেন কষ্ট করে সেই বস্তুর পিছনে ছুটব? যদি লাভ হয়, তখন দেখতে হবে কি করে জানা যেতে পারে। প্রথমে প্রয়োজন, তারপর উপায়। প্রয়োজনবোধ, ইষ্টবোধ না থাকলে সেই বস্তুর অন্বেষণ করতে যাব কেন? যেমন, পুত্রকামনা থাকলে তা পূর্ণ করতে 'পুত্রেষ্টি' যাগ করা বিধেয়, জ্ঞানকামনা

থাকলে ইতিকর্তব্যতা জ্ঞান যাকে বলে তার অন্বেষণ করতে হয়। যে স্বর্গ চায় সে যখন জানবে 'সোমযাগ' করে স্বর্গলাভ হয় তখন তা কেমন করে করতে হয় তার ইতিকর্তব্যতা তার দরকার। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ভাবলে ব্রহ্মজ্ঞান কী করে লাভ হবে তার চেষ্টা করতে হবে। এখানে সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের সাধন উপদিষ্ট হচ্ছে।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬॥

অন্বয় ঃ—[নিজ নিজ উৎপত্তির কারণ আকাশাদি পঞ্চভূত থেকে] পৃথক (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ (উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয়সমূহের) পৃথগ্ভাবম্ ([আত্মা থেকে] পার্থক্য) চ (এবং) যৎ উদয়াস্তময়ৌ (তাদের যে উৎপত্তি ও লয়) [তা] মত্বা (জেনে) ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না)।

'পৃথগ্ উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ পৃথগ্ভাবম্'—আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি থেকে পৃথক পৃথক উৎপন্ন, ইন্দ্রিয়সমূহের চৈতন্যস্বরূপ আত্মা থেকে যে পার্থক্য এবং—'উদয়-অস্তময়ৌ মত্বা'—তার উৎপত্তি ও লয় জেনে—'ধীরঃ ন শোচতি'—সংযতচিত্ত মুমুক্ষু ব্যক্তি শোক করেন না।

এক-একটি ইন্দ্রিয়ের এক-একটি বিষয়, শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্য এদের উৎপত্তি তাদের কারণ থেকে। আকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন ভূত থেকে ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। এই ভৌতিক বস্তুগুলি আত্মা থেকে ভিন্ন, পৃথক। এই ভিন্নতাকে জানতে হবে, মনন বা বিচার করতে হবে। জাগ্রৎকালে এদের উৎপত্তি এবং স্বপ্নাবস্থায় এদের লয়। এগুলি অনাত্মবস্তুর হয়, আত্মবস্তুর হয় না। এর দ্বারা আত্মাকে ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক করবার উপায় বললেন। আত্মা পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট নন। ইন্দ্রিয়গুলিকে পঞ্চভূত সৃষ্টি করছে। যে ধাতু দিয়ে বিষয়ের সৃষ্টি সেই ধাতু দিয়েই বিষয়ীর সৃষ্টি, সূক্ষ্মরূপে, স্থূলরূপে নয়। তা হলেও উপাদান একই। কিন্তু আত্মা এদের থেকে ভিন্ন।

আরো একটি কথা বললেন, ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি-লয়, উদয়-অস্ত আছে, আত্মার এসব নেই। ইন্দ্রিয়াদি যখন কাজ করে তখন যেন এদের উৎপত্তি হয়, আবার যখন কাজ করে না তখন তাদের অস্ত বা লয় হয়। জাগ্রতে আমরা সচেতন থাকি, স্বপ্নে চেতনা অপেক্ষাকৃত অল্প, সুষুপ্তিতে চেতনা প্রায় নেই। সুতরাং চৈতন্যেরও পার্থক্য হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলির উদয়-অস্তের সঙ্গে আত্মারও উদয়-অস্ত হচ্ছে কি? উত্তরে বলছেন, না, আত্মা সমানভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁর উৎপত্তি-লয় নেই। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই আত্মার অপরিণামীরূপে সমভাবে স্থিতি। অস্পষ্টরূপে নয়, স্পষ্টরূপে। কারণ, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য আছে বলে জাগ্রৎ অনুভূত হচ্ছে, স্বাপ্নবস্তু ও সুষুপ্তির অবস্থা অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং তিন অবস্থার মধ্যেই চৈতন্য অবিলুপ্তরূপে সমভাবে অবস্থান করছেন।

এই বিচারের দ্বারা পরিবর্তনশীল বস্তু থেকে পৃথক করে অপরিবর্তনশীল আত্মাকে জানা যায়। আত্মার উৎপত্তি বিনাশ নেই কেন? চৈতন্যের উৎপত্তি কি করে, কার দ্বারা জানব? চৈতন্য না-থাকা অবস্থার অনুভব কারো হয় না। চৈতন্য না থাকলে সে অবস্থাকে অনুভব করবে কে? মূর্ছাকালে আমার চৈতন্য ছিল না, জ্ঞান হলে বললাম এতক্ষণ পরে আমার জ্ঞান হলো। সেটা ঠিক চৈতন্যের উৎপত্তি-লয় নয়। চৈতন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বিষয় তার প্রকাশ এবং অপ্রকাশকে লক্ষ্য করেই চৈতন্যের উৎপত্তি-লয় বলি। চৈতন্য মানে সেখানে বিশিষ্ট চৈতন্য—নির্বিশেষ চৈতন্য নয়। বিশিষ্ট চৈতন্য দ্বারা আত্মাকে বোঝায় না। আত্মা নির্বিশেষ চৈতন্য। তিনি যেমন জাগ্রতে, তেমনি স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে আছেন। আবার এই তিন অবস্থার অতীত যদি কোন তত্ত্ব থাকে তাতেও আছেন।

আত্মা সমস্ত অনিত্যবস্তু থেকে পৃথক, নিত্যবস্তু। ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিনাশ আছে সুতরাং আত্মা তাদের থেকে পৃথক। এটি এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন এই কারণে যে, আত্মা আন্তর বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সব সময়ই অনুভূত হচ্ছেন। এইজন্য ইন্দ্রিয়দের চেতন বলে মনে হয়। যেমন জলকে গরম বলে মনে হয় জলের সঙ্গে আগুন মিশে আছে বলে, আগুন মিশে আছে বলেই লোহা পোড়ায়। তেমনি ইন্দ্রিয় বিষয়কে প্রকাশ করে বলে মনে হয় তার ভিতরে চৈতন্য ওতপ্রোত রয়েছে। এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ. সেইজন্যই আত্মার স্বরূপকে জানতে পারি না। গরম জলে জলকে দেখি অগ্নিকে দেখি না। এখানেও ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াগুলিকে দেখতে পাই, পশ্চাতের আত্মতত্ত্বকে দেখতে পাই না। প্রভেদ বোঝবার এই একটা উপায় বলছেন কথাটা খুব সাধারণভাবে বলা হলেও তাৎপর্য এই।

আত্মাকে যে উপায়ে জানা যায় তা বলে দিচ্ছেন, আত্মা যেসব অনাত্মবস্তুর সঙ্গে মিশে আছে তাদের ধর্মগুলিকে বিচার করে পৃথক করা। সমস্ত উপাধিধর্ম অপসারিত হলে এক আত্মবস্তুই থাকবেন। ধূলায় আচ্ছন্ন বস্তুকে ধূলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিলে যেমন বস্তুটির আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে তেমনই যেসকল অনাত্মবস্তু আত্মাকে আবৃত করে আছে সেইগুলি পৃথক করে ফেলতে পারলে আত্মাকে স্পষ্টরূপে, শুদ্ধ, অমিশ্রিতরূপে জানা যায়।

পথটি কঠিন খুবই—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই পথ অনুসরণ করে আত্মাকে জানলে কী লাভ হবে ? বলছেন—'মত্বা ধীরো ন শোচতি'—আত্মতত্ত্বকে জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হন না, এই হলো লাভ। যদি শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই তাহলে আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য পন্থা নেই। নারদ সনৎকুমারকে বলছেন—'তরতি শোকমাত্মবিৎ'[১]—আত্মবিদ্ শোকের হাত থেকে

১. ছান্দোগ্য—৭/১/৩

নিষ্কৃতি পান। কেন? না, শোক অন্তঃকরণের ধর্ম আর আত্মা অন্তঃকরণ থেকে ভিন্ন। আত্মাকে জানা গেলে অন্তঃকরণের ধর্ম দ্বারা আত্মা সংশ্লিষ্ট নন এ আমরা বেশ বুঝতে পারব। শোকরূপ অনাত্মধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে আত্মাকে জানলে আমি শোকগ্রস্ত হব না।

সারকথা হলো এই, আত্মাকে অনাত্মধর্মবর্জিতরূপে অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে জানতে হবে। আমরা দেখছি আত্মতত্ত্ববিশ্লেষণে অতিশয় পটু বড় বড় পণ্ডিতগণও আমাদেরই মতো সুখদুঃখাদি ভোগ করছেন। শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, পণ্ডিত আর মূর্খ সকলেরই এরকম অজ্ঞানপূর্বক ব্যবহার দেখা যায় এবং তাদের ব্যবহার পশুর মতো, 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ'[১]—পশুর সঙ্গে তাঁদের ব্যবহারে কোন পার্থক্য নেই। একটি পশুকে লাঠি দিয়ে তাড়া করলে পালায় আবার ঘাসপাতা দেখালে এগিয়ে আসে। সংসারে আমরাও দুঃখকে এড়িয়ে পালাচ্ছি। পশু অজ্ঞান কিন্তু পণ্ডিতের ব্যবহার তার থেকে কি কিছু পৃথক? সুতরাং জেনে কী লাভ হলো? এমন জানা তো এক কথায় হয়। যে দৃঢ় সংস্কার মনের ভিতরে রয়েছে তাকে দূর করবার জন্য আবার তার বিপরীত সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে স্থাপন করতে হয়। এজন্য বার বার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের আবশ্যকতা। এত শুনেও কোন কাজ হচ্ছে না, 'যথা পূর্বং তথা পরম্'। শাস্ত্র বলছেন, যে মলিন মনের জন্য সত্যকে ধরে রাখতে পারছ না তাকে ঘষামাজা করতে থাক, মনের পূর্বগ্রহ যাতে দূর হয় তার চেষ্টা কর। এখন এই যে prescription বলে দিলেন, জন্ম-জন্মান্তরে সেই ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। বার বার ব্যর্থ হয়েও আবার চেষ্টা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা কালীকে ইষ্ট জেনে তাঁর সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধ আস্বাদন করে এসেছেন। তাই ভগবানের সবিশেষরূপে মন আটকে যাচ্ছে, এগোনো যাচ্ছে না। তোতাপুরী বললেন, 'কেঁও, হোগা নেহি'।[২] তোতাপুরী একথা বলতে পারেন কারণ তিনি সেরূপ আসক্ত কখনো হননি। যিনি আসক্ত হয়েছেন তাঁর পক্ষে এই আকর্ষণ ত্যাগ করা অত সহজ নয়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি বলছেন, আমি জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে মায়ের মূর্তি কেটে ফেললাম।[৩] আমাদের জ্ঞান-খড়্গ নেই, আর কেটে ফেলাও সম্ভব হয় না। কাজেই শাস্ত্র যে উপায় বলছেন তাকে অনুসরণ করা খুব সহজ নয়। শাস্ত্র সেকথা জানেন, তাই বলছেন, তাতে হতাশ হয়ো না, চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। এই হলো মূল কথা।

---

১. ব্রহ্মসূত্র, অধ্যাসভাষ্য

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, উদ্বোধন, কলকাতা, সংস্করণ ১৩৮৩, পৃঃ ২৯৫ ৩. তদেব—পৃঃ ২৯৫

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥৭॥

অন্বয় ঃ—[সমস্ত পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে আত্মার বর্ণনা করা হচ্ছে] ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে) মনঃ (মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) মনসঃ (মনের থেকে) সত্ত্বম্ উত্তমম্ (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি অপেক্ষা) মহান্ আত্মা (সমষ্টি বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভ) অধি (বড় বা শ্রেষ্ঠ) অব্যক্তম্ (প্রকৃতি বা মায়া) মহতঃ (মহৎ তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষা) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ)।

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ'—ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ। 'পর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্মতর, অন্তরতর, ব্যাপকতর। 'মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্'—মনের থেকে উত্তম বা ভাল হলো সত্ত্ব। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ হলো বুদ্ধি, যা মন থেকে শ্রেষ্ঠ। 'সত্ত্বাদধি মহানাত্মা'—সত্ত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা বা মহৎ তত্ত্ব। 'মহতঃ অব্যক্তম্ উত্তমম্'—মহৎ থেকে উৎকৃষ্ট অব্যক্ত। যার ভিতরে কোন গুণ বা কোন বিশেষ ধর্মের অভিব্যক্তি নেই, তাকে সেইজন্য প্রকাশ করা যায় না। তাই তাকে অব্যক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥৮॥

অন্বয় ঃ—তু (কিন্তু) ব্যাপকঃ (সর্বব্যাপী) অলিঙ্গঃ চ (এবং সর্বধর্মবিবর্জিত) পুরুষঃ এব (পরমাত্মাই) অব্যক্তাৎ (প্রকৃতি থেকে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। যম্ (যাঁকে) জ্ঞাত্বা (জেনে) জন্তুঃ (জীব) মুচ্যতে ([সংসার বন্ধন থেকে] মুক্ত হয়) অমৃতত্বম্ চ গচ্ছতি (এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়)।

আগের মন্ত্রকেই আরো বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মহৎ তত্ত্ব এবং মহৎ তত্ত্ব থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। এখন আবার বলছেন, 'অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ'—অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। 'পুরুষ'-শব্দের দ্বারা এখানে আত্মাকেই বোঝাচ্ছেন। সেই আত্মা 'ব্যাপকঃ'—অর্থাৎ আত্মা সর্বকালে সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি আরো কী রূপ? 'অলিঙ্গ'—অর্থাৎ কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট নন অথবা তাঁর কোন কারণ নেই। 'লিঙ্গ্যতে বর্ণ্যতে ইতি লিঙ্গম্'—যার দ্বারা কোন বস্তুকে বর্ণনা করা যায় তাকে লিঙ্গ বা ধর্ম বলে। আত্মাকে কোন ধর্মের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

যাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা সম্ভব হয় না তাকে বুঝব কেমন করে? কোন মানুষকে যখন বুঝতে চেষ্টা করি তখন বলি সে কালো, বেঁটে, কি ফর্সা, লম্বা, মোটা কি রোগা ইত্যাদি। বর্ণনার অতীত বস্তুকে বোঝাবার একমাত্র উপায় স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, তার থেকে সূক্ষ্মতম, এরকম করে করে গিয়ে যেখানে এর শেষ, বর্ণনা যেখানে থেমে যায়, সেখানেই আত্মা। পূর্বোক্ত বস্তুগুলিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ইত্যাদিকে তাদের বিশেষ বিশেষ ধর্মের দ্বারা পৃথক করা যায়। কিন্তু এসবের পারে যিনি, তাঁকে পৃথক করা যায় না, তাঁর কোন ধর্ম নেই বলে। এজন্য তাঁকে 'অলিঙ্গ' বললেন।

তাহলে সে বস্তু যে আছে তারই বা প্রমাণ কী? আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে ইথার নামক একটি সূক্ষ্ম পদার্থে পৌঁছাল যার কোনরকম বর্ণনা করা যায় না। যাকে বর্ণনা করা যায় না তাকে স্বীকার করবার দরকার কী? কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ইথারের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বহু তথ্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, সূর্য থেকে আলোকশক্তি কিভাবে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করার জন্য ইথার মাধ্যমের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী আবার ইথারের অস্তিত্বের বদলে electro-magnetic field বলে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটি শক্তিক্ষেত্র স্বীকার করেন। আমাদের এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের তাৎপর্য হচ্ছে, আত্মা প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, একথা স্বীকার না করলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তিনি যদি সত্তারূপে, অস্তিরূপে না থাকেন বস্তু অনস্তি হয়ে যায়। প্রকাশরূপে না থাকলে বস্তু অপ্রকাশ হয়ে যায়। প্রকাশ আর অস্তিত্বকে আপাতদৃষ্টিতে বস্তুধর্ম বলে মনে করি। যেমন, একটা ঘট লালও হতে পারে কালোও হতে পারে। রঙের উপর ঘটের অস্তিত্ব নির্ভর করছে না, ঘটের উপর রঙ নির্ভর করছে। ঘট হলো ব্যাপক, রঙ ব্যাপ্য। অস্তিত্ব ব্যাপক বস্তু, ঘটপটাদি তাতে আরোপিত ধর্ম। দার্শনিক দৃষ্টিতে অস্তির উপরে ঘটপটাদি আরোপিত। আরোপিত বস্তুর নাশ হলেও অস্তির নাশ হয় না। সূর্য জগতের বস্তুকে প্রকাশ করছে। বস্তুগুলিকে এক এক করে নষ্ট করে দিলে সূর্যও কি নষ্ট হবে? হবে না। সেইরকম ঘটপটাদি বস্তুগুলিকে এক এক করে নষ্ট করে দিলেও অস্তিত্ব নষ্ট হবার নয়। অস্তিত্ব আর ঘটকে আপাতদৃষ্টিতে আলাদা করে দেখতে পারি না। কিন্তু বিচার করলে বুঝতে পারি যে, ঘটপটাদি আর অস্তিত্ব দুটি এক বস্তু নয়। অস্তিত্ব ব্যাপক, বহু জায়গায় আছে, ঘটপটাদি ব্যাপ্য, অল্প স্থানে আছে। ঘট পটে নেই, পট ঘটে নেই; কিন্তু অস্তিত্ব সর্বত্র রয়েছে। ঘটকে ভেঙে ফেললে অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় এরকম বলা যায় না। ঘট আর অস্তিত্ব এক হলে পট আর অস্তিত্বের ভেদ কী করে হবে? অস্তিত্বগুলিকে একাধিক বলব, না একই বলব? একাধিক অস্তিত্বের জায়গায় একটি অস্তিত্বের কল্পনাতে 'লাঘব' হয়। এই হলো যুক্তির প্রণালী। সুতরাং অস্তিত্ব এক, তাতে ঘটপটাদি অনন্ত বস্তু আরোপিত হচ্ছে। ঘটপটাদি অস্তিত্বের দ্বারা ব্যাপ্য বলে তারা অস্তিরূপে প্রকাশ পায়।

এইভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারব এক আত্মাতে সমস্ত বস্তু আরোপিত, অথবা বলা যায়, আত্মার দ্বারা ব্যাপ্যরূপে সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হচ্ছে। সবই অস্তিত্ববিশিষ্ট বলি, এই কথাটিকে ঘুরিয়ে বলব অস্তিত্বের উপর সবকিছু আরোপিত। আরোপিত বস্তুকে অভিন্ন বলে বোধ হলেও তা অভিন্ন নয়। একটির নাশ হলেও অপরটি থাকে। প্রশ্ন হবে, অস্তিত্বের সব উপাধি চলে গেলে কোথায় থাকবে সে? উত্তর হলো, এরকম প্রশ্নই অসঙ্গত। বিভিন্ন আরোপিত বস্তুগুলি চলে গেলে অস্তিত্ব মাত্র থাকবে। যাকে উপনিষদে 'সন্মাত্র' বলা হয়।

যেমন অস্তিত্ব, প্রকাশও সেইরকম। তাকে 'চিৎ' বলে। যদি সব বস্তু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে 'চিন্মাত্র' বলা হয়। এইভাবে বোঝাচ্ছে একটির পর একটি শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ব্যাপকতর।

এই পুরুষ সর্ব বস্তুর উপর ব্যাপক ও অলিঙ্গ। 'যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ অমৃতত্বং চ গচ্ছতি'—যাঁকে জেনে জীব মুক্ত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। পুরুষকে জানা মানে তাঁকে আত্মরূপে জানা। অন্যদ্রব্যরূপে, আত্মা থেকে ভিন্নরূপে জানা নয়, কারণ 'আমি' যাকে বলছি সেও তাঁতে আরোপিত মাত্র। তাঁকে জানলে মানুষ সর্ব বন্ধনের অতীত হয়ে যায়।

তারপর প্রশ্ন, তাহলে কি সে অনস্তি হয়ে যায়? সে কি আর থাকে না? বলছেন, তা কেন? যিনি অমৃতত্ব লাভ করেন তাঁর আর নাশ হয় না। গুণের ব্যত্যয়ের দ্বারা তাঁর বিনাশ হয় না, ক্রিয়ার নিবৃত্তির দ্বারা বিনাশ হয় না। তিনি তখন সকল গুণ-ক্রিয়ার অতীত। তাঁর কোন নাশক কারণ থাকবে না। তিনি এক, অদ্বিতীয় থাকবেন। অতএব তিনি অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। নতুন কোন ধর্মের উৎপত্তি হলো না, তিনি যা ছিলেন তা-ই রইলেন। কেবল মনে যে বিপরীত ভ্রান্তি ছিল তা দূর হয়ে গেল। অমৃতত্ব কোন নতুন ধর্ম নয়। নতুন ধর্ম হলে তা চিরস্থায়ী হতো না। এই অমৃতত্ব তাঁর নতুন কোন ধর্ম নয়, স্বরূপ। অমৃতত্ব না থাকলে তাঁর অস্তিত্বই থাকে না।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৯॥

অন্বয় ঃ—[এবার অলিঙ্গ পুরুষকে জানার উপায় বলছেন] অস্য রূপম্ (এঁর স্বরূপ) সন্দৃশে (দর্শন তথা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) ন তিষ্ঠতি (থাকে না) [সেইজন্য] কঃ চন (কেউই) এনম্ (এই পুরুষকে) চক্ষুষা (চক্ষু অথবা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই) ন পশ্যতি (জানতে পারে না)। [একমাত্র] হৃদা মনীষা (হৃদয়স্থ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) মনসা (মননের ফলে) [সেই পুরুষ] অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিত বা বিজ্ঞাত হন)। যে (যাঁরা) এতৎ (এই পুরুষকে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁরা) অমৃতাঃ (অমর, মুক্ত) ভবন্তি (হন)।

আগে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে আত্মা ভিন্ন। ইন্দ্রিয়দের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, তিনি ইন্দ্রিয়দের অধিকারের বাইরে। তাহলে ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর আত্মাকে কী করে জানা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—'অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি'—এই আত্মার স্বরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় নয়, কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় নয়। সেই হেতু 'এনম্ কঃ চন চক্ষুষা ন পশ্যতি'—এই আত্মাকে কেউ চক্ষু দ্বারা অনুভব করতে পারে না। কোন ইন্দ্রিয়ই যদি আত্মাকে জানতে না পারে তাহলে তাঁর স্বরূপ কী করে জানা যাবে? এর উত্তরে বলছেন—'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ'—মনের দ্বারা সম্ভাবিত অর্থাৎ মননরূপ বিচারের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। কিন্তু তখনো

আত্মাকে জানা হয় না। এরজন্য বিষয়কল্পনারহিত বুদ্ধির সাহায্য নিতে হবে। সেই কথাই 'হৃদা মনীষা' শব্দদুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে। 'হৃদা' মানে হৃদয়ে অবস্থিত বুদ্ধির দ্বারা। 'মনীট্' মানে মনের অধীশ্বর, মনের নিয়ন্তা। মনীষা অর্থাৎ মনের নিয়ন্তার দ্বারা। মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক। তার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। কিন্তু মনের অধীশ্বর বুদ্ধি যখন নির্বিকল্প হয় তখন সেই বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে জানতে পারা যায়। 'আত্মাকে জানতে পারা যায়'—এই কথাগুলি যুক্ত করে বাক্যটি শেষ করতে হবে। সুতরাং শুদ্ধবুদ্ধি আত্মাকে জানবার উপায়।

শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে জানা গেলে আত্মা তো বুদ্ধির বিষয় হয়ে গেলেন! এই আশঙ্কার উত্তরে বলছেন, না, তা নয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে সেই বুদ্ধি আত্মাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আত্মস্বরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধিকে যখন বিষয়ের দ্বারা মলিন করে রাখি বুদ্ধি তখনই আত্মা থেকে ভিন্ন বস্তু; কিন্তু তার মলিনতা নিঃশেষে দূর হলে সেই বুদ্ধি আত্মাই হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—তাঁকে বোধে বোধ করা যায়।[১] বোধে বোধ করা কী—তা আরো পরিষ্কার করে তিনি বলছেন—'শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা একই জিনিস'।[২] যখন বুদ্ধির এতদূর শুদ্ধি হয়—যে মলিনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—তখন সেই বুদ্ধি আত্মাকে জানে। কী করে জানে? স্বরূপে জানে, বিষয়রূপে জানে না। তাই আত্মার নির্বিষয়ত্ব এর দ্বারা ব্যাহত হয় না। তিনি নির্বিষয়ই থাকেন কিন্তু বুদ্ধি আত্মস্বরূপ হয়ে যায়। 'বোধে বোধ করা' অর্থাৎ সেখানে বুদ্ধি আর আত্মার ভিতরে কোন ব্যবধান থাকে না। ব্যবধান এক বস্তুকে আর এক বস্তু থেকে পৃথক করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধি আর আত্মাকে পৃথক করবার কোন বস্তু থাকে না। বুদ্ধি আত্মাকে জানতে চেষ্টা করলে ক্রমশ তার শুদ্ধি হয়। শুদ্ধি হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সে আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে যায়। কাজেই আত্মাকে জানা মানে আত্মাকে প্রকাশ করা নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ। বুদ্ধির মলিনতার জন্য তাঁর প্রকাশের মাঝে যে ব্যবধান আপাতত সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হওয়ায় আত্মা আর বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রভেদ রইল না, তারা এক হয়ে গেল। একেই আমরা গৌণভাবে বলি আত্মাকে জানা। নির্বিকল্প বুদ্ধি আত্মাকে জানে।

'জানা' শব্দটিকে আমাদের আরো ভাল করে বুঝে নিতে হবে। যখন আমরা কোন বস্তুকে জানি, তখন সেই বস্তুকে বুদ্ধির বিষয় করি। বুদ্ধি একটি করণ, তার সাহায্যে আমি কোন একটি জ্ঞেয় বস্তুকে জানি। তাহলে এখানে তিনটি বস্তু থাকছে—আমি, আমার বুদ্ধি এবং আমার বুদ্ধির বিষয়। আমি আত্মাকে জানতে চাইছি, অতএব বিষয় হলো আত্মা। কে জানতে চাইছে? আমি। সেই আমি হলো একটি অবিচারিত মিশ্র তত্ত্ব, কারণ আমি আমার

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮ ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩৭
২. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪২

স্বরূপকে তখন জানি না, জানবার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার যন্ত্র হলো বুদ্ধি যার সাহায্যে আত্মাকে জানব। এখন বুদ্ধির শুদ্ধি করে যাচ্ছি। বুদ্ধি শুদ্ধি করতে করতে এমন অবস্থা এল যে, বুদ্ধি আর আত্মা এক হয়ে গেল। আর যে-আমি জানছিলাম সেই জ্ঞাতা-আমিও আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলাম। বুদ্ধি যে পরিমাণে শুদ্ধ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে আমারও শুদ্ধি হচ্ছে। আর জ্ঞানের বিষয় যিনি, সেই আত্মাও ক্রমশ শুদ্ধরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। আত্মা ক্রমশ শুদ্ধ হচ্ছেন তা নয়, আত্মার বোধ আমার কাছে ক্রমশ অধিকতর পরিস্ফুট হচ্ছে। বুদ্ধির যখন পরিপূর্ণ শুদ্ধি হলো তখন জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়—এই তিনই এক হলো। সবই সেই শুদ্ধ বোধস্বরূপ হলো। 'জানা'-রূপ প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি এইখানে। এইজন্য বলে যে, এই অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটির অর্থাৎ এই তিনটি বস্তুর লয় হয়। লয় হয় মানে একই তত্ত্বে তাদের পরিণতি হয়। পরিণতি হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে এই—যা ছিল একই ছিল কিন্তু তাকে বিভিন্নরূপে, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় রূপে, আমরা দেখছিলাম, অনুভব করছিলাম। সেই বিভিন্নরূপের যে ভ্রান্ত প্রতীতি, এখন তা দূর হয়ে গেল। এই হলো 'হৃদা মনীষা' আত্মাকে 'জানা'-র অর্থ।

তারপর বলছেন—'যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি'—যাঁরা আত্মাকে এই প্রকারে জানেন তাঁরা অমৃত হয়ে যান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, যা তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ। তাঁদের 'ত্রিপুটি' লয় হওয়ায় আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত থাকেন। অজ্ঞান থেকেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন, সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাঁরা মুক্ত হয়ে যান। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে স্বপ্রকাশ আত্মার অপরোক্ষ অনুভব হয় একথা বলা হলো। কিন্তু বুদ্ধির শুদ্ধি হবে কী করে তার উপায় তো বলে দিতে হবে। উপায় বলে না দিলে শুদ্ধবুদ্ধি আর শুদ্ধ-আত্মা এক—একথা বললেও ধারণা হবে না। শুদ্ধবুদ্ধি না থাকায় শুদ্ধ-আত্মার অনুভূতিও হবে না। তাই সেই উপায়ের কথা পরের মন্ত্রে বলছেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১০॥

অন্বয় ঃ—[হৃদয়স্থ মনীষা কী উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় তা বলছেন] যদা (যখন) পঞ্চ (পাঁচটি) জ্ঞানানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনসা সহ (মনের সঙ্গে) [নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হয়ে ব্যাপারশূন্যরূপে] অবতিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে) বুদ্ধিঃ চ (বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতি (কোন বিষয়ে ব্যাপৃত হয় না) তাম্ (সেই অবস্থাকে) [যোগিগণ] পরমাম্ গতিম্ (জ্ঞানের পরম সাধন) আহুঃ (বলেন)।

'যদা মনসা সহ পঞ্চ জ্ঞানানি অবতিষ্ঠন্তে'—যখন মনের সঙ্গে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় অবস্থান করে। অবস্থান করে মানে তাদের নিজ নিজ ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয়ানুভবে ব্যাপৃত না থাকে, মনও বিষয়ানুভবে

চঞ্চল না থাকে, 'বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি'—এবং বুদ্ধিও যখন নিজ কার্যে ব্যাপৃত হয় না। মন আর বুদ্ধিকে এখানে পৃথক করা হলো ব্যবহারিক দৃষ্টিতে। কারণ অন্তঃকরণেরই কোন-একটি রূপ হলো মন—আর কোন-একটি রূপ হলো বুদ্ধি। যখন এই মন-বুদ্ধি স্থির হয়ে যায় তাকে বলে পরমা গতি—'তাং পরমাং গতিমাহুঃ'—বিষয় থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের সেই আত্মাভিমুখী অবস্থাকে তত্ত্বদর্শিগণ আত্মদর্শনের উৎকৃষ্ট সাধন বলে থাকেন।

মনের নিয়ামক যে বিকল্পরহিত বুদ্ধি, তা কিভাবে লাভ করা যায়, তার উপায়স্বরূপ যোগ বলছেন পরের মন্ত্রে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ।।১১।।

অন্বয় ঃ—স্থিরাম্ (নিশ্চল ভাবে) [বিষয়সমূহ থেকে প্রত্যাহার করে আত্মবস্তুতে] তাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্ (সেই ইন্দ্রিয়গণের ধারণাকে) যোগম্ ইতি (যোগ বলে) মন্যন্তে (মনে করা হয়)। তদাঃ (যোগে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়) [যোগাভিলাষী ব্যক্তি] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদ রহিত) ভবতি (হবেন)। হি (কারণ) যোগঃ (যোগ) প্রভব অপ্যয়ৌ (উৎপত্তি-বিনাশধর্মবিশিষ্ট অথবা সিদ্ধি ও বিনাশ উভয়ের হেতু)।

'তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্ যোগমিতি মন্যন্তে'—পূর্বোক্ত সেই বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়সমূহের লয়-বিক্ষেপহীন সর্বদা অকম্পিত যে অবস্থা, তাকেই যোগিগণ যোগ বলে থাকেন। 'তদা অপ্রমত্তো ভবতি'—সেই যোগারম্ভের সময়ে চিত্ত যাতে আত্মাতে সমাহিত থাকে সে-বিষয়ে অতিশয় যত্নবান হওয়া উচিত। 'হি যোগঃ প্রভব-অপ্যয়ৌ'—যেহেতু যোগ উৎপত্তি বিনাশধর্মবিশিষ্ট, সেইজন্য অপ্রমাদে যোগে সিদ্ধিলাভ হয় এবং প্রমাদে যোগ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

পতঞ্জলি যোগের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গেও এর মিল পাই। যোগদর্শনে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'[১]—চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ চঞ্চলতার নিরোধকেই যোগের লক্ষণ বলা হয়েছে। এখানেও আর এক ভাবে সেই কথাই বলা হলো যে, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির স্থির, অচঞ্চল অবস্থাকেই যোগ বলা হয়। যোগ হয় কী করে? না, প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে বিরত করা হলো, তারপর মনে যে নানা বৃত্তি উঠছে, সেগুলিকে বন্ধ করা হলো এবং বুদ্ধিকে সেইভাবে স্তিমিত, স্তব্ধ করে রাখা হলো। একেই 'পরমা গতি' বলেছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, বৃত্তি স্থগিত রাখার অর্থ লৌকিক উপায়ে স্থগিত করে রাখা নয়। মনকে কোন দ্রব্যগুণের দ্বারা নিশ্চল করে দেওয়া যেতে পারে, অথবা মানুষ মূর্ছাগ্রস্ত হলেও তো তার মন স্থির হয়ে যেতে পারে। তার উত্তর হচ্ছে, সেখানেও মনের সম্পূর্ণ নিশ্চলরূপে স্থিতি হয় না। তখন

---

১. পাতঞ্জলযোগসূত্র—১/২

মনের গতি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে, তাকে আমরা হয়তো স্মৃতিতে আনতে পারি না। মনের গতি শ্লথ, স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু মন একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। নিষ্ক্রিয় করাই হলো যোগের প্রক্রিয়া। যোগের দ্বারা সমস্ত মন ইন্দ্রিয়াদিকে স্তব্ধ করা যায়, বন্ধ করে দেওয়া যায়। লৌকিক উপায়ে চেষ্টা করে অনেক সময় যে স্নায়ু ও পেশীগুলিকে আমরা ইচ্ছাপূর্বক চালিত করতে পারি না, অভ্যাসের দ্বারা সেগুলির উপর প্রভুত্ব আসতে পারে। অভ্যাসের দ্বারা আমরা তাদের গতি স্তিমিত করতে পারি। আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছাড়াই এগুলি করা সম্ভব। অভ্যাসের দ্বারা এতদূর হয় যে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া যায়। সাধারণত মানুষ এগুলি পারে না কিন্তু অভ্যাস করলে পারে। যেমন স্থূলশরীরকে, তেমনই আরো সূক্ষ্ম যন্ত্র মনকেও স্তিমিত করা যায়। এটি পরীক্ষিত সত্য। আংশিক ভাবেও মনকে কোন জায়গা থেকে নিবৃত্ত করা চলে। যেমন—স্বামী তুরীয়ানন্দ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। তাঁর কার্বাঙ্কল অপারেশন করতে হবে। তিনি বললেন—অপারেশন করতে অজ্ঞান করবার দরকার হবে না, একটু আগে আমাকে বলো, তারপর অপারেশন করবে। ডাক্তার ভাবলেন, যে মুহূর্তে তিনি সহ্য করতে পারবেন না তখনই অ্যানেসথেসিয়া দেব। অপারেশন হলো। তিনি কোন যন্ত্রণাসূচক শব্দ করলেন না। ডাক্তার বিস্মিত! এত বড় একটা অপারেশনে তিনি একবারো আঃ উঃ করলেন না! এর দ্বারা বোঝা যায় তাঁর ধৈর্য খুব বেশি। পরে একদিন সেই ক্ষত ড্রেস করতে এসে দরকার বলে সামান্য একটু ছুরি চালিয়েছেন, তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলেন। ডাক্তার অবাক! সেদিন এত বড় অপারেশনে কিছু বললেন না আর আজ এইটুকুতেই চেঁচিয়ে উঠলেন! মহারাজ বললেন—আজকে তো তুমি আমাকে আগে বলনি। তাহলে আমি ও জায়গা থেকে মন তুলে নিতাম। সেদিন আগে বলেছিলে তাই আগেই মন তুলে নিয়েছিলাম।[১]

মনকে ইচ্ছামতো তুলে নেওয়া যায়। মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব মনে হলেও মনের উপর যাঁদের অসাধারণ প্রভুত্ব আছে তাঁদের পক্ষে এটা অসম্ভব নয়। শরীরের উপরে প্রভুত্বের চেয়ে মনের উপর প্রভুত্ব করা আরো কঠিন কারণ মন আরো সূক্ষ্ম, আরো চঞ্চল। সেই মনের উপর প্রভুত্ব এতদূর হতে পারে, যে-কোন দিক থেকে একে সরিয়ে নিয়ে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা চলে। তুরীয়ানন্দ স্বামী মনকে আংশিক ভাবে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আবার মনের গতিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেও দেওয়া চলে। যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করে দেওয়া হয় তাকে বলে 'যোগ'।

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ষষ্ঠ সংস্করণ (১৩৯০), পৃঃ ৪৯৭-৯৮

এই যোগের অবস্থাতেও অপ্রমত্ত থাকতে হয়, সজাগ থাকতে হয় পাছে হঠাৎ কখনো মনের উপর প্রভুত্ব চলে যায়। 'অপ্রমত্তস্তদা ভবতি'। উৎপত্তি বিনাশধর্মবিশিষ্ট যোগের যাতে হানি না হয় সেজন্য যোগীকে প্রথম থেকেই যত্নবান হতে হয়। যোগী মনকে স্থির করেও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না। তাঁকে সদা সতর্ক থাকতে হবে আবার যেন মন নেমে না যায়, নাগালের বাইরে চলে না যায়। তাকে লাগাম দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, কখন লাগাম ছিঁড়ে আবার বিষয়চিন্তা করতে আরম্ভ করে দেবে। এজন্য সাবধান হতে বলেছেন। মনকে হাতের মুঠোয় রেখে যথেচ্ছ ব্যবহার করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন, যখন ভগবৎচিন্তা করতে বসবে তখন মনের দরজায় লিখে দেবে No admission[১] এখানে অন্য কিছুর আর প্রবেশাধিকার নেই। আমরা ভাবি লিখে দিলেই মন শুনবে? মনের উপর যাঁদের তেমন প্রভুত্ব আছে তাঁরাই পারেন। যোগের আরম্ভের সময়ে, যখন সিদ্ধ অবস্থা লাভ হয়নি তখন সাবধান থাকতে বলছেন। পরে বুদ্ধি প্রভৃতির চেষ্টা একেবারে শান্ত হয়ে গেলে আর কোন সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। 'অপ্রমত্তঃ' মানে সম্যকরূপে স্থির রাখার চেষ্টায় সর্বদা অবহিত থাকা। বুদ্ধি প্রভৃতি যখন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় তখন তাদের চেষ্টার অভাবে আর প্রমাদ হয় না। তার পূর্ব পর্যন্ত প্রমাদের আশঙ্কা থাকে। এইজন্য সাবধান থাকতে বলেছেন। 'অপ্রমত্তস্তদা ভবতি' কথাটির আর একটি অর্থও করা হয়েছে। যখন ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মাতে স্থির ধারণা হয় তখনই নিরঙ্কুশ প্রতিবন্ধরহিত অপ্রমত্ততা এসে যায়। অপ্রমত্ততা যোগীর স্বরূপ হয়ে যায়। 'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ'—যোগের উৎপত্তি ও নাশ আছে। এই হলো যোগের স্বরূপ। অতএব যাতে তার নাশ হয়ে না যায় অর্থাৎ তার স্বরূপ থেকে চ্যুত না হয়ে যায় সেজন্য অপ্রমাদ করা উচিত এই কথা বলছেন। যিনি 'আরুরুক্ষুঃ' অর্থাৎ যোগের পথে আরোহণ করছেন তার জন্য এই বিধান।

এর থেকে আর একটি প্রশ্ন উঠছে। এটি সাধন-বিষয়ে খুব জটিল প্রশ্ন এবং যোগীর সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে। বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয় তাহলে তাদের যখন নিবৃত্তি হয়ে যায় তখন আর তবে ব্রহ্মের অনুভূতি থাকবে না। বুদ্ধি নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলে তাঁকে উপলব্ধি করার যন্ত্র আর রইল না। ব্রহ্ম তখন অনস্তি হয়ে যায়। কারণ, যা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণযোগ্য—তাকে বলি আছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়—তাকে বলি নেই। সুতরাং যোগ করে কী লাভ হবে? ইন্দ্রিয়াদি বিরত হয়ে গেলে জ্ঞানও আর হবে না, যোগ কোন কাজেই লাগবে না। সুতরাং বুঝব 'ব্রহ্ম নাস্তি' কারণ সেখানে ব্রহ্মের উপলব্ধি হচ্ছে না। এখানে আর একটি প্রশ্ন মনে জাগবে। আগে বলেছি যোগ আর জ্ঞানের মধ্যে একটা মূলীভূত পার্থক্য রয়েছে। হয়তো ভাষার বা প্রকাশের ভঙ্গি অনুসারে সে পার্থক্য এসে যাচ্ছে। যোগশাস্ত্র বললেন, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। এর পরে আর কিছু করবার নেই। এর নামই সমাধি। জ্ঞানী

১. জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৯৫), পৃঃ৭০।

বলবেন, এ সমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্থান কোথায়? এই বৃত্তির নিরোধ হলে কোন জ্ঞানই থাকবে না। ব্রহ্মজ্ঞান তখন কোথায়? এইরকম একটা আশঙ্কা মনে আসে। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে বলে—মনকে বৃত্তিশূন্য করলে হবে না, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি করতে হবে[১]। যোগশাস্ত্রের সঙ্গে বেদান্তশাস্ত্রের এইখানে বিরোধ। মনকে চঞ্চলতা থেকে মুক্ত করতে হবে ঠিকই কিন্তু তাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করলে হবে না, একাগ্র করতে হবে। যোগের সঙ্গে এই তফাত।

মনের বৃত্তিশূন্য অবস্থা সুষুপ্তির অবস্থার মতো। সুষুপ্তি স্বাভাবিক রূপে হয়, নয়তো কোন অভ্যাসের পরিণামে হয়। কিন্তু ফল তো সেই এক, অজ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান আনতে হলে বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি করতে হলে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি থাকতে হবে। যোগ এ বিষয়ে সাহায্য করবে কারণ যোগের দ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর হবে। কিন্তু চঞ্চলতা দূর হওয়া আর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হওয়া, দুটি এককথা নয়। মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হলে অজ্ঞানের অবস্থা হয়। তাতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে না বা ব্রহ্মজ্ঞানও হবে না। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হবে কিন্তু তারপর ব্রহ্মকে প্রকাশ করবার জন্য আর প্রকাশান্তরের প্রয়োজন হবে না। ঘটের ক্ষেত্রে যেমন চিদাভাসের দ্বারা ঘটের প্রকাশ হচ্ছিল এখানে তার দরকার হবে না। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশিত থাকবেন। এইকথা ওখানে বলা হয়েছে, তফাত এইটুকু। কিন্তু ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অবশ্য কর্তব্য।

এর আগে (পৃঃ ২৫৪) বলা হয়েছে, আত্মা ইন্দ্রিয়সমূহের গোচর নন। তাঁকে 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ' (২/৩/৯)—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রভাবশালী, সকলকে চালায় যে মন, আত্মা যদি তার দ্বারা চিন্তিত ও ধ্যাত হন তাহলে তাঁকে জানা যায়।

এখন আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হলে তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। সন্দেহ নয় বরং বলা যায় এই নিশ্চয় হয় যে, আত্মা নেই। উপলব্ধির কারণ হলো ইন্দ্রিয়। তার দ্বারা যাকে উপলব্ধি করতে পারি তারই অস্তিত্ব স্বীকার করি। আর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি না তাকে বলি 'নেই'। মীমাংসকগণ 'অনুপলব্ধি'কে অন্যতম প্রমাণ স্বীকার করেন। 'নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ'—ঘটের উপলব্ধি হচ্ছে না অতএব ঘট নেই। ঘট থাকলে ঠিকই উপলব্ধি হতো—'যদি স্যাদুপলভ্যেত'। অন্য দেশের দার্শনিকেরাও একথা স্বীকার করেন যে, যা উপলব্ধ হয় না তাকে 'আছে' বলবার কোন যুক্তি নেই। Esse est percipi[২] (perceived therefore exists)—একটি বস্তু আছে

১. পঞ্চদশী—৭/৯০, ৯২

২. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আলোচ্য উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য ঃ '.... They exist .... whereby they are perceived-for the existence of an idea consists in being perceived.' A treatise concerning the Principles of Human knowledge—George Berkeley, Edn. 1903, P.30, para—2.

কারণ তাকে উপলব্ধি করছি। Positivist বা প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন—আত্মা যদি থাকে তবে তাঁর উপলব্ধি হবে। সুতরাং আত্মা নেই এই সিদ্ধান্তই এসে দাঁড়ায়। বেদান্তী বলছেন যে, ব্রহ্মোপলব্ধির বেলায় অন্যভাবে বুঝতে হবে। ব্রহ্ম যদি মানসক্রিয়ার বিষয়ও হন তাহলেও তাঁকে আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হলে অন্তঃকরণের করণতা থাকে না। যে মন দিয়ে ব্রহ্মকে অনুভব করতে যাচ্ছি সেই মনই ব্রহ্ম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মন ব্রহ্মজ্ঞানের করণ হবে কী করে? অতএব পরের মন্ত্রে বলছেন—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥১২॥

অন্বয় ঃ—[দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব একমাত্র গুরুর উপদেশগম্য এই কথা প্রতিপাদনের জন্য এই মন্ত্র] বাচা ন (বাক্যের দ্বারা নয়) মনসা ন (মনের দ্বারা নয়) চক্ষুষা এব (চক্ষু প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) ন প্রাপ্তুম্ শক্যঃ (এই আত্মাকে জানা যায় না)। অস্তি ইতি (আত্মা আছেন এইরূপ) ব্রুবতঃ (যিনি বলেন সেই অস্তিত্ববাদী আচার্য অপেক্ষা) অন্যত্র (অন্য কোন নাস্তিক ব্যক্তির কাছে) কথম্ (কিরূপে) তৎ (তাঁকে) উপলভ্যতে (জানা যাবে)?

'নৈব বাচা ন মনসা ন চক্ষুষা প্রাপ্তুং শক্যঃ'—আত্মা বাক্যের দ্বারা অবগম্য নন, মন বা চক্ষুর দ্বারাও লভ্য নন। চক্ষু অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নন এমনকি মনের দ্বারাও নন। মন যাকে জানে তাকে বিষয় করে। আত্মা বিষয় নন তাই মন আত্মাকে জানতে পারে না। অতএব তিনি মনের দ্বারা লভ্য হতে পারেন না। অন্যান্য ইন্দ্রিয় যে জানতে পারেই না এ আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং শ্রুতিও একথা বলেছেন। 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ'—পরমাত্মা আছেন এইরকম যাঁরা জানেন সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বীকৃতি ছাড়া 'অন্যত্র কথং তদ্ উপলভ্যতে'—অন্য, নাস্তিকগণের কাছে আত্মার বিষয় কী করে জানা যাবে?

এখানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুভবকে ধরে রেখেছে যে বেদান্তবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রামাণ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হচ্ছে। শাস্ত্র অনুসারে প্রমাণ চার রকম। প্রত্যক্ষ, উপমান বা সাদৃশ্য, অনুমান এবং শাব্দ। ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না বলায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না বোঝা গেল। ব্রহ্মের সদৃশ কোন বস্তু না থাকায় উপমান বা সাদৃশ্য প্রমাণ এখানে অচল। যদি বলা যায় অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, সে প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

যাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে তাঁকে ব্রহ্ম বলি। জগৎ পরিণামী অর্থাৎ কার্য সুতরাং তার উৎপত্তির পিছনে একটা সৎ কারণ মানতে হয়।

জগতের উৎপত্তি যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে অবশ্যই মানতে হবে একসময় জগৎটা ছিল না। শূন্য থেকে জগৎটা কেমন করে এল? *Ex nihilo nihil fit* — out of nothing comes nothing—'কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত'[১] ব্রহ্মকে সেই কারণ বলা হোক। উপনিষদ্ও বলছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।.... তদ্ব্রহ্মেতি।'[২]—যেখান থেকে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যেখানে অবস্থান করে এবং যেখানে লয় হয় তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়। অনুমানগম্য ব্রহ্মকে শব্দ-প্রমাণ দ্বারা এভাবে সমর্থন করা চলে। জগদ্-ব্রহ্মের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ মানলে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ তাহলে ব্রহ্মের কারণ কে? অনুভূত সকল বস্তুর মধ্যেই কার্য-কারণ পরম্পরা রয়েছে। যে বস্তু একটি কার্যের কারণ সে-ই আবার কি নিজের কারণের কার্য? কাজেই ব্রহ্ম যিনি জগতের কারণ তিনি কার কার্য? এর উত্তর হলো—ব্রহ্ম নিজেই জগতের কারণ, ব্রহ্মের কোন কারণ নেই। তিনি স্বয়ম্ভু। কারণ পরম্পরা খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত এক জায়গায় থামতেই হবে। না হলে অনবস্থা দোষ হয়। ব্রহ্মই সেই চরম কারণ। যদি বলা যায়, ব্রহ্মে গিয়ে কারণের শেষ মানব কেন? ব্রহ্মের কারণে গিয়ে শেষ হোক। তার উত্তর এই—ব্রহ্মের ভিতর কোন বৈচিত্র্য নেই। তাঁর কারণ মানলে, কার্য হিসাবে সেই কারণ থেকে ব্রহ্মের কিছু পার্থক্য থাকবে। কার্য-কারণ সম্পূর্ণ এক হয়ে যায় না। তাহলে 'তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ'[৩] বলে একটি সূত্রে কার্যকে কারণ থেকে অভিন্ন বলে বলা হয়েছে কেন? এর উত্তর হলো, উপাদানের দিক দিয়ে কারণ আর কার্য অভিন্ন একথা বলা হয়েছে, নাম ও রূপের দিক দিয়ে নয়। যেমন, মাটি দিয়ে ঘট, খেলনা, নানারকম তৈরি হতে পারে। সেগুলি মৃত্তিকা থেকে ভিন্ন—একথা বলা যাবে না কারণ মৃন্ময়রূপেই তারা গৃহীত হয়। আবার মাটির ঘট ও মাটির খেলনার মধ্যে তফাত-ও আছে। উপাদানের দিক দিয়ে দেখলে দুটোই মাটির। যদিও কোনটাকে ঘট কোনটাকে খেলনা বলছি তবুও এগুলি মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্তিকারূপ অধিষ্ঠানে নাম ও রূপ আরোপ করে পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। আরোপ্য বস্তুর প্রকৃত সত্তা নেই, অধিষ্ঠানের সত্তাই তার সত্তা। আরোপ্য বস্তুকে তাই মিথ্যা বলা হয়। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজতের উদাহরণ দিয়ে আরোপ্য ও অধিষ্ঠানের সম্পর্ক বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই ব্রহ্ম যেহেতু সৎ, তিনিই অধিষ্ঠান হবেন। নাম-রূপাত্মক সকল বস্তুই তাঁতে আরোপিত হয়েছে। ব্রহ্মকে আরোপিত বলা বা কার্য বলার মানে তদতিরিক্ত একটি অধিষ্ঠানের কল্পনা করা। ব্রহ্ম 'সৎ' বলে তিনি আরোপ্য হতে পারেন না। সৎ-কেই আমরা অন্য ভাষায় অস্তি বলছি। 'অস্তি ইতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে'—'অস্তি' এইরূপে বলা ছাড়া আর অন্য কিরূপে সেই আত্মাকে জানা যাবে? অর্থাৎ

১. ছান্দোগ্য—৬/২/২

২. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—৩/১ ; ৩. ব্রহ্মসূত্র—২/১/১৪

সমস্ত প্রতীতির সদ্‌-রূপ যে অধিষ্ঠান, এইরূপেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলেও অনুপলব্ধির দ্বারা সত্তার লোপ হয় না। একটি বস্তুর সমস্ত গুণগুলিকে বাদ দিলাম, চোখ দিয়ে দেখলাম না অর্থাৎ রূপ বাদ দিলাম। কান দিয়ে শুনলাম না অর্থাৎ শব্দ বাদ দিলাম। বাদ দিতে দিতে কি শূন্য হবে? শূন্য হয় না, একটা অধিষ্ঠান থাকবে। নিষেধ করলেই নিষেধের পিছনে একটা সৎ বস্তু থেকে যায়। এটা ঘট নয় বলার মানে এটা আর কিছু। নয়, নয়, বলে গেলাম, প্রত্যেকটা 'নয়'-এর সঙ্গে অপেক্ষিত হয়ে রয়েছে এমন একটি বস্তু যার সম্বন্ধে 'নয়' বাক্যটি প্রযুক্ত হচ্ছে। সেই বস্তুটিকে লোপ করা যায় না। সেটিই হচ্ছে সৎ, অস্তি। অন্য কিছু, অন্য কিছু করতে করতে যখন সব বস্তুর নিষেধ হয়ে যায় তখনো যাঁর সম্বন্ধে নিষেধ তিনি নিষিদ্ধ হয়ে যান না। এর ভিতরে রহস্য এইটুকু। অতএব ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হয়েও ব্রহ্মের অস্তিত্বের হানি হচ্ছে না, যুক্তি তাঁর অস্তিত্বকে ব্যাহত করতে পারে না। অতএব সেই পরম 'অস্তি'-ই ব্রহ্ম। তাঁকে চরম কারণ না বলে তাঁর কারণ খুঁজতে যাবার কোন অর্থ হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রহ্ম যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হন, ইন্দ্রিয়গোচরও না হন তাহলে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করব কী উপায়ে? এর উত্তর হলো, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণা হবে শাস্ত্র থেকে ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুভব থেকে। শাস্ত্র তাঁকে অস্তি বলেছেন। যাঁরা অস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল, তাঁরা তাই বলছেন। তার বিপরীতক্রমে যাঁরা নাস্তিক তাঁরা বলেন এই জগতের কোন মূল নেই, এর পরিণতি শূন্যে বা অভাবে। এইরকম বিপরীতদর্শীরা ব্রহ্মকে কিরূপে উপলব্ধি করবে? ভাব হচ্ছে, তর্ক কতকটা দিগ্‌দর্শন করাতে পারে, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারে না। তাহলে কে প্রতিষ্ঠা করবে? প্রতিষ্ঠা করবে শাস্ত্র। একথা বলা হলো কেন? না, 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্'—অজ্ঞাত বস্তুকে জানিয়ে দেওয়া শাস্ত্রের কাজ। ব্রহ্ম যদি অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হতেন তাহলে আর শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকত না। যদি বলা যায়, তাহলে শাস্ত্রগ্রন্থে জগদ্‌রূপ কার্যের কারণ নির্ণয়ে এত বাদ-প্রতিবাদ কেন? আমরা তো দেখছি দেশে বিদেশে সর্বত্রই যুক্তিসাহায্যে জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাকল্পে দার্শনিকদের মধ্যে বহু বাদ-বিসংবাদ হয়েছে। সর্বত্রই আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্নরা জগতের কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। এই দৃষ্টিতে করেছেন যে, এই জগদ্‌রূপ কার্যের পিছনে একজন কর্তা থাকা চাই। সুতরাং ঈশ্বরই কর্তা। সেই ঈশ্বরকর্তার অনেকগুলি গুণ দেখাতে গিয়ে প্রায়ই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর সমস্ত জগতের কর্তা হলে জগতের সব দুঃখকষ্ট অবিচারের কর্তাও তিনি হয়ে যান। এই দোষ ক্ষালন করবার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদান্তের কাছাকাছি গিয়ে কেউ কেউ অবশ্য বলেন—যেমন স্পিনোজা বলেছেন—ব্যষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে যা দোষ, সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে সে দোষ আসে না। যেমন, আমার

পকেট থেকে একশ টাকা চুরি গেল, আমার এতে ক্ষতি হলো কিন্তু সেই টাকাটা যার পকেটে গেল তার লাভ হলো। সামগ্রিক দৃষ্টিতে টাকাটা কারো না কারো কাছে রইল। কাজেই ব্যষ্টি আর সমষ্টি দুটি দৃষ্টি ভিন্ন। সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে ঈশ্বরের ঐ দোষগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইরকম যুক্তি দিয়ে বলে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে দোষমুক্ত রাখা যায় না। আমাদের দেশেও আস্তিক দর্শন, যেমন ন্যায়দর্শন, তাতেও জগৎকারণরূপে, জগৎকর্তারূপে ঈশ্বরকে মানা হয়েছে। জগতে বৈষম্য দেখা যায় অতএব জগৎকর্তারূপে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ হলো। কাকেও তিনি বড় করেছেন কাকেও ছোট করেছেন, এ কিরকম বিচার? তাহলে তিনি ন্যায়পরায়ণ হলেন না। যদি বলা যায় যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ কিন্তু জীবের কর্ম অনুসারে ভালমন্দ ফল হচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন হবে, কর্ম সৃষ্টি করল কে? ঈশ্বর না আর কেউ? যদি বলা হয় ঈশ্বর তোমাকে কর্মে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাহলে ঈশ্বর হয়ে গেলেন ঐ জগদ্‌রূপ যন্ত্রের কর্তা। যন্ত্র তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছেন, সে যন্ত্র নিজের মতো চলছে এরকম বলা হলে ঈশ্বর জগতের বাইরে রয়ে গেলেন। তাহলে বলতে হবে, জগতের বাইরেকার বস্তুরও সত্তা আছে। এরকম নানা দোষ দেখানো যেতে পারে। আবার জগতের বৈষম্য ব্যাখ্যা করার জন্য এবং ঈশ্বরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য শয়তানের কল্পনা করা হয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরকম সব কাণ্ড করছে। সে শয়তান আমাদের ভিতরের শয়তানই হোক আর একজন মহাশক্তিশালী fallen angel-ই হোক। এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করলে কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব খর্ব হয়ে যায়।

জাগতিক ব্যাপারে আমরা অনেক সময় দেখি শেষপর্যন্ত ন্যায়ের জয় হয়। কাজেই আমরা বলি, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। সৃষ্টিচক্রের মধ্যে একটা কোথাও শৃঙ্খলা অনুভব করি, সেই কারণেই মনে করি ঈশ্বরের ভিতরেও শৃঙ্খলা আছে, তিনি chaotic নন। জগতে বুদ্ধির ক্রিয়া দেখছি সুতরাং মনে করি ঈশ্বর বুদ্ধিসম্পন্ন। অচেতন বস্তু নন। এইরকম নানা কল্পনা আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে করি। সব কল্পনাই আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এই কল্পনা দ্বারা ঠিক ঠিক ভাবে জগৎকারণের অনুভব করতে পারি—একথা কেউ সাহস করে বলতে পারে না। বেদান্ত যে জগৎকল্পনার মূল কারণ হিসাবে সদ্‌বস্তু স্বীকার করছে তা যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয়। কারণ সৎ কারণ না থাকলে এই জগৎ—যাকে লৌকিক দৃষ্টিতে সৎ বলেই অনুভব করছি—তা অ-সৎ থেকে কী করে আসবে? সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো, এটা সৎ থেকেই এসেছে। তিনি যাতে পরিণামী না হয়ে পড়েন সেইজন্য গুণগুলিকে বাদ দিতে দিতে তাঁকে একেবারে নির্গুণ করে ফেলেছি। দ্বৈতবাদীর মতে নির্গুণ অর্থ গুণহীন। এটা হীনতা, ন্যূনতা। তাঁর মধ্যে অনন্ত গুণ কল্পনা করা যায় কিন্তু নির্গুণ বললে হীনতাদোষ হয়।

তা যদি হয়, অবগুণগুলি কী হবে? তখন সমস্যা হলো। অবগুণ তাঁতে নেই। 'নিরস্তনিখিলদোষঃ অনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ'[১]—বলে ঈশ্বরের কল্পনা। হেয় গুণগুলির কী হবে? কাজেই বেদান্তী বলেন, ওরকম অর্ধেক-অর্ধেক—'তদর্ধং মদর্ধং'—চলবে না। আমরা একেবারে নিঃশেষে বলে দেব কোনটাই তাঁতে নেই। সুগুণও নেই, দুর্গুণও নেই। একটাকে রাখলেই আর একটা এসে যাবে। তাঁতে যদি গুণ নেই তো কোথায় আছে? কোথাও নিশ্চয়ই আছে নইলে দেখা যাচ্ছে কেন? সদ্‌বস্তু ব্রহ্মে তা আরোপিত বলে দেখা যাচ্ছে। মিথ্যা বস্তুর জ্ঞান হতে হলে কোন সদ্‌বস্তুর আশ্রিত **হয়েই** জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম সেই সদ্‌বস্তু। উপলব্ধ জগৎ তাঁর উপর কল্পিত, আরোপিত। সুতরাং জগতের বৈচিত্র্য সৎ-কে পরিবর্তিত করছে না। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে বলা হয় জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, অব্যক্তের পরিণাম। 'অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ'[২]—যেখানে তত্ত্বের পরিবর্তন হয় না অথচ তাতে বিভিন্ন প্রকারতার উপলব্ধি হয় তাকে বলে বিবর্ত। অব্যক্ত জগদ্‌রূপে যখন পরিণত হন তখন তাঁকে বিকার বলা হয়।

এইভাবে আমরা জগৎকারণরূপে ব্রহ্মকে বুঝতে পারছি, আর এও বুঝতে পারছি যে জগতের কারণ হয়েও ব্রহ্ম কিভাবে অপরিণামী থাকতে পারেন। এই অপরিণামী অধিষ্ঠানটি থাকার জন্যই তাঁতে আরোপিত জগদ্‌বৈচিত্র্য সত্তাবান প্রতীত হচ্ছে। জগতের সর্বত্র যা আমরা অস্তি বলে বোধ করছি সেই অস্তি-সত্তা হলো ব্রহ্মসত্তা। আমরা বলি 'ঘটোঽস্তি' অর্থাৎ ঘটের সত্তা। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সত্তার ঘট। সত্তাই আসল, ঘট একটা প্রকার, সেটা মিথ্যা। আমরা বলি, সত্তা হচ্ছে ঘটের গুণ, বলা উচিত ঘট হচ্ছে সত্তার গুণ। সত্তা নিত্য অপরিবর্তনশীল, গুণগুলি আগমাপায়ী—আসে যায়। এইখানে আমাদের ভ্রম যে, আসল যেটি, নিত্য যেটি, সেই ব্রহ্মকে ছেড়ে দিয়ে, ভুলে গিয়ে আরোপিত অনিত্য জগৎকে সত্য বলে দেখছি। আমরা যে ভুল করছি তা কিন্তু অনুমানের দ্বারা বুঝিনি, বুঝেছি শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা। 'সন্মূলাঃ.... সর্বাঃ প্রজাঃ'[৩]—সমস্ত প্রজা হচ্ছে সন্মূল অর্থাৎ তাদের মূল বা অধিষ্ঠান সৎ। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পেয়ে আমরা যুক্তি খাটিয়ে বুঝতে পারি যে, এইরকম বললে ঠিক হয়। অনুমানের দ্বারা আমরা সর্বত্র ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করতে পারি না কারণ সৎ-এর জ্ঞান আমাদের নেই। পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করতে পারি কারণ ধূম, বহ্নি এবং উভয়ের সাহচর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে।

ন্যায়শাস্ত্রে যে জগৎকারণরূপে ঈশ্বরকে মানা হয় তাতে বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর জগতের কর্তা হয়ে যান। কর্তা বললেই তিনি বিকারী ও পরিণামী হয়ে পড়েন।

---

১. ব্রহ্মসূত্র, শ্রীভাষ্য ১/১/১

২. বেদান্তসার ঃ—১০৯, সম্পাদক ঃ ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, সংস্করণ ১৯৬৮, পৃঃ১৬২

৩. ছান্দোগ্য—৬/৮/৪

কার্য-কারণ শৃঙ্খলা থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া যায় না। সেই কারণে বেদান্তী ন্যায়-মত মানতে পারেন না। সমস্যা হচ্ছে এই যে, ন্যায়ের সিদ্ধান্তে দোষ দেখিয়ে বেদান্তী খণ্ডন করলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের দ্বৈতবাদীরা অজস্র দোষ বার করেছেন। এইরকম পরস্পরের দোষ-উদ্ঘাটনের ফলে দার্শনিক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। 'ন্যায়ামৃত'তে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ করা হলো। তাকে খণ্ডন করে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচিত হলো। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-র অদ্বৈত সিদ্ধান্ততে দোষ দেখিয়ে 'অদ্বৈতশতদূষণী' বের হলো। 'শতদূষণীর' উপর গ্রন্থ বের হলো 'শতদূষণীসম্মার্জনী'—সেখানে ঝাঁটা দিয়ে একশ দোষ দূর করা হচ্ছে। সব দোষ আর দূর হলো না। বুদ্ধির কসরৎ চলছে কিন্তু অসন্দিগ্ধরূপে চরম সিদ্ধান্ত আর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'[১]—এই কথাটি বিস্তার করে আলোচনা করেছেন শঙ্করের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিমান তার্কিক, যিনি প্রখর যুক্তিবাদী, তিনিও দৃঢ়নিশ্চয় হলেন যে তর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত হবে না। তাই তিনি বলছেন 'যথামতি'—আমার বুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্র অনুসরণ করে আমি একটা সিদ্ধান্ত তোমাদের সামনে বললাম। তোমরা তাকে বিচার করে দেখে যা গ্রহণযোগ্য হয়, গ্রহণ কর। যদি গ্রহণযোগ্য না হয় যুক্তির সাহায্যে তাকে খণ্ডন কর। এটাই চরম কথা—শঙ্কর এরকম কিছু বলেননি। বলছেন, আমার পূর্ববর্তী যেসব সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা এই নিয়ে সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি চলছি। শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতির পরম্পরা রয়েছে। তার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যা বলবার আমি বললাম।

তারপর আর একটি কথা বলছেন 'তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেব উপেক্ষণীয়ঃ'[২] যদি একজন সম্প্রদায়বিহীন হয় অর্থাৎ তার পিছনে অনুভূতির পরম্পরা না থাকে তাহলে সে সর্বজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিদ্ হলেও তাকে বিশ্বাস করা চলে না। সর্বশাস্ত্রবিৎ সকল শাস্ত্র পড়তে পারে কিন্তু তার অনুভূতি পরম্পরাক্রমে পরীক্ষিত না হয়ে থাকলে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। এর ভিতরে তাহলে কতকগুলি নিরীক্ষা রয়েছে। কতকগুলি যুক্তি দিয়ে দেখে দেখে তবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। তা হয়েও শেষ পর্যন্ত চরম কথা কেউ বলছেন না। যেমন প্রেমিকের গানে আছে,

'মা তুমি কে, কেউ জানে না। তোমায় নানা লোকে বলছে নানা ॥
বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছেন নানা খানা,
তাই যে তোমার ঠিক মহিমা একথা তো কেউ বলে না ॥'[৩]

১. ব্রহ্মসূত্র—২/১/১১
২. গীতা, শাঙ্করভাষ্য—১৩/২
৩. সঙ্গীত সংগ্রহ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ৩য় সং, পৃঃ১৩৪

যদি কেউ বলেও তাহলেও, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। অতএব যিনি শাস্ত্র ও পরম্পরাগত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মকে 'অস্তি' বা সদ্‌বস্তু বলে জানছেন তাঁর উপলব্ধি ছাড়া ব্রহ্মকে কিভাবে জানা যাবে? এই অস্তিরূপে সমস্ত মিথ্যার, সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠানরূপেই তাঁকে জানা যাবে, অন্যরূপে নয়। এই হলো সিদ্ধান্ত।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১৩॥

অন্বয় ঃ—অস্তি ইতি (এই আত্মা আছেন এইরকম [সোপাধিক ভাবে]) উপলব্ধব্যঃ (তাকে জানতে হবে) চ (এবং) তত্ত্বভাবেন (নিরুপাধিক সন্মাত্ররূপেও) [জানতে হবে]। উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরুপাধিক এই দুই তত্ত্বের মধ্যে) অস্তি ইতি এবং উপলব্ধস্য (আত্মা আছেন এই উপলব্ধিবান্) [সাধকের নিকট] তত্ত্বভাবঃ (আত্মার নিরুপাধিক কূটস্থ সত্যরূপ) প্রসীদতি (প্রকৃষ্টভাবে গোচর হয়)।

'অস্তি'—জগতের কারণরূপ এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু বিদ্যমান আছেন প্রথমে 'ইত্যেব উপলব্ধব্য'—এইরূপেই অর্থাৎ সোপাধিকরূপেই তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। পরে 'তত্ত্বভাবেন চ'—নিরুপাধিক নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপরূপেও অনুভব করতে হবে। 'উভয়োঃ'—উক্ত সোপাধিক ও নিরুপাধিক আত্মার এই দুই রূপের মধ্যে 'অস্তি ইত্যেব উপলব্ধস্য'—অস্তি বলে যে সোপাধিক আত্মা অনুভূত হয়েছেন তাঁরই 'তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি'—নিরুপাধিক স্বরূপটি তত্ত্বান্বেষীর নিকট প্রকাশিত হয়।

শ্রুতি বলছেন, অসদ্‌রূপে আত্মার ভাবনাকে পরিত্যাগ করে সদ্‌রূপেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। কার্য ও কারণ রূপে সেই সদ্‌রূপ আত্মারই প্রতীতি হচ্ছে। তিনিই কার্যজগৎ, আবার তিনিই জগতের কারণ। কার্য ও কারণের উপাদান একই। অতএব কারণ থেকে কার্যের অতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করা হয় না—এ মত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। জগতের কারণ যেহেতু 'সৎ', তার কার্যকেও অতএব সৎস্বরূপেই উপলব্ধি করতে হবে। অতএব জগৎ-কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম যিনি অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু তিনিই জগদ্‌রূপে প্রকটিত হয়েছেন। জগদ্‌রূপ উপাধি যুক্ত করে যখন তাঁকে ভাবনা করা হবে তখনো তাঁকে অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তুরূপেই উপলব্ধি করতে হবে। পরে আবার নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপেও তাঁকে জানতে হবে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বস্তুত জগৎ-কারণতাও সেই নিরুপাধিক আত্মাতে নেই, নিরুপাধিক আত্মাকে আমরা ভাবতে পারি না তাই তাঁকে জগৎ-কারণরূপে ভাবতে বাধ্য হই। প্রকৃতপক্ষে, কার্য ও কারণের অতীত তিনি। স্বরূপে তিনি সব বর্ণনার অতীত। তাই তাঁকে 'অস্তি' বা 'সদ্' বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়।

যিনি এই সোপাধিক ও নিরুপাধিক আত্মাকে সদ্‌রূপে, অস্তিরূপে উপলব্ধি করেন তাঁরই কাছে সর্ব-উপাধি-বর্জিত আত্মার প্রকাশ হয়।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৪॥

অন্বয় ঃ—যদা (যখন) অস্য (সাধকের) হৃদি শ্রিতাঃ (অন্তঃকরণস্থ) যে সর্বে কামাঃ (যেসকল বাসনা)। প্রমুচ্যন্তে (সর্বতোভাবে অপগত হয়) অথ (তারপর) মর্ত্যঃ (মরণশীল জীব) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হয়) অত্র (এই দেহেই) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন)।

'যদা যে অস্য কামাঃ হৃদি শ্রিতাঃ'—যখন আত্মদর্শীর হৃদয়ে যে সকল কামনা, 'প্রমুচ্যন্তে'—বিশীর্ণ হয়ে যায়, বিদূরিত হয়, 'অর্থ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি'—সেইসময় জ্ঞানলাভের আগে যে মরণশীল ছিল সেই মানুষ অন্তরে বাইরে সতত ব্রহ্মদর্শনহেতু অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি, 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—এই শরীরেই সংসারবন্ধন বিমুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মই হয়ে যান। অবিদ্যার বিনাশে কামনা নষ্ট হয়ে যায়, কামনার অভাবে আর জন্ম হয় না।

অন্য শ্রুতি থেকেও জানা যায় যে, কাম, সংকল্প প্রভৃতির আশ্রয় হলো বুদ্ধি; আত্মা নয়। তাই জ্ঞান হবার আগে যিনি নিজেকে মরণশীল মানুষ বলে মনে করতেন, জ্ঞান হবার পর অবিদ্যা-কাম-কর্মরূপ মৃত্যুর বিনাশহেতু তিনি অমৃত হন। জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কামনা যখন বিলুপ্ত, বিদূরিত হয় তখন মরণশীল জীব অমৃতস্বরূপ হন। তখন এখানেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করে ব্রহ্ম হয়ে যান। এখানে লক্ষণীয়, বাসনাসমূহের আশ্রয় হলো হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ। আত্মার সঙ্গে এই বাসনাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। বাসনাচ্ছন্ন চিত্তেই কামনার উদয় হয়। সেই কামনাসমূহের সম্যক নিবৃত্তি হলে মরণধর্মীরূপে প্রতীত আত্মার অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। এই অমরত্ব দেবতাদের অমরত্বপ্রাপ্তির মতো নয়। এখানেই অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানের সমকালেই আত্মার স্বরূপ যে অমরত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব, তারই প্রাপ্তি। অন্য জীবের তুলনায় দেবতাদের আপেক্ষিক অমরত্ব বলা যেতে পারে। আত্মজ্ঞান না হলে দেবতাদেরও মুক্তি হয় না।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ ॥
অথ মর্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥১৫॥

অন্বয় ঃ—যদা (যখন) ইহ (এই দেহেই) হৃদয়স্য (হৃদ্‌গত) সর্বে (সমস্ত) গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থি, অবিদ্যাবন্ধন) প্রভিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়ে যায়) অথ (তখন) মর্ত্যঃ (মরণশীল জীব, মানুষ) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হয়ে যায়) এতাবৎ হি (এই পর্যন্তই) অনুশাসনম্ (শাস্ত্রীয় উপদেশ) [এর অতিরিক্ত কিছু নেই]।

'যদা হৃদয়স্য সর্বে গ্রন্থয়ঃ প্রভিদ্যন্তে'—যখন মানুষের হৃদয়স্থিত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ গ্রন্থির মতো দৃঢ়বন্ধনরূপ 'আমি দেহ, আমার ধনৈশ্বর্য' ইত্যাদি অবিদ্যাজনিত ভ্রান্ত প্রত্যয়সমূহ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, 'অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি'—সেই সময়ে মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে। 'এতাবৎ হি অনুশাসনম্'—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি বিনাশপূর্বক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি পর্যন্তই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ। অর্থাৎ আমি এই শরীর, এই ধন আমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্ত জ্ঞানসমূহ তার বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা যখন সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখনই মরণশীল মানুষ অমৃত হয়। 'এতাবৎ হি অনুশাসনম্' বলে উপসংহার করা হয়েছে অর্থাৎ এখানেই উপনিষদ্ শেষ, এই কথা বলা হলো।

তারপর একটি প্রসঙ্গের নতুন করে অবতারণা করা হচ্ছে। এটি যেন উপনিষদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, অধিকন্তু বলা। উপনিষদের যা বক্তব্য—ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব, তা বলা শেষ হয়েছে। বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর লাভ হবে তাঁর আর কোন গতি অর্থাৎ কোন লোকে গমন সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। কারণ তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গিয়েছেন, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'[১]—শাস্ত্র এই বলেন। তাই ব্রহ্মজ্ঞের আর গতায়াত থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই সম্বন্ধে বলছেন, 'যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহোত ন ইতি'[২]—যখন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁর প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে কোথাও যায়, কি যায় না? দেহ থেকে বেরিয়ে তাদের কোথাও গতি হয় কি না, যেমন অব্রহ্মজ্ঞের হয়? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'নেতি হোবাচ'[৩]—না কোথাও আর তাদের গতি হয় না। 'অত্র এব সমবনীয়ন্তে'[৪]—তারা এখানেই অর্থাৎ কারণে বিলীন হয়। বলছেন, তাহলে তার গতি কী হবে? গতি কিছুই হয় না। তার শরীর যে উপাদানগুলি দ্বারা তৈরি সেই মূল উপাদানে মিলিত হয়। যেটা compound অর্থাৎ একাধিক উপাদানের দ্বারা তৈরি ছিল, সেটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যা থেকে তারা সৃষ্ট হয়েছিল সেই মৌলিক ধাতুতে ফিরে যায়।

এর পরের কথা, যদি কেউ ব্রহ্মজ্ঞ না হয়, অন্য বিদ্যার অনুশীলন করে ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করে এবং যারা তার বিপরীত অর্থাৎ সংসারগামী তাদের কী গতি হবে তাও এখানে উল্লেখ করছেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ব্রহ্মজ্ঞের মৃত্যুর পর কী হয়? যারা ব্রহ্মজ্ঞ নয় তাদের কী হয়, সে প্রশ্নও সঙ্গতভাবেই ওঠে। তাদের কী গতি সে কথাও জানাবার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া কঠোপনিষদে যে অগ্নিবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, যার অগ্নি থেকে

---

১. মুণ্ডক—৩/২/৯ ২. বৃহদারণ্যক—৩/২/১১
৩. তদেব—৩/২/১১ ৪. তদেব—৩/২/১১

লোকসমূহের উৎপত্তি, যে অগ্নি সম্বন্ধে নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অগ্নির উপাসকদের ফলপ্রাপ্তির বিষয়ও বর্ণনা করা আবশ্যক। এইজন্য উপনিষদ্ সমাপ্তির পরেও অপেক্ষিত বিষয়গুলি আলোচ্য মন্ত্রগুলিতে বলতে হচ্ছে। বস্তুত মূল উপনিষদের সমাপ্তি হলো ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশে। ব্রহ্মজ্ঞান যখন বলা হয়ে গিয়েছে তারপর বলবার মতো নতুন আর কিছু নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ দেখাবার জন্য ভাষ্যকার নতুন প্রশ্নের অবতারণা করছেন। যারা অগ্নিবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হয় অথবা যারা ব্রহ্মলোকাদিতে না যায় তাদের কী গতি হয়? এটা উপনিষদের মুখ্য বিষয় না হলেও প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাই এই অংশটুকু পরিশিষ্ট রূপে উল্লিখিত হচ্ছে।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্ব মায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥১৬॥

অন্বয় ঃ—হৃদয়স্য (হৃদয়ে) শতম্ চ (একশত) একা চ (এবং একটি) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) [আছে] তাসাম্ (তাদের মধ্যে) একা (একটি—সুষুম্না নাড়ী) মূর্ধানম্ অভি (ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে) নিঃসৃতা (নির্গত হয়েছে) [মৃত্যুকালে জীব] তয়া (সেই নাড়ীর দ্বারা) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বদিকে) আয়ন্ (গমন করে) অমৃতত্বম্ এতি (অমরতা লাভ করে), বিষ্বঙ্ (বিভিন্ন দিকে প্রসারিত) অন্যাঃ (অন্য নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে ভবন্তি (লোকান্তর প্রাপ্তির কারণ হয়)।

'হৃদয়স্য শতং চ একা চ নাড্যঃ'—হৃদয় থেকে বিনিঃসৃত একশটি এবং আর একটি নাড়ী আছে। জীবনীশক্তির গতিপথকে নাড়ী বলে। একশটি এবং অপর একটি নাড়ী সাধককে দুটি অত্যন্ত বিপরীত দিকে নিয়ে যায়। এজন্য এদের পৃথক করে বলা হয়েছে। 'তাসাম্ একা মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা'—তাদের মধ্যে একটি নাড়ী ব্রহ্মতালুর দিকে যায়। 'তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন অমৃতত্বম্ এতি'—সেই নাড়ী অবলম্বন করে সাধক ঊর্ধ্বগতি লাভ করে অমরত্ব প্রাপ্ত হন। আর 'বিষ্বঙ্ অন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি'—অন্য নাড়ীগুলি সব উৎক্রমণের, দেহ থেকে জীবাত্মার বেরিয়ে যাওয়ার উপযোগী হয়। অর্থাৎ অপরাপর নাড়ীর দ্বারা উৎক্রমণ হলে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হয়ে থাকে। ফল কথা, সেই সব নাড়ী কেবল সংসার পথের নিদান হয়ে থাকে। 'হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্'—যে স্থানে জীব শরীরের নিয়ন্তারূপে অবস্থান করে তাকে বলা হচ্ছে হৃদয়। সেই হৃদয় থেকে নাড়ীগুলি বেরিয়ে চারদিকে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একশটি নানান দিকে আর একটি মূর্ধার দিকে গিয়েছে। শিরোদেশের বিশেষ অংশকে মূর্ধা বলে, চলতি কথায় আমরা তাকে ব্রহ্মতালু বলি। মূর্ধা অভিমুখী সেই নাড়ীকে অবলম্বন করে গেলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। এখানে আপেক্ষিক অমৃতত্বের কথা বলা হয়েছে। অন্য নাড়ীগুলি জীবকে দেহের বাইরে নিয়ে যায়। দেহের

বাইরে যারা যাচ্ছে বিভিন্ন লোকে তাদের গতি হয়। অথবা তারা এই জগতেই বারবার জন্মায় এবং মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়; লোকান্তরে তাদের গতি হয় না। যারা লোকান্তরে যায় তারা কর্মপ্রধান। কোন বিশিষ্ট কর্ম করার ফলে তাদের ঊর্ধ্বলোকে গতি হয়। চন্দ্রলোক প্রভৃতি অসংখ্য লোকের কথা পুরাণে বিস্তার করে বলা হয়েছে। এক-একজন দেবতা এক-এক লোকের অধিষ্ঠাতা। মানুষ নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করবার জন্য সেই সেই লোকে গমন করে। যারা শুদ্ধ, যারা আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করেছে তারা সমস্ত লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যায়। উপনিষদ্ বলছেন, সেই ব্রহ্মলোকে যাবার জন্য ঐ নাড়ীটি উপযোগী। মাথার ভিতরে যেন দুটি ভাগ আছে। তার মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রপথে বেরিয়ে জীব ব্রহ্মলোকে যায়। ছিদ্রটি অবশ্য সাধারণ চোখে দেখা যায় না, বলা হয় এটি যোগীদের প্রত্যক্ষ। আর যে নাড়ীটি মূর্ধাতে যায় সেটি সুষুম্না নাড়ী, এখানে তার নামোল্লেখ করা হয়নি। সাধারণ দৃষ্টিতে এইসব বর্ণনা বুঝবার কোন উপায় নেই, শাস্ত্রে আছে বলে মেনে নিতে হয় অথবা তাকে উপেক্ষাও করা যায়। এরকম আরো দুটি নাড়ীর কথা বলা হয়—ইড়া ও পিঙ্গলা। এদুটিও যোগী ছাড়া অপরের প্রত্যক্ষ নয়। শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ দেখবার যন্ত্র থাকলেও তাতে এইগুলি ধরা পড়বে না। এগুলিকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়, যাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখা যায় না।

সুষুম্নাপথ দিয়ে গেলে যে ব্রহ্মলোকে গতি হয় তা আমরা আগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এই গতি হয় উত্তরায়ণের পথে। ধারাবাহিক পদ্ধতিতে প্রথমে অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর প্রভৃতি অর্থাৎ তৎ-তদ্-অভিমানী দেবতারা জীবের আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম দেহকে যেন বহন করে ক্রমশ ব্রহ্মলোকে পৌঁছে দেয়। সেখানে জীব সেই লোকের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে ভোগ করে এবং ভোগান্তে তার এই গতির নিবৃত্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ একটু যা ভোগ অবশিষ্ট ছিল, যা শেষ না হলে মুক্তিলাভ হচ্ছিল না সেই ভোগটুকু হয়ে গেলে' বিদেহ হয়ে জীব ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তখন সে সকল অবচ্ছেদকে অতিক্রম করে ব্রহ্ম হয়ে গেল। সাধারণ মৃত ব্যক্তিকে বোঝাবার জন্য বলে স্বর্গত। আবার সন্ন্যাসী সম্পর্কে বলা হয় ব্রহ্মীভূত বা ব্রহ্মলীন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেছেন। সমস্ত ভোগের অন্তে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। ভোগস্থান হিসাবে ব্রহ্মলোককে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। আবার এই ব্রহ্মলোকই মুক্তির স্থান, কারণ সেখানে জীব সমস্ত ভোগকে অতিক্রম করে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। এইভাবে তার যে অমৃতত্ব লাভ হলো তা আত্যন্তিক অমৃতত্ব, আপেক্ষিক নয়। কেবল দেবত্ব থাকলে এ অমৃতত্ব লাভ হবে না। যারা অন্যান্য

নাড়ী দিয়ে উৎক্রমণ করে তাদের উৎক্রমণ মাত্র হয়, যে দেহের মধ্যে সীমিত ছিল সেই দেহের সীমাকে অতিক্রম করে যায় মাত্র, কিন্তু উপাধির দ্বারা তখনো সীমিত থাকে? নিরুপাধিক না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মস্বরূপতার অনুভব হয় না। এরা অন্যান্য সব গতি লাভ করে।

গতি সম্বন্ধে বলার তাৎপর্য এই যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ হলে তাঁর আর গতি নেই। সেখানেই তাঁরা লয় প্রাপ্ত হন। 'বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্'[১]—প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিশে যায় এবং এই দেহ ভস্মাবশেষ হয়ে পড়ে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'অস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্...'[২]—মৃতব্যক্তির বাক্, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে লীন হয়, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্যে লয় হয়। এইরকম প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে চলে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তি দিয়ে তারই সমষ্টিভূত যে জীবদেহ গঠিত হয়, তার আমি-রূপ বন্ধন যদি না থাকে তাহলে সেই সমষ্টিটি তখন বাঁধনছাড়া হয়ে যায় এবং ঐ শক্তিগুলি নিজের নিজের স্থানে চলে যায়। আমরা যেমন চলতি কথায় বলি—পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশে গেল, সেইরকম। শুধু স্থূল শরীর নয়, সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তারাও যে যে উপাদানে তৈরি সেই সেই উপাদানে মিলিত হয়ে যায়, তাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। পৃথক্করণ তখনই সম্ভব যখন সেই সমষ্টিতে অভিমানী কেউ থাকে অর্থাৎ 'আমি'-রূপ একটা দড়ি দিয়ে যেন কতকগুলি শক্তিকে বেঁধে একটা গুচ্ছ তৈরি করা হয়েছে—সেইটিই হলো জীব। 'আমি' দড়িটি চলে গেলে তখন শক্তিগুলি সব পৃথক পৃথক হয়ে যে যার সত্তাতে মিশে যাবে। এই তাদের পরিণাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে হৃদয়ের সমস্ত কামনাগ্রন্থি বিনষ্ট হলে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হৃদয়স্থ একশ একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী দিয়ে গমনে মুক্তি এবং অন্য নাড়ীদ্বার দিয়ে গেলে জীবের উৎক্রমণমাত্র হয়।

পরবর্তী মন্ত্রে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের অর্থটিকে একসঙ্গে সংগৃহীত করে বলছেন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১৭॥

অন্বয় ঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) অন্তরাত্মা (অন্তর্যামী) পুরুষঃ (পরমাত্মা) সদা (সর্বদা) জনানাম্ (সকল প্রাণীর) হৃদয়ে (হৃদয়কন্দরে, অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হয়ে আছেন)। মুঞ্জাৎ (মুঞ্জ তৃণ থেকে) ঈষীকাম্ ইব (তৃণমধ্যস্থ কোরকটি) [যেমন বার করা

১. বৃহদারণ্যক—৫/১৫/১
২. বৃহদারণ্যক—৩/২/১৩

হয় সেরকম মুমুক্ষু সাধক] ধৈর্যেণ (তিতিক্ষা সহকারে) স্বাৎ শরীরাৎ (নিজ শরীর থেকে) তম্ (সেই অন্তর্যামী পুরুষকে) প্রবৃহেৎ (পৃথক করবে)। তম্ ([শরীর থেকে পৃথককৃত] তাঁকেই) শুক্রম্ (শুদ্ধ) অমৃতম্ (অমৃত-ব্রহ্ম) [রূপে] বিদ্যাৎ (জানবে)। তম্ শুক্রম্ অমৃতম্ বিদ্যাৎ ইতি (তাঁকে শুদ্ধ, অমৃত বলে জানবে)। [সমাপ্তি সূচনার জন্য এই অংশটির দ্বিরুক্তি করা হয়েছে] ইতি।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা'—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত যিনি অন্তরাত্মা, অন্তরে অবস্থিত, তিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন। সেই অন্তরাত্মাকে, 'স্বাৎ শরীরাৎ ধৈর্যেণ প্রবৃহেৎ'—নিজের শরীর থেকে অত্যন্ত যত্নসহকারে পৃথক করতে হবে। কিরকম ভাবে? 'মুঞ্জাৎ ঈষীকাম্ ইব'—যেমন মুঞ্জ ঘাস থেকে ঈষীকাকে অর্থাৎ তার কোরককে অতি সাবধানে পৃথক করা হয়।

ঘাসের উপরের কোরকটিকে টানলে দেখা যায় একটা শীষের মতো বেরিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি করতে গেলে তা ছিঁড়ে যায়। তাই বলছেন, 'ধৈর্যেণ'—ধীরে ধীরে। যে অন্তরাত্মা বিভিন্ন কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে তাকে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক করবে কিন্তু খুব সাবধানে ধীরে ধীরে করতে হবে। 'ধৈর্য' শব্দের অর্থ ধীরতা। 'ধীরতা' শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক হলো হঠাৎ নয়। আস্তে আস্তে করবে। দ্বিতীয় হলো, ধী, বুদ্ধি, বিচারশক্তির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে করবে। বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে এই পৃথক্করণ করবে। উপাধি থেকে পৃথক না করলে আত্মার স্বরূপকে বোঝা যাচ্ছে না। যেমন বলা হলো, কোরক কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় সেটা দেখা যাচ্ছে না, তাকে ধীরে ধীরে পৃথক করলে দেখা যাবে। ব্যাখ্যাকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অপ্রমাদেন'—অবহিত হয়ে, সতর্কভাবে করতে হবে। বলা বাহুল্য, যতই পৃথক করবার চেষ্টা করি, গ্রন্থিটি এমন দৃঢ়বদ্ধ যে, জট আর কিছুতেই খোলে না। অনাত্মা থেকে আত্মাকে কিছুতেই আলাদা করতে পারি না। পৃথক্করণের উপায় এখানে বলছেন ধৈর্য।

'তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্'—শরীর থেকে পৃথক্কৃত সেই আত্মাকে শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলে জানবে। কোষগুলি অশুদ্ধ, অশুদ্ধি দিয়ে যেন বেষ্টিত, কিন্তু আত্মা শুদ্ধ। যেন মৃত্যু দিয়ে ঘেরা অমৃত। অর্থাৎ ইনিই হলেন সেই ব্রহ্ম যাঁকে এই উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর অনুসন্ধানে উপনিষদের তাৎপর্য।

পুনর্বার যে-'তাঁকে শুদ্ধ অমৃত বলে জানবে'-বলা হয়েছে এর অর্থ উপনিষদ্‌টি এখানে শেষ হলো। দ্বিরুক্তি উপনিষদের সমাপ্তিসূচক। প্রাচীনকালে লোকে শুনে শুনে শিখত বলে সাধারণত দ্বিরুক্তির দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করা হতো।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং য়ো বিদধ্যাত্মমেব ॥১৮॥

অন্বয় ঃ—অথ (অনন্তর) নচিকেতঃ (নচিকেতা) মৃত্যুপ্রোক্তাম্ (যমরাজ কর্তৃক কথিত) এতাম্ বিদ্যাম্ (এই তত্ত্বজ্ঞান) চ কৃৎস্নম্ (এবং সমগ্র) যোগবিধিম্ (যোগানুষ্ঠান) লব্ধ (লাভ করে) বিরজঃ (সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যা বর্জিত হয়ে) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ) অভূৎ (হলেন)। অন্যঃ অপি (অন্যও) যঃ (যিনি) অধ্যাত্মম্ এব (প্রত্যগাত্মাকেই) এবম্-বিৎ (এইভাবে জানেন) [তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ হবেন]।

এই মন্ত্রটি ঠিক উপনিষদের অঙ্গ নয়, একে ফলশ্রুতি বলা যায়। উপনিষদ্ বলা সমাপ্ত হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য এখন এই মন্ত্রটি বললেন।

'অথ নচিকেতঃ মৃত্যুপ্রোক্তাং এতাং বিদ্যাম্'—অনন্তর বিবেক-বৈরাগ্যবান নচিকেতা যমরাজ কর্তৃক উপদিষ্ট এই ব্রহ্মবিদ্যা, 'কৃৎস্নং যোগবিধিং চ লব্ধ্বা'—উপায় ও ফলসমেত সমুদয় যোগবিধি জেনে, কী হলেন? 'বিরজঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ বিমৃত্যুঃ অভূৎ'—ধর্মাধর্মরহিত হয়ে অবিদ্যা-কাম-কর্ম বিমুক্ত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হলেন অর্থাৎ তিনি মলিনতাশূন্য হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমর হয়ে গেলেন। কেবল যে নচিকেতাই এরকম হয়েছিলেন তা নয়, 'অন্যঃ অপি যঃ এবংবিদ্ অধ্যাত্মমেব'—অপর যে কোন ব্যক্তি নচিকেতার মতো আত্মজ্ঞ হলে স্বীয় শরীরেই প্রত্যগাত্মাকে উপলব্ধি করে এই প্রকার ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তিনিও বিরজ বিমৃত্যু হয়ে থাকেন।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহবীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

মন্ত্রনির্দেশিকা

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং	২।২।৯	২২০	ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়তি	২।২।৩	২০০
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিঃ	২।১।১৩	১৯০	ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য	১।৩।১	১৩৫
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ	২।৩।১৭	২৭২	একো বশী সর্বভূতান্তর	২।২।১২	২২৪
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য	২।১।১২	১৮৭	এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য	১।২।১৩	৬০
অজীর্যতামমৃতানাম্	১।১।২৮	৩৩	এতত্তুল্যং যদি মন্যসে	১।১।২৪	২৯
অণোরণীয়ান্ মহতঃ	১।২।২০	১০৭	এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্	১।২।১৭	৭৯
অনুপশ্য যথা পূর্বে	১।১।৬	৫	এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম	১।২।১৬	৭৮
অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ	১।২।১	৩৯	এষ তে অগ্নির্নচিকেতঃ	১।১।১৯	২১
অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদ্	১।২।১৪	৬৭	এষ সর্বেষু ভূতেষু	১।৩।১২	১৪৮
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাঃ	২।১।৮	১৮১	কামস্যাপ্তিং জগতঃ	১।২।১১	৫৫
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ	১।২।৫	৪৪	জানাম্যহং শেবধিরিতি	১।২।১০	৫৫
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ	২।৩।৮	২৫২	তদেতদিতি মন্যন্তে	২।২।১৪	২২৭
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্	১।৩।১৫	১৫৮	তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা	১।১।১৬	১৮
অশরীরং শরীরেষু	১।২।২২	১১৭	তং দুর্দর্শং গূঢ়ম্	১।২।১২	৫৬
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ	২।৩।১৩	২৬৭	তং হ কুমারং সন্তম্	১।১।২	২
অস্য বিস্রংসমানস্য	২।২।৪	২০৩	তাং যোগমিতি মন্যন্তে	২।৩।১১	২৫৭
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি	১।৩।৩	১৪১	তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে	১।১।৯	৮
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতম্	১।১।৮	৭	ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতৎ	১।১।১৮	২০
আসীনো দূরং ব্রজতি	১।২।২১	১১৫	ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য	১।১।১৭	১৯
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ	১।৩।৪	১৪১	দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী	১।২।৪	৪৩
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ	২।৩।৭	২৫২	দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতম্	১।১।২২	২৮
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ	১।৩।১০	১৪৫	দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতম্	১।১।২১	২৭
ইহচেদশকদ্বোদ্ধুম্	২।৩।৪	২৪৪	ন জায়তে ম্রিয়তে বা	১।২।১৮	৯২
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য	১।৩।১৪	১৫৫	ন তত্র সূর্যো ভাতি	২।২।১৫	২৩২
উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ	১।১।১	১	ন নরেণাবরেণ প্রোক্তঃ	১।২।৮	৫০
ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখঃ	২।৩।১	২৩৫	ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যঃ	২।২।৫	২০৭

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যাঃ	১।১।২৭	৩২	যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি	১।৩।৬	১৪৩
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য	২।৩।৯	২৫৪	যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি	১।৩।৮	১৪৪
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি	১।২।৬	৪৫	যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ	১।৩।৭	১৪৩
নাচিকেতমুপাখ্যানম্	১।৩।১৬	১৬৩	যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন	১।৩।৫	১৪২
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ	১।২।২৩	১১৯	যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি	১।১।২৯	৩৪
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তঃ	১।২।২৪	১২৪	যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে	১।২।২৫	১৩১
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনঃ	২।২।১৩	২২৫	যঃ পূর্বং তপসঃ	২।১।৬	১৭৯
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুম্	২।৩।১২	২৬১	যঃ সেতুরীজানানামক্ষরম্	১।৩।২	১৩৮
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া	১।২।৯	৫৪	যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিঃ	২।১।৭	১৮০
পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ	২।১।২	১৭২	যেন রূপং রসং গন্ধম্	২।১।৩	১৭৫
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ	২।১।১	১৬৭	যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা	১।১।২০	২২
পীতোদকা জগ্ধতৃণাঃ	১।১।৩	২	যে যে কামা দুর্লভাঃ	১।১।২৫	৩০
পুরমেকাদশদ্বারমজস্য	২।২।১	১৯৪	যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে	২।২।৭	২০৯
প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ	১।১।১৪	১৬	লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ	১।১।১৫	১৭
বহূনামেমি প্রথমো বহূনাম্	১।১।৫	৫	বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ	২।২।১০	২২২
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি	২।৩।৩	২৪৪	বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ	১।৩।৯	১৪৫
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ	২।১।১১	১৮৫	বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিঃ	১।১।৭	৬
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ	১।৩।১১	১৪৬	শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ	২।৩।১৬	২৭০
মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ	২।৩।১৮	২৭৪	শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্	১।১।২৩	২৯
য ইমং পরমং গুহ্যম্	১।৩।১৭	১৬৫	শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা	১।১।১০	৯
য ইমং মধ্বদং বেদ	২।১।৫	১৭৮	শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন	১।২।৭	৪৯
য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি	২।২।৮	২১৭	শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ	১।২।২	৪০
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ	১।৩।১৩	১৫৪	শ্বোভাবা মর্তস্য যদন্তকৈতৎ	১।১।২৬	৩১
যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তম্	২।১।৯	১৮১	স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি	১।১।১৩	১৩
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা	২।৩।৫	২৪৭	স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ	১।২।৩	৪১
যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা	১।১।১১	১০	সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি	১।২।১৫	৬৯
যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং	২।১।১৪	১৯১	স হোবাচ পিতরং তত	১।১।৪	৪
যথোদকং শুদ্ধে	২।১।১৫	১৯২	সূর্যো যথা সর্বলোকস্য	২।২।১১	২২৩
যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে	২।৩।১০	২৫৬	স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তম	২।১।৪	১৭৭
যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে	২।৩।১৫	২৬৮	স্বর্গে লোকে ন ভয়ম্	১।১।১২	১০
যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ	২।৩।১৪	২৬৮	হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি	২।২।৬	২০৮
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্	২।৩।২	২৪৩	হন্তা চেন্মন্যতে হন্তম্	১।২।১৯	১০৩
যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র	২।১।১০	১৮৩	হংসঃ শুচিসদ্	২।২।২	১৯৮

আকরগ্রন্থাবলী

১। উপনিষদ্ সংগ্রহঃ—সম্পাদক ঃ জে. এল. শাস্ত্রী, মোতীলাল বনারসীদাস, পুনর্মুদ্রণ-১৯৮০

২। ঐতরেয়ব্রাহ্মণম্—সম্পাদক ঃ কাশীনাথ শাস্ত্রী ২য় ভাগ, আনন্দাশ্রম, প্রকাশ-১৯৩১।

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা, ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ—১৩৮৩।

৪। কঠোপনিষদ্—সম্পাদক ঃ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি, ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার, ১৩৫৫।

৫। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ—সম্পাদক ঃ নারায়ণ শাস্ত্রী, প্রথম ভাগ, আনন্দাশ্রম, সংস্করণ-১৯৩৪।

৬। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৩।

৭। জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি (স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি ও কথা সংগ্রহ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫।

৮। দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী—সম্পাদক ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৩৫৩।

৯। পঞ্চদশী—সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২য় সংস্করণ-১৩২০।

১০। পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ-১৩৮৪।

১১। পাতঞ্জল দর্শন—সঙ্কলক ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশ ১৯৮৩।

১২। বিবেকচূড়ামণি—অনুবাদক ঃ স্বামী বেদান্তানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৩৭২।

১৩। বেদান্তসার ঃ—সম্পাদক ঃ ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৮।

১৪। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—সঙ্কলক ঃ শ্রীমহেশচন্দ্র পাল, সংস্করণ-১৯৫১।

১৫। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—সম্পাদক ঃ পঞ্চানন তর্করত্ন।

১৬। ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্—অনুবাদক ঃ শ্রীসত্যানন্দ সরস্বতী, গোবিন্দ মঠ, বারণসী।

১৭। ব্রহ্মসূত্র (শ্রীভাষ্য সহ)—প্রথম খণ্ড, অনুবাদক ঃ শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য, প্রকাশক ঃ শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৮৫।

১৮। ভাষাপরিচ্ছেদ—সম্পাদক ঃ শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ—১৩৮৭।

১৯। মনুসংহিতা—সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ—১৩৯৭।

২০। মহাভারতম্—সম্পাদক ঃ হরিদাস ভট্টাচার্য, ভীষ্মপর্ব, ২য় ভাগ, প্রকাশ—১৩৪৩।
২১। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ (গৌড়পাদীয় কারিকা)—সম্পাদক ঃ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি, ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার, সংস্করণ-১৩৬৫।
২২। মীমাংসাদর্শন (কুমারিল ভট্ট রচিত টুপ্‌টীকা এবং শাবরভাষ্য সহ)—জৈমিনী, চতুর্থ ভাগ, আনন্দাশ্রম, প্রকাশ—১৯৩২।
২৩। মুণ্ডকোপনিষদ্—সম্পাদক ও অনুবাদক ঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, ৩য় সংস্করণ—১৩৫৮।
২৪। লিঙ্গ পুরাণ—সম্পাদক ঃ শ্রীরাম শর্মা আচার্য, প্রথম খণ্ড, সংস্কৃতি-সংস্থান, বেরিলী, উত্তরপ্রদেশ, ২য় সংস্করণ—১৯৭০।
২৫। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—অনুবাদক ঃ শ্রীহরিকৃষ্ণদাস গোয়েঙ্কা, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ৪র্থ সংস্করণ।
২৬। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—অনুবাদক ঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, ১০ম স্কন্ধ, ২য় সংস্করণ ১৯৩৩।
২৭। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—অনুবাদ ঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ১১শ স্কন্ধ, সংস্করণ—১৩১২।
২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ—১৩৯৩।
২৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ—১৯৮৭।
৩০। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৯০।
৩১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সংস্করণ—১৩৮৩।
৩২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সংস্করণ—১৩৯৩।
৩৩। শ্লোকবার্তিকম্—সম্পাদক ঃ স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী, তারা পাব্‌লিকেশন্স, বারাণসী, ১৯৭৮।
৩৪। সঙ্গীত সংগ্রহ—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ৩য় সংস্করণ।
৩৫। সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—অনুবাদক ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশ-১৩৬৫।
৩৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদক ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১০ম সংস্করণ—১৩৯৩।
৩৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ—১৩৮৭।

৩৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ—১৩৮৭।

৩৯। *Advaitasiddhi*— Madhusudana Saraswati, Ed. Ananta Krishna Sastri, Parimal Publication, Delhi, 1992.

৪০। *Āpastambaśrautasūtra*, Vol. 2.—Edited by A. Chinnaswami Shastri & P.N.Pattabhirama Sastri, Oriented Institute, Baroda, Ist Edn. 1963.

৪১। *A Treatise Concerning the principles of Human Knowledge*—George Berkeley, Chicago, The Open Court Publishing Co. Edn. 1903.

৪২। *Chandogya Upaniṣad*— Tran, Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1st Edn.

৪৩। *Mahānārāyaṇopaniṣad*—Swami Vimalananda, Sri Ramakrishna Math, Madras, 3rd impression: 1979.

৪৪। *Mīmāmsā Sūtras of Jaimini*—Translated by Mohan Lal Sandal, Vol, I, Motilal Banarasidass, New Delhi, Reprint: 1979.

৪৫। *Niruktam*— Yaska Muni Editor: M.M. Pandit Mukund Jha Bakshi. Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, Reprint Edn. 1989.

৪৬। *The Bible*—American Bible Society, New York, 1983.

৪৭। *The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*— Translated by Swami Madhavananda, Advaita Ashrama, Mayavati.

৪৮। *The Complete Works of Swami Vivekananda,* Vol. V. Advaita Ashrama, Calcutta, 12th reprint.

৪৯। *The Poems of Gray*—Collins and Goldsmith, Edited by Roger Lonsdale, Longman, 2nd impression: 1980.

৫০। *The Republic*—Plato, Penguin Books, 2nd Edn. 1977.

৫১। *The Siddhāntabindu*— Madhusudana Saraswati, Ed. Tryambakram Sastri Vedantacharya, Publisher: Jaikrishnadas-Haridas Gupta, Benaras, 1928.

৫২। *The Taittirīya Samhitā, Vol. 2— Edited by A. Mahadeva Sastri & K. Rangacharya, Motilal Banarasidass, Reprint, 1986.*

৫৩। *Do, Vol. 4.*

৫৪। *Do, Vol. 5.*

নির্ঘণ্ট

অকামহত ১২৫; অকৃত ৬৮
অক্ষয় স্বর্গলাভ ৪৪
অক্ষরপুরুষের শাসনাধীন ১৩৩
অক্ষরপ্রতীক ১৮৯
অগ্নি ১৩২, ১৩৪, ২১৫, ২২১, ২৫০, ২৭০, ২৭১
অগ্নি (ব্রাহ্মণ অতিথি) ৬
অগ্নি (স্বর্গপ্রদ) ১৪
অগ্নি (স্বর্গ প্রাপ্তির উপায়) ১৭
অগ্নি (সৃষ্টবস্তুর আদিভূত) ১৭
অগ্নি অভিমানিনী দেবতা বিরাট ১৭
অগ্নিচয়ন ১৭; অগ্নিদেব ১৩৭
অগ্নিপদবাচ্য (হিরণ্যগর্ভ) ১৮১
অগ্নির দৃষ্টান্ত ২২২; অগ্নির স্বরূপ ১৭
অগ্নিবিদ্যা ১৪, ১৬, ২৭০
অগ্নিহোত্রযাগ ৪৪, ৭৩
অগ্র্যাবুদ্ধি ১৪৯, ১৫৪
অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া ২৩০
অঙ্গ ৭০, ৭১
অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ ১৮৭
" (আত্মা) ১৮৮
অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা ২৭৩
অজ্ঞান ৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৮, ৮২, ৮৮, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৬, ১৭৭ ১৯৬, ২৩৩, ২৬০
অজ্ঞান (আত্মাতে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বের বোধের নাম) ৪৫
" (আত্মবিষয়ক) ১৭৬
অজ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ৩৬, ৩৭
অজ্ঞান (ব্রহ্মবিষয়ক) ৮২
অজ্ঞান অন্ধকার ৪৫
অজ্ঞান অবস্থার পরিচয় ১৫৯
অজ্ঞান আত্মা ৯৭
অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্যের নিবৃত্তি ১০২
অজ্ঞানকে আশ্রয় করে লোকব্যবহার ১০৪
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি ২৪১
অজ্ঞানের অবস্থা ২৬০
অজ্ঞানের আবরণ ৫৮
অজ্ঞানের কার্য ৬২
অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকার ৪৪
" দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মা ১০৪
" নাশ ২৬০
অজ্ঞানের নিবৃত্তি ৩৭, ৮২, ১০২, ১৩৮, ১৫২, ১৭১, ২৬০
অজ্ঞানের নিঃশেষে নিবৃত্তি ১৭৭
অজ্ঞানের পথ ৪৮
অজ্ঞানের বিনাশ ১৬৯
" সীমা ৮৭
অজ্ঞানের হাত থেকে নিষ্কৃতি ৩৭
অজ্ঞেয়বৎ ৬০; অজ্ঞেয়বাদ ১০০
অণিমাদি ঐশ্বর্য ৫৬; অণুপরিমাণ ৫১
অতিথি ৬, ১৯৯; অতিথি সৎকার ৬
অতিথিসেবার গুরুত্ব ৮; অতীন্দ্রিয় ২৭১
অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ২৪০; অদিতি ১৮০
অদ্বয়তত্ত্ব ২০০
অদ্বিতীয় আত্মা ১৯২, ১৯৯
অদ্বিতীয় সদ্ বস্তু ২৬৭
অদ্বৈত ১৯৯; ২০০
অদ্বৈত গুণ নয়; গুণের নিষেধ ২০০
অদ্বৈত তত্ত্ব ৮৭
অদ্বৈত তত্ত্ব (সাক্ষ্য দেবে কে?) ৮৪
অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ৮২
অদ্বৈত মত ৯৮
অদ্বৈত বেদান্তী ৮২, ৮৪, ১০১
অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত ৭৭, ১৭৯, ২৬৬
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ২৬৬
অদ্বৈতসিদ্ধি ৯৮, ২৬৬
অদ্বৈতকে খণ্ডন ৯৮
অদ্বৈতের হানি ৮৩
অধিকারী (আত্মজ্ঞানের) ১৭৬
" শিষ্য ১৮৬
অধিকারী ভেদ ১২৯; অধিদৈব ১৮২
অধিষ্ঠান ৯৫, ১৪৮, ১৮৩, ২৩০, ২৩৯, ২৬৭

অধিষ্ঠান (অধ্যাসের) ১১২
অধিষ্ঠান (অপরিণামী) ২৬৫
" এর প্রকাশ ২৩৪
" ব্রহ্ম ১৮৩
" রজ্জুকে জানলে সর্পের জ্ঞান থাকতে পারে না ২৩৯
অধিষ্ঠানের জ্ঞান ২৩৯
" সম্পর্ক (আরোপ্য ও) ২৬২
অধ্যাত্ম ১৮২; অধ্যাত্মনীতি ১২৭
অধ্যাত্মযোগ ৫৯; অধ্যস্ত ৮৭, ১০৮, ১০৯
অধ্যাস ৮৭, ১০৮, ১০৯, ১১২
অনন্তফল ১৬৫
অনন্তফল (যজ্ঞের) ৫৫
" নরক ১৬৬
অনন্ত স্বর্গ ১৬৬
" স্বরূপ ১৩৪
অনন্দলোক ৩
অনন্যচিত্ততা ১২০, ১২৩
অনবস্থা দোষ ৫৩; অনভিব্যক্ত ৭৭
অনভিব্যক্ত উপাদান (জগতের) ১৫৯
" ভাব ৭৮
অনভিব্যক্তরূপ ৮১; অনস্তি ১০১, ১০৩
অনাত্মধর্ম ৫৮, ৬১, ৬৫, ৭৫, ৯৪, ১০৭, ১১২
অনাত্মধর্ম বর্জিত ৬৬
অনাত্মধর্ম বা বৈচিত্র্য ২২০, ২২৩, ২২৪
অনাত্মভ্রম ৭৭
অনাত্মবস্তু ৬১, ৯৪, ২৫০
অনানন্দত্ববোধ ৭৯
অনিত্য (বিষয়সুখ অনিত্য) ১৭৩
" (সংঘাত মাত্রই) ১৭৫
" (দুঃখময়) ৫৭
" বলে বোধ (নিজেকে) ১৬০
" (ভোগমাত্রেই) ১৬৪
" (স্বপ্রকাশ বস্তু অনিত্য হতে পারে না) ৫৮
অনিত্য ৪২, (কর্মফল অনিত্য) ৫৫
" (জগৎকে সত্য বলে বোধ) ২৬৫
অনিত্যবস্তু ৯৫, ২৫০
অনিত্যসুখ ৩৭, ৪১
অনির্দেশ্য ৮১
" (সুখ) ২২৭
" (ব্রহ্ম) ২৩১
অনুচ্ছিত্তিধর্মা ১৭২
অনুপলব্ধি ২৪, ২৬০
অনুকল্প ২
অনুবৃত্তি (ব্যবহারের) ৮৫
অনুভব (তাঁর) ৫৮
" ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১০০, ১৩৫, ১৩৬, ১৬০, ১৬৮-১৬৯, ১৭৫-১৭৮, ২৪১, ২৬৪
" (আত্মার) ৬৬
" (আনন্দস্বরূপের) ৬৬
অনুভবক্রিয়ার কর্ম শরীর ৯৬
অনুভবের ধারা ২০৪
অনুভবের বিষয় ১০৯, ২০৩, ২৩০, ২৩৩
অনুভবগম্য ১৭১
অনুভবের শেষ কথা ২০৬
অনুভূতি ১৩৬, ২৪৮
" (অলৌকিক) ২৪১
" (আত্মা সম্বন্ধে) ১৭৬
" (ভ্রান্ত) ১৭২
" মানে অপরোক্ষ ৬৩
অনুভূতি মানে কি? ৬৩
অনুভূতির অগোচর পরব্রহ্ম ১৮৪
অনুভূতির (সব) পিছনে অনুসৃত তত্ত্ব ১৭২
অনুভূতির পরম্পরা (শাস্ত্র, যুক্তি) ২৬৬
অনুভূতির রেকর্ড (শাস্ত্র) ২৪০
অনুভূতির বিষয় ২০৩
অনুমান ১৫, ৯৭, ১৪৯, ১৯৫, ১৯৭, ২৬৩, ২৬৫
অনুমান (ন্যায়ের কথা) ২৪
অনুমান (প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল) ৯১
অনুমান প্রমাণ ২৪
অনুমানগম্য ১৪৯, ২৬২
অনুমেয় ১৪৯, ২০৮
অনুলোম প্রক্রিয়া ১৫৪
অনুশীলন ৬৪, ৬৫, ৭২, ১১০, ১৫২, ১৫৩

অনুষ্ঠেয় ৬৭ ; অনুস্যূত সম্বন্ধ ৭২
অন্তরতম (তিনি হলেন) ১৬৮
 ” হলেন আত্মা ১৬৮
অন্তরাত্মা ১৬৮, ২২১, ২৭৩,
অন্তরিন্দ্রিয় ১১১
অন্তরের অন্তস্তলে ৬৩
 ” করণ ২০১ ; অন্তর্জগৎ ১৬০
অন্তর্নিহিত ১৫৪
 ” সত্তা ৮০
অন্তর্মুখ অবস্থা (সাধনার দ্বারা লভ্য) ১৬৮, ১৭০, ১৭৪ ;
অন্ত্যপ্রমাণ ১৯, ৭১
অন্তঃকরণ ৫৮, ৬০, ১৪৯-১৫০, ১৬৮-১৭০, ১৭৪, ১৮৬, ২০১, ২১৯, ২২৮, ২৩৩, ২৫১, ২৫৭, ২৬৮
অন্তঃকরণ-এর নির্মলতা ১১৩,
 ” শুদ্ধি ১৩৭
অন্তঃকরণ জড় ১৯৫
অন্তকরণ মানে ভিতরের ইন্দ্রিয় ২০১
 ” (আত্মার স্থান) ২০২
অন্তকরণের করণতা ২৬১
অন্ধকার ৫৮, ৬২
 ”-এর অর্থ অজ্ঞান ২১৫
অন্যাভিমুখী গতি (মনের) ১৬৯
অন্বেষণ ৮৯, ৯০, ৯৫, ১১৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৫, ২৪০ ; অপচয় ৫৯
অপচয় বা উপচয় ৯৩
অপরব্রহ্ম ৭৯, ৮০, ৮১, ২৩৭
 ” প্রাপ্তিসাধন ৮০
অপরব্রহ্মস্বরূপ ৮২
অপরব্রহ্মস্বরূপতা ৮২
অপরাবিদ্যা ৪৯; অপরিগ্রহ ৬৪
অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ ২২৫
অপরিণামী ২৪৯, ২৬৫
অপরিণামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব ১৯৬
অপরিবর্তনশীল ৯৩, ১০২, ২৬৫
 ” (আত্মা) ১৬১
অপরিবর্তনশীল (সত্তা) ১০৭
অপরোক্ষ ২২৭
 ” অনুভব ২৫৬
অপরোক্ষ অনুভূতি ৩৬, ৬৫, ৬৬, ৮২
অপরোক্ষ অনুভূতির ফল ২২৪
অপরোক্ষ জ্ঞান ৬৩, ৬৪, ৬৫
অপরোক্ষ বস্তু ৬৩
অপরোক্ষানুভূতি ৬৩, ৭৮
অপবাদ ৭৫, ৭৬,
অপসিদ্ধান্ত ৭১,৭৪,৮২
অপূপাকার মাংসপিণ্ড ২০১
অপূর্ণতা ৮৫ ; অপূর্ণতাবোধ ৬৮
অপূর্ব ১৫, ১৬, ৭৩, ৭৪
অপূর্ব (মানবার দরকার নেই) ১৬
অপূর্বতা ৭৩, ৭৪ ; অপৌরুষেয় ৭২
অপ্রকাশ (জ্ঞান অপ্রকাশ থেকে যাবে ?) ৯০
অপ্রমাণ ৭১, ৭৩
অপ্রমত্ত ২৫৭, ২৫৯
অপ্রমত্ততা ২৫৯ ; অপ্রমাদ ২৫৭
অপ্রাপ্ত বস্তু ৬৫ ; অপ্রাপ্তির বোধ ৬৫
অপ্সরা ৪২ ; অবকাশ ৬৭, ৭৩
অবগুণ তাঁতে নেই ২৬৫
অবচ্ছেদ (কালিক অথবা ভূতান্তর দ্বারা) ১১২
অবদান ৭২ ; অবয়ব ১৪৯, ১৫৯
অবয়বের অপচয়ের দ্বারা বস্তুর বিনাশ হয় ১৫৯
অবশিষ্ট ১০০, ১০৪, ২০৪
অবস্থা ১৬০, ১৯৬
অবস্থা (গাছপাথরের) ৫৭
 ” (জড়) ৫৭
অবস্থান (আত্মাতে) ৬৫
অবাস্তব প্রতীতি ৬২
অবিকারিত্ব (আত্মার) ১০৫
অবিকারী আত্মা ১০৮
অবিচ্ছিন্ন সত্তা (আমি) ১৭২
অবিদ্যা ৩৯, ৫৭, ৬৮
 ” (অন্তর্হিত হয়) ৮৪
অবিদ্যা (লেশ) ১৯৭
 ” (বিদ্যার নিষেধ) ৪৩

অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য ৮৪
অবিদ্যাকর্মরূপ মৃত্যু ১৬৩
অবিদ্যা-কাম-কর্ম ৪২, ৬৮, ২৭৪
অবিদ্যাকামকর্মরূপ সংসার বন্ধন ১৯৪
অবিদ্যাজনিত ভ্রান্ত প্রত্যয়সমূহ ২৬৯
অবিদ্যাজনিত বাসনা ২৩৭
অবিদ্যার লেশ ৮৪
অবিদ্যাবাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ ১৭৩
অবিনাশী সত্তা ১০৮
অবিনাশী (অনুচ্ছিত্তিধর্মা) ১৭২
" নিত্যস্বভাব ২৩৮
অবিবেকী ৪৫, ১৭৩
অবিবেকী ব্যক্তি ৪১, ১৯২
অবিভাজ্য ৬৮, ১৮৮
" সত্তা ১৮৯
অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠা ১০৩
অবেদ (বেদ অবেদ হয়ে যান) ৯১
অব্যক্ত ৭৭, ৮১, ১৪৬, ১৫৫, ১৮৯, ২৩৭, ২৫২, ২৬৫
অব্যক্তই জগদ্‌বৃক্ষের বীজ ২৩৭
অব্যাকৃত উপাদান (জগতের) ১৫৯
অব্যাপক ২০১
অব্রহ্মভাব ৭০
অভয়স্থান (পরম) ৫৬
অভয়স্বরূপ ১৮৭, ১৯১
অভয়স্বরূপতা (তত্ত্বজ্ঞের) প্রাপ্তি ১৭৮
অভিধেয় অর্থ ৭১
অভিনয় দেখার আনন্দ হতো ১০৬
" (যা দেখছি সব) ১০৭
অভিন্নবোধ ১৬০, ১৮৬, ১৯২, ১৯৫
অভিব্যক্তি ৭৮, ৮০, ৮১
অভিভূত ১৫০, ১৭৭, ২৪৭
অভিমান ১৩০, ১৩৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০৯, ২১০
" 'আমি আমার' ১৯৬
অভুক্ত কর্মফল ২৩
অভ্যস্ত ১৬০
অভ্যাস (করতে হবে) ৬২, ৬৫, ৭৩, ৭৪
অভ্যুদয় ৩৯, ৪০
অভ্রান্ত (সিদ্ধান্ত) ১০৩
অমর ১৬১, ১৭১, ১৮৪, ১৯১
অমরণধর্মী ২২০, ২৩৫
অমরত্ব (আপেক্ষিক) ২৭০, ২৭১
" (আত্যন্তিক) ২৭১
অমরত্ব পাবার আকাঙ্ক্ষা ১০৫
অমরত্ব প্রাপ্য নয়, স্বভাবস্বরূপ ১০৬
অমরত্ব লাভের চেষ্টা ১৬১-১৬৩, ১৭১, ১৮৪
অমৃতত্ব লাভের চেষ্টা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৮৪
অমৃতত্বকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি ১৬২
অমৃতত্বলাভ ২৬৮, ২৭০, ২৭১
অমৃতস্বরূপ ২৬৮, ২৭৩
অমৃতধর্মী পরমেশ্বর ১৮৪
অযৌক্তিক (অনুপপন্ন) ৮৫
অরণি ১৮১
অরণ্য ১১৫
অরুন্ধতী দর্শন ন্যায় ৬৯
অর্জুন ৪৮, ১৯৭, ২১২, ২১৩
অর্থক্রিয়াকারিত্ব ৯৯
অর্থবাদ ১, ৭৩, ৭৪, ১৬৫
অর্থাপত্তি ২৪
অর্ধমাত্রা ৭৭
অলীক ২৩৬, ২৩৯
" মানে নিরর্থক ২৩৮
" বস্তুর অস্তিত্ব নেই ২৩৮
অলৌকিক অনুভূতি ২৪১
অলৌকিক উপায় (কামনাপূরণের) ১
অল্প শক্তি ৭১
অল্পজ্ঞ ৭১
অশ্বত্থ বৃক্ষ ২৩৫
অশ্বত্থ শব্দের অর্থ ২৩৫
অসৎ (হলে জগতের প্রতীতি হতো না) ২৩৯
অসন্দিগ্ধ-অবিপর্যস্ত-অসম্ভাবনা-বিপরীত-ভাবনারহিতজ্ঞান ৩৭
অসন্দিগ্ধ অবিপর্যস্ত আত্মজ্ঞান ১৭৬
অসন্দিগ্ধ অবিপর্যস্ত জ্ঞান ৬৩
অসন্দিগ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার ৭৭
অসন্দিগ্ধ জ্ঞান ৬৪

অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতি ৮৪
অসীম অনন্তকে সসীম সান্ত মনে চিন্তা ১৮৯
অস্তিত্ব ১৬৬, ১৮৫, ২৬০, ২৬১, ২৬৩
অস্তিত্ব (থাকে না) ১০১
অস্তিত্ববাচক পদ ৯৪
অস্তিত্ববাদী ২৬৩
অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ ১৯৩
অহং অর্থাৎ অবিদ্যা ৮৪
অহংকার ৭৭
অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্য ৭১
অক্ষর ৭৮
আইডিয়া (idea) ২০১, ২১৮
আইন্‌স্টাইন্ ১৩
আকাঙ্ক্ষা ২২, ৬৮, ৮৯, ১০৫, ১৬৮, ১৭০, ১৮৪
আকার ১৫০, ২২১, ২২৮
" মানে সব সময়ে রূপই নয় ২২৮
আকার শব্দের অর্থ ২২৮
আকাশ ১৬৭, ১৭৯, ১৮৮, ১৯৮
আকাশকুসুম ১১৬, ২৩৯
আকাশের উপমা ২২৪
আকাশের দৃষ্টান্ত ২২১
আকাশের রঙ নেই, রূপ নেই ২২৪
আচরণ ১২৮, ১৭৭
" (ব্রহ্মজ্ঞের) ১০৫
আচারশুদ্ধি ৬৪, ১৩০, ১৭৬
আচার্য ১৫৭, ১৫৮, ১৮৫-১৮৭, ১৯৭
আচার্য কোথায় পাওয়া যেত? ৮৫
আচার্য শঙ্কর ৬৮, ২৩৬
আচার্যত্ব ১৮৭
আত্মচৈতন্য ১৭৫, ১৮৩, ২০৪, ২২০, ২২১, ২২২, ২৩৪
আত্মজিজ্ঞাসু ১৫৪
আত্মজ্ঞ ৫৭, ৬৬, ১৯২
" (যিনি, তাঁর ভয় থাকে না) ৯৩
আত্মজ্ঞান ৮৯, ১৬৭, ১৯৭, ২৪৫, ২৪৮
আত্মজ্ঞান (কেবল বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায় না) ৩৫
" (দুরূহ) ৩৫
আত্মজ্ঞান (শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য) ৫৪
" (সহজবোধ্য নয়) ২৮
" অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় ২৩৩
" দ্বারাই মুক্তি ২৮
আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ ৪০
আত্মজ্ঞান লাভ ৬১, ৬৭, ১৫৪
আত্মজ্ঞান লাভের দুটি শর্ত ৩৬
" সম্বন্ধে বাধা ৯২
" -এর অধিকারী ১৭৬
আত্মজ্ঞানের ফল ৭৪
আত্মতত্ত্ব ৩৪, ৩৫-৩৮, ৪৯-৫১, ৫৫, ৫৬, ৬৫-৭০, ৮৯, ৯২, ১০৭, ১১৬, ১২২, ১২৯, ১৩১, ১৩৭, ১৪৯ ১৫৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ২০৯, ২১৬, ২৪২-২৪৫, ২৫০, ২৫৩, ২৬৬, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩
আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ (সর্বত্যাগ করে) ৩৯
আত্মতত্ত্ব অনুশীলনের জন্য অসাধারণ মূল্য দিতে প্রস্তুত ৩৯
আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু (নচিকেতা) ২৫
আত্মতত্ত্বদর্শী ১৪৯
আত্মতত্ত্ব বোঝা সুকঠিন ৫৪, ৫৭, ৬০-৬১
আত্মতত্ত্বের ধারণা ৬৪, ১৫৪
" প্রতিষ্ঠা ৭৫
আত্মদর্শন ১৯০, ২৪৭, ২৫৭
আত্মদৃষ্টি ১৯১
আত্মধর্ম (চৈতন্য) ১৯৭
আত্মধর্ম ৭৫,৭৬
আত্মবস্তু ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ২০৪
আত্মবস্তুকে বাহ্যবস্তুর মতো জানা যায় না ৯৫
আত্মবাদ ১৪০
আত্মবিচারের প্রয়োজন ১০১

আত্মবিৎ ১৪১, ১৭৭
আত্মবিশ্লেষণ ১৩০, ১৭৭
আত্মবিষয়ক সন্দেহ ৬৩
" অজ্ঞান ৬৮, ৭৯, ১৫১
আত্মবিষয়ে অন্বেষণ ১৫৬
আত্মমনঃসংযোগ ৯৮
আত্মলোক ১৬৪
আত্মসমাধি ১৭৬
আত্মসম্বন্ধী যোগ ৬০
আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান ১৫১
আত্ম সাক্ষাৎকার ৭৭, ১৯৯
আত্মস্বরূপকে ব্যাখ্যা ৭৫
আত্মস্বরূপ ৬০, ৬২, ৬৬, ৭৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৬৩, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৯, ১৯১, ২৫৫
আত্মা ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৮, ১৩৫, ১৪২, ১৪৮-১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৬-১৭৮, ১৮২, ১৮৪- ১৮৯, ১৯০- ১৯৪, ১৯৬, ১৯৯, ২০০
আত্মা (অচেতন) ৯৭
" (অণু থেকেও অণুতর, মহৎ থেকেও মহত্তর) ১০৭
আত্মা (অন্তরতম হলেন) ১৬৮, ১৭৪
" (সুখদুঃখের দ্বারা অস্পৃষ্ট) ১০৭
আত্মা (সেই বস্তুই) ১৯০
আত্মা অমৃতস্বরূপ ১৭১
আত্মাই অমৃত ১৬১
আত্মা প্রকাশস্বরূপ ২৩৪
আত্মা মানে আমি ১৭২
" শব্দ ১৪৬
আত্মা শব্দের অর্থ ১১১
" শব্দের ব্যাখ্যা ১১১
" শব্দের দুটি তাৎপর্য ১৪৮
" সম্বন্ধে কল্পনা ৫১
আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ় আছেন ১৬৭
আত্মা সহজে জানা যায় না ৫১
আত্মা স্বরূপত অকর্তা, অভোক্তা ৪৯
আত্মাকে প্রকাশ ৯২
আত্মানন্দ ২২৭, ২২৮
আত্মানন্দরূপ সুখলাভ ২২৫
আত্মানুভূতি ৬৩
আত্মার অনুভব ৬৬
" অমরত্বরূপধর্ম ১৬২
" উপর উপহিত গুণ ১১৬
" উপাধি ৫৮
" জ্ঞাতা ৮৮
আত্মার জ্ঞান (কখনো পরোক্ষ হয় না) ৬৩
" দুর্জ্ঞেয়ত্ব ১৬৭
আত্মার ধ্যান ২০২
আত্মার নিরাকরণ ১০৩
আত্মার ব্যাপকত্ব ১৪৬
আত্মার স্বরূপ ২৩, ৫৭, ৬৫, ৬৮, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১৩৩, ১৩৮
আত্মার স্থান ৮৯
আত্মোপলব্ধি ৭০, ২০০
আদর্শ ১৩০
আদিত্য ১২২, ১৯৮
আধার ২২০, ২৩০
আধুনিক বিজ্ঞান ৫২, ১১০, ১৩১
" মনোবিজ্ঞানী ৫৩
আনন্দ ১৬৫, ১৭৯, ১৮৬
আনন্দ (দুঃখেরই নামান্তর) ২৫
" (মানে) ৯৪
আনন্দস্বরূপ ৬৬, ১৬৫, ২২৬
আনন্দের উৎস আত্মা ১৬৫
আনন্দের উৎস-স্বরূপ ৬১
আনন্দানুভূতি ৬৬
আন্তর বস্তু ৫৩, ২১৯
আপ্ত ২৪০
আপ্তবাক্য ২৫, ২৪২
আবসথ্য অগ্নি ১৩৭
আভাসচৈতন্য ১৫০
আমি ৫২, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ২০৫
আমি (অধ্যস্ত) ৮৭
" (অবিদ্যার) ৮৫

আমি (যথার্থ) ১৭৫
আমি (বিদ্যার) ৮৫
আমি অজ্ঞ ৩৭
" অবিচ্ছিন্ন সত্তা ১৭২
আমি-আমার অভিমান ১৯৬
" কর্তা ভোক্তারূপে বিষয় ভোগ করি ১৭২
আমি কাকে বলব? ৫৩
আমি দেহ থেকে ভিন্ন ৮৭
" নিজের মধ্যে সকলের উপসংহারক ১৭২
আমি নেই এরকম কখনো হয় না ১১৩
(যে) আমি বলছি আমার প্রারব্ধ সেই আমি কি আত্মা ৮৭
আমি ব্রহ্ম ১৭৭
আমি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ৮৮
আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ১৭২
আমি সেই পরমাত্মা ১৭৮
আমিত্ববোধ ১৯৭
আমির অন্বেষণ ৯০
আমি-বুদ্ধি ৪২
আমি-বোধ (দেহে) ৪২
আরুণি ১০
আরোপ ৬১, ৯২, ১০৭, ১১৩, ১৭২, ১৮৯, ১৯২, ২৩৮
আরোপিত ৭০
" আত্মধর্ম (শরীরে) ১৭২
" উপাধির অপবাদ করলে যা থাকে ২৩০-৩১
" চৈতন্য ১১৩
" জগৎ ২৩৮
" জ্ঞান ২৩০
" ধর্ম (আত্মার উপর) ৯২
" নামরূপ ৯৫
" (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি) ১৯৩
" বৈচিত্র্য ১১৩
" (ব্রহ্মে জগৎ) ১৮২
" (রজ্জুতে সর্প) ১৮২
" (স্ফটিকে যে লাল বর্ণ) ১৯২-৯৩
আরোপিতের জ্ঞান ২৩০
আরোপের নিরাকরণ ৭৫
আরোপ্য ১৮৩, ২৩৮, ২৩৯
" বস্তু ২৩০, ২৩৪
আলোর পথ ২১৫
আলোকের পথ ২১৫
আশা (অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাবার আকাঙ্ক্ষা) ৭
আশ্রয় ১৬৬, ১৯৮; আহবনীয় ১৩৭
আহার্যস্বরূপ ১৩২; ইংগিত ২৪১
ইচ্ছা ১৬২, ১৮৭
" (জগৎ সৃষ্টির) ৮০, ১৪৭
" থেকে জগৎ সৃষ্টি ৮০, ১৭৮
ইতিহাস ২৬
ইন্দ্র ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৬১
ইন্দ্রজাল ২৩৬; ইন্দ্রলোক ১৬৩
ইন্দ্রিয় ৬০, ৬২, ৬৪, ৮৯-৯১, ১১১, ১৪২-১৪৭, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৮-১৭১, ১৭২, ১৭৩-৭৪, ১৭৫-৭৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯২-১৯৮, ২০১, ২০২-২০৪
ইন্দ্রিয়গ্রাম ১৫৪; ইন্দ্রিয়ধর্মী ৬১
ইন্দ্রিয়প্রণালী ১৫০; ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ৫৮
ইন্দ্রিয়সংযম ৬৯, ৭৭, ১২৭, ১৩০-১৩১, ১৭৭; ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি ৬১
ইন্দ্রিয়ের অগোচর ১৫৩
" দ্বারা গ্রাহ্য ১৫১
" প্রভু ২০২
" শান্তি ১৩০
ইষ্ট (বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মের ফল) ৭
ইষ্টবোধ ২৪৮; ইষ্টাপূর্ত ৭
ইহলোক ১৬৪, ১৭১
ইহলৌকিক সুখ ১, ৯, ১০, ২২, ২৫, ৩৭, ৪৪; ইংগারসোল ৪৬
ঈর্ষা ৯০, ঈশান ১৮৯
ঈশ্বর ১৬, ৬২, ১৫২-১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ২৩০
ঈশ্বর কর্ম-অনুরূপ ফল দেন ১৬
" (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা) ৬৮

ঈশ্বর (জগৎসিসৃক্ষু) ৮০
উঞ্ছবৃত্তি ১৩০; উৎক্রমণ ২০২
উত্তরমীমাংসক ১৫, ১৬
উত্তরায়ণ ৪৭, ৪৮
" এর অভিমানী দেবতা ২১৫
উৎপত্তি এবং বিনাশ ৫৮
উৎপত্তি-বিনাশশীল ৫৮
উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেরই বিনাশ আছে ১০৫; উৎপন্ন জ্ঞান ৯৮
উৎপাদ্য ৮২, ৮৩
উৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান ৮২
উৎপাদ্য সুখ ৩৭, ৬৭; উৎস-স্বরূপ ৬১
উদাসীন ২৫; উদ্দালক ১০
উদ্দেশ্য ১০১, ১৩৯, ১৪০, ১৬২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৯, ২৪২, ২৪৯
উদ্দেশ্য (অজ্ঞানের হাত থেকে নিষ্কৃতি) ৩৭, ৭০
উদ্দেশ্য (আমাদের) ৩৭
" (আসল) ৬৫
" বন্ধনমুক্তি ৩৭
উদ্ভাসন ৫৮
উপকরণ ৭২, ১১৪, ১৯৫
উপক্রম ও উপসংহার ৭৩, ৭৪
উপচয় ৫৯; উপজাত ৫৩
উপদেশ ৫১, ৬৭-৬৯, ৭৭, ৮৫, ১২৯, ১৪১, ১৬১-১৬৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯৬; উপনয়ন ১৯
উপনিষদ্ ৭৫, ৮৯, ৯৫, ১১০, ১১২, ১৫১, ১৬০, ১৬২-১৬৪, ১৭০, ১৮৫-১৯০, ১৯৫
" -এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ১৫৫
" এর কাহিনী ১৩২
" এর শিক্ষা ৫৮
উপপত্তি ৭৩, ৭৪; উপমান প্রমাণ ২৪
উপলব্ধি ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৯২, ১৩৫, ১৪০, ১৬০, ১৬২, ১৮৪-৮৫, ১৮৭, ১৯২, ১৯৪
উপসংহার ১৬৩, ১৬৫, ১৯৬
উপাদান ১৪০, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯; উপলক্ষণ ১৩৯, ১৫৪
উপাধি ৭০, ৭৫, ৭৮, ৯২, ১০৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২০৩, ২৫০, ২৫৩
" (ইন্দ্রিয়রূপ) ৬১
" (মনরূপ) ৬১; উপাধি (মানে) ৫৮
উপাধিগুলি সব নামমাত্র ১১৫
উপাধিধর্ম ৬১, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১১৬, ২২১; উপাধিধর্মরহিত ১১৬
উপাধিধর্মবর্জিত ৯৪, ১৩৮, ২৩১
উপাধিধর্ম সংশ্লিষ্ট ২৩১
উপাধিধর্মেরও তিনিই আত্মা ১১৪
উপাধিনির্মুক্ত ২৬৭; উপাধিযুক্ত ৫৮
উপাধিবিযুক্ত করে আত্মাকে জানতে হবে ১১৩
উপাধিসকলের দ্বারা তিনি অস্পৃষ্ট ১০৭
উপায় ৬৪, ৭৩, ৭৪, ৯২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২২৬, ২৩৩
উপায় (অতি সোজা) ৬১
" (অন্য কোন নেই) ১১৪
উপায় (অমরত্বলাভ) ১৬১, ১৬২, ১৬৮-১৭১, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮
" (সেতু অর্থাৎ) ১৩৮, ১৪৫
উপায় উদ্ভাবন ১৬২
উপাসক ৭৯, ৮১
উপাসকদের মার্গ ৪৭
উপাসনা ৭১, ৭৭-৭৮
উপাসনা পরম্পরাক্রমে আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ ৮২
উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় ৮২
উপাস্য ৭৮, ৮০; উপাস্য আত্মা ২০১
উমা ১৩৩; ঊর্ধ্বমূল ২৩৫
ঋত ১৩৬, ১৯৯, ২৪২
ঋতজা ১৯৯
একাকার ১৯২; এক কারণ ১৪০
এক বহু হননি ২২৪
এক বহু হলেন কেমন করে? ২২৪
এক রূপ ১৮৯; এক সদ্বস্তু ১৪০
এক হয়েও বহু ২৩১

এক হয়েও বহুরূপে প্রকাশিত ২২৬
একত্ব ৭১, ১৩৯, ১৮৩, ১৮৪
একত্বরূপ গুণ ২০০
একত্বের বোধে প্রতিষ্ঠিত ২৩২
একাগ্র ১৪৯, ১৭১
একাগ্রতা ১২৭, ১৬৭, ১৭৬
একাগ্রবুদ্ধি ১৪৯, ১৫৪
এশিয়াটিক সোসাইটি ১৫২
ঐক্য ৭০, ৭১, ৮৫, ১৩৭
ঐক্যানুভূতি ৭০
ঐশ্বর্য (কর্মফল) ৫৫, ৮০
,,(সৃষ্টি কর্তৃত্বরূপ) ৮১
ঐহিক ১৬২, ১৬৪
ওঙ্কার ৬৯, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১
ওঙ্কার-প্রতীকোপাসনা ৯২, ১৮৯
ওঙ্কারের সৃষ্টি ৮১; ওম্ ৬৯, ৭৭
করণ ৯০, ৯১, ২০৩
কর্তা ৬৮, ৭০, ১৫৯, ১৭৮, ১৮৪
কর্তা আর কর্ম এক হতে পারে না ৯৬
কর্তা (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের) ৬৭
,, বললেই তাঁর পরিচ্ছেদ এসে যাবে ১০১
,, ভোক্তা ৩৭, ৪৫, ৭০, ১৩৫, ১৫৯
,, (যে কর্তা সেই কর্ম) ৫৯, ৭৬
কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা ১৩৩
কর্তৃত্ব-কর্মত্ব-ধর্মবর্জিত আত্মা ১০৩
কর্তৃত্ববোধ ১০৪
,, -ভোক্তৃত্ব ৪৫, ১১৬, ১৬০
,, ,, -জনিত দুঃখ ২২৪
কর্তৃত্বাভিমান ১০২, ১৩৩
কর্ম ৭০, ৭১, ৭৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৯৪, ২৪৮
,, (আত্মা লিপ্ত হন না) ১৪
,, (আত্মার কোন কর্ম থাকে না) ৮৭
,, (জ্ঞান ও কর্ম) ১৫
,, নিয়ম ২৩
,, (যজ্ঞীয়) ১৫
কর্ম (বেদের তাৎপর্য) ৪৫
কর্ম (শুভাশুভ) ৬৮; কর্ম-অনুষ্ঠান ৪৬
কর্মকাণ্ড (-এর বিধি) ১৪, ৪৪, ৬৭
কর্মত্ব ১০৫
কর্মফল ২৩, ১৭৮, ১৯৭, ২১৫-২১৬
,, ভোক্তা ১৩৬
কর্মভোগ ১৬৬; কর্ম এবং উপাসনা ৭০
কর্ম বা উপাসনা ৭৩
কর্ম সহিত উপাসনা ৪৮; কর্মী ১৩৬
কর্মীদের মার্গ ৪৭; কর্মেন্দ্রিয় ১৫৯
কর্মের পথ ৪৮
,, পরিণাম ৮২
,, ফল ৬৮
কর্মের শৃঙ্খলা ১৬, ২৩
কাজ ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৭
কাদাচিৎক ৮২, ৮৩; কাম ৬৮
কামনা ১৭৩
,, (মানুষের অনন্ত) ১
কামনা (যজ্ঞ করার মূল) ১
কামনা (শেষ কথা) ৫৬
কামনা (স্বর্গকামনা) ১
কামনাজনিত কর্ম ২৩৮
কামনাপূরণের উপায় ১
কামনাবিশিষ্ট ৭০; কাম্যসুখ ৩৭
কায়িক তপস্যা ৭৭
,, সংযম ১৪৬
কারণ ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৭, ১৪০, ১৪৬ ১৫৪, ১৬৫, ১৬৮-১৮৫, ১৮৯, ২৯৮, ২৪১
কারণ (আত্মসাক্ষাৎকারের) ৮২
কারণাতীত ১৪০
কারণান্তর থেকে উৎপন্ন হন না ৯৩
কারণ (কার্যের বিপরীত, অকৃত) ৬৭
কার্য ৫৮, ৬৭, ১৪৬, ১৫৫, ১৬৫, ১৭৯-১৮৫ কার্য ও কারণ ৬৮
কার্য তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়নি ৯৩
কার্য দেখে কারণের অনুমান ২৩৫
কার্যকারণ ১৭৯, ১৮০
কার্যকারণ শৃঙ্খল ৮৩
কার্যকারণ শৃঙ্খলা ১৪০
কার্যকারণসম্বন্ধ ৬৬, ৬৮, ৮২, ৮৪, ১১০ ; কার্যকারণসম্বন্ধশূন্য ৮১
কার্যকারণাত্মক দেহ ২০৪

কার্যকারণাদি থেকে পৃথকতত্ত্ব ৯২
কার্যকারণের অতীত ৭৯
কার্যকারণের অভিব্যক্তি ৮১
কার্যকে কারণে লয় ১৫৪
কার্যের দ্বারা অনুমেয় ১৪৯
কাল ৬৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০
কাল-এর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ৯৩
কাল পরিচ্ছেদ ২২৫
কুল ১৬৪
কৃচ্ছ্রসাধন ৬৯, ৭৭
কেন্দ্র ২৫, ১৮২
" (চৈতন্যের বা চিন্তার) ১১০
কেন্দ্র (জ্ঞানের) ৫৮; কেন্দ্রিত ৬৪
কেন্দ্রের নাম হৃদয় ১১০
কোষ (মস্তিষ্কের) ৫৩
কৌশল ১৭১, ১৮৯
ক্রতুঃ মানে সংকল্প, মন ১১২
ক্রম ৬৮, ১৪৭, ১৬৯, ১৮০, ১৮৭
ক্রমমুক্তি ৪৮, ২৪৮
" -র পথ ২১৪, ২১৫
ক্রান্তদর্শী ১৫৫; ক্রিয়া ১৭৬, ২৩১
ক্রিয়া (থাকাটা তাঁর কোন ক্রিয়া নয়) ৯১; ক্রিয়ার কর্তা ১০৩
ক্রিয়ার ফলের আশ্রয় কর্ম ১০৩
ক্রিয়াশক্তি ২৩৭; ক্লেশ ১৭৩
খণ্ডন ৯৮
খণ্ডিত (দেশের দ্বারা, কালের দ্বারা, বস্তুর দ্বারা) ১১২
খ্যাতি ১৬২; খ্রীস্টান ১৮৩
গঙ্গা ৮৪, ১৮৮
গতি ১৫৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৯৬,
" (অর্থ) ৫১
" (দেবলোকে) ৪৭
গতি (প্রাণীর) ৪৬
" (সাধকের) ৪৮
" (সূর্যের) ৪৭
গতির (সকল) পরিসমাপ্তি ১৪৫
গতিশীল (তিনি) গতিহীন (তিনি) ১১৩
গন্ধর্বনগর ২৩৬; গন্ধর্বলোক ২৪৮
গাছ দেখতে দেখতে অরণ্যকে হারিয়ে ফেলেছি ১১৫
গায়ত্রী ৭৮; গার্হপত্য ১৩৭
গীতা ১৭০, ১৭৪, ১৯৭, ২১৪
গুছিয়ে নেওয়া ৪৪; গুঞ্জাফল ৮৬
গুণ (বিশেষ) ১০৫, ১৫৯, ২৩১
গুণের অতীত ১৫৯
গুরু ৫৫, ১৬৩, ১৮৬
গুরুগৃহে বাস ৬৯
গুরুশিষ্যপরম্পরা ক্রমে ১৬৩
গুহায় নিহিত ১০৯; গুহ্য ১৯৪
গূঢ় ৫৮; গৃহ ৬৬, ১৯৯
গৃহস্থ ৬, ১৩৭, ১৯৯
গোপন (আকাঙ্ক্ষা) ৪০, ১৭৯, ১৮৭
গোপনীয় ১৬৫, ১৭৯
গোপী ২১৬, ২১৭; গোড়া ১৭৬, ১৭৭
গৌণভাব ২৫৫; গৌণরূপে নয় ১৬০
গৌণসত্তা ২০৩
গৌরব-লাঘব বিচার ১৯৫; গ্রহ ১৯৫
গ্রহণ ১৭০, ১৭২, ১৮৪, ১৯৬ ১৯৮
গ্রহণকারিণী ১৮০; গ্রহণশক্তি ১৫৯
ঘটজ্ঞান ১৫০; ঘটবিষয়ক অজ্ঞান ১৫০
ঘটাকাশ ১১১, ২২২
ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ১১১
ঘটাকারাবৃত্তি ১৫০, ২২৮
ঘুম ১৬২, ১৬৬
ঘুমের ওষুধ ২০৫
চণ্ড ২৬; চণ্ডী ৭৭
চন্দ্রলোক ৪৮; চরম কাম্য ৫৭
চরম তত্ত্ব ৫২; ১৫৫
" নীতি ১২৯
" প্রমাণ ৭১
চরম লক্ষ্য ৭০, ১৩০, ১৪৭
চরম সত্তা ১২৯
" সূক্ষ্মতত্ত্ব ৫২, চরিত্র ১৭৭
চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি ২০০; চাটনি ৩৮
চাতুর্মাস্য যাগ ৭, ১৩; চান্দ্রপথ ৪৭
চার্বাক ২৩, ১০৩; চাল ৬১, ৬৫
চিকিৎসা শাস্ত্র ২০৫; চিৎ ১৭৯, ২৫৪

চিৎ (মানে) ৯৪; চিত্ত ১৭১, ১৭৬, ১৯৫
চিত্ত (শুদ্ধ হবে) ৬৫; চিত্তবৃত্তি ১১০
চিত্তশুদ্ধি ৮২; চিদাভাস ১৫১
চিন্তা (শব্দ) ১০৯, ১১০
চিন্তা চৈতন্যধর্ম ১০৯; চিন্তার বিষয় ৮১
চেতন ৫৮, ৬১, ১৪৭, ১৭২, ১৭৬, ১৯৫, ২৫০
চেতন হয়েও অচেতন ২৩০
চেতনবস্তু ৯৬, ১৫০
চেষ্টা (ভুল পথে) ৮৯
চেষ্টা করে নীতিপরায়ণ ১০৪
চৈতন্য ৯৬, ৯৭, ১৫০, ১৫১, ১৫৯, ১৭৫, ১৭৮, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২২৪, ২২৯
চৈতন্য (শুদ্ধ, নির্বিশেষ) ১০১
চৈতন্যজ্যোতি ২৩৪, চৈতন্যধর্ম ১০৯
চৈতন্যময়ী ২৪৪
চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত আত্মা ২২৫
চৈতন্যস্বরূপ ১৯৪, ২২৪, ২৪৯
চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ২০৩
চৈতন্যের প্রকাশ ১৩৫
চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকার ২২১
ছত্রিন্যায় ১৩৬
ছায়া ১৬০, ১৬১
ছায়া (বিধির) ৭৪
ছায়া আর আতপ ১৩৬
ছাড়পত্র (যা খুশি করার) ১০৩
ছোঁয়া (অবিদ্যার) ৮৪
জগৎ ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৮২-১৮৬, ১৮৯, ১৯৮, ২২২, ২২৪
" অলীক হলে জগতের প্রতীতি হতো না ২৩৯; জগৎ মিথ্যা ২৩৮, ২৩৯
জগৎ যেমন আছে তেমনি থাকবে ১০৬
জগৎ বস্তুত ব্রহ্মস্বরূপ ২৩৮
জগতের আদি অনভিব্যক্তরূপ ২৩৭
" আদি কারণ ১৪৮
" আধার ২৩০
জগতের আশ্রয়স্বরূপ ৫৬
" উৎপত্তি ১৫৩
জগতের উপাদান ১৫৯
" এক ব্রহ্মস্বরূপেই পর্যবসান ৯৩
" ক্রমাভিব্যক্তি ১৪৭
" ধর্ম ২২৫
" বৈচিত্র্য অনন্ত ১৪০
" সত্যতা সম্বন্ধে ভ্রান্তি ৮৬
" সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা ঈশ্বর ৭৮
জগৎকর্তা ৮১; জগৎকারণ ১৮৫
জগৎকারণ পরমেশ্বর ১৪৭
জগৎকেন্দ্র হিরণ্যগর্ভ ১৮২
জগৎপ্রপঞ্চ ৭৭; জগৎসিসৃক্ষু ঈশ্বর ৮০
জগৎস্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মাশক্তিলাভ ৮১
জগদতীত সত্য ২৪০
" তত্ত্ব ২৪০
জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ ৫৮, ৭৬
জনকরাজা ৯৩
জনকরাজা মহাতেজা ৪২
জন্ম ৬১, ১৬৬-১৬৭, ১৭১, ১৭৯, ১৯১, ১৯৫; জন্ম-জন্মান্তর ২৫১
জন্ম-মৃত্যু ১৫৯, ১৮৪
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ৭৯
জন্ম-মৃত্যু-পরম্পরা ৪৯
জন্মমৃত্যুর বন্ধন ৬৩
জন্মান্তরবাদ ১৯, জন্য সুখ ৩৭
জরা ৬১; জহাতি পদ ৫৭
জড় ১৯৪, ১৯৫, ২০৪
জড় অবস্থা ৫৭
" জগৎ ১৪০; জড়ত্বপ্রধান ২৪৬
জড়ধর্ম ৬১, ৬৭, ২০০; জড়বস্তু ১৫০, ২২৫
জড়শক্তি ৫২; জড়ের ধর্ম ৫৮
জড়বাদীর দৃষ্টি ৯৭
জাগতিক ভোগসুখের অন্বেষণ ১৬৫
জাগতিক সাফল্য ৪৪
" সুখ ৩৮, ১৭৩
জাগতিক সুখের অনিত্যতা ১৭৩
জাতি ১৬৪; জাতি (পরিভাষা) ২৩১

জাতি গুণ ক্রিয়া ১০১
জাতির দ্বারা বস্তু নির্দেশ ২৩১
জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি ১৩
জীব ৫, ৮১, ১৩৪, ১৪০, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪-১৮৫, ১৮৯-১৯১, ১৯৪, ২০০, ২১৫
জীব (মরণশীল) ৬০, ৭০, ৭১
জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন ৮৫
জীবকোষ ১১০; জীবত্ব ৮১
জীবদেহ ২০৩
" -এর পরিণতি ১১০
জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ৮৫
জীবনের সার্থকতা ৪০
" মূল লক্ষ্য ৪০
জীবন্মুক্তি ১০৭, ১৫২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭; জীবন্মুক্তির প্রতিষ্ঠা ১০৭
জীবন্মুক্তি শব্দের অর্থ ১০৭
জীবন্মুক্তি শব্দের প্রয়োগ ১০৭
জীবাত্মা ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৮৬, ১৮৯, ২৪৪; জীবাধিষ্ঠিত শরীর ১৪১
জীবের সংখ্যা ১৩৯; জেমস্ জীন্স্ ১২
জ্ঞাতা ১৭৫, ১৭৬
" (তিনিই একমাত্র) ৬০
" (পরিবর্তনশীল আত্মার) ৮৮
জ্ঞান ১৫১, ১৬২, ১৬৩, ১৭১, ১৭৫-১৭৯, ১৯৪-১৯৬, ১৯৭, ২৪৭, ২৫৬
জ্ঞান (অসন্দিগ্ধ অবিপর্যস্ত অসম্ভাবনা-বিপরীত ভাবনারহিত) ৩৭
" (পরোক্ষ) ৩৬
" (প্রত্যক্ষ) ৩৬
" (বুদ্ধিগম্য) ৩৬
" (সংশয়-বিপর্যয়রহিত) ৩৭
জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে ৮৪
জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান ১৩৭
জ্ঞানকাণ্ড ৭১, ৭৪; জ্ঞান-খড়্গ ২৫১
জ্ঞানগুণ (আত্মাতে) ৯৭, ৯৮
জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক ৫৭
জ্ঞানপ্রধান ৪৮; জ্ঞানবৃত্তি ৯৫
জ্ঞানলাভ ৫৭
জ্ঞানলাভ (একটি মাত্র উপায়) ৩৭
জ্ঞানস্বরূপ ৯১, ১০৩, ১৭৯, ১৯৬
জ্ঞানাগ্নি ৮৪, ৮৫, ১৯৭
জ্ঞানী ৫৭, ৫৯, ১৭৮, ১৯৪, ১৯৬ ১৯৭, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৫০
জ্ঞানী পুরুষের আচরণ ১২৮, ১৪২
জ্ঞানীর ব্যবহার ৮৪, ৮৭
" স্বরূপ ৯২, ৯৫
জ্ঞানে রুচি ১১৭; জ্ঞানেন্দ্রিয় ১৫৯
জ্ঞানের অর্থান্তর ৭৯
" উন্মেষ ১০৬
" কেন্দ্র ৫৮
" দুটি ভাগ ১০২
" দ্বারা নাশ্য (অবিদ্যা) ৮৪
" নতুন অধ্যায় সৃষ্টি ১৩৮
জ্ঞানের পথ ২১৫
" পরেও অবিদ্যার লেশ ৮৪
জ্ঞানের বিভাগ ১০২
" বিশেষ ১০০
জ্ঞানের বিষয় ৭৬, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৭, ১০০, ১০১, ১৫১
" ব্যাঘাত ১২৮
" সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত ৯৫
" সঙ্গে ব্যবহারের সহঅস্তিত্ব ৮৬
জ্ঞেয় ৬০, ১৬৯, ১৭৬, ২৩৩
জ্ঞেয়বস্তু ৯১, ২৩৩; জ্ঞেয়ের রাজ্য ৯৫
জ্যোতির্ময় সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ২৩৫
জ্যোতিঃস্বভাব ২৩৮
ডঙ্কামারা জায়গা ২০২; তৎ-স্বরূপ ৬০
তত্ত্ব ৫৩, ৫৭, ৬৯, ৭০, ৭৭, ১৩৩, ১৪০, ১৫৪, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২, ১৭৬, ১৭৯-১৮৩, ১৯০-১৯২, ১৯৬, ২০১, ২০৫, ২২১, ২২৫, ২৩৮-২৪১
তত্ত্ব (পরোক্ষভাবে জানলে হবে না) ৩৬
তত্ত্ব কি স্বতন্ত্র না বস্তুতন্ত্র ৯৮

তত্ত্বকে স্বরূপে জানলে বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায় ১০৭; তত্ত্বজ্ঞান ১০২, ১৭৮
তত্ত্বজ্ঞান লাভ ১৫৮
তত্ত্বদর্শী ১৯২, ২৬১; তত্ত্বলাভ ২৪১
তদাকারা বৃত্তি ২২৮; তদ্রূপপ্রাপ্তি ৭৮
তদ্রূপাপত্তি ৭৮; তপশ্চর্যা ৭৭
তপস্যা ১৩১; তব্য-প্রত্যয় ৭৩
তর্ক ৫৩-৫৫, ৮৩, ২৪১
তর্ক (শ্রুতি অনুসারী) ৯৯
তর্কপটু ৯৮; তর্ক-বিতর্ক ৬৫
তর্কবিচার ২৪১; তর্কশাস্ত্র ১৯৫
তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হবে না ৯৮
তাৎপর্য ৬৭, ৬৯-৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮৪, ১০৭, ১২০, ১৩৪, ১৪৯, ১৫৪, ১৬৩, ১৭১, ১৭৮, ১৮৮, ১৯০, ১৯৫, ১৯৮, ২০৩, ২১৫, ২৫৩, ২৫৬
তাৎপর্য (বেদের) ৪৫, ৭০, ৭৪, ৮৫
 ,, (শাস্ত্রের) ৪৫, ৬৪
 ,, (শ্রুতির) ৯৮; তাদাত্ম্য ৮১
তাদাত্ম্যজ্ঞানের নিবৃত্তি ১০২
তিনটি কথা ১২৭; তুলান্বেষণ ১৪০
তেজ ১৭৯; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১৩৯
তোতাপুরী ২৫১; ত্রসরেণু ৫২
ত্রিণাচিকেত ১৩৭; ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ ১১২
ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য ৬৮; ত্রিমাত্র ৭৭
ত্রিমাত্রিক বস্তু ২২৮
থাকাটা তাঁর কোন ক্রিয়া নয় ৯১
দক্ষিণায়ন ৪৭, ২১৪; দত্তকপুত্র ১০
দর্শন ৫২, ৭৫, ৮৭, ১৫৩, ২০১, ২৪১, ২৪৮
দর্শনের উপযোগিতা ৯৬
দর্শনের বিভিন্ন শাখা ৮৩
দশাঙ্গুলি পরিমাণ ১৮৮
দার্শনিক ৫২, ৫৩, ৭৫, ৮৫, ৮৯, ১৫৯, ১৭৫, ২৪০
 ,, পরিভাষায় অলীক শব্দের অর্থ ২৩৮
 ,, বিচার ৫২, ১০১, ১১৭, ১৫৯, ১৭৫
দিব্যানুভূতি ২৪১; দুর্গা প্রতিমা ১৮৯
দুঃখ ৬২; দুঃখ-এর লাঘব ৪০
দুঃখপ্রদ ১৬০; দুঃখময় ৫৭
দুঃখের নিবৃত্তি ৩৭, ৪০, ৭৯, ১০১
দৃশ্য ৫২
দৃশ্য জগৎ ৫২, ৮৩
 ,, বস্তু ৫৯
দৃষ্টনষ্টস্বরূপ ২৩৬
দৃষ্টান্ত ১৮১, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২২১, ২২২
দৃষ্টিবিরোধ ১৯৭; দৃষ্টির পরিণাম ১০০
দেবতা ১৬১, ১৭১, ১৮০, ১৮২, ২৪৪
 ,, (অগ্নি-অভিমানী) ২১৫
 ,, (দিবসাভিমানী) ২১৫
দেবতা (উচ্চশ্রেণীর জীব) ২৭
দেবতাদের সংশয় ২৭
দেবতাদের সন্দেহ ২৮
দেবযান ২১৪; দেবলোক ৪৭, ৬৩
দেব শব্দ ৫৭
দেহ ৪২, ৬৮, ৯৬, ১৪১, ১৬২, ১৬৬, ১৭২, ১৭৫, ১৮৪, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪-১৯৮, ২০২, ২০৪
দেহধর্ম ১৯৫; দেহধর্মবর্জিত ২২১
দেহপুরী ১৯০; দেহমুক্তি ১৯৪
দেহযাত্রা ২০৫; দেহরূপ উপাধি ৬১
দেহরূপ পুর ২০৪; দেহাত্মভাব ৮৭
দেহাত্মবাদ ১৬১; দেহাত্মবাদী ৪৬
দেহাত্মবুদ্ধি ৮৭; দেহাত্মবোধ ১৯৭
দেহাদির ধর্ম ২০০
দেহাদিসংঘাত ২০৪
দেহান্তর গমনের পন্থা ২১৪
দেহান্তরগামী আত্মা ২২, ৬৮
দেহাভিমানী আত্মা ১৮৯, ২০৪
দেহাবচ্ছিন্ন ২৪০
দেহী ১৯৪
দেহেন্দ্রিয়াদি ৪৫, ৬৮, ১৭৫, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮, ২০৫
দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম ২২৪; দৈবজ্ঞ ২৬
দৈশিক ব্যাপকতা ১৮২

দোষ ৮১, ৯৭, ১০৫, ১৭৪, ১৭৫, ২০০
দোষ (ন্যায়ের, তর্কের) ৫৯, ৮২
দ্যুলোক ১৯৮
দ্রষ্টা ৫২, ৫৯, ৬০, ৭৬, ১০০, ১০৯
দ্রষ্টার অনুভব ১০০
" দৃষ্টি ১০০
দ্বৈতনিবৃত্তি ৮৩; দ্বৈতপ্রতীতি ১০৬
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ ৯৮
দ্বৈতাপত্তি ৮২; দ্বৈতের অতীত ১৭৮
দ্বৈতের অবসান ১৪৭
" ভান ১০৭
দ্ব্যণুক ৫২
ধর্ম ১৬২, ১৯১-১৯৩, ২৫০, ২৫৪
ধর্ম (জীবনের পরিপূরক) ৩৮
" (বলা হচ্ছে) ৬৭
" (যাকে ধর্ম বলি) ৬৫
ধর্মধর্মী সম্বন্ধ ৯৭
ধর্মনীতি ১২৬, ১২৭
ধর্মশাস্ত্র ৬৫; ধর্মাধর্ম ৯২
ধর্মানুষ্ঠান ৬৫; ধর্মান্তর সৃষ্টি ৬৬
ধারণা ৬৪, ৬৯, ৭২, ৭৯, ৮৮, ১১৬, ১৩৯, ১৪৯, ১৫২, ১৬০, ১৬৯, ১৭৪, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ২৫৬
ধ্যান ১৭০, ১৮৮, ১৯০, ১৯৪, ১৯৬, ২২৯
ধ্যান (আত্মার) ২০২
ধ্যেয় ১৭১; ধ্যেয় বস্তু ৬৪
ধ্রুব ৫৫, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪
নঞ্-প্রত্যয় ৪৩
নতুন জীব সৃষ্টি ১৩৯; নরঋণ ৭
নশ্বর ১৬৪
নাচিকেত অগ্নি ৫৫, ১৩৫, ১৩৬
নানা জ্ঞান ৫৯; নানা বস্তু ৫৯
নানা সংশয় ১০০
নাভি ১৮২, ১৯৪
নাম বা রূপের অনন্ত প্রকার ১১৫
নামরূপ ৯৫, ১৭৯, ১৮৩
নামরূপাত্মক জগৎ ১৩৯
নামরূপাদিযুক্ত ২২৪
নামরূপের অতীত ৮১
নামান্তর ১৭৪; নারদ ১৪০
নারায়ণ ৮০; নাশ্য ৬৭
নাশ্য-নাশক সম্বন্ধ ৮২
নিউ টেস্টামেন্ট ৩১
নিজ মনের প্রভু ১৫৩
নিজেকে কর্তা ভোক্তারূপে জানা ১৫৯
নিজেকে জানা ১৬২, ১৭২
নিত্য ৬৭, ৯৫
নিত্য অপরিণামী নিরূপাধিস্বরূপের উপলব্ধি ২৩১
নিত্য অপরিবর্তনশীল অপরিণামী তত্ত্ব ২৩৮
নিত্য অপরোক্ষ বস্তু (আত্মা) ৬২, ৬৩
নিত্য আর শাশ্বত ৯৩
নিত্য (যা স্বপ্রকাশ তা নিত্য) ৫৮
নিত্য ও অনিত্য ৬২
নিত্য চেতন ২২৬
নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ১৯৪
নিত্য জ্ঞাত ১৩৮
নিত্য জ্ঞাতা ৬০
নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ১১৬; নিত্য তত্ত্ব ১৩৯
নিত্যতা (তাঁর) ৯৫; নিত্য তৃপ্ত ২৫
নিত্য প্রকাশমান ৬১, ৭৬, ১৫১, ২২৯
নিত্য প্রাপ্ত ৬৫, ৬৬, ১৩৮
নিত্য রূপ ১৬০; নিত্য বস্তু ৫৫, ২৫০
নিত্য বিজ্ঞাতা ৯১, ৯৫, ১০২
নিত্য বিষয়ী ৯১, ১০১, ২৩৩
নিত্য সত্তা ২৩৯
নিত্য সুখ ৪১, ২২৫, ২২৬
নিত্যস্বরূপ ১৬০
নিত্য হয়েও অনিত্য ২৩০
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ৬২
নিদিধ্যাসন ৬৫, ৭৩, ২৪১, ২৪৩, ২৫১; নিন্দা ৭৩
নিয়ম ১৬৮, ১৭৫, ১৮১
নিরবয়ব ২২৮; নিরসন ৭৫
নিরস্তসমস্তবিশেষ ১৬২
নিরাকার ৭৭, ১৯০
নিরাস (উপাধি) ৯২, ৯৫

নির্গুণ ৭৭
” ব্রহ্ম ২৩১; নির্বাচন ২২৭
নির্বাচন (তাঁর নিকটতম) ৯৪
নির্বিকল্প ২৫৫; নির্বিশেষ তত্ত্ব ৯২
” ব্রহ্ম ১৮০
নির্বিশেষ স্বরূপ ১৬০
নির্বিষয় ১৮৫
” (আত্মা) ৬০
নিবৃত্তি ১৪০, ১৬৯-১৭১, ১৭৭
” অজ্ঞানের ৩৭, ৭৪
” অবিদ্যার ৮৩
” উপাধির ৭৫
নিবৃত্তি দুঃখের ৩৭, ৭৯
নিষিদ্ধ কর্ম ৬৭; নিষেধ ৭৩
নিষেধ বাক্য ৭৩
নিষ্কর্ষ (বেদান্তের) ৬০
নিষ্কৃতি (শোকের) ৩৭, ৬১, ১৪১
” অজ্ঞানের হাত থেকে ৩৭
নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির হেতু ২৯
” শব্দের অর্থ ২৯
নিঃশ্রেয়স্-সাধন ৪০
নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান ৬৩
নীতিপরায়ণ (চেষ্টা করে) ১০৩
নীতিমূলক, যা করবেন তাই ১০৩
নুনের পুতুল ১৪৭
নৃঋণ ৭; নৃযজ্ঞ ৭
নেতি নেতি করে বোঝানো হয়েছে ৯৪
নৈয়ায়িক ৯৭
” -এর ঢঙ ৮৩
” -এর ভাষা ১১১
নৈরাত্মবাদী ১৪০
নৈসর্গিক ব্যবহার ৮৩
ন্যায়শাস্ত্র ২৪, ৯৬, ১১৬
ন্যায়ামৃত ৯৮; ন্যায়ের কথা ২৪
ন্যায়-এর ভাষা ৮৩
পঞ্চভূত ২৩, ১৫৩, ১৫৯, ১৭৯, ২৪৯
পঞ্চেন্দ্রিয় ১১-১৩, ১৫৯, ১৬৪
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ১৫৩
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য (ভোগ) ১৬৪, ১৬৯
পতঞ্জলি ২৫৭
পথ ৪৮, ১৬২, ১৭১, ১৭৪, ১৭৭
পথ (তৃতীয়) ৪৮; পথ (দুটি) ৪৭, ৪৮
পথ (শাস্ত্রীয়) ৪৯
পরপ্রকাশ ১৭৫, ২২৮
পরব্রহ্ম ৭৮, ৮১, ১৩৭, ১৭৯-১৮১, ১৮৪, ১৮৯, ২৩৭
পরব্রহ্ম জ্ঞান সাধন ৭৯
পরব্রহ্মস্বরূপতা ৮২
পরব্রহ্মের স্থান ১৩৫
পরম ১৮০, ১৮১
পরম অভয়স্থান ৫৬
পরম আশ্রয় ১৫৫
পরমকল্যাণ ১৬১
পরমকারণ ১৪৫, ১৫৫
পরমগন্তব্যস্থল ১৫৫; পরম গম্য ১৪৭
পরম তত্ত্ব ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫
পরম তত্ত্ব আমারই স্বরূপ ২২৪
পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম ২৩৫
পরম সার্থকতা ১৪৮; পরম সুখ ২২৭
পরমাণু ৫২, ২৪২
পরমাত্মা ১৩৬, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ২৩৮
পরমাত্মার অস্তিত্ব ২২৬
পরমাত্মার উপলব্ধি ১৩৫
পরমাত্মার স্থান ১৩৫, ১৩৭
পরমানন্দ (আত্মজ্ঞানস্বরূপ) ২২৭
পরমানন্দের প্রাপ্তি ৭৪
পরমেশ্বর ৭৯, ১৪৮, ১৬৭, ১৭৯, ১৮৪, ১৯৬, ২২৬
পরম্পরা ৫৩, ৫৮, ৬৮, ১৮৪, ২১৩
পরলোক (কেউ প্রত্যক্ষ করেনি) ২৪
পরলোক (প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন) ৪৬
পরলোকগত আত্মা ২৬
পরলোকগামী ১৬৬
পরলোকবিষয়ক আত্মজ্ঞান ৩৪
পরাশক্তি ১৮৯
পরিণাম ৬০, ৭৯, ৮০, ৮২, ৯৩, ১৬২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ২২০
পরিণামী ১৮৬, ১৯৯

পরিত্রাণ ১৬১, ১৬২, ১৭০
পরিমাণ ১৮৯, ১৯০, ২৫৬
পরিমিত ১৮৮
পরিবর্তন ৫৩, ৫৮, ৭৮, ৮৮, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ১০৭, ১০৯, ১৭৪, ১৯৩, ২০৫
পরিবর্তনশীল ৫৩, ৮৮, ৯৫, ১০২, ১১৩, ১৬১, ১৭৬
পরিবর্তমান বস্তু ১০৮
পরিব্যাপ্ত ১৭২, ১৮২, ১৮৮, ১৯০, ১৯৫
পরিব্যাপ্ত চৈতন্য ২২১
পরীক্ষা ২৪২, ২৪৭,
পরোক্ষ জ্ঞান ৩৬, ৬৩
পানা সরিয়ে জল খাওয়া ১১৩
পারমার্থিক তত্ত্ব ১৮০
পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ২৩৯
পারমার্থিক সত্তা ১০৮, ২৩৯
পারস্পরিক বিরোধ ২৪০
পার্থক্য ৬৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৪, ১৭৯, ১৮৪, ১৯২, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২২১; পাশ্চাত্য দর্শন ৭৫
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ১০০
পিতৃগণ ৪৭, ৪৮; পিতৃযান ২১৪
পিতৃলোক ৪৬, ২১৪, ২৪৮
পুতুল (নুনের পুতুল) ১৪৭
পুতুলনাচের পুতুল ১৩৩
পুত্র ১৬৫
 ,, (দত্তক) ১০
পুত্রকামনা ২৪৮; পুত্রের কর্তব্য ৪
পুত্রেষ্টি ২৪৮; পুত্রৈষণা ১৬৫
পুনরাবৃত্তি ২৪১; পুনরুক্তিদোষ ২১৭
পুর ১৯৪, ১৯৬
পুরাণ ১১, ২১৫; পুরাণাদি ১৩১
পুরী (দেহ) ১৯০, ১৯৪
পুরুষ ১৪৮, ১৫৫, ১৬৩, ১৭২, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৭-১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৬, ১৯৯, ২৫২, ২৫৪
পুরুষকার ১৫৭
পুরুষতন্ত্র ৯৮, ৯৯; পুঁথিগত জ্ঞান ২২৫
পুঁথিগত তত্ত্ব (বেদান্তের) ৩৬
পূজা ৭১, ১৮৯,
পূজ্য ১৬৩, ১৬৪
পৃথক ৬৬, ৬৮, ১৭৫, ১৮৪, ১৯০-১৯৫, ২২১, ২২৮
পৃথককরণ ৪১, ৬১, ৬৫, ৬৬, ১০১, ১০২, ১১৩, ১৫০, ২০৩, ২৩০
পৃথককরণই হলো কৌশল ১১৪
পৃথক করা ৪১, ৬১, ৬৫, ৬৭, ১৫০
পৃথককৃত ২৪৮; পৃথকতা ১৩৯
পৃথক সত্তা ৮৮, ১৩৯, ১৪০
পৃথিবী ৫৮, ১৬৪, ১৭৬, ১৯৪
প্রকার ১৭২, ১৯১, ২২১
প্রকারতা ১০০, ১০১
প্রকাশ ১৬৭, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪ (শীল), ১৯৬, ২২৯, ২৫০, ২৬০
প্রকাশ (চৈতন্যের) ১৩৫, ১৪৮
প্রকাশ (সুখদুঃখের) ৫৭
প্রকাশই অধিষ্ঠান ২৩৪
প্রকাশক ১৬৮, ১৭৫
প্রকাশধর্মী পদার্থ ৯৬
প্রকাশধর্মী হিরণ্যগর্ভ ১৮১
প্রকাশমান (সর্বদা) ১১৪, ১১৫
প্রকাশরূপ ২৫৩
প্রকাশস্বরূপ ১৩৭, ২৩৪
প্রকৃত আত্মজ্ঞান ১৫২
প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধি (বেদান্তের) ৩৬
প্রকৃত তাৎপর্য ৭০; প্রকৃত শক্তি ২০৩
প্রকৃত সত্তা ২০৩; প্রকৃতি ১৬২
প্রক্রিয়া ১৪৪, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৯, ১৭০, ২০৫
প্রণালী ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৯১, ১৪০, ১৯০, ১৯৫, ২০২, ২২৯, ২৪২
প্রতিবন্ধক ৭৪, ১৫১, ১৬৭, ১৬৮, ১৮৬

প্রতিবিম্ব ১৬১, ১৯০, ২৪৮
প্রতিমা ১৮৯
প্রতিষ্ঠা (অপরকে প্রবঞ্চিত করেও) ৪৪, ৫৬
প্রতিষ্ঠা (আত্মস্বরূপে) ৬০, ৭২, ৭৪, ৭৫
প্রতিষ্ঠিত ৬০, ১৬২, ১৭১, ১৮৫, ১৯২
প্রতীক ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ১৮৯, ২৩৮; প্রতীক্ষা (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ) ৭
প্রতীতি ৬২, ১৯১, ২৩৮, ২৩৯
প্রতীয়মান ১৭৮
প্রত্যক্ ১৫৫, ১৭১, ১৭২
প্রত্যক্ত্ব আর পরাক্ত্ব ১৪৮
প্রত্যক্ষ ১৯২, ২৪২
প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ অর্থাৎ) ৩৬
" (তত্ত্বকে) ৩৬
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ৯৬
প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান ১৫১
প্রত্যক্ষগোচর ২৫৩; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ২৪
প্রত্যক্ষবিরোধী সিদ্ধান্ত (বেদে) ৮৪
প্রত্যক্ষস্বরূপ ২২৭
প্রত্যগাত্মা ১৬৮, ১৭১-১৭৪, ১৭৯;
প্রথমজাত ১৭৯
প্রমাণান্তরের অপেক্ষা ১০৩
প্রমাণ ১৩, ১৪৯
প্রমাদ ১৫৬, ১৫৭, ১৮৭
প্রযত্ন ১৫৭, ১৬৭, ২৪৭
প্রয়াস ১৬২, ১৬৭, ১৮৫, ১৮৯
প্রয়োগবাদ ৯৯
প্রয়োজন ১৩০, ১৪০, ১৮৭, ১৯৬
প্রয়োজন (কি?) ৩৭
" (অজ্ঞানবন্ধক থেকে মুক্তি) ৩৭
প্রয়োজন (আত্মতত্ত্বলাভের) ৫৭
প্রয়োজনীয় কথা ১৫৮
প্রবৃত্তি ৩৯, ৪২
" (পরায়ণ) ৪৫, ৭৪, ১৩১, ১৪২
প্রবৃত্তিশূন্য ৭৬
প্রশ্ন ৫৩, ৮৬, ৮৮, ১৬৬, ১৭৩, ১৮০, ১৯৫, ১৯৬, ২০৫, ২৪৫
প্রশ্রয় ১২৯; প্রাকৃতরূপ ৭৮
প্রাচীন উপদেশ ১২৯
" ধর্ম ১২৯
প্রাচীন সাধু ১৩৯; প্রাণ ১৮২
প্রাণায়াম ২০৭; প্রাণিহিংসা ১২৬
প্রাণী ৪৬, ১৬২, ১৭৪, ১৭৯, ১৯৬
প্রাতিভাসিক রূপ ১৮৯
প্রাতিভাসিক বস্তু ২৩৬
প্রাপ্তবস্তুর (প্রাপ্তি হয় না, অনুভব হয়) ৭৯; প্রাপ্তব্য (তিনি) ৭৮
প্রাপ্তি ৭৯, ১৭২, ১৮৭, ১৯১, ১৯৩
প্রামাণ্য (বেদের) ৮৪
প্রায়শ্চিত্ত ১৬৬
প্রারব্ধ ১৬, ১৯৭
প্রারব্ধকর্ম ৮৪, ৮৫, ৮৭
প্রারব্ধের বিঘ্ন ৪৮; প্রার্থনা ১৭৩
প্রিয় ৪২; প্রিয়রূপ ৪২
প্রেমধর্ম ১২৯; প্রেয় ৩৫-৪৩
প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করা (জ্ঞানলাভের একটি মাত্র উপায়) ৩৭
প্রেয় ও শ্রেয় ৩৫, ৩৭, ৪০, ৪১
প্রেরণা ১৯৭, ২০৩
প্রোটন ৫২; প্লেটো ১৬০
ফল ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৯, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৮, ১৮৩, ১৯০, ১৯৩
ফলদাতা ঈশ্বর ১৬; ফলদান ২৪৫
ফলশ্রুতি ৫৫, ১৬৩, ১৬৫
ফলস্বরূপ (অনন্ত) ৫৬
ফলাভিলাষী ১২৭
ফলে কি লাভ (জ্ঞানলাভের) ৫৭, ৬৭,
ফল (কৃতকর্মের) ৭৯, ১০৩, ১৩৬
ফলের (ক্রিয়ার) আশ্রয় কর্ম ১০৪
বহির্মুখ ৯০, ১৬৮-১৬৯, ১৭৪
বহির্মুখ ইন্দ্রিয় ৮৯
বহুমুখী বৃত্তি ১১২
বহুরূপী ১০৬, ১০৮
বাইবেল ৩১
বাধা (নির্বাধ অনুভবের) ৯৬, ১০৫, ১৬৭, ১৬৮

বাধিত হওয়া (বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা আপাতজ্ঞান প্রতিহত হওয়া) ২৩৯
বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ ৫২
বাহ্য বস্তু ২১৯
বাহ্য বস্তুর মধ্যে (তাঁকে) ৮৯, ১৬৮-১৭২, ১৭৪, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯
বীজাকারে সুখদুঃখ ৫৭, ৮১
" সৃষ্টি ১৪৭
বুদ্ধি ৪০, ৯২, ১৪২-১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১-১৫৩, ২৫২, ২৫৫
বুদ্ধি (অভেদ, দেহের সঙ্গে আত্মার) ৮৬
বুদ্ধিগ্রাহ্য ২২৮
বুদ্ধিতত্ত্বের উপাদান ১৪৬
বুদ্ধিবৃত্তি ১০০; বুদ্ধির দোষ ২৩০
বুদ্ধির বিভ্রম ২০৪
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১২৮
বোধ হলেই মানুষ নিশ্চিন্ত ১০৭
বোধগম্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য ৮৪
বৌদ্ধ ৫৩; বৌদ্ধ শূন্যবাদী ১০৩
ব্রহ্ম ২২৫, ২২৮-২৩৮
ব্রহ্ম অধিষ্ঠান ২৩৮
ব্রহ্ম সর্বসংশ্লেষশূন্য ২২৫
ব্রহ্মকে জানলে জগৎ বাধিত হয়ে যায় ২৩৯
ব্রহ্মচর্য ৬৯, ৭৭, ১৬১
ব্রহ্মজ্ঞ ১১৪, ১২৮, ১২৯, ১৪২, ২৪৬
ব্রহ্মজ্ঞ অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন ২৩২
" পুরুষের আচরণ ১০৫
ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া ১০১
ব্রহ্মজ্ঞান ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮২-৮৩, ১০৩-১০৫, ২১৭, ২৪৫-২৪৬, ২৪৮, ২৪৯
ব্রহ্মজ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ ১০৩
ব্রহ্মজ্ঞানী ১২৮
ব্রহ্মজ্ঞানী যথেচ্ছাচারী (এ ভয় নেই) ১০৪
ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ১০৪
ব্রহ্মজ্ঞানের পরে অবিদ্যা স্বীকার ৮৪
" অধিকারী ৫৫
ব্রহ্মজ্ঞের জগদ্ব্যবহার ৮৬
ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গে আমার তফাত ২৩১
ব্রহ্মতুল্য জীব ৮১
ব্রহ্ম নির্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ২৩৪
ব্রহ্মপ্রকাশ ২২০, ২২৯
ব্রহ্মলোক ১৬৩-১৬৪, ২১৫, ২৪৭
ব্রহ্মবস্তু ১৮৩, ১৮৬, ২১৭
ব্রহ্মবিদ্ ১৩৫-১৩৭
ব্রহ্মবিদ্যা ৪০, ১৬৩
ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ৮২, ১৫১
" বৃত্তি ১৫১; ব্রহ্মসত্তা ১৮২
ব্রহ্মস্বরূপ ৬১, ২৩২
ব্রহ্মস্বরূপতা ৮২, ১৮৬
ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি ১৩৮
ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ৮২, ১৬৯, ১৭১, ২২৮, ২৩৩
ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না ২৩৩; ব্রহ্মাণ্ড ৮১
ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা ৮১
ব্রহ্মাত্মৈক্য ২৪২
" জ্ঞান ১৬৩; ব্রহ্মানুভূতি ১৩৭
ব্রহ্মে জগতের আরোপ ২৩৮
ব্রহ্মের জ্ঞান ২৩৯
ব্রহ্মের প্রকাশ ২৩৩
" প্রতীক ৭৮, ৮০
ব্রহ্মের লক্ষণ ১০১
" বাচক ৮১
ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান ২৩৫
" সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান ২৩৮
ব্রহ্মের স্থান ১৩৭
ব্রাহ্মণ ১৬৫, ১৯৯, ২৪৬
ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় ১৩২, ১৩৩
ব্রাহ্মণবর্ণ ২৪৬; ব্রাহ্মীসত্তা ২৩৯
ব্র্যাড্‌লী ৭৫; ভক্তি ২১৬
ভক্তির পথ ২১৬
ভগবান ৩, ৯০, ১৬৬, ১৭০, ১৭৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৫১
ভগবান বুদ্ধ ২১৩; ভগবান যীশু ৩১
ভগবানের বিরহ ২১৬
ভজনীয় তত্ত্ব ২০২; ভবচক্র ৪৯

ভস্মীভূত ১৯৭; ভাগবত ২১৬
ভাব ৭৭, ১১০, ১৩৬
ভাব-এর উদ্ভব ২০১
ভাববস্তু ৮৮; ভাববিকার (ষড়) ৯২
ভাষ্য (শাঙ্কর) ৭৪
ভাষ্যকার ১৩৫; ১৪৯, ১৫৪, ১৬৪, ১৮২, ১৮৭
ভীষ্মদেব ৪৭; ভূবর্লোক ৮১
ভূতগুণ আত্মাতে নেই ১৫৮
ভূতশুদ্ধি ৭১; ভূলোক ৮১
ভূমা ১৮৪, ১৮৯
ভেদ ১৪২, ১৬৪, ১৮৪, ১৯০, ১৯১, ১৯৫; ভেড়া ১৮৯
ভোক্তব্য বিষয় ১৪২
ভোক্তা ৬৮, ৭০, ১৪২, ১৬০, ১৯৯
ভোক্তৃত্ব ১৬০; ভোগ ১৯৪
ভোগ-ঐশ্বর্যের চরম উৎকর্ষ ১৩৮
ভোগদেহ ৪৯
ভোগপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা ৫৬
ভোগায়তন ১৯৫
ভোগাসক্তি বর্জন করে ধর্মলাভ ৩৯
ভোগের অন্বেষণ ৩৯
ভোগের পথ ৪২
ভোগের পরাকাষ্ঠা (স্বর্গলোক) ৪৬
ভোগের স্থান (চন্দ্রলোক) ৪৮
ভোগ্যবস্তু ১০৫, ১৬৫, ২২৭
ভোগ্যবস্তু (নশ্বর) ৩১, ৩৩, ৪৩
ভোগ্যবস্তুসমূহ ৪২; ভৌতিক গুণ ১৫৯
ভৌতিক দ্রব্য ১৫৯; ভৌতিক সম্বন্ধ ১৫৯
ভ্রম ১৪২, ১৮২, ১৮৩
ভ্রমজ্ঞান ৯৪, ১০৩; ভ্রমের দূরীকরণ ৬৫
ভ্রান্ত অনুভব ১০৬; ভ্রান্ত জ্ঞান ৬১
ভ্রান্ত প্রতীতি ১০৬; ভ্রান্ত ভেদজ্ঞান ৬৫
ভ্রান্তি ৭৬, ৭৯, ১০০, ১০৬, ১৩৩

মক্ষিকারানী ২০২; মঠাকাশ ২২২
মতবাদ ২৩৯; মধুকর ২০২
মন ৬৫, ৬৬, ৮০, ৮১, ১৩০, ১৪৩-১৪৬, ১৪৯, ১৫১-১৫৩, ১৫৭, ২০৪, ২০৫; মন (জড়বস্তু) ৫৮
মন নিরবয়ব বস্তু ২২৮
মন মুখ এক করা ৬৪
মনরূপ উপাধি ৬১
মনকে ধ্যেয় বস্তুতে কল্পিত ৬৪
মনন ১৭৮, ১৮৬, ১৯৪, ২৪২, ২৪৯
মনঃসংযম ১৩১; মনুষ্যজন্ম ২৪৫
মনুষ্যলোক ২৪৭, ২৪৮
মনের অনুশীলন ১৫৩
মনের ক্রিয়া অনুভবের গোচর ৯০
মনের তরঙ্গ ৫২; মনের ধর্ম ৫৮
মনের পিছনে সত্তা ৯০
মনের ভাগাভাগি ৩৮
মনের মন ৯০, ১১৪
মনোজগতের বিশ্লেষণ ৫২
মনোধর্ম ৯৪, ১১২
মনোবিজ্ঞান ৫৩; মনোবিজ্ঞানী ৫৩
মনোবিশ্লেষণ ৫৩
মনোবৃত্তি ৫২, ৫৮, ১১১
মন্ত্রের পুনরুক্তিদোষ ২১৭
মরীচিকা ২৩৬; মস্তিষ্ক ২০৫
মহৎ ২৫২
মহৎতত্ত্ব ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯
মহানটরাজ নটরূপে অভিনয় ১০৭
মহাপুরুষ মহারাজ ১২৭
মহা সমস্যা ১০০
মহিমা ৭৫, ৯৫, ১১৩, ১১৪
মহিম্নস্তোত্র ৯৪; মাইক্রোস্কোপ ১৫২-৫৩
মানসিক তপস্যা ৭৭
মানুষ ১৬০-১৬৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৪, ১৮৪, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৮
মানুষ (মরণশীল) ৬, ১৩
মানুষ যে ভাবে জানতে অভ্যস্ত ৬৯
মানুষের অন্বেষণ ৮৯
মানুষের আকাঙ্ক্ষা ২২, ১১৯
মানুষের কাম্য ২২
মানুষের কাম্য সুখ ৩৭
মানুষের জীবন ৩২; মানুষের ধর্ম ১১৯
মানুষের নীতিবোধ ২৬
মানুষের বুদ্ধি ২৫; মানুষের সংশয় ২৩
মায়া ২৩৯; মায়াজাল ২৩৬
মায়াবাদী ২৩৯; মায়ার আবরণ ২৪০
মাস্টারমশায় ৩৫

মিথ্যা মানে অলীক নয় ২৩৮
মিথ্যা মানে যাকে স্বরূপে জানছি না ২৩৮
মিথ্যাত্বনিশ্চয় ৮৬; মিথ্যাত্ববোধ ২৩৯
মিথ্যাত্ববোধ হলেই যথেষ্ট ১০৬
মিথ্যাত্বের নিশ্চয় ২৩৯
মিথ্যাপ্রতীতি ২৩৮
মিথ্যার অধিষ্ঠান ২৩৮
মীমাংসক ১৬, ৭০-৭২, ৭৪, ২১৬
মুখ্যপ্রাণ ২০২, ২০৩; মুখ্যসত্তা ২০৩
মুঞ্জ থেকে ঈষিকা ১১৩
মুক্ত ১৯৮, ২৫৬; মুক্তিলাভ ৪৮
মুণ্ডক উপনিষদ্ ১৩৬, ১৪১
মুমুক্ষু ১৫৪, ২২৫, ২৫৯
মূর্ছাকাল ২৫০
মূল ১৪০, ১৯৬, ২৫১
মূল অন্বেষণ ২৩৯; মূলতত্ত্ব ১৩৯
মূলসিদ্ধান্ত ৮৪
মূলস্বরূপ ২৩৫; মূলান্বেষণ ১৪০
মূলে সত্য রয়েছে বলে জগতের প্রতীতি হচ্ছে ২৩৯; মৃগতৃষ্ণিকা ২৩৬
মৃত্যু ৬, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪
মৃত্যু (অজ্ঞানরূপ) ৪২
মৃত্যু (উত্তরায়ণে; দক্ষিণায়নে) ৪৭
মৃত্যুকে অতিক্রম ২১; মৃত্যুগ্রস্ত ৬
মৃত্যুর অর্থ ২১; মৃত্যুরও মৃত্যু ১৩৩
মেঘ সূর্যকে ঢাকে না ৯৫
মোহনিদ্রা ১৫৬, ১৫৭; মৌন ২০০
মৌমাছি ২০২; যক্ষ ১৩২
যজমান ৭১; যজ্ঞ ১৮১, ১৯৯
যজ্ঞ (-এ সর্বস্ব দিতে হয়) ৪, ১৩৭
যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ১৩৬, ১৩৭
যজ্ঞানুষ্ঠান ৭০, ১০৫
যজ্ঞের অনন্ত ফলস্বরূপ ৫৬
যমুনা নদী ২১৬; যাগ ১১৭
যাগযজ্ঞ ১৩৮; যাজ্ঞবল্ক্য ৯৩
যাদুকর ২৩৬
যীশু ১২৯, ১৬৪
যুক্তি ৭৪-৭৬, ৮৩-৮৫, ৯৭-৯৯, ১০১, ১৯৫, ১৯৭, ২৩৯
যূপকাষ্ঠ ৭১; যোগভ্রষ্ট সাধক ২১৩
যোগশাস্ত্র ১৩১
রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা প্রতিভাসিত সর্পজ্ঞান বাধিত ২৩৯
রজ্জুতে সর্প ভ্রম ২৩৭
রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত ২৩৮, ২৩৯
রত্নময়ী মালা ১৮
রথ ১৪১-১৪৪, ১৮২
রথী ১৪১-১৪২; রসাস্বাদ ১৩১
রাগদ্বেষ ২০, ১৫২, ১৫৩, ২৪২
রাজনীতি ১২৭, ১২৯
রাজার ছেলের স্বপ্ন ১০৬
রামপ্রসাদ ১৭৪; রূপ ২২৮
রূপক ১৬৯; রূপরসাদি বিষয় ২০৩
রূপাদি অবয়ব ১৫৯
রেশ (অবিদ্যা নাশ হয়েও) ৮৪
রেশ (টুকুর নাশ কী করে হবে) ৮৪
রোমান ১৬৪; লক্ষণ (ব্রহ্মের) ৮৫, ১০১
লক্ষণা ৭১; লক্ষ্য ৭০, ১৭১, ১৮৮
লক্ষ্যার্থ ৮৪
লয় ৭৮, ১৫৪, ১৮০, ১৮২, ১৮৫
লাভ (আত্মতত্ত্ব) ৬৭
লাভ (আত্মবস্তুকে) ৬৫
লাভ (লৌকিক বস্তু) ৬৬
লিঙ্-এর প্রয়োগ ২১
লিঙ্গ বা হেতু ২৪; লীলা ১০৬
লেশ-অবিদ্যা ৮৬
লোকব্যবহার ৮৩; ৮৫, ১০৩, ১৯৭
লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান ১৭
লৌকিক উদাহরণ ৭১
লৌকিক উপায় ১৬১
লৌকিক প্রণালী ৭১; লৌকিক বস্তু ৬৬
লৌকিক বিষয় ৬৩, ১৫২
লৌকিক ব্যবহার ৮৭; বর্ণ ৭৮
বর্ণমালা ৭৭; বর্ণরূপী পরব্রহ্ম ৭৮
বর্ণাশ্রম ধর্ম ১২৯; বশী ২২৪
বস্তু ৯৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১-১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৫-১৮৭, ২৪৯
বস্তু (কাল্পনিক) ৫৩
বস্তু (স্বপ্রকাশ) ৫৮
বস্তু স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয় না ১০৬

বস্তুতন্ত্র ৯৮; বস্তুধর্ম ২২৪
বস্তুনির্দেশের উপায় ২৩১
বস্তুর অনুভব ১৩৫
বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ ২২০
বস্তুলাভ ২৪৬; বাক্য ৭০, ৭৩, ১৫৪
বাক্য মনের অগোচর ১০১
বাগিন্দ্রিয় ১৫৪
বাচক (ওঁকার, ব্রহ্মের) ১৮৯
বাচক শব্দ ৭৮; বাচ্য ১৮১; বাচ্যার্থ ৮৪
বাদ ২৩৯; বামন ২০২
বায়ু ১৩২, ১৩৪; বাসনা ৪২, ১৯৮
বাসনাজনিত কর্ম ২৩৭; বাসনাদুষ্ট ১৮৬
বিকৃতি ৭৮, ১০৭, ১১০
বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি ১৩২
বিক্ষেপ ১৭০, ১৭১; বিচরণ ভূমি ১৪২
বিচার ৫২-৫৩, ৬১, ৬৫, ৮৫, ৮৭, ১১০, ১১৭, ১৬২, ১৬৬, ১৭৩-১৭৬, ২০৫, ২৪১, ২৪৯
বিচার আমাদের গণ্ডি থেকে বার করে দেয় ১০৩; বিচারের অবকাশ ৯৭
বিচ্যুতি মানেই বিনাশ ১০৬
বিজ্ঞাতা ৬০, ৯১, ২৩৩
বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানের বিষয় করতে পারা যায় না ২০৫; বিজ্ঞান ১১৪, ২০৫
বিজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সমন্বিত রূপ ২৩৭
বিজ্ঞান ও দর্শনের ভেদ ৫২
বিজ্ঞানী ২৫৩
বিজ্ঞান-এর অন্বেষণের মর্যাদা ১২
বিজ্ঞান-এর আবিষ্কৃত চরমতত্ত্ব ৫২
বিজ্ঞানের নিয়ম ৫২
বিজ্ঞানের বিচারের প্রণালী ৫২
বিজ্ঞানের স্বনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ১২
বিত্তৈষণা ১৬৫; বিদেহমুক্ত ১৯৬
বিদেহমুক্তি ১৯৪, ১৯৮
বিদ্যা আর অবিদ্যা ৪৩
বিদ্যা আর অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী ১৩৫
বিদ্যার আমি ১৯৭
বিদ্যার পরিপূর্ণতা ১৯
বিদ্যার স্বরূপ ফল ১৩৫
বিধান ৭০, ৭৩, ৭৪
বিধি (কর্মকাণ্ডের) ১৪
বিধিচ্ছায়াপরবাক্য ৭৪; বিধিনিষেধ ৬৭
বিধির দ্যোতক ৫৭
বিনাশ ৮৪, ১৬৯, ১৭০, ১৮৪
বিনাশ (অমরত্বের) ১০৫
বিনাশ (আত্মার) ১০৫
বিনাশ (উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রের) ১০৫
বিনাশকর্তৃত্ব কল্পনা ১০৫
বিনাশী ১৮৬, ১৯০, ১৯১
বিনাশের কারণ ১৫৯
বিপরীত ৭৫, ২৫৪
বিপরীত ধর্ম আরোপ করে ১১৩
বিপরীত ধর্মী গুণ ১০৮
বিপরীত পক্ষ ৯৮
বিপরীত সংস্কার ৬২-৬৩
বিপরীত সিদ্ধান্ত ৯৭; বিপশ্চিৎ ৯২
বিভিন্ন দর্শন ৯৭; বিরাট ১৭, ২১
বিরাট (জগতের স্থূলভূত সমষ্টিরূপ) ১৭
বিরুদ্ধ পক্ষ ১১১
বিবর্ত ৮০, ১০৭
বিবেক ৬১, ১৪৩, ১৪৪
বিবেকী ৪১, ৬০, ১৪৪
বিশেষ ১৪৭, ১৫০, ১৫৫
বিশেষ জ্ঞান ১১৫
বিশেষণ ২৫২
বিশেষত্ব ৮১
বিশেষিত ২৫২
বিশ্বজিৎ যাগ ১
বিশ্বসৃষ্টি ১৪৭
বিশ্বাস ১৭৩, ২৪২
বিশ্লেষণ ৪১, ৫২, ১০২, ১১৩, ১৩০, ১৪০, ১৬০, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৬, ১৯৮
বিষয় ৫৪, ৬০, ৬৯, ৭৬, ৮৯, ৯১, ১৪২, ১৪৪, ১৫২, ১৬২, ১৬৮-১৭৯, ১৮৩, ১৮৫, ১৯৮, ২০৫, ২৩৩, ২৫০, ২৫৫
বিষয়গুলি সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের পরিণাম ১০২
বিষয় সুখ ১৭৩
বিষয়ানুভবের প্রক্রিয়া ১৪৪
বিষয়ী ৬০, ২০৫, ২৩৩
বিষয়ের জ্ঞাতা ৫২

বিষয়ের ভাসক; প্রকাশক ১০১
বিষ্ণু ১৪৫
বৃত্তি ৫২, ৫৮, ৬৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭১
বৃত্তিজ্ঞান ৮২, ১০১
বেদ ৭১-৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮৪
বেদ অন্ত্যপ্রমাণ ৮৪, ৯১
বেদ ও অবেদ ৮৭
বেদও আত্মাকে বা ব্রহ্মকে স্বরূপত প্রকাশ করতে পারেন না ৯৪
বেদও এই তত্ত্বকে আমাদের গোচর করে দিতে পারেন না ৮৯
বেদও ব্যবহারের অতীত নয় ৮৭
বেদবাক্যের তাৎপর্য ৭০, ৮৩, ৮৪
বেদের কথা ৮৫
বেদের তাৎপর্য ৪৫, ৬৯
বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় ৮৪
বেদের সার্থকতা ৯২
বেদান্ত ৫৪, ৯৭, ১৭৯, ১৮৩, ১৯৪, ১৯৬, ২৪২; বেদান্তচর্চা ১২৮
বেদান্ত মত ১৯৯; বেদান্ত বিচার ১০২
বেদান্তশাস্ত্র ২২৫, ২৩৭; বেদান্তবাদী সাধু ১০৫
বেদান্তী ১৫, ৯৮, ১৭১
বেদান্তের অধ্যয়ন ৩৭; বেদান্তের দৃষ্টি ৪৫
বেদান্তের নিষ্কর্ষ ৬০; বেদান্তের পথ ৪৫
বেদান্তের পুঁথিগত তত্ত্ব ৩৬
বেদান্তের ভাষা ৮৬; বেদান্তের সারকথা ৮৭
বেদান্তের সিদ্ধান্ত ৮৫, ২৪১
বৈচিত্র্য ১১৩; ১১৫; ১৪০, ১৪১
বৈজ্ঞানিক ৫৩, ২৪২
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ১২, ২৩, ২৪০
বৈজ্ঞানিক প্রণালী ১৩
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ১৩
বৈদান্তিক (ঈশ্বর মানেন) ১৬
বৈদিক (যজ্ঞাদি কর্মের ফল) ৭
বৈদিক ব্যবহার ৮৭
বৈদিক সাধনপ্রণালী ৪৬; বৈরাজপদ ১৩৭
বৈশেষিক দর্শন ১৫০
ব্যক্তিত্ব ১৪৬, ২৪৭
ব্যক্তিত্বটি তাঁতে বিসর্জন ১৩৪
ব্যক্তিরূপে অভিমান ১৩৪
ব্যঞ্জনা ৮০; ব্যত্যয় ২৫৪
ব্যবধান ২৫৫
ব্যবহার ৬৮, ৮৪, ১২৮, ১৩১, ১৬৬, ১৮৪
ব্যবহার (জ্ঞানীর) ৮৫
ব্যবহার(ই) সত্য এবং মিথ্যার মিশ্রণ ২৪১
ব্যবহার সম্বন্ধে কী উপায়? ৮৫
ব্যবহারকে যুক্তিসম্মত করবার জন্য ৮৭
ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্ব ২০৫
ব্যবহারাসিদ্ধি ৮৪; ব্যবহারিক ৭৫
ব্যবহারিক জগৎ ১০৪, ২৩৩
ব্যবহারিক জ্ঞান ২৩৯
ব্যবহারিক তত্ত্ব ১৮০
ব্যবহারিক সত্তা ২৪০
ব্যবহারের অনুবৃত্তি ৮৫
ব্যবহারের রাজ্য ২০০
ব্যবহারের সীমা ২০০
ব্যবহারের নিবৃত্তি ৮৫; ব্যবহার্যরূপ ৮১
ব্যাঘাত ১০৯, ১২৮
ব্যাপক ১৮২, ২৫২
ব্যাপার ২০৩
ব্যাপ্ত ১৮২, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৮
ব্যাপ্য ২৫৩; ব্যাসদেব ২১৬-২১৭
শক্তির ব্যবহার ১৩১
শঙ্কর প্রারব্ধ কেন স্বীকার করেছেন ৮৭
শঙ্করাচার্য ২৮, ৬৮, ৭৪, ৮৩-৮৬, ৮৭, ৯৮, ১৩৬, ১৭২, ১৯৭, ১৯৮, ২৩৯, ২৫১
শঙ্করের সিদ্ধান্ত ২৩৯
শব্দ ৬৪, ৭২, ৭৭
শব্দ (আত্মা সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ) ২৪
শব্দ (-এর অর্থ আপ্তবাক্য) ২৫
শব্দজ্ঞান ২৫; শব্দ প্রমাণ ২৪
শব্দের অগম্য ২০০; শব্দের অতীত ২০০
শব্দের বাচ্যার্থ ৮৪; শয়তান ৩১
শরীর ২৩-২৪, ৬২, ৯৬, ২০৪, ২৪৬, ২৪৭
শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট আত্মা ১৪২
শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা ১৪১
শরীরের ধর্ম ৯৪; শশশৃঙ্গ ২৩৮

শাক্যকুল ২১৩; শাশ্বত সুখ ২২৬
শাস্ত্র ৪২, ৪৬, ৪৮, ৬১-৬৩, ৯২, ৯৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ২০০, ২০৩-২০৫
শাস্ত্র (স্বর্গলোকের প্রমাণ) ১৩
শাস্ত্র নিয়োগ করে ২১; শাস্ত্রকথা ৬৪
শাস্ত্রকার ২২৮
শাস্ত্রকে এই দৃষ্টিতে দেখতে হবে ৯৬
শাস্ত্রজ্ঞ ৪৪
শাস্ত্র প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান ৫৪
শাস্ত্রীয় জ্ঞান ৪৬; শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ৪৬
শাস্ত্রীয় সাধন ৪৬
শাস্ত্রের তাৎপর্য ৪৫, ৬৪, ৬৭, ৮৯, ১২৮
শাস্ত্রের প্রয়াস ৯৬; শাস্ত্রের প্রামাণ্য ১৩
শাস্ত্রের বিধান ১৪; শিক্ষার সূচনা ১৯
শিক্ষালাভ ১৯-২০
শিবানন্দজী মহারাজ ১২৭
শুক্তিতে রজতভ্রম ২৩৭
শুদ্ধচৈতন্য ১৯৬, ২০৩, ২০৬
শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ২৩০, ২৩৮
শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ ১৯০
শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য ১০১
শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা ১৪৮
শুদ্ধ বুদ্ধি ১৫২, ২৫৫
শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ৮২
শুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতি ১৩১
শুদ্ধ মন ১৫৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০
শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক ১৮৬
শুদ্ধ সত্ত্ব ২৪৭
শুদ্ধ ১০৩, ১৮০, ১৮৬-১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২৫৫, ২৫৬
শুদ্ধ সংস্কার ১০৩
শুদ্ধ স্বরূপ ১০৩, ১১২, ১৮৬
শুদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি ১২০
শুদ্ধি ১৩৬, ১৩৮, ১৫৩
শুদ্ধি (মনের) ৬৪, ৭১, ৮২
শুভঙ্করী ১৫২; শৈলোপদেশ ১২৯
শ্রদ্ধা ২; শ্রদ্ধাবান ১৪
শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে যোগাভ্যাস ১৫৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৮, ১৫২, ২০০, ২৮৪
শ্রীরামকৃষ্ণ (বলেছেন) ৯, ৬২, (এককথায়) ৬৪, ১০৫; শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন ১০৮
শ্রীরামকৃষ্ণও এসম্বন্ধে বারবার আমাদের সতর্ক করেছেন ১৭৭
শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ১৩৩, ১৭৪, ১৮৬, ২৩০, ২৪০, ২৫৭
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ১৫২, ১৭৭
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ১০৫, ২৪১
শ্রীরামকৃষ্ণ বড় বড় কথা শুনলে অনেক সময় বিরক্ত হতেন ১৭৭
শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তটি চমৎকার ১১৩
শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ১৮৩
শ্রীরামকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য ২৩২
শ্রুতি ২১, ৩৪, ৫৫, ৯৪, ৯৬, ৯৮-৯৯, ১৪২, ১৬০, ২০৪, ২১৭, ২৪৮
শ্রুতি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন না ৯৫
শ্রুতি-অনুসারী তর্ক ৯৮
শ্রুতির উদ্দেশ্য ২০৩
শ্রেয় (পরিণামে রমণীয়) ৩৬, ৩৯, ৪০
শ্রেয় আর প্রেয় ৪০, ৪৩
শ্রেয়কে অবলম্বন ৩৭; শ্রেয়োমার্গ ৪৩
ষড়্ভাববিকার ৯২; ষষ্ঠেন্দ্রিয় ১৬৪
সকলের সত্তা সেই আত্মসত্তা ১১৪
সকাম উপাসনা ১; সকাম ক্রিয়াকর্ম ১
সংকল্পবিকল্পরহিত ১১২
সংখ্যা ১৯৯, ২০০; সঞ্চিত কর্মফল ২১৬
সৎ ১৪০
সৎ অর্থে অস্তিত্ববান নয় ৯৪
সৎ অর্থে তিনি অনস্তি নন ৯৬
সৎ ও অসতের বিবেক ১৪৩
সৎ হলে তার জগতের বোধ বাধিত হতো না ২৩৯
সৎ-চিদ্-আনন্দ ৯৪
সৎ-চিদ্-আনন্দ-স্বরূপ ১৭৯
সত্তা ১০১, ১০৮, ১৭২, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ১৯২, ১৯৫, ২২৪, ২৩৯; সত্তা (নির্বাধ) ১৮২
সত্তাবান ২২৮

সত্য ৬৪, ৭৬, ৮৭, ১৩৬, ২২৯, ২৪০, ২৪১; সত্য কি? ৯৯
সত্য এবং মিথ্যা ৮৩,
সত্য হলো বস্তুতন্ত্র ৯৯
সত্যতা (কথার) ৫
সত্যত্ব অর্থক্রিয়াকারিত্ব ৯৯
সত্যনিষ্ঠ ৫; সত্যপরায়ণ ৫
সত্যরক্ষা ৫; সত্যসংকল্প (যমরাজ) ৩০
সত্যের লক্ষণ ২৪১; সদাপ্রকাশশীল ৭৬
সনৎকুমার ১৪০; সনাতন ২৩৫, ২৩৮
সনাতন ব্রহ্মকে জানলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি ২১৭
সন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমাধান ৮৯
সন্দেহ ৯৭, ২৩০
সন্দেহ-এর অবকাশ ৮৪, ৯৭
সন্ধ্যা (গায়ত্রীতে লয়) ৭৮
সপ্তর্ষি ৬৯; সভ্য (অগ্নি) ১৩৭
সমাজ ১২৬, ১২৯
সমাজব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হবে ১০৩
সমাধান ৯৬, ১০১
সমাধি ৬৫, ১২৭, ১৭৭
সম্প্রদায় ৭২; সম্বন্ধ ২০২
সম্বন্ধ (কার্যকারণ) ৮২
সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) ৮৬
সম্বন্ধ (ধর্মধর্মি) ৯৭
সম্বন্ধ (নাশ্য-নাশক) ৮২
সম্বন্ধ (সংযোগ) ২০১
সম্বন্ধ (সাক্ষাৎ) ২০১
সম্বন্ধ (স্ব-স্বামিত্ব) ৯৬, ২০৯
সম্বন্ধ তাঁকে নিয়ে (সমস্ত) ১১২
সম্বন্ধে ষষ্ঠী ৭৫
সর্ব তাঁর উপরে অধ্যস্ত ১১৫
সর্বকারণাতীত ১৮০
সর্বকারণের অতীত সত্তা ১৮৯
সর্বজ্ঞানের অধিষ্ঠান হৃদয় ২০২
সর্বত্যাগ ১২৯; সর্বধর্মবর্জিত ২৩১
সর্বধর্মবিশিষ্ট ১১৬; সর্বনাশ ১৬৭
সর্বনিয়ন্তা ১৩৪
সর্বপ্রকারতা থেকে ভিন্ন ১০১
সর্বভাবের উৎস হৃদয় ২০২
সর্ববস্তুর স্বরূপ ১১২; সর্ববাদিসম্মত ২৪২
সর্ববাদিসম্মত (লক্ষণ) ৭৬
সর্ববিক্রিয়ারহিত ৮১
সর্ববিক্রিয়াশূন্য ২৩১
সর্ববিশেষশূন্য ১০১
সর্বব্যবহারের অতীত ৭৮
সর্বব্যাপক ১৪৮, ১৮৮
সর্বব্যাপক আত্মা ১৮৮
সর্বব্যাপিত্বে বাধা ৮৯
সর্বব্যাপী ১৭৮, ১৮২
সর্বভূতে একমাত্র আত্মাকে অনুভব করেন ১৮৭; সর্বভূতের অন্তরাত্মা ২২৩
সর্বভূতের অন্তর্যামী ১৩৩
সর্বশেষ কারণ ব্রহ্ম ১৮৫
সর্বসংহারক মৃত্যু ১৩৪
সর্বস্ব (যজ্ঞে দিতে হয়) ৪
সর্বস্ব ত্যাগ (করে আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ কল্পনাতীত) ৩৯
সর্বস্ব দান (আত্মজ্ঞানের মূল) ৪৩
সর্বাত্মা ১৯৯; সর্বানুস্যূত ১৪৮
সর্বাপেক্ষা মহৎ; সর্বব্যাপক পরমাত্মা ২৩৮
সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ৯৯
সর্বোত্তম পরমাত্মা ২৩৫
সহকারী (কর্মের) ৭০; সহবৃত্তিত্ব ১১৬
সংযম ১৩১; সংযত মন ১৩১
সংশয় ২৩, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৬৪, ৭৬, ৮৪, ১৫৮, ১৬৬
সংশয়-এর কারণ ৬৩
সংশয়-বিপর্যয় ৬৭
সংশয়-বিপর্যয়রহিত ৬৭
সংশয়ের উত্তর ২৩৩
সংসার ১৭৩, ১৯৪
সংসার গতি ৫১, ১৪৩
সংসার-ধর্মবর্জিত ৫৮
সংসার-ধর্ম বর্জিত আত্মা ২২৫
সংসার-ধর্ম বিশিষ্ট ৬১
সংসার-ধর্মের অতীত ৬১
সংসারকে অতিক্রম ২৩১
সংসার বন্ধন ১৯৪, ২৪৫
সংসারবৃক্ষ ২৩৫

সংসারবৃক্ষ ব্রহ্মমূল থেকে উৎপন্ন ২৩৫
সংসারবৃক্ষের পলাশ বা পত্র ২৩৭
" প্রবাল ও অঙ্কুর ২৩৭
" ফল ২৩৭
" বীজ ২৩৭
" মূল ২৩৭
" বর্ণনা ২৩৬
" স্কন্ধ ২৩৭
সংসারের মূল ২৩৭
সংস্কার (বিপরীত) ৬২, ৬৩, ৬৪, ১৭১, ১৮৬, ২১৯
সংহার ১৩২, ১৩৪; সাকার ২২৮
সাক্ষাৎ অনুভব ২৪১; সাক্ষাৎকার ৬৮
সাক্ষাৎভাবে ৭৭
সাক্ষী ১১২, ১৩৭, ১৪০
সাক্ষী চৈতন্য ১৭৮
সাক্ষী পাখি ১৬০
সাগ্নিক ১৩৭; সাংখ্য ১৯৪, ১৯৯
সাংখ্য মতে পুরুষ ১৯৯
সাধক ৭০, ৮০, ৮৩, ১৩০, ১৪৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৯৮
সাধন ৬৫, ৬৮, ৭৭, ১৩০, ১৭৭, ১৮৬
সাধনসম্পন্ন ১৩২
সাধনা ৯০, ১৫১, ১৭০
সাধনার ধন কিছুই ফেলা যায় না ২১৪
সাধনার গতি প্রতিহত ১৩১
সাধনের গোড়ার কথা ১৭৬
সাধু ৫, ৬৯, ১৭১; সাধ্য ২৪
সাধ্যের সংশয় ২৪; সাবয়ব রূপ ২২৮
সামান্য জ্ঞান ১১৪; সাম্য ৮৪
সার কথা (বেদান্তের) ৮৭
সার কথা ২৫১
সারথি ১৪২; সার্কাস ১৫২
সিদ্ধ (প্রারব্ধ) ৮৭
সিদ্ধ (বৈদিক ব্যবহার) ৮৭
সিদ্ধান্ত ৫৯, ৭২-৭৫, ৮৪-৮৯, ৯১, ৯৫-৯৭, ১০১, ১০৫, ১৩০, ১৪৪, ১৬৬, ২০৫, ২৪১, ২৪২
সিদ্ধান্ত (শঙ্করের) ২৩৯
সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ৯৯
সিদ্ধান্তের হানি ২৩; সিংহশাবক ১৮৯
সুখ ২৫, ৩২, ৪১, ৬৬
সুখ (অনিত্য) ৩৭, ৪১
সুখ আকারবিশিষ্ট বস্তু নয় ২২৮
সুখ ও দুঃখ ৯৪, ১৬০
সুখ-কল্পনার পরিসমাপ্তি ২২
সুখদুঃখ ২৪৫, ২৫১
সুখদুঃখ (আত্মাতে নেই-ই) ৫৭, ৬১
সুখদুঃখ থেকে মুক্তি ৫৭
সুখদুঃখ (ভোগ) ৪৯, ৫৭
সুখদুঃখাদি ফল ৬৮
সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম ২২২
সুখদুঃখাদির অনুভব ১৩৫, ১৬০
সুখদুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট ১০৭
সুখদুঃখাদির হাত থেকে নিষ্কৃতি ১০২
" অতীত (অবস্থা) ৫৭
" কারণ ৫৭
" দাস ৫৭
সুখস্বরূপ ১৮৪, ২২৬-২২৮
সুখাকার বৃত্তি ৬৬
সুখাকারা বৃত্তি ১৫০, ২২৮
সুষুপ্তি ১৭১, ২৩১, ২৪৯, ২৫০
সুসাইটি ১৫২
সূক্ষ্ম আর স্থূলের তফাত ১৫৩
সূক্ষ্মতম (আত্মা) ৫১
সূক্ষ্মতা (আত্মার) ১৫৩
সূক্ষ্মতা (জড়ের) ১৫৩
সূক্ষ্মতা আর শুদ্ধি ১৫৩
সূক্ষ্মবুদ্ধি ১৫০, ১৬৭
সূক্ষ্মশরীর ২১৫
সূর্য ৯১, ৯৫, ১৫০, ২২৯, ২৩২
সূর্যই জীবমাত্রের দর্শনের হেতু ২২৩
সৃষ্টি ১৭২, ১৭৩, ১৭৮-১৭৯, ১৯৮, ২৪৯; সৃষ্টিকর্তৃত্ব ৮১
সৃষ্টিতত্ত্ব ১৩৯
সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা ৮১
" ক্রমকল্পনা ১৪৭
সৃষ্টির মুখ ৮০; সেন্ট ম্যাথিউ ৩১

সেতু ১৩৮; সোনার তলোয়ার ১০৪
সোনার পাথরবাটি ৩২
সোমযাগ ১৩, ৭০, ১৯৮, ২৪৯
সোমরস ১০৫, ১৬১, ১৯৯
সৌরমার্গ ৪৭, ৪৮; স্তুতি ৭৩
স্থান (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের) ২০১
স্থায়িত্ব ৫৩; স্থায়িত্বশীল ১৬২
স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ১২৯
স্থিতি (আত্মাতে) ৬০
স্থিতি-গতি, নিত্যত্ব-অনিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম ১১৬
স্থিতিশীলতা ৫৩; স্থির সিদ্ধান্ত ১০৫
স্থূলসূক্ষ্মের পার্থক্য ১৫৩
স্থূলঅভিব্যক্তি ১৫৪; স্থূলবিষয় ১৫৭
স্থূলশরীরাকাশ ১৩৫; স্পর্শমণি ১০৪
স্ফটিক ৬১-৬২, ১০৯, ১৯২
স্ফটিক-এ আরোপিত রঙ ২৩০
স্ফটিক-এর স্বচ্ছতা ১৯৩
স্ফোট ৭৫, ৭৯
স্মরণীয় (বিশেষভাবে) ৯৫
স্মৃতি ২১৯; স্বগতভেদ ১৮২
স্বচ্ছ ৬৫, ১১৬, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৩, ২৪৭, ২৪৮; স্বতন্ত্রপ্রমাণ ৯৯
স্বতঃ ১০১, ১৪২, ১৬৮, ১৭৬
স্বপ্ন ৮৮, ১০৬, ১৫৭, ১৭৮, ২৩১
স্বপ্ন আর স্মৃতিতে পার্থক্য ২১৯
স্বপ্ন সম্বন্ধে ধারণা ২১৮
স্বপ্নবস্তু ২১৯, ২৪৯; স্বপ্নবিলাস ১০৭
স্বপ্নাবস্থা ২১৯; স্বপ্নের নিবৃত্তি ৮৮
স্বপ্রকাশ ৫৮, ৬০, ৭৫, ৯০, ৯৫, ১০১, ১৩৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৬৮, ১৭৫, ১৯০, ২২৭-২২৯, ২৩৩, ২৫৬
স্বপ্রকাশ বস্তু ৫৯, ৬৩
স্বপ্রতিষ্ঠ ৯৫; স্বমহিমা ৭৫, ১০১
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ৭৫, ১৬৪, ২০০
স্বয়ংকৃত কর্ম ১৩৬
স্বরূপ ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭৮, ৮৮, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১৩৮, ১৪৮, ১৬০, ২০৩, ২৫৫
স্বরূপকে জানবার চেষ্টা ১১২
স্বরূপ অপ্রতিহত ১৬২
স্বরূপতাপ্রাপ্তি ৮০; স্বর্গরাজ্য ১৬৪
স্বর্গসাধন অগ্নি ২১; স্বর্গ সুখ ৭০
স্বর্গাদি ফল ৭৯
স্বর্গাদিভোগ ১০৫
" লাভ ৬৭
" লোক ১১-১৫, ১৭, ৩৭, ৪৪
স্বর্গাদি সুখ ৬৭; স্বয়ংবেদ্য ২০
স্বাতীনক্ষত্রের জল ১৩০
স্বামী তুরীয়ানন্দ ২৫৮, ২৫৯
স্বামী বিবেকানন্দ ৩, ৩২, ৩৮, ৮৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৮৯, ২১৫
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৪৬
স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১২৭
" সারদানন্দজী মহারাজ ১২৭
হননকারী ১০৩
হননক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম ১০৩
হানি (অদ্বৈতের) ৮৩
" (সিদ্ধান্তের) ৮৪; হিন্দুশাস্ত্র ২১৫
হিরণ্যগর্ভ ১৭, ২৭, ৫৬, ৭৯-৮১, ৯৩, ১৩৭, ১৫৪, ১৭৯-১৮২, ১৮৫, ২৩৭
হিরণ্যগর্ভ (জগতের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ) ১৭
হিরণ্যগর্ভ (সৃষ্টির মুখ, দ্বার) ৮০
হিরণ্যগর্ভ কে? ৮০
হিরণ্যগর্ভত্ব ৪৬, ৫৬, ১৩৮
হিরণ্যগর্ভস্বরূপতা ৮০
হিরণ্যগর্ভের লোক ৪৮
হীনতাদোষ ২৬৪; হৃৎকম্প ২১৫
হৃদয় ৮৮, ১১০, ১৩৫, ১৩৭, ১৬৭, ১৮১, ১৮৭-১৮৮, ১৯০, ২০১, ২০২, হৃদয় অবকাশ ১১০, ১৩৫
হৃদয় আকাশ ১৭৯, ১৮৮, ১৯০
হৃদয়রূপ গুহা ১০৯; হৃদয়সীমা ১৮৮
হৃদয়ান্তর্বর্তী আকাশ ১৮৮
হৃদয়াকাশস্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ২০৩
হোতা ১৯৮